বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক [redacted]

মাঘ ১৩৪৯ | আষাঢ় ১৩৫০

বিশ্বভারতী পত্রিকা

মাঘ ১৩৪৯

বিষয়সূচী

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতবর্ষের ভৌগলিক রূপ	- শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন	৪০৭
জন্ম ও জাতি	- শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৪১৬
সেকালের কাব্যকলা	- শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ	৪২১
দুই সন্ধানী	- শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৪২
পত্রাবলী	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৪৭
কাঠের রাজা	- বীরবল	৪৫৫
ভারতীয় সাধনার ইঙ্গিত	- শ্রীঅবনী নাথ রায়	৪৫৮
স্বরলিপি	- শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী	৪৬২
সঞ্চয়ন		৪৬৪

প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে-সকল মনীষী নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন শান্তিনিকেতনে তাঁহাদের আসন রচনা করাই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যসাধনের অন্যতম উপায়রূপে বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। শান্তিনিকেতনে বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন এবং শিল্পসৃষ্টিকার্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, শান্তিনিকেতনের বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে যে-সকল জ্ঞানব্রতী সেই একই লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই শ্রেষ্ঠ রচনা এই পত্রে একত্র সমাহৃত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গভীর ও বিস্তৃতভাবে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেশে এখন বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে, এবং সর্বত্র এই আলোচনার সূত্রপাতও হইয়াছে। আলোচনার সেই ব্যাপক প্রচেষ্টার সহিত যোগসূত্র স্থাপন করা এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে শিল্পকল্পনার ক্ষেত্রে যে-পরীক্ষার প্রাণবান প্রয়াস সজাগ ও সক্রিয়, এই পত্রিকার দ্বারা তাহার আত্মপ্রকাশের সুযোগ হইবে, পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এই আশা পোষণ করেন।

সম্পাদক
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক
শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

পরিচালকবর্গ
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন
শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীনন্দলাল বসু
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী পত্রিকা

ফাল্গুন ১৩৪৯

বিষয়সূচী

সেকালের কাব্যকলা	- শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ	৪৬৯
"সেল্‌ফ-ডিটারমিনেশান"	- শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী	৪৮৭
চেনাশোনা	- শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়	৫০১
আত্মকথা	- শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	৫০৮
শ্রীনিকেতন	- শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫১৬
পত্রাবলী	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫২২

প্রতিসংখ্যার মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে সকল মনীষী নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন শান্তিনিকেতনে তাঁহাদের আসন রচনা করাই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যসাধনের অন্যতম উপায়রূপে বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। শান্তিনিকেতনে বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন এবং শিল্পসৃষ্টিকার্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, শান্তিনিকেতনের বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে যে-সকল জ্ঞানব্রতী সেই একই লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই শ্রেষ্ঠ রচনা এই পত্রে একত্র সমাহৃত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গভীর ও বিস্তৃতভাবে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেশে এখন বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে, এবং সর্বত্র এই আলোচনার সূত্রপাতও হইয়াছে। আলোচনার সেই ব্যাপক প্রচেষ্টার সহিত যোগসূত্র স্থাপন করা এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে শিল্পকল্পনার ক্ষেত্রে যে-পরীক্ষার প্রাণবান প্রয়াস সজাগ ও সক্রিয়, এই পত্রিকার দ্বারা তাহার আত্মপ্রকাশের সুযোগ হইবে, পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এই আশা পোষণ করেন।

সম্পাদক
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক
শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

পরিচালকবর্গ

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন
শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীনন্দলাল বসু
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী পত্রিকা

চৈত্র ১৩৪৯

বিষয়সূচী

মহর্ষির ডায়েরী	-	৫৩৩
বনলতা	- শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৪০
সাহিত্যের রূপ ও সাহিত্যবোধ	- শ্রীমনোমোহন ঘোষ	৫৪৪
আত্মকথা	- শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	৫৪৯
চেনাশোনা	- শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়	৫৫৬
পত্রাবলী	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৬৩
স্বরলিপি	- শ্রীসমরেশ চৌধুরী	৫৭৬
সঞ্চয়ন	-	৫৮০

প্রতিসংখ্যার মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে-সকল মনীষী নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন শান্তিনিকেতনে তাঁহাদের আসন রচনা করাই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যসাধনের অন্যতম উপায়রূপে বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। শান্তিনিকেতনে বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন এবং শিল্পসৃষ্টিকার্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, শান্তিনিকেতনের বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে যে-সকল জ্ঞানব্রতী সেই একই লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই শ্রেষ্ঠ রচনা এই পত্রে একত্র সমাহৃত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গভীর ও বিস্তৃতভাবে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেশে এখন বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে, এবং সর্বত্র এই আলোচনার সূত্রপাতও হইয়াছে। আলোচনার সেই ব্যাপক প্রচেষ্টার সহিত যোগসূত্র স্থাপন করা এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে শিল্পকল্পনার ক্ষেত্রে যে-পরীক্ষার প্রাণবান প্রয়াস সজাগ ও সক্রিয়, এই পত্রিকার দ্বারা তাহার আত্মপ্রকাশের সুযোগ হইবে, পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এই আশা পোষণ করেন।

সম্পাদক
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক
শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

পরিচালকবর্গ

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন
শ্রীনন্দলাল বসু
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন
শ্রীপুলিনবিহারী সেন
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বিশ্বভারতী পত্রিকা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০

বিষয়সূচী

বিশ্বভারতী	- শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত	৬৬৭
হাতে খড়ী	- শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৭৪
আইভারী টাওয়ার	- শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী	৬৭৯
‘বলাকা’র যুগ	- শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ	৬৮৬
মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি	- শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী	৭০২
পত্রাবলী	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭১১
চেনাশোনা	- শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়	৭১৭
অন্নদামঙ্গল	- শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	৭২৪

প্রতিসংখ্যার মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে-সকল মনীষী নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন শান্তিনিকেতনে তাঁহাদের আসন রচনা করাই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যসাধনের অন্যতম উপায়রূপে বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। শান্তিনিকেতনে বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন এবং শিল্পসৃষ্টিকার্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, শান্তিনিকেতনের বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে যে-সকল জ্ঞানব্রতী সেই একই লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই শ্রেষ্ঠ রচনা এই পত্রে একত্র সমাহৃত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গভীর ও বিস্তৃতভাবে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেশে এখন বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে, এবং সর্বত্র এই আলোচনার সূত্রপাতও হইয়াছে। আলোচনার সেই ব্যাপক প্রচেষ্টার সহিত যোগসূত্র স্থাপন করা এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে শিল্পকল্পনার ক্ষেত্রে যে-পরীক্ষার প্রাণবান প্রয়াস সজাগ ও সক্রিয়, এই পত্রিকার দ্বারা তাহার আত্মপ্রকাশের সুযোগ হইবে, পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এই আশা পোষণ করেন।

সম্পাদক
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক
শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

পরিচালকবর্গ

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন
শ্রীনন্দলাল বসু
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন
শ্রীপুলিনবিহারী সেন
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বিশ্বভারতী পত্রিকা

আষাঢ় ১৩৫০

বিষয়সূচী

চণ্ডীদাসসমস্যা	- শ্রীসুখময় চট্টোপাধ্যায়	৭২৯
সমালোচনা	- শ্রীজীবেন্দ্রকুমার গুহ	৭৪৮
ভঙ্গী ও রীতি	- শ্রীনবেন্দু বসু	৭৫৩
নামকরণে রবীন্দ্রনাথ	- শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	৭৬৬
চিত্রশিল্পী ও শিক্ষাগুরু	- শ্রীমতী তরুণপ্রভা সিংহ রায়	৭৬৯
পত্রাবলী	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭৭৪
রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থসংখ্যা কত ?	- শ্রীসরোজকুমার বসু	৭৮১
শান্তিনিকেতনের অভিজ্ঞতা	- শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	৭৯০

প্রতিসংখ্যার মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে-সকল মনীষী নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন শান্তিনিকেতনে তাঁহাদের আসন রচনা করাই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যসাধনের অন্যতম উপায়রূপে বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। শান্তিনিকেতনে বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন এবং শিল্পসৃষ্টিকার্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, শান্তিনিকেতনের বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে যে-সকল জ্ঞানব্রতী সেই একই লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই শ্রেষ্ঠ রচনা এই পত্রে একত্র সমাহৃত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গভীর ও বিস্তৃতভাবে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেশে এখন বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে, এবং সর্বত্র এই আলোচনার সূত্রপাতও হইয়াছে। আলোচনার সেই ব্যাপক প্রচেষ্টার সহিত যোগসূত্র স্থাপন করা এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে শিল্পকল্পনার ক্ষেত্রে যে-পরীক্ষার প্রাণবান প্রয়াস সজাগ ও সক্রিয়, এই পত্রিকার দ্বারা তাহার আত্মপ্রকাশের সুযোগ হইবে, পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এই আশা পোষণ করেন।

সম্পাদক
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক
শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

পরিচালকবর্গ

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন
শ্রীনন্দলাল বসু
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন
শ্রীপুলিনবিহারী সেন
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বিশ্বভারতী পত্রিকা

প্রথম বর্ষ সপ্তম সংখ্যা

মাঘ ১৩৪৯

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপ কি ভাবে ক্রমশ অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠেছে, সৌভাগ্যবশত তার আদি ইতিহাসটুকু রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই পাচ্ছি।— "যখন বালক ছিলুম ঘরের কোণের বাতায়নে ব'সে দেশের প্রাকৃতিক রূপকে অতি ছোটো পরিধির মধ্যেই দেখেছি। বাইরের দিক্ থেকে দেশের এমন কোনো মূর্তি দেখিনি যার মধ্যে দেশের ব্যাপক আবির্ভাব আছে। বিদেশী বণিকের হাতে গড়া কলকাতা শহরের মধ্যে ভারতের এমন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না যা সুগভীর ও সুদূর-বিস্তৃত। সেই শিশুকালে কোণের মধ্যে অত্যন্ত বেশি অবরুদ্ধ ছিলাম ব'লেই ভারতবর্ষের বৃহৎ স্বরূপ চোখে দেখবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল।

এমন সময়ে আমার আট নয় বছর বয়সে গঙ্গাতীরের এক বাগানে কিছুকালের জন্যে বাস করতে গিয়েছিলাম। গভীর আনন্দ পেলাম। গঙ্গানদী ভারতের এক বৃহৎ পরিচয়কে বহন করে। ভারতের বহুদেশ বহুকাল ও বহুচিত্তের ঐক্যধারা তার স্রোতের মধ্যে বহমান। এই নদীর মধ্যে ভারতের একটি পরিচয়-বাণী আছে। হিমাদ্রির স্কন্ধ থেকে পূর্ব-সমুদ্র পর্যন্ত লম্বমান

এই নদী। সে যেন ভারতের যজ্ঞোপবীতের মতো, ভারতের বহুকালক্রমাগত জ্ঞান ধর্ম তপস্যার স্মৃতিযোগসূত্র।

তারপর আর কয়েক বৎসর পরেই পিতা আমাকে সঙ্গে ক'রে হিমালয় পর্বতে নিয়ে যান।...এই প্রথম দেখেছি হিমালয় পর্বতকে।...হিমালয় এমন একটি চিরন্তন রূপ যা সমগ্র ভারতের— যা একদিকে দুর্গম, আরেক দিকে সর্বজনীন" (বৃহত্তর ভারত, কালান্তর)।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের ধ্যানদৃষ্টিতে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপটিও যে-আলোকে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে সে আলোক হচ্ছে পুণ্যের আলোক, সত্যের আলোক, কল্যাণের আলোক। ভারতবর্ষের বাইরের রূপটিকেও তিনি তাঁর অন্তরের আলোকেই উজ্জ্বল ক'রে দেখেছেন এবং তার কাছে হৃদয়ের ভক্তির অঞ্জলি অর্পণ করেছেন। ভারতবর্ষের এই অপূর্ব কল্যাণময় পুণ্যমূর্তি রবীন্দ্রকাব্যে যেভাবে ফুটে উঠেছে আর কোনো কবির রচনাতে তার তুলনা দেখিনে। ভারতবর্ষের নদী-পর্বত-প্রান্তরের বাহ্য সৌন্দর্য, বাহ্য গৌরব ও বাহ্য বিশালতার বর্ণনাই সাধারণত দেখি আমাদের সাহিত্যে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভারত-দৃষ্টিতে যে একটি অপূর্ব মহিমা ফুটে উঠেছে তা অতুলনীয়। পূর্বে তাঁর রচনা থেকে যে-সমস্ত গদ্যাংশ উদ্ধৃত করেছি তাতেও দেখা গিয়েছে ভারতের ভৌগোলিক মূর্তিকেও তিনি কি শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিলেন। মহাভারতবর্ষ, বৃহৎ ভারতভূমি, ভারতের মহাক্ষেত্র, ভারতের পুণ্যভূমি, ভারত-তীর্থ প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগের মধ্যে যে শ্রদ্ধানত মনোভাবটি ফুটে উঠেছে, তাঁর কবিতায় ও গানে তাই পূজা ও আত্মনিবেদনের সুরের সঙ্গে মিলিত হয়ে অপূর্ব মহিমায় মহিমান্বিত হ'য়ে উঠেছে।—

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি দেখা দিলে আজ কী বেশে।
দেখিনু তোমারে পূর্বগগনে, দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
ললাট তোমার নীল নভতল,
বিমল আলোকে চির উজ্জ্বল
নীরব আশিস সম হিমাচল
তব বরাভয় কর,—

সাগর তোমার পরশি চরণ
পদধূলি সদা করিছে হরণ ;
জাহ্নবী তব হার-আভরণ
দুলিছে বক্ষ 'পর।
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে, হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা মোর সনাতন স্বদেশে।

এ দৃষ্টি হৃদয়ের দৃষ্টি। অন্তরের রূপ দেখতে হ'লে অন্তরের দৃষ্টিই চাই। বাহ্য দৃষ্টিতে অন্তরের রূপ ধরা পড়ে না। ভারত-তীর্থ কবিতাটির প্রথমেই আছে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপের ধ্যান, তার পরে আছে তার ঐতিহাসিক ও ভাবরূপের স্তবমন্ত্র। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক স্বরূপকেও অন্তরের দৃষ্টিতে দেখার সাধনা প্রকাশ পেয়েছে ওই প্রথমাংশটিতে। তাই তো তিনি বলতে পেরেছেন—

ধ্যান-গম্ভীর এই যে ভূধর
নদীজপমালাধৃত প্রান্তর
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

গায়ত্রীমন্ত্রের প্রথমেই ভূর্ভুবঃ স্বঃ ব'লে চিত্তকে জগতের বিশ্বমূর্তির ধ্যানে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। এও যেন ঠিক সেই রকম ভারতবর্ষের সত্যস্বরূপকে অন্তরে ধারণা করবার পূর্বে তার ভূস্বরূপের ধ্যানের উদ্বোধন-মন্ত্রবিশেষ।

এই ভারতভূমি শুধু যে পুণ্যভূমি তা নয় ; সে যে আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের "জনকজননী-জননী"। এই কল্যাণরূপিণী ভারতভূমির কল্যাণ-হস্তের স্পর্শে বিশ্বপৃথিবী কৃতার্থতা লাভ করেছে।—

অয়ি ভুবন মনোমোহিনী,
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী,
অয়ি জনকজননী-জননী!
নীলসিন্ধুজলধৌত-চরণতল,
অনিলবিকম্পিতশ্যামল-অঞ্চল,

অম্বরচুম্বিতভাল হিমাচল,
শুভ্রতুষারকিরীটিনী।...
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবীযমুনা বিগলিতকরুণা
পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী।

যে দেবতাত্মা হিমালয় পর্বত কালিদাসের লেখনীতে বিরাট্ ভারতাত্মা রূপ ধারণ ক'রে আমাদের চিত্তকে অভিভূত করে, সেই ধ্যানগম্ভীর ভূধরটিও কি-ভাবে রবীন্দ্রনাথের বালক-বয়সেই তার মনে একটা বিশাল ও গম্ভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। পরিণত বয়সেও ওই হিমাদ্রি তাঁর চিত্তে কি অপূর্ব মূর্তিতে প্রতিভাত হয়েছে, তার প্রমাণ রয়েছে 'উৎসর্গ' কাব্যে।—

তুমি আছ হিমাচল, ভারতের অনন্তসঞ্চিত
তপস্যার মতো।...
একদিন এ ভারতে বনে বনে হোমাগ্নি-আহুতি
ভাষাহারা মহাবার্তা প্রকাশিতে করেছে আকূতি,
সেই বহ্নিবাণী আজি অচল প্রস্তরশিখারূপে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে কোন্ মন্ত্র উচ্ছ্বাসিছে মেঘধূম্রস্তূপে।
......ভারতের হৃদয়-সমুদ্র এতকাল
করিয়াছে উচ্চারণ উর্ধ্বপানে যে বাণী বিশাল,—
অনন্তের জ্যোতিস্পর্শে অনন্তেরে যা দিয়েছে ফিরে,
রেখেছ সঞ্চয় করি, হে হিমাদ্রি, তুমি স্তব্ধ শিরে।
তব মৌন শৃঙ্গমাঝে তাই আমি ফিরি অন্বেষণে
ভারতের পরিচয় শান্ত-শিব-অদ্বৈতের সনে।

রবীন্দ্রনাথের এই যে ভারত-দৃষ্টি যার ফলে তিনি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সত্তার মধ্যে তার মানস সত্তার রূপ দেখ্‌তে পান, সে দৃষ্টি ভারতবর্ষেরই সনাতন দৃষ্টি। এ দৃষ্টির পরিচয় পাই ভারতবর্ষেরই পুরাণে এবং মহাভারতে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ দৃষ্টি ঠিক আধুনিক কালের স্বাদেশিকতার অর্থাৎ

Patriotism-এর দৃষ্টি নয়, এ দৃষ্টি হচ্ছে ভারতেরই ধ্যানদৃষ্টি। বিষ্ণুপুরাণের 'ভারতবর্ষবর্ণন' অধ্যায়ে এই দৃষ্টির অতি চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥...
অত্র ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতোহি কর্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ॥ ..
গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ২।৩।১, ২২, ২৪

অর্থাৎ সমুদ্রের উত্তর এবং হিমালয়ের দক্ষিণবর্তী যে ভূভাগ ভারতবর্ষ নামে খ্যাত জম্বুদ্বীপের সমস্ত দেশের মধ্যে এটিই শ্রেষ্ঠ। কেননা, অন্য সব দেশই ভোগভূমি, কিন্তু ভারতবর্ষ হচ্ছে কর্মভূমি। তাই দেবতাদের মধ্যেও ভারতবর্ষের এই গৌরবগীতি প্রচলিত আছে যে, "ভারতভূমি হচ্ছে স্বর্গ ও ধর্মাদি অপবর্গ লাভের মার্গ স্বরূপ, সেই ভারতভূমিতে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা দেবতাদের চেয়েও ধন্য"। লক্ষ করবার বিষয় এই যে, অন্য সমস্ত দেশই ভোগভূমি কিন্তু ভারতবর্ষ হচ্ছে কল্যাণ ও পুণ্য-কর্মের ভূমি এবং সে-জন্যেই পুরাণে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতা ঘোষিত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথও তাঁর বহু প্রবন্ধে ঠিক এই কথাটিই নানা যুক্তিতর্ক দ্বারা আমাদের কাছে প্রতিপন্ন করেছেন। আরও লক্ষ করা উচিত যে, পুরাণে ভারতভূমিকেই স্বর্গাপবর্গ-স্বরূপ মানুষের পরমার্থ লাভের মার্গ ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পুরাণ-কথিত 'ভারতমার্গ' আর রবীন্দ্রব্যাখ্যাত 'ভারতপথ' একই বস্তু। জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ, ভক্তিমার্গ প্রভৃতি সমস্ত মার্গের সমন্বয়স্থল-স্বরূপ যে মহামার্গ, তারই নাম ভারতমার্গ।

যা-হোক, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সত্তার এই যে ভাবস্নাত রূপের পরিচয় পেলাম পুরাণে, তার পূর্ণতর পরিচয় পাই মহাভারতে। বৃহৎ ভারতবর্ষের

একটি গভীর পরিচয় সংহত হ'য়ে আছে মহাভারত নামটির মধ্যেই। ভারতবর্ষীয় ভূসত্তার যে অপূর্ব রূপ ভারতীয় অন্তরের আলোকে উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে উঠেছে তার মর্মকথাও রবীন্দ্রনাথই আমাদের জানিয়েছেন।— "ভারতবর্ষের একটি সম্পূর্ণ ভৌগোলিক মূর্তি আছে। এর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত যে-একটি সম্পূর্ণতা বিদ্যমান, প্রাচীন কালে তার ছবি অন্তরে গ্রহণ করার ইচ্ছে দেশে ছিল দেখতে পাই।··· ভারতবর্ষের ভৌগোলিক স্বরূপকে অন্তরে উপলব্ধি করবার একটি অনুষ্ঠান ছিল, সে তীর্থভ্রমণ। দেশের পূর্বতম অঞ্চল থেকে পশ্চিমতম অঞ্চল এবং হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত সর্বত্র এর পীঠস্থান রয়েছে, সেখানে তীর্থ স্থাপিত হ'য়ে একটি ভক্তির ঐক্যজালে সমস্ত ভারতবর্ষকে মনের ভিতরে আন্‌বার সহজ উপায় সৃষ্টি করেছে।

ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ। একে সম্পূর্ণভাবে মনের ভিতরে গ্রহণ করা প্রাচীন কালে সম্ভবপর ছিল না। আজ সার্ভে ক'রে মানচিত্র এঁকে ভূগোল-বিবরণ গ্রথিত ক'রে ভারতবর্ষের যে ধারণা মনে আনা সহজ হয়েছে, প্রাচীন-কালে তা ছিল না। এক হিসাবে সেটা ভালোই ছিল। সহজ ভাবে যেটা পাওয়া যায়, মনের ভিতরে তা গভীরভাবে মুদ্রিত হয় না। সেইজন্য কৃচ্ছ্র সাধন ক'রে ভারত-পরিক্রমা দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ হ'তো, তা সুগভীর এবং মন থেকে সহজে দূর হ'তো না।

···সমস্ত ভারতবর্ষকে অন্তরে-বাহিরে উপলব্ধি করবার প্রয়াস ছিল ধর্মানুষ্ঠানের অন্তর্গত। মহাভারত-পাঠ যে আমাদের ধর্ম-কর্মের মধ্যে গণ্য হয়েছিল তা কেবল তত্ত্বের দিক্ থেকে নয়, দেশকে উপলব্ধি করবার জন্যও এর কর্তব্যতা আছে। আর, তীর্থযাত্রীরাও ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে দেশকে স্পর্শ করতে করতে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে ক্রমশ এর ঐক্যরূপ মনের ভিতরে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছেন" (প্রবাসী—১৩৪৪, অগ্রহায়ণ, পৃঃ ২৪৪)।

ভারতবর্ষের যা সত্য পরিচয় তার "আলোকেই যদি নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করতে পারি 'তা-হ'লেই আমরা ধন্য। আমরা যে ভারতবর্ষে জন্ম লাভ করেছি সে এই মুক্তি-মন্ত্রের ভারতবর্ষে, সে এই তপস্বীর ভারতবর্ষে। এই কথাটি যদি ধ্রুব ক'রে মনে রাখতে পারি তা-হ'লে আমাদের সকল কর্ম

বিশুদ্ধ হবে, তা-হ'লে আমরা নিজেকে বিশুদ্ধ ক'রে ভারতবাসী বলতে পারব" ('বৃহত্তর ভারত', কালান্তর)।

কিন্তু যে সত্য ভারতবর্ষ অন্তরে উপলব্ধি করেছিল, তার "আলোক-দীপ্তি ভারতবর্ষ নিজের মধ্যে বদ্ধ রাখতে পারেনি। এই আলোকের আভাতেই ভারত আপন ভূখণ্ড-সীমার বাইরে আপনাকে প্রকাশ করেছিল"। আর, সত্যের আলোকে আত্মপ্রকাশের এই প্রেরণাতেই "আপন সীমার বাধা সে ভাঙ্‌তে পেরেছে, বাইরের ভৌগোলিক বাধাও সে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। এইজন্যেই ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্যকে জান্‌তে হ'লে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে ব'সে ধূলি-কলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল ক'রে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে" (ঐ)।

আধুনিক কালের পরিক্রমার দ্বারা যাঁরা ভারতবর্ষকে ঘনিষ্ঠ ও সত্যরূপে অন্তরে উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। কিন্তু ভারতবর্ষকে সত্যতর রূপে এবং নিত্য কালের আলোকে উজ্জ্বলতর রূপে প্রত্যক্ষ করার অভিপ্রায়ে তিনি যাত্রা করলেন বৃহত্তর ভারত পরিক্রমায়। গেলেন চীনে-জাপানে, সিয়ামে-ব্রহ্মে, জাভায়-বালীতে। ভারতবর্ষের সীমার বাইরে বৃহত্তর ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দূরের থেকে স্বদেশের মূর্তিকে তিনি যে নূতন দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলেন, তার কথা বলেই এই অলোচনা সমাপ্ত করব। বালী-দ্বীপের রাজা যখন প্রসঙ্গ-ক্রমে "সুমেরু-হিমালয়-বিন্ধ্য-মলয়ঋষ্যমূক, গঙ্গা-যমুনা-নর্মদা-গোদাবরী-কাবেরী-সরস্বতী" প্রভৃতি ভারতীয় পুরাণোক্ত ভৌগোলিক নামমালা আবৃত্তি ক'রে গেলেন, তখন রবীন্দ্রনাথের মনে কি সুগভীর শ্রদ্ধা-মিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হয়েছিল তার পরিচয় রয়েছে তাঁর জাভা-যাত্রীর পত্রে।—

"আমাদের ইতিহাসে একদিন ভারতবর্ষ আপন ভৌগোলিক সত্তাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিল। তখন সে আপনার নদী-পর্বতের ধ্যানের দ্বারা আপন ভূমূর্তিকে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিয়েছিল। তার তীর্থগুলি এমন ক'রে বাঁধা হয়েছে—দক্ষিণে কন্যাকুমারী, উত্তরে মানস-সরোবর, পশ্চিম সমুদ্রতীরে দ্বারকা, পূর্বসমুদ্রে গঙ্গাসংগম—যাতে ক'রে তীর্থ-ভ্রমণের দ্বারা

ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ রূপটিকে ভক্তির সঙ্গে মনের মধ্যে গভীর ভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। শুধু ভারতবর্ষের ভূগোল জানা যেত তা নয়, তার নানাজাতীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আপনিই হ'তো। সেদিন ভারতবর্ষের আত্মোপলব্ধি একটা সত্য সাধনা ছিল ব'লেই তার আত্মপরিচয়ের পদ্ধতিও আপনিই এমন সত্য হ'য়ে উঠেছিল।···

সেদিনকার ভারতবর্ষের এই আত্মমূর্তি-ধ্যান সমুদ্র পার হ'য়ে পূর্ব মহাসাগরের এই সুদূর দ্বীপ-প্রান্তে এমন ক'রে স্থান পেয়েছিল যে, আজ হাজার বছর পরেও সেই ধ্যানমন্ত্রের আবৃত্তি এই রাজার মুখে ভক্তির সুরে বেজে উঠ্‌ল—এতে আমার ভারি বিস্ময় লাগল। এই সব ভৌগোলিক নামমালা এদের মনে আছে ব'লে নয়, কিন্তু যে-প্রাচীন যুগে এই নামমালা এখানে উচ্চারিত হয়েছিল সেই যুগে এই উচ্চারণের কী গভীর অর্থ ছিল সেই কথা মনে ক'রে। সেইদিনকার ভারতবর্ষ আপনার ঐক্যটিকে কত বড়ো আগ্রহের সঙ্গে জানছিল এবং সেই জানাটিকে স্থায়ী করবার জন্যে ব্যক্ত করবার জন্যে কী রকম সহজ উপায় উদ্ভাবন করেছিল তা স্পষ্ট বোঝা গেল আজ এই দূর দ্বীপে এসে—যে দ্বীপকে ভারতবর্ষ ভুলে গিয়েছে।

রাজা কী রকম উৎসাহের সঙ্গে হিমালয়-বিন্ধ্যাচল-গঙ্গা-যমুনার নাম করলেন, তাতে কী রকম তাঁর গর্ব বোধ হ'লো! অথচ এ-ভূগোল বস্তুত তাঁদের নয়·· পৃথিবীতে ভারতবর্ষ জায়গাটি যে কোথায় এবং কী রকম, সে সম্বন্ধেও সম্ভবত তাঁর অস্পষ্ট ধারণা।··তবুও হাজার বছর আগে এই নামগুলির সঙ্গে যে সুর মনে বাঁধা হয়েছিল সেই সুর আজও এদেশের মনে বাজছে। সেই সুরটি কত বড়ো খাঁটি সুর ছিল তাই আমি ভাবছি। আমি কয়েক বছর আগে ভারত-বিধাতার যে-জয়গান রচনা করেছি তাতে প্রদেশগুলির নাম গেঁথেছি—বিন্ধ্য-হিমাচল-যমুনাগঙ্গার নামও আছে। কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের ও সমুদ্রপর্বতের নামগুলি ছন্দে গেঁথে কেবলমাত্র একটি দেশপরিচয় গান আমাদের লোকের মনে গেঁথে দেওয়া ভালো। দেশাত্মবোধ ব'লে একটা শব্দ আজকাল আমরা কথায় কথায় ব্যবহার ক'রে থাকি, কিন্তু দেশাত্মজ্ঞান নেই যার তার দেশাত্মবোধ হবে কেমন ক'রে?"

অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা

তাঁরই সংকল্পিত ভৌগোলিক নামগাঁথা দেশপরিচয়ের গান পাই নি। কিন্তু যে দেশাত্মজ্ঞানের অভাবের কথা তিনি পুনঃ পুনঃ বলেছেন এবং অন্যত্র যে দেশ-দেখা চোখের অভাবের জন্যে দুঃখ করেছেন, সেই দেশাত্মজ্ঞান এবং দেশ-দেখা দৃষ্টি লাভ করতে হ'লে আমাদের পক্ষে রবীন্দ্রসাহিত্যেরই আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তাঁর রচনায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক রূপের যে অভিব্যক্তি ঘটেছে সেটিও খুবই ঔৎসুক্যকর। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে ভারতবর্ষের কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। তাই রবীন্দ্রদৃষ্ট বাংলাদেশের ভৌগোলিক রূপবৈচিত্র্য সম্বন্ধে এ-স্থলে কোনো কথাই বলা গেল না।

জন্ম ও জাতি

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আশ্বিনের বিশ্বভারতী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় প্রাচীনকালের জাতিভেদ নামক প্রবন্ধে ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে "বৈদিক যুগে জাতিভেদের বাঁধাবাঁধিই ছিল না। ক্রমে যখন জাতিভেদ প্রবর্তিত হইল তখনও এখনকার দিনের মতো তাহাতে এত বাঁধাবাঁধি হয় নাই। মহাভারতের যুগে ও পুরাণাদির কালে জন্মগত জাতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে।"

মনু বলিয়াছেন বর্ণাশ্রমব্যবস্থা বেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত :—

চাতুর্বর্ণ্যং ত্রয়ো লোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যং চ সর্বং বেদাৎ প্রসিধ্যতি॥ মনুসংহিতা ১২।৯৭

অর্থাৎ বর্ণবিভাগ প্রভৃতি বেদ হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

জন্ম অনুসারে যে বর্ণ নির্ণয় হইবে ইহাও মনু বলিয়াছেন :

সর্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যাজ্ঞেয়াস্তএত তে॥ মনু ১০।৫

অর্থাৎ সমানবর্ণের পত্নীতে যে সন্তান হইবে, সে পিতার জাতি প্রাপ্ত হইবে। মনু যে সকল ব্যবস্থা দিয়াছেন সে সকলই বৈদিক ব্যবস্থা—তাঁহার নিজের কল্পিত ব্যবস্থা নহে। কারণ মনুসংহিতাতে দেখা যায়—

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিৎ ধর্মো মনুনা পরিকীর্তিতঃ
স সর্বোভিহিতো বেদে ··· মনু ২।৭

স্বয়ং বেদও মনুর ব্যবস্থাসকল সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, "যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তৎ ভেষজম্" অর্থাৎ মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ঔষধের ন্যায় হিতকারী।

ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।৯০ সূক্তে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের স্পষ্ট উল্লেখ আছে :

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥

সেই বিরাট পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই মন্ত্র অন্যান্য বেদেও পাওয়া যায়, যথা যজুর্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতা ৩১।১১৬, অথর্ববেদ ১৯।৬, সামবেদ কৌথুমী শাখা, আরণ্য সংহিতা। তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।১।১এ বলা হইয়াছে যে প্রজাপতির মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষ ও বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, মধ্য ভাগ হইতে বৈশ্য, পদ হইতে শূদ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। বেদের অন্যান্য স্থলেও বিভিন্ন জাতির উল্লেখ দেখা যায়, যথা ঋগ্বেদ সংহিতা ১।৭।৯, ৯।৬৫।২৩, ১০।৫৩।৪ এই সকল স্থলে 'পঞ্চ' ও 'পঞ্চজন' শব্দ পাওয়া যায়, যাহার অর্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ এই পাঁচ জাতি। ব্রাহ্মণ অর্থে ব্রহ্ম শব্দ এবং ক্ষত্রিয় শব্দ বেদে নানাস্থলে পাওয়া যায়, যথা ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।৮৫।১৬, ১০।৮৫।২৯, ১০।৮৫।৩৪, ১০।৮৫।৩৫, কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা ৩।১।১।৪ ঋগ্বেদ সংহিতা ৪।৪২।১, ৫।৬৯।১, ৬।৭৫।১, ৭।১০৬।৭, ৮।৬৭।১, শুক্ল যজুর্বেদ ৭-৪৬, ঋগ্বেদ সংহিতা ১০-৮৮-১৯, ১০-৯৭-১২, ১০-১০৯-৪ ; ১০-৭-৮ ; ২-৩৬-৫ বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে ডক্টর হগ তাঁহার 'ব্রাহ্মণের উৎপত্তি' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,— "অনেকে বলিয়া থাকেন যে বেদের প্রথম অংশে জাতিবিভাগের কথা দেখা যায় না, পরবর্তী কালে ঐ প্রথার সৃষ্টি হয়। এ ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। বেদের সময় জাতিভেদ প্রথা পূর্ণরূপেই বর্ত্তমান ছিল।" তিনি বেদ ও জেন্দএভেস্তার সাহায্যে এ বিষয় নিঃসন্দিগ্ধরূপ সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ যে বংশগত ছিল তাহাও তিনি দেখাইয়া দেন।

ক্ষিতিমোহনবাবু কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যেস্থলে অনেকে ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। এই সকল স্থলেই তপস্যার ফলে জাতি পরিবর্তন হইয়াছিল। তপস্যার অলৌকিক প্রভাব, তাহার দ্বারা দেহের উপাদান পরিবর্তন হইতে পারে, সুতরাং জাতিও পরিবর্তন হইতে পারে। বিশ্বামিত্র এইভাবে কঠোর তপস্যা করিয়া জাতি পরিবর্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রকে জাতি পরিবর্তনের জন্য এইরূপ কঠোর তপস্যা করিতে হইয়াছিল ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে জাতি কর্মের দ্বারা নির্ধারিত হইত না, কারণ যদি কর্মের দ্বারা জাতি নির্ধারিত হইত তাহা হইলে ব্রাহ্মণের

কর্ম করিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যাইত, এত তপস্যার প্রয়োজন হইত না। তপস্যার পূর্বে যে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে ক্ষত্রিয়ের পুত্র বলিয়া তিনি প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিলেন, অর্থাৎ সাধারণতঃ জন্ম দ্বারাই জাতি নির্ধারিত হইত। তপস্যার দ্বারা কেবল নিজের জাতি পরিবর্তন করা যাইত তাহা নহে, তপঃসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁহার তপঃশক্তির প্রভাবে অন্য ব্যক্তিরও জাতি পরিবর্তন করিতে পারিতেন। মহর্ষি ভৃগুর বরে রাজা বীতহব্য এইভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ক্ষিতিমোহনবাবু তাঁহার প্রবন্ধে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ক্ষিতিমোহনবাবু কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যেস্থলে দাসী বা গণিকার পুত্রও ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। এ সকল স্থলে তপঃসিদ্ধ পিতার শুক্রের অলৌকিক তেজের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, যাহার ফলে নিকৃষ্ট ক্ষেত্রে পতিত হইয়াও উৎকৃষ্ট জাতির পুত্রের জন্ম হইয়াছিল; অথবা পুত্রের তপস্যার ফলেই তাহার জাতি পরিবর্তন হইয়াছিল।

ক্ষিতিমোহনবাবু ঋগ্বেদ সংহিতা ৯।১১২।৩ মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ঋষি বলিতেছেন, "আমি স্তব রচনা করি, আমার পিতা ভিষক্, আমার মাতা শিলার দ্বারা শস্যচূর্ণকারিণী"। মনে হয় যে ক্ষিতিমোহনবাবু ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পিতা ও পুত্রের বিভিন্ন জাতি ছিল, অর্থাৎ জন্ম অনুসারে জাতি নির্দিষ্ট হইত না। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। পিতা ও পুত্রের জাতি যে ভিন্ন ছিল একথা এই মন্ত্রে বলা হয় নাই। বস্তুত ঋষির পিতা ব্রাহ্মণ হইয়াও ভিষক হইতে পারেন। এখনও যেমন অনেক ব্রাহ্মণ চিকিৎসকের কার্য করেন, তখনও সেইরূপ কোনও কোনও ব্রাহ্মণ চিকিৎসকের কার্য করিতেন ইহা কল্পনা করা দুরূহ নহে।

ঋগ্বেদসংহিতা ১০-৭১-৯ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে যে সকল ব্রাহ্মণ বেদের অর্থ জানে না তাহারা কৃষি প্রভৃতি নিন্দিত কর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়া কৃষিকার্য করিলেও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইত। যদি কর্ম অনুসারে জাতিনির্দিষ্ট হইত তাহা হইলে ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া বৈশ্য বলা উচিত ছিল।

ক্ষিতিমোহনবাবু লিখিয়াছেন "উপনিষদে আগাগোড়াই একটি উদার সামাজিক ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।" ইহার সমর্থনে তিনি বলিয়াছেন যে

উপনিষদে অনেক ব্রহ্মজ্ঞ রাজর্ষির উল্লেখ আছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া বর্ণাশ্রমধর্মের বিরোধী নহে। পরন্তু উপনিষদে ইহা স্পষ্ট ভাবেই উল্লেখ আছে যে জন্ম অনুসারেই জাতি নির্দিষ্ট হইত।

রমণীয়চরণা রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরণ্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা, কপূয়চরণা কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরণ্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫।৯।৭) অর্থাৎ যাহারা উৎকৃষ্টকর্ম করে তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বংশে জন্ম গ্রহণ করে, যাহারা মন্দকর্ম করে তাহারা কুকুর বা শূকর বা চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয়। নচিকেতা অল্পবয়স্ক বালক, তথাপি তাহাকে যমরাজা ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং প্রণাম করিয়াছেন, ইহা কঠোপনিষদে দেখা যায়। ইহা হইতেও দেখা যায় যে জন্ম অনুসারেই জাতি নির্দিষ্ট হইত।

ক্ষিতিমোহনবাবু বলিয়াছেন যে বায়ুপুরাণ এবং লিঙ্গপুরাণে দেখা যায় যে আদিকালে বর্ণাশ্রমব্যবস্থা ছিল না। এ বিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১।৪।১১তে দেখা যায় যে প্রথমে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইয়াছিল, পরে ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, পরে বৈশ্যের, পরে শূদ্রের। প্রথমে কেবল ব্রাহ্মণ ছিল, অন্য জাতি ছিল না, এজন্য বর্ণাশ্রমব্যবস্থা ছিল না। ব্রাহ্মণের পুত্র ক্ষত্রিয় হয় নাই। ক্ষত্রিয় নামক নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। কারণ বেদ বলিয়াছেন যে মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় সৃষ্টি হইয়াছিল। যদি ব্রাহ্মণের পুত্র ক্ষত্রিয় হইত তাহা হইলে বলিতে হয় প্রজাপতির মুখ হইতে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছিল।

শাস্ত্রে কোনও কোনও স্থলে বলা হইয়াছে যাহার এই সকল গুণ আছে সে ব্রাহ্মণ, যাহার সে সকল গুণ নাই সে শূদ্র। এই সকল স্থলে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র শব্দ জাতিবাচক নহে, গুণ বাচক। ব্রাহ্মণ শব্দ দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (১) যাহার জাতি ব্রাহ্মণ, ইহাই মুখ্য অর্থ, (২) যাহার ব্রাহ্মণোচিত গুণ আছে, ইহা গৌণ অর্থ। ক্ষিতিমোহনবাবু এই প্রসঙ্গে মহাভারত শান্তিপর্ব ১৮৮, ১৮৯ অধ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন। বনপর্ব ১৭৯ অধ্যায়েও এইরূপ কথা আছে। সেখানে বলা হইয়াছে, "ন বৈ শূদ্রো ভবেৎ শূদ্র ব্রাহ্মণো নৈব ব্রাহ্মণঃ"। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণও শূদ্র শব্দ প্রত্যেকেই দুই বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। নচেৎ "শূদ্রো ন শূদ্রো ভবেৎ" এই বাক্য self contradictory বা আত্মবিরোধী হইত।

সাধারণযুক্তিতেও বুঝিতে পারা যায় যে যাহার ক্ষমা দয়া প্রভৃতি গুণ আছে সেই ব্রাহ্মণ— এই বাক্য জাতিনির্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইতে পারে না, ক্ষমা দয়া প্রভৃতি গুণের প্রশংসার উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে। ক্ষমা দয়া প্রভৃতি গুণ অল্পবিস্তর পরিমাণে প্রায় সকলেরই আছে। ঠিক কত পরিমাণে থাকিলে ব্রাহ্মণ হইবে তাহা কে বলিবে? কোনও একব্যক্তির ঠিক কত পরিমাণে এই সকল গুণ আছে তাহাই বা কিরূপে জানা যাইবে? একটি ব্যক্তি ভাল না মন্দ এ বিষয়ে প্রচুর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়;—বন্ধুরা বলেন ভাল, শত্রুরা বলেন মন্দ। একই ব্যক্তির গুণের পরিবর্তন দেখা যায়, যিনি আজ ভাল তিনি কিছু দিন পরে মন্দ হইতে পারেন। গুণ অনুসারে জাতি নির্দেশ করিতে হইলে বার বার জাতিপরিবর্তন করিতে হয়। অতএব অব্যবস্থা হয়। এরূপ ব্যবস্থা কখনও ছিল না, কখনও হইতে পারে না। যাঁহার ক্ষমা দয়া প্রভৃতি গুণ আছে তিনিই ব্রাহ্মণ,—ইহার অর্থ এই যে এইরূপ সদ্‌গুণশালী ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মান করা উচিত।

আর এক কথা মনে রাখিতে হইবে। শাস্ত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে হইবে। শাস্ত্রের কতকগুলি বাক্যে বলা হইয়াছে যে জন্ম অনুসারে জাতি নির্দিষ্ট হইবে; কতকগুলি বাক্যে বলা হইয়াছে এই সকল গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণ হইবে। উভয় শ্রেণীর বাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা এইভাবে করা যায়:—প্রথম শ্রেণীর বাক্য জাতিনির্ণায়ক, দ্বিতীয় শ্রেণীর বাক্য কতকগুলি গুণের প্রশংসাসূচক। ক্ষিতিমোহনবাবু বলেন প্রথম শ্রেণীর বাক্য বিদ্বেষপ্রসূত; দ্বিতীয় শ্রেণীর বাক্য উদারতাপ্রসূত। ইহাতে শাস্ত্রের গৌরবহানি হয়। প্রত্যেক শাস্ত্রগ্রন্থেই এমন অনেক বাক্য আছে যাহা হইতে বোঝা যায় যে জন্ম অনুসারে জাতি নির্দেশ করা উচিত। অল্প সংখ্যক বাক্যে আপাতত মনে হয় যে গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতি হওয়া উচিত। ক্ষিতিমোহনবাবু দ্বিতীয় শ্রেণীর বাক্যগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর বাক্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কিরূপে দ্বিতীয় শ্রেণীর বাক্যের অর্থ করিতে হইবে তাহা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে দেখান হইল।

সেকালের কাব্যকলা

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

আমাদের প্রচলিত ধারণা, সংস্কৃত কবিরা যে যুগে জন্মেছিলেন সে যুগে বোধ হয় একালের মত নানা ঝড় ঝাপটা ছিল না, 'জীবনতরী' শুধু মন্দাক্রান্তা ছন্দে বয়ে যেত, কবিদের কোন ভাবনা চিন্তাই ছিল না। মলয়-চকোর-চাঁদ-ইন্দ্র-কুবের-অলকা নিয়ে ছিল তাঁদের কারবার, রাজারাজড়ার নীচে তাঁদের চোখই পড়তে চাইত না। আর সেকালের কবিদের উপমায়, বর্ণনাভঙ্গীতে এমন একটি আবহাওয়ার আভাস আছে যাতে মনে হয় জগতে কি ঘটছে না ঘটছে সে কথা ভাববার দায় তাঁদের ছিল না। আমরা সাধারণতঃ সংস্কৃত কাব্য, সেইজন্য, অবসর মুহূর্তে ভেসে আসা সৌরভের মতো উপভোগ করার চেষ্টা করি; সে যেন একটা অলস মায়াময় অন্য স্বপ্ন জগতের কথা। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে এইরকম ধারণার সহায়তা করেছেন কোনো কোনো সংস্কৃত আলংকারিকেরা। শেষের যুগের আলংকারিকদের মতে কাব্য অন্যফলনিরপেক্ষ, কাব্যেই কাব্যের শেষ। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত 'কাব্যজিজ্ঞাসা'তে লিখেছেন "আলঙ্কারিকেরা কাব্যরসকে লোকোত্তর বলেছেন সত্য, কিন্তু এই অলৌকিক বস্তু লৌকিক জগতের কোনো হিতেই লাগে না, সমাজের বুকে থেকে এত বড় অসামাজিক কথা সোজাসুজি প্রচার করা তাঁরা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। সুতরাং তাঁদের গ্রন্থারম্ভে অনেক আলংকারিক প্রমাণ করেছেন যে কাব্য থেকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তি হয়। কাব্যরসের এই এই ফলশ্রুতি যে আলংকারিকদের মনের কথা নয়, সমাজ ও সামাজিক লোকের সঙ্গে মুখের আপসের কথা, তার প্রমাণ, ও-সব কথা তাঁদের গ্রন্থারম্ভেই আছে, গ্রন্থের আলোচনার মধ্যে তাদের লেশমাত্রেরও খোঁজ পাওয়া যায় না।" 'দশরূপক'-কার লিখেছেন—

আনন্দনিষ্যন্দিষু রূপকেষু
ব্যুৎপত্তিমাত্রং ফলমগবুদ্ধিঃ।
যোঽপীতিহাসাদিবদাহ সাধুঃ
তস্মৈ নমঃ স্বাদপরাঙ্‌মুখায়॥ ১।৬

সাহিত্য দর্পণের মতেও রস হচ্ছে 'বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য', অন্য কোনও জিনিসের ছোঁওয়া তার মধ্যে নেই।

কিন্তু এ যুগের নাস্তিক সমালোচকেরা এই ব্রহ্মাস্বাদসহোদর রসতত্ত্বে সাধারণতঃ বিশ্বাস করতে চান না। গত শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জয়গানের পর যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এসেছে তার ফলে আমরা অনেকেই উগ্র সমাজবোধের দাবি ঘোষণা করছি। আমাদের কাছে সমষ্টি-রূপটাই, অন্ততঃ বুদ্ধির ক্ষেত্রে, বড়ো হয়ে উঠেছে। আমরা দাবি করছি, যে সাহিত্য আমাদের সমাজবোধের সহায়ক নয়, সে সাহিত্য সাহিত্যই নয়। বলা বাহুল্য, এ কথা সুস্থ মনের কথা নয়। সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক কি তার বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করেছি। কিন্তু সংক্ষেপে বলতে হলে বলতে হয়, সাহিত্য এক হিসেবে বাস্তবিকই অন্যফলনিরপেক্ষ, কেননা সে তো শিল্পীর মনের সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের কথায় সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন। কিন্তু শিল্পীর মন নিশ্চয়ই নির্বাতাস কাঁচের ঘরে থাকে না, পৃথিবীর জল হাওয়াতেই তার পরিপুষ্টি, সেইজন্য চারপাশের ঘটনা সংস্থানে তাঁর চিত্ত যে ভাবে স্ফুরিত হল, তার মধ্যে সমাজের ছায়া পড়া স্বাভাবিক, এইখানেই দুয়ের যোগসূত্র, তা না হলে কবিতা ও সংবাদপত্রে কোনও তফাত থাকে না।

সে কারণে, আমাদের আর একটি সমস্যায় পড়তে হয়। সাহিত্য যদি সমাজবোধের প্রচারপত্র না হয়, সে হিসেবে সে যদি বাস্তবিকই অন্যফলনিরপেক্ষ হয়, তা হলেও সাহিত্য অন্যপ্রভাবনিরপেক্ষ কি না। অর্থাৎ কবিমানসের প্রকাশরীতি, দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সমাজবিবর্তনের ধারার কোনও ঘনিষ্ঠ যোগ আছে কি না। সহজ বুদ্ধিতে বিচার করলে এর উত্তরে বলতে হয়, ওরকম যোগ নিশ্চয়ই আছে। কবি অবশ্য কখনই রিপোর্টারের কাজ করেন না, তিনি ক্রান্তদর্শী, বর্তমান ছাড়িয়েও তাঁর দৃষ্টি অতীত এবং ভবিষ্যতে পৌঁছয়। কিন্তু তা হলেও তাঁর মনে তাঁর অতীত ও বর্তমানের ছায়া তো পড়বেই। অবশ্য এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কবির রচনার মধ্যে তা হলে যদি সাম্প্রতিক জিনিসই স্থান পায়, তার মধ্যে সার্বকালিক এমন কি থাকবে যা সব যুগের পাঠকদের মনে আনন্দ জোগাতে পারে? প্রশ্নটি খুবই সমীচীন, কিন্তু অপ্রয়োজনীয়। কারণ, কবির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তাঁর চিত্তস্ফুরণকে প্রকাশ দেওয়া, সে স্ফুরণের মূল

কারণ ও নিয়ন্তা অতীত বা বর্তমান সমাজ হলেও তার মধ্যে অতীত ও বর্তমান এক হিসেবে পরোক্ষ। ঐ অতীত ও বর্তমানের ফলে কবি যে কাব্যরচনা করলেন, যে উপকরণ তিনি গ্রহণ করলেন তার তাৎকালিক রূপের মধ্যে দিয়ে বা সেই তাৎকালিক রূপকে উপলক্ষ্য করে একটি চিরন্তনতা সৃষ্টি করাই কবিকর্ম। একদিকে যেমন eternal verities বলে কিছু নেই, অন্যদিকে তেমনি প্রচারপত্রও কবিতা নয়। সমাজ ও কবিমানস, সম্প্রতি ও চিরন্তন, বন্ধন ও অবন্ধনের ঠোকাঠুকিতেই কাব্যদীপ্তি চমকে ওঠে।

কবিমানসের স্ফুরণের জন্য সমাজ কতটা দায়ী, সে স্ফুরণ সমাজের সঙ্গে বিরোধমুখে না অন্বয়মুখে হচ্ছে, এ নির্ভর করে নানা ঐতিহাসিক কারণের উপরে। যে দেশের সমাজই শক্তির আধার, যেখানে রাষ্ট্রিক, সামাজিক বা যে কোনো কারণেই হোক সমষ্টিবোধ দৃঢ়, সেখানে কবির সঙ্গে সমাজের সংস্পর্শ ঘনিষ্ঠ, যোগাযোগও দৃঢ় এবং সম্ভবতঃ অন্বয়মুখীন। এর নানা বৈচিত্র্য আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। কিন্তু মোট কথাটা এই যে কাব্য অন্যফলনিরপেক্ষ হলেও অন্যপ্রভাবনিরপেক্ষ নয়। তার আস্বাদ ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর কিনা জানিনে, তবে এ কথা নিশ্চিত যে সে রস ঊর্ধ্বমূল অবাঙ্‌শাখ নয়। ব্রহ্মের মতো সে রসের হঠাৎ স্ফুরণ হয় কিনা জানা নেই, তবে তার বিভাব নিশ্চয়ই মায়া বা প্রতিভাস নয়। রসের অলৌকিকত্ব স্বীকার করি আর নাই করি, তার গোড়ার কথাটা লৌকিক এ কথা তো 'সাহিত্যদর্পণে'ও স্বীকৃত হয়েছে। সেকালের ইতিহাস আমরা যথেষ্ট জানি না, কিন্তু সেকালের কাব্যের theory এবং practice আলোচনা করলে দেখা যায় তার মধ্যেও সামাজিক হাওয়া-বদলের সঙ্গে কাব্যের ও কাব্যশাস্ত্রের সুরবদলের চিহ্ন আছে। অন্ততঃ কয়েকটা বড়ো বড়ো লক্ষণ সুস্পষ্ট।

২

প্রথমে থিওরির কথা।

সেকালের আলংকারিকদের মধ্যে কেউ অলংকার, কেউ রীতি, কেউ ধ্বনি, কেউ বা রস প্রভৃতি কাব্যের বিভিন্ন দিকে ঝোঁক দিয়েছেন। ফলে, কারুর মতে কাব্য সার্থক হয় অলংকারের জোরে, সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারলেই

কাব্য হলো। কেউ বললেন, কাব্য সার্থক হয় রীতি বা রচনাভঙ্গীর জোরে, স্টাইলের জন্যই কাব্য কাব্য হয়ে দাঁড়ায়। অন্য আলংকারিকরা বলেছেন, অলংকার বা রীতি কাব্যের জন্য প্রয়োজনীয় হলেও আসল কথা তা নয়, আসল কথাটা হচ্ছে ধ্বনি। যে অর্থ লুকিয়ে আছে সেই অর্থটিকে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই কাব্য সার্থক হয়। পরের যুগের আলংকারিকরা বললেন, কাব্যের আসল ব্যাপারটা হচ্ছে রস; সে রসসৃষ্টির জন্য অলংকার, রীতি, ধ্বনি যা কিছুর দরকার হোক না কেন, কাব্যের আত্মা হচ্ছে ব্রহ্মসহোদর রস, তারই ফলে কাব্যের সার্থকতা।

এই মতবাদগুলির বিস্তৃত বিবরণ ও বিশেষ বিচার এখানে সম্ভবপর না হলেও এগুলি উল্লেখ করার কারণ এই যে এগুলি থেকে সেযুগের মনের ক্রমবিকাশের এবং সেইসঙ্গে সমাজবিকাশের একটা হদিস মেলে। নানা মতবাদের পর যে মতটি সেযুগে শেষে প্রবল হয়ে উঠেছিল সে হচ্ছে রসের স্বপক্ষের মত। এ মতের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় 'সাহিত্যদর্পণ' ও 'রসগঙ্গাধর' নামে বই দুটিতে। এ বই দুটির রচনাকাল আনুমানিক ষোল শতাব্দী ও সতের শতাব্দী। 'সাহিত্য দর্পণ'কার বলছেন কাব্য হচ্ছে রসাত্মক বাক্য; কিন্তু রস বলতে আমরা বুঝি এমন একটি জিনিস যা পাঠক বা দর্শকদের সত্ত্বোদ্রেক করে, যা অখণ্ড, যা আনন্দচিন্ময়, যা বিষয়ান্তরের স্পর্শশূন্য, যা ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন সত্ত্বোদ্রেকের মানে হচ্ছে কর্মপ্রবৃত্তির মূলস্বরূপ রজঃ ও অজ্ঞানের মূলস্বরূপ তমঃ অভিভূত হলে মনে যে ভাবটির উদয় হয় সেইটেই সত্ত্ব। অর্থাৎ কাব্যের রস আমাদের কর্মপ্রেরণা জোগাবার জন্যে নয়, সে হচ্ছে ব্রহ্মের মতো স্বপ্রকাশ ও চিন্ময়। তাতে অন্য কিছুর ছোঁওয়া থাকে না।

রসের স্বরূপ যদি এই হয় তা হলে কাব্য কি ভাবে আমাদের মনে আনন্দ জোগাতে পারে সে সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ তত্ত্বের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 'সাহিত্যদর্পণ'কার রস সৃষ্টির কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন তুলেছেন, রসসৃষ্টির মধ্যে কি এমন কৌশল আছে যার ফলে আমাদের প্রতিদিনকার কষ্ট দুঃখও কাব্যে রমণীয় হয়ে ওঠে—

কিংচ তেষু যদা দুঃখং ন কোঽপি স্যাওতুন্মুখঃ।
তথা রামায়ণাদীনাং ভবিতা দুঃখহেতুতা ॥ ৩।৫

যদি আমাদের লৌকিক জীবনের সুখদুঃখ দুই-ই কাব্যে রমণীয় না হয়ে ওঠে, তাহলে তো রামায়ণ প্রভৃতি করুণরসাত্মক গ্রন্থ আমাদের দুঃখই দিত। কিন্তু সার্থক কাব্যে তা হয় না, দুঃখও সুখের কারণ হয়ে ওঠে। সুতরাং প্রশ্ন জাগে, 'কথং দুঃখকারণেভ্যঃ সুখোৎপত্তিঃ'— দুঃখের কারণ হতে কি ভাবে সুখের উৎপত্তি হয়? এই কাব্যকৌশল বুঝতে হলে একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন।

সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন, মানুষের মনে নানা অন্তর্নিহিত ভাব আছে, যা সবসময়ে পরিস্ফুট না হলেও কখনই একেবারে অনুপস্থিত থাকে না। এই ভাবগুলিকে বলা হয় স্থায়ী ভাব।

অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মত ॥ ৩।১৩৪

এই স্থায়ীভাবগুলি তিরোধান করতে পারে না, এই ভাবগুলিই কাব্যাস্বাদের অঙ্কুরমূল। প্রধান প্রধান স্থায়ী ভাব নয়টি রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, শম। এগুলি হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথা, সুতরাং এগুলি লৌকিক। কাব্যে 'বিভাব', 'অনুভাব', 'সঞ্চারীভাব', 'ব্যভিচারী-ভাবে'র সংস্পর্শে এসে এই স্থায়ী ভাবগুলি রসে পরিণত হয়। উৎসাহ রূপ স্থায়ী ভাববীর রসে পরিণত হয়, শোক করুণরসে পরিণত হয়, ভয় পরিণত হয় ভয়ানক রসে। এই রসে পরিণত হলেই স্থায়ীভাবের লৌকিকত্ব কেটে গিয়ে একটি অলৌকিকত্বের সৃষ্টি হয়, যে অলৌকিকত্বের ফলে শোকও করুণরসে পরিণত হয়ে আমাদের আনন্দ দিতে পারে।

হেতুত্বং শোকহর্ষাদের্গতেভ্যো লোকসংশ্রয়াৎ।
শোকহর্ষাদয়ো লোকে জায়ন্তং নাম লৌকিকাঃ॥
অলৌকিকবিভাবত্বং প্রাপ্তেভ্যঃ কাব্যসংশ্রয়াৎ।
সুখং সঞ্জায়তে তেভ্যঃ সর্বেভ্যোঽপীতি কা ক্ষতিঃ ॥ ৩।৬-৭

শোক.হর্ষ প্রভৃতি যে সমস্ত লৌকিক ভাব আমাদের মনে আছে, কাব্যের সংশ্রয়ে অলৌকিক বিভাব প্রভৃতির সহায়তায় তা থেকে সুখ সঞ্জাত হয়।

এইখানে বিভাব, সঞ্চারীভাব, অনুভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে দু একটা কথা

বলা যেতে পারে। বিভাব হচ্ছে সেই সেই জিনিস যার সহায়তায় স্থায়ী ভাব রসে পরিণত হয়। বিভাবের দুটি শ্রেণী, উদ্দীপন আর আলম্বন। যে সমস্ত জিনিসে ভাব উদ্দীপিত হয়, তাকে বলা হয়েছে উদ্দীপন বিভাব— যেমন নায়িকার বিলাস শৃঙ্গার রসের উদ্দীপনে সহায়তা করে। আর যে জিনিসকে অবলম্বন করে রস উদ্দীপিত হয় তার নাম আলম্বন বিভাব,— যেমন নায়কের ধীরোদাত্ততা। সঞ্চারী ভাব হচ্ছে নানা ছোটো ছোটো mood— যা প্রধান ভাবের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয়। অনুভাব বলতে বোঝায় রসের বাহ্যলক্ষণ। যেমন ইন্দুমতী স্বয়ম্বরসভায় আসা মাত্র কোনও রাজা লীলারবিন্দ নাড়তে লাগলেন। এইরকম নানা আঙ্গিকের সহায়তায় নানা উপায়ের মধ্য দিয়ে স্থায়ী ভাব রসে পরিণত হয়।

এখানে প্রশ্ন ওঠে: রসের অলৌকিকত্বই তা হলে আনন্দের হেতু; কিন্তু লৌকিক থেকে অলৌকিক জন্মায় কি উপায়ে? বিভাব আমাদের স্থায়ীভাবের লৌকিকতা নষ্ট করে কি কৌশলে? বিশ্বনাথ বলছেন, বিভাবের একটি ক্ষমতা আছে যার বলে সে পাঠকের মনের স্থায়ীভাব আর কাব্যের পাত্রপাত্রীদের স্থায়ীভাবকে এক করে দেয়। এই একীকরণ হলে পরে মনে হয় কাব্যের ঘটনা যেন আমাদের নিজেদেরই জীবনের ঘটনা, অথচ নিজেদের জীবনের ঘটনা নয়-ও। কিন্তু একটি অলৌকিক মায়াজগতের মধ্য দিয়ে না হলে এই একীকরণ সম্ভব হয় না।

ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণীকৃতিঃ।

বিভাবাদির সাধারণীকরণ নামে একটি ব্যাপার আছে। প্রত্যেকের জীবনের ঘটনা সাধারণ হয়ে ওঠে, 'রামাদিরত্যাদ্যুদ্বোধকারণৈঃ সামাজিকরত্যাদ্যুদ্বোধঃ' —রাম প্রভৃতির রতির উদ্বোধ হতে সামাজিক রতির উদ্বোধ হয়। তখন,

পরস্য ন পরস্যেতি ন মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥ ৩।১২

এই অলৌকিক আনন্দের স্তরে কাব্যের পাত্রপাত্রী ও পাঠকদর্শকেরা মিলিত হন বলেই তাঁদের সত্ত্বোদ্রেক হয়, কষ্টেও সুখ জন্মায়। এই অলৌকিক আনন্দ সকল হৃদয়ে সম-বাদী, প্রত্যেকের মনেই তা সমানভাবে বেজে ওঠে। তার কারণ এ ব্যক্তিবিশেষের কথা হয়েও ব্যক্তিবিশেষের কথা নয়, লৌকিকের মধ্য

থেকেও লৌকিকত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে অলৌকিকত্বের সীমায় পৌঁছল। এইখানেই রসসৃষ্টির কৌশলের মূল কথা—এইকারণেই কাব্য সার্থক হয়ে ওঠে, তার মধ্যে আমাদের দুঃখ কষ্টও একটি মনোজ্ঞ সুষমায় ভূষিত হয়ে আনন্দের কারণ হয়ে ওঠে।

সাহিত্যদর্পণ রচিত হবার অনেক পরে যখন রসগঙ্গাধর রচিত হল তখন দেখা গেল উভয় লেখকই রসের প্রাধান্য স্থাপনা করতে উৎসুক হলেও দুয়ের থিওরি বা দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। জগন্নাথের মতে কাব্য রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদক শব্দ। রমণীয়তার অর্থ হচ্ছে লোকোত্তর-আহ্লাদজনক-জ্ঞানগোচরতা, যে জ্ঞান থেকে লোকোত্তর আহ্লাদ জন্মায় সেই জ্ঞান পাওয়া। লোকোত্তর কথাটি, পূর্বের মতো, তার বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তবুও সাহিত্যদর্পণের যে মত, বাক্যংরসাত্মকং কাব্যম্, সে মত ইনি গ্রাহ্য করেন নি। "বস্তলংকারপ্রধানানাং কাব্যানামকাব্যত্বাপত্তেঃ।" অর্থাৎ কাব্যকে যদি শুধুই রসাত্মক বাক্য বলে স্বীকার করতে হয়, তা হলে বস্তুপ্রধান এবং অলংকার-প্রধান কাব্য অকাব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মহাকবিদের কাব্যেও এরকম বস্তুপ্রধান ও অলংকারপ্রধান অংশ আছে যার কাব্যত্ব অস্বীকার করা চলে না। সেইজন্য কাব্য হতে এগুলিকে বাদ দিলে মহাকবিরাও আকুল হয়ে উঠবেন, "ন চেষ্টাপত্তিঃ, মহাকবিসম্প্রদায়স্যাকুলীভাবপ্রসঙ্গাৎ।" যাঁরা কাব্য রসাত্মক বাক্য এই মত পোষণ করেন তাঁরা হয়তো বলতে চাইবেন কাব্যের মধ্যে বস্তু বা অলংকার আলাদা স্বীকার করার দরকার নেই, কেননা এদের পরিণাম সার্থকতা রসসৃষ্টির সহায়তায়। একটু কঠিন কথায় বলতে হলে বলতে হয় বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনির পর্যবসান রসধ্বনিতেই। কিন্তু জগন্নাথের মতে এ উত্তর অচল, কেননা 'তথা চ জলপ্রবাহবেগনিপতনোৎপতনভ্রমণানি কবিভির্বর্ণিতানি। ন চ তত্রাপি যথাকথঞ্চিৎ পরম্পরয় রসস্পর্শোঽস্ত্যোবেতি বাচ্যম্",—মহাকবিরা জলপ্রবাহ, বেগ, নিপতন, উৎপতন, ভ্রমণ ইত্যাদি অনেক জিনিস বর্ণনা করেন যার সঙ্গে রসের কোনই সংস্পর্শ নেই, অথচ তার কাব্যত্বও অস্বীকার করা চলে না। সুতরাং কাব্য সার্থক হয় শুধু রসাত্মক বাক্যের জোরে নয়, কেননা তাতে রসধ্বনি ছাড়াও আরও নানা জিনিস থাকে এবং অপরিহার্যভাবেই থাকে। সেইজন্যে কাব্য হচ্ছে রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদক শব্দ যার থেকে লোকোত্তর আনন্দ

জন্মায় এবং তার হেতু হচ্ছে কবিপ্রতিভা। "তস্য চ কারণং কবিগতা কেবলা প্রতিভা। সা চ কাব্যঘটনানুকূলশব্দার্থোপস্থিতিঃ। তদ্গতং চ প্রতিভাত্বং কাব্যকারণতাবচ্ছেদকতয়া সিদ্ধো জাতিবিশেষ উপাধিরূপং বাখণ্ডম্। তস্যাশ্চ হেতুঃ ক্বচিদ্দেবতামহাপুরুষপ্রসাদাদিজন্যমদৃষ্টম্। ক্বচিচ্চ বিলক্ষণব্যুৎপত্তিকাব্য-করণাভ্যাসৌ। ন তু এয়মেব।" সেই কবিপ্রতিভা কাব্যঘটনার অনুকূল শব্দার্থকে আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করে— এই প্রতিভার একটি অখণ্ডরূপ আছে। অদৃষ্ট বা অভ্যাস এ ছাড়া এ প্রতিভা পাওয়া যায় না।

প্রতিভার অখণ্ডত্বের উপর এই যে ঝোঁক দেওয়া হল তার ফলে এখানে একটু নতুনত্ব দেখা দিল। পূর্বের আলংকারিকদের ধারণা ছিলো কাব্য ভালো হতে হলে একেবারে নির্দোষ হওয়া দরকার, তাতে একটুও খুঁত থাকবে না। মম্মট কাব্যপ্রকাশে বলেছিলেন কাব্য হচ্ছে অদোষ, শব্দার্থসমন্বিত, সগুণ, তাতে অলংকার থাকলেও চলে না থাকলেও চলে। কিন্তু কাব্যকে যদি নির্দোষ হতে হয় তা হলে সেরকম শাস্ত্রসম্মত কাব্য খুঁজে পাওয়া যাবে না, খুঁজবার দরকারও নেই। বাস্তবিকপক্ষে একটি শ্লোকের একাংশে দোষ থাকলে সেটি অকাব্য এবং অপর অংশগুলি কাব্য— এরকম বিভাগ করা চলে না। একটি শ্লোক, কাব্যাংশ বা কাব্য পড়ে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হয় সে একটি অখণ্ড ভাব— তার মূলে আছে দোষগুণ জড়িয়ে সমগ্র কাব্যটিই। দোষগুণ মিলিয়ে সমগ্রভাবে কাব্য যদি সহৃদয়দের মনে একটি লোকোত্তর আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে তা হলেই কাব্য সার্থক হলো। সেইজন্য জগন্নাথ কাব্যতত্ত্বকে যেদিকে মোড় ফেরালেন তার ফলে কাব্যবিচার সম্ভবতঃ কঠিনতর হয়ে উঠল। কেন না, তাঁর মতে একদিকে আছে কবিপ্রতিভা আর অন্যদিকে আছে সহৃদয় হৃদয়। বলা বাহুল্য, দণ্ডী প্রভৃতিরা যে সব বাঁধা ধরা লক্ষণ বলেছিলেন তাতে আমাদের কাব্যবিচার সহজ হতো, কিন্তু এই মত অনুসারে সমালোচক বাস্তবিক সহৃদয় কিনা এবং কবির প্রতিভা আছে কিনা সে সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলা চলে না, সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্, যাঁরা কাব্যরসিক তাঁদের অনুভবই সেখানে একমাত্র প্রমাণ। কাব্যত্বের প্রমাণ বস্তুগত হতে ব্যক্তিগত হয়ে উঠল। এইটিই এখানে বিচার্য বিষয়।

৩

কাব্যবিচারে এই বস্তুগত প্রমাণ ছেড়ে ব্যক্তিগত প্রমাণের উপর ঝোঁক পড়ার একটা সামাজিক কারণ থাকে। শুধু কাব্যবিচারে নয়, জীবনের অন্যান্য দিকেও দেখা গেছে সমাজে দুটি আদর্শ সাধারণতঃ আমাদের নিয়ন্ত্রিত করে। কোনও সময় ব্যষ্টির উপর সমষ্টির প্রাধান্য, কখনও সমষ্টির বিরুদ্ধে ব্যষ্টির বিদ্রোহ। অবশ্য কথাটা মূলতঃ এই হলেও বাস্তবিক এত সহজ নয়। মানবসভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, ব্যষ্টির উপর সমষ্টির প্রাধান্য আর সমষ্টির বিরুদ্ধে ব্যষ্টির বিদ্রোহ, কথাটা ঠিক এ ভাবে বলা চলে না। কারণ এ ভাবে বললে মনে হয় ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে সবসময় একটি দ্বন্দ্ব চলেছে, যখন যেটি প্রধান হয়ে ওঠে। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। মানুষ পরস্পর একটি সামাজিক সত্তায় মিলিত তার অন্ততঃ একটি অনস্বীকার্য প্রমাণ তারা যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষা পশুদের মত ইঙ্গিতের ভাষা নয়, তার একটি অর্থ আছে এবং সে অর্থ অপরকে বোঝাবার জন্যই বলা হয়। সেজন্য সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির নিরন্তর সংঘর্ষ কল্পনা করলে ব্যষ্টির স্বরূপকে অতিরঞ্জিত করা হয়। সমষ্টিসত্তা সব সময়েই আছে, কিন্তু কোনও সময়ে সেই সত্তার সঙ্গে ব্যষ্টির অন্বয়, কোনও সময়ে সংঘর্ষ। মানুষের পক্ষে একটি সামাজিক সত্তায় পরস্পর মিলিত হওয়াই যদি স্বাভাবিক হয় তা হলে স্বীকার করতেই হয় ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির অন্বয়মুখীন সম্বন্ধটাই স্বাভাবিক, বিরোধ ঘটলে বুঝতে হবে কোথাও গোল বেধেছে।

মানবসভ্যতার আদিম যুগে দেখা গেছে সে যুগে মানুষ সাধারণতঃ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত। সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হওয়ার পর মানুষের একটা স্বাভাবিক বোধ জন্মায় প্রকৃতির রুদ্রলীলা থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে পরস্পর মিলিত হওয়া দরকার। সেইজন্য হিংস্রতার যুগ বা যাযাবর যুগ কাটবার পর কৃষিসভ্যতার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি সমাজসংহতি গড়ে ওঠে— বাইরের আঘাত হতে আত্মরক্ষার চেষ্টায় নিজেদের মধ্যে হানাহানি স্থগিত থাকে। সে যুগে অভাববোধ কম, দাবি অল্প, পরস্পরবিরোধী স্বার্থ প্রবল হয়ে ওঠে নি, বাইরের আঘাত প্রবল। সেইজন্য একটি সমাজসংহতি দেখা যায় যদিও এই

সংহতির মধ্যে সচেতনতা নেই, অনেকটা বাইরের চাপে অনেকটা সহজ সংস্কারের ফলে এই সংহতি বজায় থাকে। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একধারে যেমন জ্ঞানোন্মেষ হতে থাকে অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিক স্বার্থও গড়ে উঠতে থাকে। তখন ক্রমশঃ ক্রমশঃ নানা স্তরবিভাগ হয়, শ্রেণীভেদ হয়, গোষ্ঠী স্বার্থে বা দলগতস্বার্থে সমাজসংহতি নষ্ট হতে থাকে। সেইজন্যে প্রথম যুগে কাব্য অনেকসময় গান, collective emotion, কিন্তু ক্রমশঃ ক্রমশঃ তার সেই সংহতিবদ্ধ রূপও নষ্ট হয়। এই সংহতিনষ্টের সেকালের একটি চরম উদাহরণ দাস সমাজ। মুষ্টিমেয় প্রভুদের কাছে দাসেরা বিক্রীত, তাদের স্বতন্ত্র কোনো অধিকার নেই। দাস সমাজের পর যখন সামন্ততন্ত্র দেখা দিলো তখন সামন্তেরা প্রভু হলেও দাসদের জীবনমরণের অধিকার তাঁদের রইলো না, বরং এর শেষের যুগে দেখা যায় বাণিজ্যগোষ্ঠী প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, যারা সামন্ততন্ত্রেরই অঙ্গ হলেও সামন্তসম্প্রদায় হতে বিভিন্ন। এইরকম স্তর-বিভাগ চরমে পৌঁছল ধনতান্ত্রিক সমাজে। সামন্ততন্ত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠী গড়ে উঠলেও তার মধ্যে একটি সংহতি ছিল, কেননা তখন অর্থনৈতিক স্বার্থেই ব্যক্তিপ্রাধান্য প্রচার করা চলতো না, গোষ্ঠী ছাড়া ব্যক্তির শোষণ ক্ষমতা তখনও অতো বড়ো হয়ে ওঠে নি। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব্যক্তিবিশেষের লোভ ও ক্ষমতা দুইই বেড়ে গেল। সেই-জন্য ধনতান্ত্রিক সমাজ সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার হতে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অত্যা-চারিতদের মুক্তি দিলে স্বাধীন চুক্তির নামে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই স্বাধীন চুক্তিও আর এক অত্যাচারের ছদ্মবেশে পরিণত হলো। সেইজন্যই এ যুগের সমাজদর্শন হচ্ছে ব্যষ্টির প্রাধান্য, বক্তব্য ছিলো, ব্যষ্টির প্রাধান্য স্বীকার করলেই সামাজিক প্রগতি সম্ভব। এই সমাজদর্শনের ফলে জগৎ যেখানে পৌঁছেছে সেখান হতে তাকে উদ্ধার করে প্রকৃত ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্থাপনা করার জন্যই সাম্যবাদের জন্ম। সমষ্টির মধ্যেই ব্যক্তিবিশেষ তার সাফল্য লাভ করে, তাতেই সামাজিক ভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্ভব, তা না হলে ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে মুষ্টিমেয় কজন বহুর উপর অত্যাচার করবেই।

সমাজের অগ্রগতি সাধারণতঃ এই পথে। এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। বিভিন্ন যুগে সমষ্টি ও সংহতির উপর যে ঝোঁক

পড়েছে সেগুলির চেহারা কিন্তু এক নয়, কারণ সমাজের অগ্রগতি সে হিসেবে কম্বুরেখায় চলে। বর্তমানে যে নতুন সংহতি গড়ে তুলবার চেষ্টা হচ্ছে তার মানে নয় আমরা মানবসভ্যতার আদিম অবিজ্ঞানে ফিরে যাবার চেষ্টা করছি। দুই-এ অনেক তফাত; প্রথমটি আত্মসচেতন ছিল না, কিন্তু দ্বিতীয়টি অত্যন্ত আত্মসচেতন— প্রথমটিতে সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের প্রাধান্য, দ্বিতীয়টির নির্ভর আত্মসমালোচনা ও যুক্তিতর্কের উপর। সেকালের কাব্যকলা আলোচনা করতে হলে সেইজন্য হঠাৎ এ যুগের সঙ্গে তুলনা করা চলে না, অন্ততঃ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নয়, যদিও তাদের মধ্যে অনেক আপাত-সাদৃশ্য থাকে। সেযুগের কাব্যকলার সামাজিক পটভূমিকা বুঝতে হলে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লেখকদের মধ্যে কি পরিবর্তন এলো এবং সেইসময় অন্যদেশের কাব্যরসিকেরা কি দৃষ্টিভঙ্গীতে কাব্যালোচনা করতেন, সেই কথাগুলির আলোচনা প্রয়োজন।

আমরা যে যুগের কাব্যশাস্ত্রের কথা আলোচনা করছি সে যুগের ইতিহাস সমাজের বিস্তৃতি ও স্তরবিভাগ গড়ে ওঠার ইতিহাস। সে সময় জীবনযাত্রার আদিম ভাব আর নেই, রাষ্ট্র আছে, রাজা আছেন, ক্রমশঃ ক্রমশঃ স্তরবিভাগ গড়ে উঠছে। আর সে সময়েও সেকালের মতো একটি ধনতন্ত্র (একে 'ধনতন্ত্র' বলা চলে কিনা সন্দেহ, কারণ ধনসঞ্চয় ও সাম্রাজ্যবিস্তার প্রভৃতি কয়েকটি বাহ্য লক্ষণ থাকলেও সামাজিক গতির যে পর্যায়ে ধনতন্ত্রের আবির্ভাব এবং সামাজিক গতি ধনতন্ত্র যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তা এসময়ে ছিল কিনা সন্দেহ) গড়ে উঠছিল, যার ফলে একদিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার। সংস্কৃত আলংকারিকরা সাধারণতঃ এই যুগের মানুষ; শেষের যুগের যে আলংকারিকদের কথা উল্লেখ করেছি তাঁদের মানস ঐতিহ্যও এই। সে কারণে, যদি সামাজিক স্তরবিভাগ গড়ে ওঠার ইতিহাসই সেকালের ইতিহাস হয় তা হলে আলংকারিকদের মধ্যে ক্রমশঃ বস্তুগত প্রমাণ হতে ব্যক্তিগত প্রমাণের উপর ঝোঁক পড়াও স্বাভাবিক, কেননা স্তরবিভেদের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিপ্রাধান্যের কথা ওঠা সামাজিক ভাবে স্বাভাবিক। সেইজন্য বিশ্বনাথ বা জগন্নাথ ব্যক্তিগত প্রমাণের উপর ঝোঁক দিলেন তা নিতান্ত আকস্মিক নয়। এর পিছনে আছে সমাজের ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাস। এঁদের আগের ও পরের যুগের লেখকদের রচনার সঙ্গে তুলনা করলেই সে ইতিহাসের সন্ধান মেলে।

উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারা যায় সাহিত্যদর্পণের অন্ততঃ আটশো বছর আগে দণ্ডী যখন তাঁর কাব্যাদর্শ রচনা করেছিলেন তখন কাব্যতত্ত্ব ছিল নেহাতই ঢিলে ব্যাপার, তার মধ্যে বেশী বাঁধাবাঁধি ছিল না। সেইজন্যে তাঁর বই-এর নাম কাব্যাদর্শ, কাব্যসূত্র নয়— কেননা আলংকারিকরা কেবল আদর্শের কথাই বলেন, তাঁদের সূত্রমতো কাব্যরচনা করতে হলে প্রতিভার অপমৃত্যু অনিবার্য। তা ছাড়া আরও লক্ষ করার বিষয়, তিনি এককথায় কাব্যের কোনও সংজ্ঞা নির্দেশ করেন নি, কেননা তাতে বিপদ হবেই। ভালো কাব্যে কি কি থাকা দরকার কাব্যাদর্শের প্রথমে তারই বর্ণনা দেবার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। তিনি কল্পনা করেছেন, কাব্যের শরীর হচ্ছে ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্ন পদাবলী, তার আবার কতকগুলি অলংকার আছে। এ ছাড়া দরকার ভাষার সৌন্দর্য এবং বলার ভঙ্গী (রীতি)। সেইসঙ্গে প্রয়োজন মাধুর্যের যা কাব্যে রসরূপে থাকে। এ নিয়ে কূটতর্ক না তুললেও সহজবুদ্ধিতেই বোঝা যায় কাব্যের মধ্যে যে যে উপকরণ আমরা খুঁজি সেগুলির তালিকা এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোনও অদ্বৈত সূত্রে তাদের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয় নি। সেইজন্য দণ্ডীর মতে পাঠক সম্ভবতঃ রস পান কোনও অলৌকিকত্বের জন্য নয়, ঐ সব গুণ থাকার জন্য। বলা বাহুল্য, এ প্রথম যুগের কথা।

কিন্তু ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেখা গেল উপরি উক্ত গুণগুলি সব সমান দরের নয়। অলংকারের চেয়ে বলার ভঙ্গীটাই হয়তো কাব্যের পক্ষে বেশী প্রয়োজনীয়। এইরকম নানা মতবাদের মধ্য দিয়ে আমরা যখন আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোকে এসে পৌঁছলাম, তখন দেখা গেল কাব্যতত্ত্ব আর একটি মোড় ফিরেছে, আর এক ধাপ এগিয়েছে। আনন্দবর্ধনও কাব্যের কোনো সংজ্ঞা দেন নি, কিন্তু তিনি বললেন, কাব্যের মধ্যে ধ্বনিই হচ্ছে প্রধান। অর্থাৎ যখন উপরকার অর্থ ছাড়িয়ে আর একটি নিগূঢ় অর্থ ফুটে ওঠে, সেইখানেই কাব্যত্ব।

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ।
ব্যক্তঃ কাব্য বিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ॥ ধ্বন্যালোক, ১।১৩

যেখানে কাব্যের শব্দ ও অর্থ নিজেদের প্রাধান্য ত্যাগ করে আর একটি অর্থকে সূচিত করে সেইখানেই ধ্বনি হয়। অর্থাৎ বাচ্যার্থ বা প্রতীয়মান অর্থ ছাড়া আর একটি অর্থ ব্যঞ্জিত হলে সেই ব্যঙ্গার্থই ধ্বনি। এবং তাই কাব্যের মূল

কথা। লক্ষ করতে হবে, প্রথম জটিলতার আবির্ভাব এইখানে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সহজবুদ্ধি লোপ পায়, তখন তার ভাষা, শব্দ, বক্তব্য আদিম ঋজুতা ত্যাগ করে নানা কলাকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। এটি সামাজিক জটিলতারই ফল, এইভাবে সামাজিক জটিলতা যখন অত্যন্ত বেশী হয়ে ওঠে তখন কাব্যও অত্যন্ত ব্যক্তিগত উপকরণে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সেইজন্য ধনতান্ত্রিক সভ্যতার শেষ যুগে দেখা দেয় সুর-রিয়ালিজম, যার গোড়ার কথাটা পাঠকসমাজকে অস্বীকার করে চরমভাবে ব্যক্তিক হওয়া। দণ্ডীর মধ্যে এরকম কোনও তির্যক্ ভঙ্গী নেই— কিন্তু এর প্রথম সূত্রপাত আনন্দবর্ধনে। ঠিক এই কারণেই আনন্দবর্ধনই প্রথম আভাস দিলেন, কাব্যের সৌন্দর্য একটা অবর্ণনীয় জিনিস যা অনুভব করা যায় কিন্তু সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।

যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু॥ ধ্বন্যালোক ১।৪

মুক্তাফলে যেমন একটি ছায়া টলটল করে তেমনি অঙ্গনাদের অঙ্গে অবয়ব ছাড়া একটি লাবণ্য থাকে। মহাকবিদের বাণীতেও তেমনি অবয়ব-অতিরিক্ত একটি বস্তু আছে। কাব্যের লাবণ্য অবর্ণনীয় হলে তার কোন বাঁধাধরা লক্ষণ করা চলে না, সুতরাং বেদ্যতে স হি কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞৈরের কেবলম্ (ধ্বন্যালোক, ১।৭)। সমাজের প্রথম যুগে যখন শ্রেণীভেদ হয় না সে সময় কাব্যের একটি সার্বজনীনতা থাকে, সমাজ আর পাঠকসমাজ সেখানে নামান্তর মাত্র। কিন্তু জটিলতা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং মানসিক উপকরণ তফাত হতে বাধ্য। সে সময় কবিও সামাজিক সার্বজনীনতার উপাসক থাকেন না, ফলে তাঁর পাঠকসমাজও শ্রেণীবদ্ধ। সেইজন্য এযুগের জীবনদর্শনে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সমাজপ্রাধান্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা। এই চেষ্টা শেষের যুগে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলেও প্রথম যুগে পরোক্ষ, নানা মিস্টিক্ মতবাদ, দৈবী অনুশাসন আবিষ্কারের চেষ্টা সে সময় দেখা যায়। ইংরেজী সাহিত্য ও সমাজের প্রাচীন যুগের কথা আলোচনা করতে গিয়ে কডওয়েল বলেছেন,

'What in fact in this emotional complex of tribal poetry? It is a social reality. ... A new form of religion begins when the

mytholigising era ends. Religion becomes 'true' religion. How has this come about? Only because society has separated itself from itself; because the matrix of religion has become only a part of society, standing in antagonism to the rest of society. 'True' religion marks the emergence of economic classes in society...This division of the undifferentiated tribe into a class of supervisors who exercise thought, and a class of workers who only work, is refluted by a similar dichotomy in religion and art. (Christopher Caudwell: Illusion and Reality, Ch. II).

দণ্ডীর তুলনায় আনন্দবর্ধনের মধ্যে এই differentiation এর পরিচয় যথেষ্ট।

এর পরের যুগে কাব্যশাস্ত্র যে রূপ ধারণ করেছে সেও সমাজবিবর্তনের প্রচলিত তত্ত্বের বাইরে নয়। আনন্দবর্ধনের মধ্যে সমাজ-অস্বীকৃতির প্রথম আভাস থাকলেও সেটি তখনও প্রবল নয়। আনন্দবর্ধন স্বীকার করেছিলেন যে ধ্বনি কাব্যের আত্মা সে ধ্বনি তিন রকম,— বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি আর রসধ্বনি। অর্থাৎ কাব্যে প্রথম অর্থ ছাড়িয়ে আর একটি নিগূঢ় অর্থে পৌঁছন তিনভাবে সম্ভব হতে পারে। যে জিনিসটি ব্যঞ্জিত হল সেটি একটি বস্তু হতে পারে, একটি অলংকার হতে পারে, বা একটি ভাবও (রস) হতে পারে। বস্তুধ্বনি বোঝাতে গিয়ে আনন্দবর্ধন একটি শ্লোক তুলেছেন—

ভ্রম ধার্মিক বিস্রব্ধঃ স শুনকোঽদ্য মারিতস্তেন।

গোদানদীকচ্ছ কুঞ্জনিবাসিনা দৃপ্তসিংহেন। ধ্বন্যালোক, ১।৪, বৃত্তি

এর আপাততঃ অর্থ মনে হয় "হে ধার্মিক, তুমি এবার নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াও; গোদাবরী নদীর কুঞ্জে যে দৃপ্ত সিংহটি বাস করে সেই সিংহ কুকুরটিকে আজ মেরে ফেলেছে।" কিন্তু এর প্রকৃত বক্তব্য এ নয়। এর আসল ইঙ্গিত হচ্ছে নিশ্চিন্তে বেড়ানো ঠিক নয়, কেননা কুকুরের বদলে সিংহ দেখা দিয়েছে। এখানে বাচ্য অর্থ ছেড়ে আর একটি ব্যঙ্গ অর্থ অভিলষিত হওয়ায় ধ্বনি হয়েছে, সে ধ্বনি বিধিরূপে প্রতিষেধরূপ, কিন্তু যে জিনিসটি ধ্বনিত হয়েছে সেটি একটি খবর, বস্তু,— কোনও অলংকার বা ভাব নয়। সুতরাং এখানে ধ্বনি হয়েছে এবং সে ধ্বনি বস্তুধ্বনি।

কিন্তু যতো দিন কাটতে লাগলো কাব্যে বস্তু ও অলংকারকে স্বীকার করতে ততোই আপত্তি প্রবল হতে লাগল। এমন কি আনন্দবর্ধনের টীকাকারই কটাক্ষ করলেন, ঐ কথাটা কেবল মাত্র প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা হয়েছে, সে হিসাবে ওটি হয়তো খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা নয় (যস্তু ব্যাচষ্টে ব্যঙ্গানাং বস্তুলংকাররসানাং মুখেন ইতি স এবং প্রষ্টব্য এতৎ তাবৎ ত্রিভেদত্বং ন কারিকা-কারেন কৃতং বৃত্তিকারেন তু দর্শিতম— অভিনবগুপ্ত)। সেইজন্যে বস্তুধ্বনি ও অলংকারধ্বনি আলাদা করে স্বীকার করার কোন দরকার নেই, কেননা রসধ্বনিতে পর্যবসান হলেই তাদের সার্থকতা। ধন্যালোকের টীকাতেই অভিনবগুপ্ত এই মোচড় দেবার চেষ্টা করেছেন— তার পরের যুগের লেখকদের মধ্যে এই মতবাদ আরও স্পষ্ট। মম্মটের কাব্যপ্রকাশে খোলাখুলি ভাবেই বলা হল রীতি, অলংকার বা ধ্বনির অর্থই থাকে না যদি তাতে রস না থাকে, কারণ ও সবগুলির সম্বন্ধ ও সার্থকতা রসে।

৪

সুতরাং দেখা যাচ্ছে দণ্ডী হতে জগন্নাথ পর্যন্ত প্রায় হাজার বছরে কাব্যতত্ত্ব যে পথে এগিয়েছিল সে হচ্ছে জটিলতার পথ, সমাজের শ্রেণীভেদের ফল। প্রথম যুগের বস্তু, ধ্বনি, অলংকার, রীতি প্রভৃতি ক্রমশঃ ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে রসের প্রাধান্য স্বীকৃত হলো; শেষের দিকে বলা হলো এ রস আবার সাধারণ রস নয়, এ অলৌকিক রস, ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর। এর সাধারণ মানবিকতা ঘুচে গিয়ে একটি রহস্যময় এবং অদ্বৈত তত্ত্ব গড়ে উঠবার চেষ্টা হলো, যা এক হিসেবে সামাজিক অবক্ষয়ের চিহ্ন। অবশ্য এখানে একটি খুব বড়ো আপত্তি ওঠে, কাব্যে রস থাকবে এই কথা বলা যদি অবক্ষয়ের চিহ্ন হয়, তা হলে কি রসহীন কাব্যই প্রগতির লক্ষণ? তা অবশ্য কখনই নয়, কারণ আদিম যুগ হতে কাব্যের অর্থই হচ্ছে রসবোধ সৃষ্টি করা। সে হিসেবে রসহীন কাব্য কাব্যই নয় (আমি 'রস' সাধারণ অর্থে ব্যবহার করছি), তা প্রগতির লক্ষণ হওয়া দূরের কথা। কিন্তু দেখা গেছে যে যুগ ক্ষয়িষ্ণু নয় সে যুগের রস একটি বড়ো পাঠকসমাজের মনে সাড়া জাগাতে পারে, তার একটি বৃহৎ সামাজিকতা ও মানবিকতা আছে। তার ফলে বহু পাঠকের চিত্তই কবির গানে স্পন্দিত

হয়ে ওঠে তাদের সুখদুঃখের কথা সেই গানে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। সভ্যতার আদিযুগে কবি তাঁর এই ধর্ম সম্বন্ধে আত্ম-সচেতন ছিলেন না, বর্তমানে যে আত্ম-সচেতন সমাজসংহতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে তার মধ্যে কবিধর্মও সচেতন ভাবে প্রতিপালিত। কিন্তু অবক্ষয়ের চিহ্ন তখনই দেখা দেবে যখন কবি এই অতীন্দ্রিয় অদ্বৈত রসতত্ত্বের দোহাই দিয়ে পাঠক সমাজকে অস্বীকার করবেন, বলবেন, কাব্য রচিত হয় ঈশ্বরদত্ত প্রতিভার গুণে, সেখানে অদলবদলের উপায় নেই,—রস হচ্ছে ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর, সে কেবল সহৃদয়েরাই উপভোগ করতে পারেন। এর ইঙ্গিত হচ্ছে এই যে যাঁরা কবির কাব্য বোঝেন না তাঁরা অসহৃদয়। অর্থাৎ শুধু কাব্য রচনা নয়, কাব্যাস্বাদের জন্যও দীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন, সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। এই স্বৈরাচারে কবিধর্মের ক্ষতি ও কবিকর্মের অবনতি। কালিদাসের ধারণা ছিল বিদ্বানদের তুষ্টি না হলে কাব্যরচনা সার্থক হল না, কিন্তু পরের যুগের কবিরা স্বচ্ছন্দে 'কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী' বলে পাঠকসমাজকে অস্বীকার করতে পারলেন। এই রকম অবস্থা তখনই সম্ভব যখন শ্রেণীভেদ বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, কবির পাঠকসমাজ সংকীর্ণতর হতে হতে এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে সময় কবি আর পাঠকসমাজের সঙ্গে মিলতেই পারছেন না, আহত আত্মাভিমানে, অসুস্থ মনে কেবল আত্মকেন্দ্রিক হতে চলেছেন। প্রত্যেক সাহিত্যেই কোন না কোন সময়ে এই লক্ষণগুলি দেখা যায়, কারণ সমাজ যদি এই স্তরে এসে পৌঁছয় তা হলে সাহিত্যেও এই লক্ষণগুলি দেখা দেবেই। এই অবস্থাটি বর্ণনা করতে গিয়ে কডওয়েল বলেছেন :

The next phase of bourgeois poetry is therefore that of "Commodity— fetishism" or "art for arts' sake"...this meant a movement which would completely separate the world of art from the world of reality and, in doing so separate it from the source of art itself so that the work would burst like a bubble just when it seemed most self-secure...if an art work is valued for its own sake in defiant and rebellious opposition to the sake of a society which now has no use for skill, it is in fact valued for the artist's

sake. One cannot simply construct random poems. If their associations are not social they are personal, and the more the art work is opposed to society, the more are personal associations defiantly selected which are exclusive of social-bizarre, strange phantastic ... poetry exhibits a rapid movement from the social world of art to the personal world of private phantasy, (Illussion and Reality, pp 109-118)

বলা বাহুল্য, ইতিহাসের কম্বুরেখায় কডওয়েলের বুর্জোয়াসমাজের সঙ্গে সংস্কৃত কাব্য ও তার সমাজের সাদৃশ্য আছে কিন্তু একাত্মতা নেই, থাকবার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু তবুও সেকালে যে এইরকম একটি অবস্থার ক্রমিক উদ্ভব হচ্ছিল, কাব্যতত্ত্বের ক্রমবিবর্তনেই তার প্রমাণ মেলে।

সেকালের কাব্যতত্ত্ব থেকে সেকালের সামাজিক আবহাওয়া অনুমান করা এবং দুয়ের সম্বন্ধ নির্দেশ করা অবৈজ্ঞানিক না হলেও অবিসম্বাদিত সম্ভবতঃ নয়। কিন্তু সেকালের রচনায় এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে যা হতে সে যুগের সামাজিক হাওয়াবদল স্পষ্টই অনুভব করা যায়। সে যুগে কাব্যতত্ত্বে সুরবদলের সঙ্গে সঙ্গে (বা পূর্বে) সামাজিক হাওয়াবদল হয়েছিল তা আরও জোর করে বলার অধিকার আমাদের আছে, কেননা প্রথমতঃ কাব্যতত্ত্বের যে যুগের কথাটি আলোচনা করেছি তার আগের ও পরের যুগের কথা আলোচনা করলে আমার বক্তব্যের আরও প্রমাণ মেলে ; দ্বিতীয়তঃ এই রকম সুরবদল যখন শুধু কাব্যতত্ত্বে নয়, অন্যান্য শাস্ত্রেও দেখা যায় তখন একথা বলতে দ্বিধা হওয়া উচিত নয় যে সেকালে শুধু কাব্যতত্ত্বই মোড় ঘোরে নি, সেকালের মানুষের সমস্ত মনটাই মোড় ঘুরেছে, গোটা দৃষ্টিভঙ্গীটাই পরিবর্তিত। এরকম সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তন ছাড়া হয় না। এই দুটি প্রমাণ ক্রমশঃ আলোচনা করা যাক।

দণ্ডী যে সময় কাব্যাদর্শ লিখেছিলেন, তার পূর্বে, ডাঃ সুশীলকুমার দে'র মতে, শুধু কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোন বই ছিল না। কিন্তু তার আগে ছিল ভরতের নাট্যশাস্ত্র, তার একাংশে কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা ছিল। অর্থাৎ তখনও কাব্য একটি আলাদা শাস্ত্র হয়ে ওঠে নি, সে নাট্যের অঙ্গীভূত। এই

দৃষ্টিভঙ্গীটিও অর্থবহ। নাট্য হচ্ছে জীবনের প্রতিরূপ, তার মধ্যে জীবনের নানা বৈচিত্র্যের ছায়া আছে। কাব্যের একমুখীনতার চেয়ে তার সর্বাঙ্গীণতা বেশী। যে যুগে নাট্যের উপর ঝোঁক পড়ে সে যুগে সমাজসংহতিও বেশী, কারণ সমাজের সঙ্গে কবির যদি মিল না থাকে তা হলে কবি এমন কিছু রচনা করেন না যা অভিনয় করতে হলে মিলিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই, এবং যা অভিনয় করতে হলে প্রযোক্তাদের সঙ্গে দর্শকদের একটা প্রত্যক্ষ দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত হবে। সেইজন্য যে যুগে সমাজের সঙ্গে কবির অমিল সে যুগে কবি কেবল নিজের অন্তর নিয়েই ব্যস্ত, তখন সন্ধান পড়ে শুধু অন্তরদেবতার, তখন কবি পাঠকসমাজকে সমাজের চিত্ররূপ উপহার দেন না বরং তার পরিবর্তে উপহার দেন ব্যক্তিগত কাব্য। "This is helped by the swing-over of art from forms visibly dependent on men in association—the dance, the song, music, the spontaneous drama and commedia dell' arte—to crystallised records of the art process not therefore visibly dependent on society— the written poems, the musical score, the written play, the picture or sculpture". আর একটি প্রাচীন সভ্যতার মধ্যেও দেখা যায় আরিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব নাট্যশাস্ত্রেরই অন্তর্গত, কাব্য নাট্যেরই অঙ্গ। ভরত সেইজন্য নাট্যরস ছাড়া কাব্যরস বলে পৃথক কিছুর আলোচনা করেন নি।

আশ্চর্যের কথা, কাব্যশাস্ত্রে রসতত্ত্বের প্রাধান্য স্বীকৃত হতে বহুদিন লাগলেও নাট্যে সে প্রাধান্য বহুদিন আগেই স্বীকৃত হয়েছিল। ভরতের মতে রস আটটি, সেগুলি বিভাব প্রভৃতির সহায়তায় ঠিক ঐ ভাবেই আনন্দ সৃষ্টি করে। কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন স্থায়িভাবগুলির অভিনির্বৃত্তি রসে, না রসের অভিনির্বৃত্তি ভাবে। কারোর মতে এ দুয়ের পরস্পরের সম্বন্ধতেই অভিনির্বৃত্তি। কিন্তু ভরত এ মত অস্বীকার করে রসের প্রাধান্য স্থাপনা করেছেন, বলেছেন দৃশ্যতে হি ভাবেভ্যো রসানামভিনির্বৃত্তিরিতি ন তু রসেভ্যো ভাবনামভিনির্বৃত্তিরিতি (৬।৩২)। বাস্তবিক, আরিস্টটলের সঙ্গে এই মতবাদ এবং যুগের মতবাদের তুলনা করলে স্পষ্ট অনুভব করা যায় নানা সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও কি ভাবে দুটি পৃথক্ সামাজিক পরিবেশে মতবাদগুলির পৃথক্ চেহারা

হয়ে দাঁড়ালো। ভরতের সঙ্গে আরিস্টটলের সাদৃশ্য ঐ সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিভঙ্গীতে, কিন্তু পার্থক্য সেইখানে, যখন আরিস্টটল রসকে অত প্রাধান্য দেন না— তাঁর নাট্যশাস্ত্রে ছন্দ, রীতি, বস্তু, চরিত্র, ভাষা প্রভৃতির বিশেষ গুরুত্ব আছে। পরের যুগের'মতবাদের সঙ্গে, বিশেষ করে দণ্ডীর সঙ্গে, আরিস্টটলের বহুবিষয়ে সাদৃশ্য আছে। দণ্ডী যেমন অলংকার, রীতি, গুণ, রস— সব কটি উপাদানকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন, তেমনি আরিস্টটলেরও বিশ্বাস ট্র্যাজেডির জন্য প্রয়োজন ছ'টি উপকরণের,— প্লট, চরিত্রচিত্রণ, উপযুক্ত বচন বিন্যাস, প্রসাদগুণ, গান, দৃশ্যাবলী। কিন্তু বিরোধ হচ্ছে আসল কাব্যতত্ত্বে— কি উপায়ে কাব্য আনন্দসৃষ্টি করে। পূর্বে এঁদের অলৌকিক আনন্দের যে থিওরির কথা উল্লেখ করেছি তার গোড়ার কথাটা হচ্ছে কাব্যের আনন্দ অলৌকিক, সেই অলৌকিক মায়ার মধ্যেই কবি ও পাঠকের একীকরণ হয় বলেই লৌকিক ভাব অলৌকিক আনন্দে পরিণত হয়, ব্যক্তিগত দুঃখও সাধারণীকৃতির ফলে সুখের কারণ হয়। এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যায়, কাব্যতত্ত্ব নিছক সামাজিক হতে হতেও হলো না। কবি ও পাঠকের এক হওয়া তখনই সম্ভব যখন কবি পাঠকসমাজের একজন হয়ে কাব্যরচনা করেন, অন্ততঃ তাঁর কাব্যের একটা সামাজিক দিক্‌ আছে, সে কেবল ব্যক্তিগত উপকরণে ভারাক্রান্ত নয়। সে হিসেবে যদি তাঁরা বলতেন, কাব্য আনন্দসৃষ্টি করে আমাদের সুখদুঃখের বেদনাকে বাণীমূর্তি দিয়ে, সে সুখের কারণ কেননা তার মধ্যে আমাদের সেই সামাজিক সত্তার প্রকাশ যেখানে পরস্পরের সুখদুঃখে আমরা পরস্পর মিলিত, তা হলে আমরা কাব্যের একটি লৌকিক তত্ত্ব পেতাম। আরিস্টটলের মতে কাব্য আনন্দ দেয় আমাদের রুদ্ধ আবেগকে মুক্তি দিয়ে। তাঁর প্রথম কথা, ট্র্যাজেডি হচ্ছে an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude. অর্থাৎ তার বিভাবের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। ট্র্যাজেডির জন্য আরও প্রয়োজন language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play. অলংকার আর গুণের কথা সংস্কৃত সাহিত্যেও নতুন নয়। তা ছাড়া ট্র্যাজেডি হবে action, narrative নয়। ভরতের মতে নাট্য তাই-ই। কিন্তু আসল কথা

হল, আরিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডির কাজ হচ্ছে through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions (VI. 2-3) এই ক্যাথারসিস তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি তাঁর politics এ বলেছেন যে আবেগ আমাদের কষ্ট দেয় সেই আবেগ হতে মুক্তি দেয় বলেই কাব্যে আমরা আনন্দ পাই। সেগুলি হচ্ছে a means of freeing the 'o'er frought heart' from an excessive accumuilation of emotion. (Newman's Ed. Vol I p 367). অর্থাৎ ব্যক্তির কষ্ট এইভাবে সমষ্টির মধ্যে সুখে পরিণত হচ্ছে। এর জন্য কোনও অলৌকিকত্বের দরকার নেই। যখন কষ্টের সাধারণীকরণ করা হলো তখনই সে আর কষ্ট রইলো না, সমষ্টির মধ্যেই তার সার্থকতা। এই থিওরির মধ্যে এমন কোনও কথা নেই যাতে সন্দেহ করা যায় একালের মনোবিকলনবাদীদের মতো তাঁরা সুখদুঃখের সাধারণীকরণকে কেবল আত্মরতির উপলক্ষ্য হিসেবেই ধরেছিলেন, আবার এ থিওরিতে এমন কিছুও নেই যাতে বলা হয়েছে অলৌকিকত্ব ছাড়া কাব্যের আনন্দ সম্ভব হয় না। যখন সমাজই ব্যষ্টিকে ধারণ করে, সমষ্টিতেই ব্যষ্টির সার্থকতা, এ মত হলো, সেই যুগের কথা, কেননা এতে সামাজিকী-করণেই কাব্যের সার্থকতা, কোনো অলৌকিকীকরণে নয়। এ সম্ভব হয়েছিল কারণ গ্রীক সভ্যতায় সমাজের স্থান অত্যন্ত বড়ো এবং আরিস্টটলই সবপ্রথম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সুর তুললেও তখনও সমাজপ্রাধান্য নষ্ট হয় নি; সে হিসেবে দণ্ডী হতে জগন্নাথ পর্যন্তই শুধু যে একটি সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধির ইতিহাস পাওয়া যায় তাই নয়, তার আগের যুগে এমন একটি সর্বাঙ্গীণতার পরিচয় মেলে যা আদিম যুগের সূচক। কিন্তু গ্রীক কাব্যতত্ত্বের তুলনায় আমাদের ঐ আদিম যুগও স্তরবিভেদে অনেকটা অগ্রসর— এদেশের পরের যুগের তুলনায় না হলেও অন্যদেশের তুলনায় কাব্যশাস্ত্র তখন অপেক্ষাকৃত অসামাজিক। অবশ্য কালক্রমের হিসেবে এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, আরিস্টটল সম্ভবতঃ আরও আগের যুগের লোক। এই অসামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে এসে জগন্নাথে এমন রূপ ধারণ করলো যেখানে পাঠকদের কোনও সমালোচনারই অধিকার প্রায় নেই, কারণ তাঁর মতে কাব্য হচ্ছে প্রতিভা-প্রসূত, আর কাব্য যিনি না বুঝবেন তিনিই অসহৃদয়। কবি

যা লিখবেন পাঠকদের তাই গ্রহণ করতে হবে, দুয়ের সুস্থ যোগাযোগেই যে সার্থক কাব্যের উৎপত্তি সে কথা এ যুগে লুপ্তপ্রায়। Commodity-fetishism এর চূড়ান্ত উদাহরণ !

কিন্তু এরও পরের যুগে যে মতবাদ দেখা দিলো সামাজিক কারণে সেটি অপ্রত্যাশিত না হলেও তা এতই অসামাজিক হয়ে দাঁড়ালো যে সাধারণ পাঠক-সমাজের স্থান সেখানে একেবারেই নেই। পূর্বে যে যে থিওরির কথা উল্লেখ করেছি তাতে রস অলৌকিক হলেও তার কারণটি লৌকিক। শেষের যুগের আলংকারিকরা অবশ্য এ মতকে এই বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন যে বিভাব প্রভৃতি যদি কারণ হয় আর রসই যদি কার্য হয় তা হলে রসের প্রতীতি হবার সঙ্গে সঙ্গে বিভাব প্রভৃতি কারণ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, কেননা কার্যজ্ঞান ও কারণজ্ঞান একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয়। সেইজন্য তাঁরা বলতে চেয়েছেন, বিভাব প্রভৃতি রসের কারণ নয়, বিভাবাদি সংযোগে রস নিষ্পত্তি হয় মাত্র। কিন্তু এই নিছক রসবাদীদের কথা ছেড়ে দিলে মনে হয় যদি অলংকার, ধ্বনি, রীতি, রস প্রভৃতির সুধু সমন্বয়েই সার্থক কাব্যের উৎপত্তি তা হলে পাঠকদের কাছে যে রস প্রতিভাত হয় তার উদ্রেকে বুদ্ধিরও কিছু আভাস আছে, বিশুদ্ধ ভাবালুতা নেই। মনে হয় যেন মননবৃত্তিতে ভর করে রস চিত্তলোকে পৌঁছল, তার পরিণতি মেঘলোকে লুপ্ত হলেও তার প্রভব মর্ত্যলোক হতে। কিন্তু বৈষ্ণব রসগ্রন্থে রসের যে আদর্শ বর্ণিত হল তার মধ্যে গোড়ার কথাটাই স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়ালো। তাঁরা রসের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করলেও এ কথা স্বীকার করলেন না কোনও লীলার রসবর্ণনা প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর নির্ভর করে। এ রস অপ্রাকৃত, অর্থাৎ সব বিষয়ে লৌকিকের মত দেখতে হলেও লৌকিক নয়, গোড়া থেকেই অলৌকিক। সুতরাং এ রস সৃষ্টি হচ্ছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুভূতিরও বাইরে। কি কবি, কি পাঠক, কারুরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুভূতি হতে এ রস সৃষ্ট হয় না, সেইজন্যই এর গতি লৌকিক হতে অলৌকিকে নয়, মূল হতেই অলৌকিক। সাহিত্যদর্পণকার প্রভৃতি শেষের যুগের আলংকারিকেরা বলতে আরম্ভ করেছিলেন লৌকিক কাব্য হতে দৈবী লীলার একটু বিশেষত্ব আছে, কিন্তু সেই কথাটাই এখন চরমে উঠল। ফলে কাব্যের সঙ্গে সমাজের যোগ একেবারে তিরোহিত হলো, কেননা, দৈনন্দিন জীবনকে অস্বীকার করেই এই তত্ত্ব আরম্ভ। এর মধ্যে সাধারণ মানুষের বেদনাকে আনন্দে পরিণত করার কোনো চেষ্টাই নেই, বরং সে চেষ্টা পাপ, কারণ এ রসের মূল সমাজে নেই আছে অপ্রাকৃততত্ত্বে।*

* আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

দুই সন্ধানী *

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন আর বিশ্বভারতী দুটিই দুই সন্ধানীর সৃষ্টি বলতে পারি। মহর্ষিদেব সন্ধান ক'রেছিলেন কি? এই বিচিত্র বিশ্বের মধ্যে সেই বিশ্বাতীত এককে— যিনি আনন্দরূপ অমৃতস্বরূপ। যে-মন্ত্র মহর্ষি বাল্যাবস্থায় নিয়েছিলেন সেই দীক্ষা মন্ত্র তখনকার দিনে নিয়েছিলেন অনেকেই; কিন্তু ওই একটি মানুষের মধ্যে সেই ব্রহ্মমন্ত্র ক্রিয়া করলে। আঠারো বছরের বালক সেই যে ঈশাবাস্যমিদং সর্বং এর মন্ত্র নিলেন সারাজীবন ধ্যানে ও কর্মে তিনি তা সাধন করেছিলেন। সমস্ত জগতের মধ্যে যিনি আছেন জগতকে অতিক্রম ক'রে, তাঁর সন্ধান তো সহজ কথা নয়। তাই মহর্ষিদেব সংসারের শত কাজের মধ্যেও ভোগৈশ্বর্যের তুচ্ছতায় ডুবে রইলেন না। বৈরাগ্য এল তাঁর— এ ভিকিরীর কৃত্রিম বৈরাগ্য নয়। ঘরে আর মন বসে না, রাজপুত্র সব ছেড়ে যেন সন্ধানে বেরুলেন, মনে আশা তিনি বিশ্বাতীতকে উপলব্ধি করবেন। দেশে বিদেশে কতো ঘুরেছেন, ভারতবর্ষে এমন জায়গা নেই যেখানে তিনি যাননি; কৈশোর থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে, প্রৌঢ়ত্ব থেকে বার্ধক্যে ক্রমাগত তিনি সন্ধান ক'রে ফিরেছেন। ভারতের ধ্যানী যোগীদের যে-তীর্থস্থান— হিমালয়, তার শিখরে শিখরে তাঁর জীবনের কত স্তব্ধ সমাহিত দিন কেটেছে। পাহাড় থেকে ফিরে আসার পর তাঁকে দু-একবার দেখেছি, আধ-শোওয়া অবস্থায় তাঁর ঘরে বসে' আছেন, কোলের ওপর দুহাত জোড়া, চোখে মুখে একটা গভীর প্রশান্তির ভাব। অথচ সংসারের কাজে তিনি উদাসীন ছিলেন এমন নয়। প্রত্যেক খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তিনি জানতেন; হিসেব পত্তর, আত্মীয়পরিজনদের খবরাদি— কিছু তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারতো না। অথচ তার মধ্যেই তিনি থাকতেন স্থির-গম্ভীর। কাজের মধ্যে, সংসারের নানা কোলাহলের মধ্যেও তিনি যেন সেই বিশ্বাতীতের রূপটি তাঁর হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত ধ্যান করতেন। গৃহস্থের সংসারে,

* গত ৬ই মাঘ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু তিথিতে শান্তিনিকেতন ছাতিমতলায় আচার্য অবনীন্দ্রনাথের বক্তৃতার সারাংশ। শ্রীক্ষিতীশ রায় অনুলিখিত।

বিশেষত একটা বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে যেমন হ'য়ে থাকে, তেমনি বাধা-বিরুদ্ধতা তিনি যে পেতেন না এমন নয়। কতোবার মতের অমিল হ'য়েছে, কিন্তু বাধা তিনি কাউকে দিতেন না, কাউকে তিনি 'ভজাননি', কারু ওপর জোর করেননি। বিসম্বাদ তাঁর মনে স্থান পাবে কেন— তিনি যে দেখেছিলেন সেই এককে। গার্হস্থ্য ব্যবস্থায় যখন জঞ্জাল বড়ই জ'মে উঠত, শান্তির প্রয়াসী হয়ে তিনি তখন সেই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য একা চলে যেতেন; ঘুরে ঘুরে সন্ধান ক'রে বেড়াতেন বিশ্বাতীতকে ধ্যান করার মত একটি শান্তিময় জায়গা। প্রথম জীবনে তিনি এই রকম একটি জায়গা পেয়েছিলেন, সে হ'লো আমাদের চাঁপদানীর বাগান। তখনো সে বাগান আমাদের পরিবারের দখল থেকে বেরিয়ে যায়নি। পিসেমশাইদের কাছে শুনেছি যে প্রতিবছর ৭ই পৌষে তিনি বাড়ির ছেলেদের ও ধর্মসঙ্গী এবং তাঁর দীক্ষিত শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন সেই চাঁপদানীর বাগানে, গঙ্গার ধারে। সেখানে কীর্তন ধর্মোপদেশাদি হ'ত। সে বাগান কিছু দিন পরে হাতছাড়া হ'য়ে গেল। এ বাগান ছিল যেন তাঁর সেকালকার শান্তিনিকেতন।

আবার সেই সত্যসন্ধানীর ভ্রাম্যমান জীবন শুরু হ'ল, এদেশে যান ওদেশে যান কোথাও যেন তাঁর সাধনার ঠিক অনুকূল ক্ষেত্রটি তিনি পাচ্ছেন না। একবার আসছেন তিনি ওই রায়পুরের সিংহদের বাড়ি; সেখানকার শ্রীকণ্ঠ বাবু তাঁর ভক্ত বন্ধু সেতার বাজিয়ে মাঝে মাঝে তাঁর মনোরঞ্জন করতেন। কল্পনায় দেখি তাঁর সেই যাত্রা—দারুণ দ্বিপ্রহরের রোদ, শিবিকা বাহকেরাও ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, হঠাৎ মহর্ষিদেব দেখলেন সামনে দিগন্ত প্রসারিত মাঠ আর তারই মাঝখানে একটি ছায়াতরু। কী তাঁর মনে হয়েছিল জানি না— হয়তো তিনি সেই বিশ্বাতীতকে এইখানে যেন নিকটে পেয়েছিলেন, সেই যিনি বৃক্ষোইব দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। তিনি বাহকদের থামতে বললেন, শিবিকা থেকে নেমে তিনি বললেন 'আমি এখানে বিশ্রাম কোরবো।' এই সেই ছাতিম তরু কত ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে, কত ঋতুপর্যায় অতিক্রম ক'রে যেন অপেক্ষা করেছিল কবে একজন পথক্লান্ত মহাসন্ধানী আসবেন, বিশ্রাম করবেন তার সুশীতল স্নিগ্ধ ছায়ায়। সারাজীবন ঘুরে বেড়িয়েছেন, মরণাপন্ন অবস্থা থেকে উঠে প্রৌঢ়ত্বের শেষ প্রান্তে এসে তিনি যেন তাঁর তপস্যার ক্ষেত্রটি খুঁজে পেলেন। মনের চোখে যেন দেখতে পাই

তিনি এই ছাতিমতলায় বসে সূর্যাস্তের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলছেন 'তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।' সে কী গম্ভীর স্বর। সৌভাগ্যক্রমে আমরা এক-একবার শুনেছি তাঁর সেই ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ— সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মঃ ;— কী উদাত্ত কণ্ঠ, মনে হ'তো যেন অন্তর থেকে উদ্বেলিত ভাব-সাগর ঊর্ধ্বের দিকে ধ্বনি পাঠাচ্ছে। সেই সন্ধানীর শেষ বাসনা হ'ল তিনি এই বিস্তৃত প্রান্তরের নির্জনতায় পরমপিতার ধ্যান করবেন। পাখি যেমন দিগদিগন্ত ঘুরে এসে সন্ধ্যায় একটি নীড় খোঁজে, তেমনি তিনি চাইলেন এই শান্তিনিকেতনে একটা আশ্রয়। এই আশ্রমের যে-শান্তি তা তিনি সকলের জন্য উৎসর্গ করে রেখে গেলেন— এইভাবে হ'লো আশ্রমের প্রতিষ্ঠা।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার ইতিহাসও কম বিচিত্র নয়। এর যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনিও একজন সন্ধানী। মহর্ষি সন্ধান করেছিলেন বিশ্বের মধ্যে বিশ্বাতীতকে, তেমনি তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্রও এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে, ফুলের রূপে, পাখির গানে, মানবসমাজের সেবায় ও কাজে বিচিত্র দিক দিয়ে ঠিক যেন সেই একই আরাধ্যকে খুঁজেছিলেন। দুইই সন্ধানী— তবে পথ তাঁদের আলাদা, একজন সাধক অপরজন কবি তবে লক্ষ্যবস্তু উভয়েরই এক। রবিকা তাই যখন মহর্ষিদেবের কাছে বললেন যে তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ভার নেবেন শান্তিনিকেতনে, তখন উৎসাহের সঙ্গে মহর্ষি সেই প্রস্তাবে মত দিলেন। আর দিলেন কেন— তিনি যে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন এও এক সন্ধানী, সুরের পথে গানের রাস্তায় সেই এককে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পিতা গড়লেন মন্দির, আর পুত্র সেই দেবদেউলের চারিদিক ঘিরে রচনা করলেন বিশ্বভারতীর মনোরম উদ্যান। দুটিতে মিলে সম্পূর্ণ চমৎকারী একটি জিনিস।

পিতা যে আনন্দরাজ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি তো তা কৃপণের মতো নিজের কাছেই রাখতে চাননি, সবাইকে ডেকে বলেছিলেন : এই আনন্দে এই সাধনায় সবাই আমার সমভাগী হও। পুত্রও যখন আশ্রয় খুঁজে পেলেন এই বিশ্বভারতীতে— যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্— সমস্ত বিশ্বের কাছে তিনি এই ব'লে তাঁর আমন্ত্রণ পাঠালেন। কতো লোক আমায় বলেছে : এত জায়গা থাকতে তোমার রবিকা বীরভূমের ঊষর মরুতে তাঁর প্রতিষ্ঠান কেন করলেন। তখন হয়তো ঠিকমত বুঝিনি। এখন বুঝতে পারি যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক

তেমনই হ'য়েছে— পিতার বাঁধা-নীড় পুত্র যেন উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। কলকাতায় থাকতে অসুখবিসুখের সময় রবিকা দুঃখ ক'রে বলতেন: কলকাতা আর ভালো লাগেনা, অবন— আমার যেন কোথাও একটা বাসা নেই। আমার বলতে ইচ্ছা হ'ত: তোমার ঘরের মত ঘর কোথায়। বিশ্বে বিশ্বের জন্য ঘর বেঁধেছো তুমি। এই শান্তিনিকেতনের সবাইকে নিয়ে তাঁর ঘর ও পরিবার গড়ে উঠেছে। তাঁর পিতার মত তিনিও ছিলেন ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনিও ছিলেন গৃহস্থ। এঁরা কেউই বৈরাগী ছিলেন না। তা যদি হ'তেন তবে এই নির্মল আনন্দলোকের সৃষ্টি কি সম্ভব হ'ত। শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর মর্মের কথা ওই একই। প্রথম সন্ধানী উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি। দ্বিতীয় সন্ধানীও সেই কথাই কত সুরে, কত গানে, কত কাজের মধ্যে দিয়ে আজীবন বলেছেন। এই দুই সন্ধানী পুরুষ, এই পিতাপুত্র— শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর অন্তরলোকে অধিষ্ঠিত হ'য়ে আছেন— এঁদের মিলিত ইচ্ছা নিয়ে সৃষ্টি হ'ল এই আনন্দলোক, এইখানেই তাঁরা বিশ্বের মধ্যে বিশ্বাতীতকে, সীমার মধ্যে অসীমকে সন্ধান করে পেয়েছিলেন।

পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক বন্ধুত্বলাভের পরম সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল সেই অল্প কয়েকজন ভাগ্যবান পুরুষের মধ্যে মোহিতচন্দ্র সেন অন্যতম। মোহিতচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র এবং পরে সুদক্ষ অধ্যাপক রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের চেয়েও তাঁর সুগভীর সহৃদয়তাই রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। মোহিতচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ও বন্ধুতা অল্পদিনই স্থায়ী হয়; অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর আবির্ভাবে সেই সুনিবিড় বন্ধুতার অকালসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু সেই অল্পদিনের সৌহার্দ্য শুধু যে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কেই গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল তা নয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও তার চিহ্ন অক্ষয় হয়ে রয়েছে। মোহিতচন্দ্রের অন্তরপ্রকৃতি কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের দ্বারাই আকৃষ্ট হয়নি, শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ এবং কবি রবীন্দ্রনাথের মানসসত্তাও তাঁর অন্তরে সমানুভূতির প্রতিধ্বনি জাগিয়েছিল। এই সমচিত্ততাই উভয়ের বন্ধুতার আসল যোগসূত্র।

এই বন্ধুতা মোহিতচন্দ্রের ত্যাগের দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে নবস্থাপিত বিদ্যালয় পরিচালনায় নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করছিলেন; অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা এবং বিঘ্নে এই কর্মের ভার তাঁর পক্ষে অত্যন্ত দুর্বহ হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় মোহিতচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়ালেন তাঁর বন্ধু ও সহায়ক রূপে। একদিন তিনি কলকাতা থেকে বোলপুরে উপস্থিত হয়ে "আমাকে কোণে ডাকিয়া ··· সলজ্জভাবে আমার হাতে একখানি নোট গুঁজিয়া দিলেন। নোট খুলিয়া দেখিলাম হাজার টাকা।" এই হাজার টাকা তখন রবীন্দ্রনাথের কতখানি আনুকূল্য করেছিল, রবীন্দ্রনাথই তার যথোচিত মূল্য নিরূপণ করেছেন। "এই হাজার টাকার মত দুর্লভ দুর্মূল্য হাজার টাকা ইহার পূর্বে এবং পরে আমার হাতে আর পড়ে নাই। টাকায় যাহা পাওয়া যায় না এই হাজার টাকায় তাহা পাইলাম। আমার সমস্ত বিদ্যালয় একটা নূতন শক্তির আনন্দে সজীব হইয়া উঠিল।···আমাদের মাথার উপর হইতে বিঘ্নবাধার ভার লঘু হইয়া গেল।" শুধু অর্থানুকূল্য নয়, কর্মানুকূল্যের দ্বারাও মোহিতচন্দ্র বিদ্যালয়পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের সহায়তা করেন। বিদ্যালয়ের অতি দুঃসময়ে

তিনি তার অধ্যক্ষপদ গ্রহণ ক'রে এখানে আসেন (১৯০৪) এবং তাঁর যত্নে বিদ্যালয়ের যথেষ্ট উন্নতি হয়। কিন্তু কয়েক মাস পরেই কঠিন পীড়াগ্রস্ত হ'য়ে তাঁকে আশ্রম ছেড়ে যেতে হয়।

কিন্তু সব চেয়ে বড়ো কথা এই যে, মোহিতচন্দ্রই বাংলা দেশে রবীন্দ্রকাব্য-পিপাসুদের প্রথম যথার্থ পথপ্রদর্শক; তাঁরই চেষ্টায় ব্যাপকভাবে রবীন্দ্রকাব্যের রসগ্রহণের পথ সরল ও প্রশস্ত হয়। ১৯০৩-০৪ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের তৎকালপ্রচলিত কাব্যগ্রন্থসমূহের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণে তিনি সমস্ত রচনাকে বিষয় ও ভাবানুসারে সজ্জিত, শ্রেণীবদ্ধ ও নয় ভাগে বিভক্ত ক'রে প্রকাশ করেন। তাঁর সম্পাদিত এই শ্রেণীবিভাগের ফলে রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতার অন্তর্নিহিত যোগসূত্র ও ভাবগ্রন্থি পাঠকসাধারণের কাছে সুস্পষ্ট হয়। ফলে রবীন্দ্রকাব্যের মর্মগ্রহণ অনেকের পক্ষেই সহজ হয়। মোহিতচন্দ্রের অবলম্বিত শ্রেণীবিভাগ এখন আর প্রচলিত নেই বটে; কিন্তু তাঁর প্রদর্শিত কাব্যরসগ্রহণের পদ্ধতি আজও অব্যাহত আছে। বস্তুত রবীন্দ্রকাব্যের ভাবসংশ্লেষ উপলব্ধি করতে হ'লে এখনও মোহিতচন্দ্রের শ্রেণীবিভাগের উপযোগিতা স্বীকার করতে হয়। তা-ছাড়া এই কাব্যগ্রন্থাবলীর ভূমিকায় তিনি যে-ভাবে রবীন্দ্রকাব্যের মর্ম উদ্‌ঘাটন করেছেন তা যথার্থ রসজ্ঞের নিকট বহুকাল আদরের বস্তু হয়ে থাকবে। বস্তুত এই গ্রন্থাবলী-সম্পাদনের দ্বারা তিনি বাংলাসাহিত্যের যে উপকার করেছেন তা অবিস্মরণীয়।

মোহিতচন্দ্র সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠকরা রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রপ্রবন্ধ' গ্রন্থের বন্ধুস্মৃতি অংশে 'মোহিতচন্দ্র সেন'-নামক প্রবন্ধ এবং 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' পুস্তিকার অনুরূপ অংশ থেকে অনেক তথ্য অবগত হ'তে পারবেন।

মোহিতচন্দ্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের বহু পত্র 'রবীন্দ্রভবনে' রক্ষিত আছে। এই পত্রগুলি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হ'লে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন চিন্তা, কর্ম, শান্তিনিকেতন -বিদ্যালয়ের আদর্শ এবং বিশেষভাবে মোহিতচন্দ্রের সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলী সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথাই জানা যাবে। বিশ্বভারতী পত্রিকার 'পত্রাবলী' বিভাগে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন শ্রেণীর পত্র যথাসম্ভব ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়েছে। উক্ত পত্রশ্রেণীর ধারাবাহিকতা ও সম্পূর্ণতা-রক্ষার খাতিরে প্রয়োজন মতো কোনো কোনো পূর্বমুদ্রিত পত্রের পুনর্মুদ্রণ করা যাবে। মোহিতচন্দ্রকে লেখা পত্রগুলিই সর্বপ্রথম ধারা হিসাবে প্রকাশিত হবে। এইগুলির মধ্যে বিশ্বভারতী পত্রিকায় (প্রথম ও চতুর্থ সংখ্যা) সাতখানি পত্র ইতিপূর্বেই সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং তিনখানি পত্র আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে (পঞ্চম সংখ্যা)। উক্ত সাতখানি পত্র পুনর্মুদ্রিত হবে না; তবে অংশত প্রকাশিত পত্র তিনখানি যথাস্থানে ও যথাসময়ে সমগ্রভাবে প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদক]

ওঁ

মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত—

বন্ধু

কাল হঠাৎ পিতার অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে চলে এসেছি। আপনার বইগুলি প্যাক করিয়ে দিয়ে ভূপেন বাবুকে[১] বলে এসেছি আপনাকে পাঠিয়ে দিতে। চৌকি প্রভৃতিও পাঠানো হচ্চে। আপনার কাচের জিনিষগুলি এই সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্চি।

বিদ্যালয়ে গিয়ে এবারে খুব আনন্দে ছিলুম। শিক্ষকেরা সকলেই একাগ্র উৎসাহের সঙ্গে কাজ করচেন— ছেলেদের মধ্যে বেশ একটা স্ফূর্ত্তি দেখা দিয়েছে—স্পষ্টই বুঝতে পারলুম এ জিনিষটিকে কলকাতায় উৎপাটিত করে আনা কিছুতেই সম্ভবপর ও শ্রেয়স্কর নয়। এবং এ জিনিষটি যেমন দীন এবং ক্ষুদ্র আছে এই ভাবেই আমি এ'কে রাখতে চাই—এর উপরে অত্যাকাঙ্ক্ষার ভার চাপানো চল্‌বে না।

আশা করি প্রমথবাবু[২] আমার প্রস্তাবের তাড়নায় নিজেকে বিপন্ন মনে করচেন না। তাঁর মনে যখন প্রবল দ্বিধার সংগ্রাম চল্‌চে তখন তাঁর পক্ষে এর থেকে নিরস্ত হওয়াই উচিত। মাঝখানের এই ক্ষুদ্র ঘটনার জন্যে তিনি আমার কাছে যদি লেশমাত্র কুণ্ঠিত হন তবে আমি দুঃখিত হব—এ কথা যেন কখনই ওঠেনি এমনভাবে তিনি যেন আমার কাছে আস্‌তে পারেন। আপনি তাঁকে এই কথাটার জাল থেকে মুক্ত করে দেবেন—এতে তাঁর সঙ্কোচের কোনোই কারণ নেই এটা তাঁকে নিশ্চয় বুঝিয়ে বলবেন—বরঞ্চ তাঁকে এই একটুখানি চক্ষুলজ্জার মধ্যে ফেলেছি বলে আমি মনে মনে সঙ্কোচ বোধ করচি।

পিতার শরীর একটু সুস্থ হলে দেখা করতে যাব। বুধবার

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল

২ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় (?)

ওঁ

জোড়াসাঁকো
শুক্রবার
ফাল্গুন ১৩০৪

বন্ধু

পিতার শরীর কাল থেকে অনেকটা ভাল। এবারকার মত সঙ্কট উত্তীর্ণ হ'ল বলে বোধ হচ্ছে।

আপনারা সকল সুস্থ হয়ে উঠলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

বিদ্যালয়ের অর্থসংগ্রহের একটা সুযোগ উপস্থিত হয়েছে— যদি কৃতকার্য্য হই তবে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারবে। কিন্তু লোভ করব না। টাকা বেশি হাতে এলে ভাল হবে কি মন্দ হবে বলা যায় না। অধিক পরিমাণ টাকা গ্রহণ রক্ষণ ও ব্যবহার করতে যে সমস্ত কল কারখানার প্রয়োজন হয় সে গুলোর ভার সম্বরণ করা কঠিন। টাকা জিনিষটার দোষ এই যে, সে ছোটলোকের মত ঠেলে ঠুলে সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠ্‌তে চায় এবং তার খাতিরে তার চেয়ে অনেক বড়ো জিনিষের খাতির রক্ষা করা কঠিন হয়ে ওঠে। ঈশ্বর করুন টাকার কাছে আমাদের যেন মাথা নীচু না করতে হয়। আমরা যা পারি তাই যথার্থভাবে করব— তার চেয়ে বেশি করবার প্রলোভনে পড়ে যা যথার্থভাবে করতে পারি তাকে যেন খর্ব্ব না করে ফেলি। ময়ূরভঞ্জের দ্বারে, এই কথা ভেবেই, আমি অগ্রসর হইনি। ভাল কাজেরও বৈষয়িক দিকটা ভয়ঙ্কর— তার মধ্যেও লোভ মোহ ভ্রষ্টতা অহঙ্কার এসে পড়ে—সাংসারিক স্বার্থের বৈষয়িকতার চেয়ে সেটা কোনো অংশে ন্যূন নয়। আমরা দরিদ্র থেকে যা কাজ করতে পারি তাই করব— ঈশ্বর আমাদের শক্তি দেবেন— টাকা আমাদের কাছ থেকে সেই শক্তিকে আচ্ছন্ন করবার চেষ্টা করবে। এ বিদ্যালয়ে যে পরিমাণে টাকার সংস্রব আছে সেই পরিমাণে আমরা দুর্ব্বল হয়ে আছি। কবে তার জাল থেকে মুক্তি পেতে পারব আমি এই কথাই ভাবি। যাই হোক্ আমাদের যদি টানাটানি ঘোচে যদি দিব্য হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠি তবে আত্মবিস্মৃতির দিন আস্‌বে বলে আশঙ্কা হয়। আমাদের যা কিছু দরকার সবই আমাদের পেতেই হবে, কোনো কিছুকেই খর্ব্ব করতে পারবো না এ যদি হয় তাহলে ঈশ্বরের কার্য্যে ইস্তফা দিতে হয়।

আপনার শ্রীরবীন্দ্রনাথ

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর
২৮শে পৌষ ১৩০৮

প্রিয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার উপহারখানি আন্তরিক প্রীতির সহিত গ্রহণ করিলাম। আমি দার্শনিক বই প্রায় পড়ি নাই—ভয় হয় পাছে যাহাকে সহজ বলিয়া জানি তাহার কঠিন স্বরূপ দেখিয়া আতঙ্ক জন্মে। সমস্ত প্রকৃতি দিয়া যাহাকে অনুভব করা যায় তাহাকে কেবল মাথা দিয়া দেখিতে গেলে অনেকটা অংশ হাঁ হাঁ করে— তাহার সকল স্থানে সমান আলোকপাত হয় না—ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতির মূলে যে বিশ্বব্যাপী স্বয়ম্ভু আনন্দ আছে তাহাকে প্রমাণের মধ্যে কেমন করিয়া আনা যায় এবং তাহাকে বাদ দিয়া ধর্ম্মকে দেখিতে গেলে সহস্র বিরোধের মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়। আইনকে কেবল আইনের ভাবে বিচার করিতে আমার মন বিমুখ হয়— কিন্তু আইনের গোড়ায় সকল আইনকে অতিক্রম করিয়া যেখানে খুসি আছে, যেখানে আনন্দ বিরাজমান, সেইখানে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে বিসর্জ্জন দিতে পারিলে আমি বাঁচি— পাছে সেখানকার উল্টাদিকের গলিতে গলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় এই ভাবনায় ফিলজফির সিষ্টেমগুলি দেখিলে আমার ভয় হয়। এই আতঙ্ক আমার প্রকৃতিগত— মূলজ্ঞানকে মাতৃস্তন্যের মত শোষণ করিয়া লইবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা— তাহাকে চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া রন্ধন করিয়া লইতে আমার রুচি হয় না। বোধ হয় এ সম্বন্ধে আমার আবদার অত্যন্ত বেশি বলিয়া আমি

"একেবারে পেতে চাই পরশ রতন।"

কিন্তু আপনার বইখানি আমি পড়িবই—চারিত্রশাস্ত্রে এই গ্রন্থই আমার প্রথম প্রবেশিকা হইবে। আমার অন্তঃকরণ আপনাকে আত্মীয় বলিয়া জানিয়াছে। অতএব আপনার প্রসারিত হস্ত অবলম্বন করিয়া কোনো নূতন পথে প্রবেশ করিতে তাহার কোনো সঙ্কোচ নাই।

আপনি ইংরাজি ভাষায় পত্র লিখিয়া কুণ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু হৃদয়ের

ভাষা মাতৃভাষা অপেক্ষাও অন্তরতর—অতএব সে ভাষা ইংরাজিতেই পাই আর বাংলাতেই পাই তাহাকে মূল্যবান্ বলিয়াই জানি। ইতি

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

বন্ধুবর

আগামী বৃহস্পতিবারে হাজারিবাগে যাত্রা করিতেছি। যদি ছুটীর সময় আপনাকে সেখানে দেখিতে পাই ত বড় আনন্দিত হইব।

আপনার দান যে আমাদের পক্ষে কি অমূল্য হইয়াছে তাহা আপনাকে কেমন করিয়া জানাইব? ধনীর দানে আমাদের বাহ্য অভাব মোচন হইত মাত্র, কিন্তু আপনার দানে আমাদের বল এবং নিষ্ঠা বাড়িয়া গেছে। আমরা সকলেই আত্মসমর্পণের জন্য অধিকতর প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছি— এখন আর কোনো ভারকে ভার বলিয়া বোধ করিতেছি না। আপনি আমাকে দুঃসময়ে হঠাৎ সচেতন করিয়া অনেকদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। আমাদের অধ্যাপকেরাও নূতন প্রাণ পাইয়া দৃঢ়তর নিষ্ঠার সহিত এই বিদ্যালয়ের অন্তর্নিহিত মহৎ আদর্শকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য আত্মোৎসর্গে সচেষ্ট হইয়া উঠিতেছেন তাহা আমি অনুভব করিতেছি। আপনার আকস্মিক দান নব বসন্তের উদার দক্ষিণ বাতাসের মত আমাদের বিদ্যালয়কে নূতন পুষ্পে কিশলয়ে নূতন প্রাণ বিকাশের চেষ্টায় পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। ঈশ্বর মঙ্গলের পথে আপনাকে নিয়ত অগ্রসর করিয়া আপনার জীবনকে পূর্ণভাবে সার্থক করুন তাঁহার নিকট এই আমার একান্ত মনের প্রার্থনা।

উপাধ্যায়[৩] মহাশয়ের শেষ পত্রখানি এই সঙ্গে পাঠাইতেছি। যদি অবকাশ পান তবে পত্রখানি জগদীশকে[৪] লইয়া দেখাইবেন তিনি খুসি হইবেন। ভারতবর্ষের যথার্থভাবে আত্মপরিচয় দিবার সময় আসিয়াছে। এখন তাহাকে

৩ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

৪ জগদীশচন্দ্র বসু

আর সঙ্কুচিত হইয়া থাকিলে চলিবে না। এই পরিচয়দানের কার্য্যে আপনাকেও যোগ দিতে হইবে। বিশ্বসভায় ভারতবর্ষের অমর বাণী আপনিও উচ্চারণ করিতে অগ্রসর হইবেন এমন আশ্বাস পাইয়াছি। এখন হইতে প্রস্তুত হউন বন্ধু— আপনাকে একদিন পতাকা হস্তে অগ্রসর হইতে হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। স্বদেশের আহ্বান প্রত্যহই পরিস্ফুটতর ভাবে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। আপনি যে এই আহ্বানের লক্ষ্য আছেন তাহা আমি কবির চক্ষে দেখিতেছি এবং একদিন আপনি সংগ্রাম হইতে ফিরিয়া স্বদেশের ললাটে নূতন যশোমাল্য স্থাপন করিতেছেন তাহাও আমি দেখিতে পাইতেছি। ইতি ২৬শে ফাল্গুন ১৩০৯

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

হাজারিবাগ
১১ই চৈত্র ১৩০৯

প্রিয় বন্ধু

পর্শু আমার জ্বর ছেড়েছে—কাল থেকে আমি গুটি তিনেক কবিতা লিখে ফেলেছি। তার কোন্‌টা কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তা আপনি বিচার করে দেখবেন— আপাততঃ আপনি পড়ে নিয়ে বঙ্গদর্শনে ছাপবার জন্যে শৈলেশের[৫] হাতে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু এখন আপনার কবিতা পড়বার অনুকূল সময় কিনা সে আমার একটি ভাবনা আছে। সকালবেলা তখন আপনার মহা ব্যস্ততার সময়— চার দিকে পরীক্ষার কাগজ—সেই কর্ম্মব্যূহের দ্বারে আমার এই তিনটি ক্ষীণ কবিতা কম্পান্বিত কলেবরে গিয়ে দাঁড়াবে তখন এদের অত্যন্ত দীন চেহারা বেরবে। এখানে এখন পরিপূর্ণ বসন্ত। আমার পূবদিকের জানলা খোলা,— সম্মুখে তরঙ্গায়িত চষা মাঠ দিক্‌প্রান্তে নীল পাহাড়ে গিয়ে মিলেছে। এখানকার বার্ত্তা কলকাতার সেই রথঘর্ঘরিত গলির মধ্যে কেমন করে গিয়ে পৌঁছবে? এখানকার রং সেখানে

৫ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

ফুটবে—এখানকার সুর সেখানে কি বাজ্‌বে ? এখানে আমি একান্ত অলস—তার উপরে শরীরটা শিথিল। আমার আঙুলের মীড় সেই ভিড়ের মধ্যে পৌঁছবে কি ? এখানকার আকাশ ও বাতাসের খানিকটা দিয়ে যদি কবিতা ক'টা মোড়ক করে বুকপোষ্ট করে দিতে পারতুম তাহলে কতকটা ঠিক অবস্থায় গিয়ে পৌঁছত। আপাততঃ কেবল উপরে লিখে দিচ্ছি Glass with care। আপনি চিঠির জবাব দেবার জন্যে কোনো তাড়া করবেন না এবং কবিতা ক'টাকে পরীক্ষার কাগজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে ওর উপরে শূন্য মার্কা বসিয়ে দেবেন না। বঙ্গদর্শনের ঝরনা তলাটা দেখেচেন— ওটা রূপকের কোটায় যাবে তো ? এখন থেকে বঙ্গদর্শনের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। একটা গল্প না ধরলে পাঠকরা ইঁট্‌পাট্‌কেল ছুঁড়তে আরম্ভ করবে।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

ওঁ

প্রিয়বন্ধু

আজ আর একটি লিখেছি। এটা প্রকৃতি গাথায় বসিয়ে দেওয়া চলে। যদি সেটা ছাপা হয়ে থাকে তাহলে আপনার যেখানে খুসি দেবেন। গ্রন্থাবলী কি পর্য্যন্ত হলো আমি তার কিছুই জানিনে। ফর্ম্মা চারেকের ফাইল পেয়েছিলেম— তার পরে আমার বরাদ্দ বন্ধ। আমার প্রতি নিতান্ত নিঃসম্পর্ক লোকের মত ব্যবহার করা হচ্চে— শৈলেশের কাছ থেকে কোনো খবরও পাইনে, আশাও পাইনে, প্রুফও পাইনে। যা ছাপা হচ্চে তাতে ভুলচুক আছে কিনা তাও বুঝতে পারচিনে। যে জননীর ছেলে যুদ্ধে গেছে, এবং যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সেনাপতি মহাশয় বাড়িতে খবর পাঠান নিষেধ করেছেন আমি সেই যুদ্ধক্ষেত্রগত সন্তানের [মাতার] মত বসে আছি— ছেলের গায়ে অস্ত্র লাগ্‌ছে কি না তাও জানিনে, সে জয়ী হচ্চে কিনা সে খবরও পাইনে—এখন কোথায় কোন্ লড়াইটা হচ্চে সে জনশ্রুতিও আমার কানে আসে না। কোনো দেশের কোনো প্রকাশক গ্রন্থকারের প্রতি এরকম নিষ্ঠুর আইন চালায় নি। দূরে থাকি, সুতরাং নিরুপায় হয়ে বসে আছি। আপনি যদি

শৈলেশকে ডেকে তার শৈলের মত অচল চিত্তকে আমার দুঃখে একটু বিচলিত করতে পারেন তাহলে আপনি আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। ইতি ১২ই চৈত্র ১৩০৯

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ এ কবিতাও বঙ্গদর্শনে বোধ হয় যেতে পারে। তাহলে শৈলেশের হাতে সমর্পণ করবেন।

কাঠের রাজা

বীরবল

[বীরবল বহুকাল পূর্বে একখানি তিন অঙ্ক নাটিকা লিখতে চেষ্টা করেছিলেন। আমার বিশ্বাস যে উক্ত নাটিকার প্রস্তাবনা এবং প্রথম অঙ্ক লেখা হয়েছিল। তারপর আমার কোন বন্ধু সে লেখাটি নিয়ে যান এবং ফেরত দেন নি। তাঁর কাছে তার খোঁজ করা অসম্ভব কেননা তিনি এখন আর ইহলোকে নেই। সেদিন আমার পুরোনো কাগজ ঘাঁটতে হঠাৎ এই অসম্পূর্ণ প্রস্তাবনাটি আবিষ্কার করলুম। এখন যে সেটি প্রকাশ হচ্ছে সে শুধু বীরবলের নাটক রচনার নমুনা হিসেবে।— বীরবল]

কবি। রচেছি অপূর্ব বস্তু করো অভিনয়।
নিজমুখে নিজ স্তুতি করা অবিনয়॥
নইলে বলিতে পারি এর মত লেখা।
বহুদিন ভূভারতে যায় নাই দেখা॥

নট। প্রশংসা নিশ্চয় পাবে, বন্ধু যত আছে।
ঠেলে তোমা তুলে দেবে সাহিত্যের গাছে॥
নিন্দে যদি কেহ করে কখন ভুলিয়ে।
তার পিছে দিয়ো তুমি কাগজ লেলিয়ে॥

কবি। নাটকের পরিচয় নাম রানা রাজা।
আর কিছু নাহি হোক আগাগোড়া তাজা॥

নট। কি কাহিনী করিয়াছ তাহাতে বিন্যাস।
শেষেতে বিবাহ আছে অথবা সন্ন্যাস॥

কবি। গল্প ভাগ অল্প তাতে বেশি ভাগ স্ফূর্তি।
আব্ছায়া দেখা যাবে পাত্র পাত্রী মূর্তি॥
এত বিদ্যে বলি সত্যি নেই মোর ঘটে।
দুনিয়ার ছবি আঁকি রঙ্গালয় পটে॥
মোর হাতে ভাঙ্গে শুধু কিছুই গড়ে না।
মোর নাট্যে যবনিকা শেষেতে পড়ে না॥

কল্পনা প্রথমে চড়ে' পরেতে নামিয়া।
ঘড়ির কাঁটার মত যাইবে থামিয়া॥
আদি আমি নাহি জানি নাহি জানি অন্ত
মাঝেতে দেখেছি শুধু প্রকৃতির দন্ত॥
কামড় তাহার সহি দেখি তার হাসি।
তারি পরে রাগ করি ফের ভালবাসি॥
বেদান্তের অন্তে আসে দন্তের দর্শন।
মম নেত্রে তারি রূপ শ্রবণে ঘর্ষণ॥
নাটকেতে পুরিয়াছি একসঙ্গে ঠাসি।
কিঞ্চিৎ দংশন আর অকিঞ্চিৎ হাসি॥

নট। দৃশ্যকাব্যে দর্শনের স্থান নেই স্পষ্ট।
ছন্দবন্ধে ফিলজফি শুধু পায় কষ্ট॥
নাটকের কাজ এক দর্শক হাসানো।
আরেক দর্শক চক্ষু জলেতে ভাসানো॥

কবি। কোনো কবি মোড়া দিয়ে খোলে মনোকল।
অমনি সবার বহে নাকে চোখে জল॥
নাট্যরস কারো ফোটে নানা অঙ্গ ভঙ্গে।
রঙ্গভূমি ডুবে যায় হাস্যের তরঙ্গে॥
আমি কিন্তু রোদ বৃষ্টি করিয়াছি মিল।
আমার যা হাসি তাহা কান্নার সামিল॥

নট। সলিলে উত্তাপ যোগে রচিবে ধোঁয়ায়।
দেখা যাবে পরে তাতে কি রস চোঁয়ায়॥

কবি। এক রস নাহি তাতে শুধু এক ভাবে।
আদি মধ্য অন্ত রস এক সাথে পাবে॥

নট। ব্যাখ্যা ত্যজি আখ্যায়িকা এবে করো শুরু।
চক্ষের পল্লব ক্রমে হয়ে আসে গুরু॥
কেবা রাজা কেবা রানী কোথা কার দেশ।
কোন্ গুণে নাটকেতে লভিলা প্রবেশ॥

কবি। পুরাকালে বকদ্বীপে ছিল দারুরাজ।
মুখ তার কুঁদে কাটা অঙ্গে কারুকাজ ॥
রূপেতে মদন রণে দেব সেনাপতি।
ধরণীর রমণীর মনে কেনা পতি ॥
কাতিকের মত তবু আইবুড় ছিল।
ধরে বেঁধে পাত্রমিত্রে বিয়ে দিয়ে দিল ॥
রক্তে মাংসে গড়া রানী রাজাটি কাঠের।
তাইতে নাটক মম নতুন ঠাঠের ॥
নট। সরস্বতী তব বুঝি টেনে থাকে গাঁজা।
কবি। দারু যদি ব্রহ্ম হয় হতে নারে রাজা ?

ভারতীয় সাধনার ইঙ্গিত

শ্রীঅবনী নাথ রায়

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে ধারণাটা আমার মনে বদ্ধমূল হচ্চে সেটা এই যে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা এবং ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্নিহিত কথাটা এক নয়। তা' যদি না হ'ত তা হ'লে দুই জাতির দৈনন্দিন জীবনযাত্রাপ্রণালীতে এত বৈষম্য পরিলক্ষিত হ'ত না। একটা উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্যটিকে পরিস্ফুট করা যাক্। আমার এক বন্ধু কথাপ্রসঙ্গে একদিন বল্‌ছিলেন যে তিনি এক সাহেবের সঙ্গে একদা প্রথম শ্রেণীর কাম্‌রায় পরিভ্রমণ করছিলেন। ভোর হ'ল— সাহেব উঠে বাথ্ রুম থেকে ফিরে এসে খাবার নিয়ে বস্‌লেন। প্রথমে হ'ল tinned কমলা লেবুর রস— তারপর রুটি, মাখন, কেক্ ইত্যাদি। তারপর একটা ক'রে স্টেশনে গাড়ী থামে আর সাহেব মুখ বাড়িয়ে কিছু না কিছু কেনেন। এই রকম ক'রে সমস্ত দিন চল্‌লো জিহ্বাপরিতৃপ্তির অবাধ লীলা যতক্ষণ না তাঁরা দিল্লী পৌঁছুলেন। এখানে এ কথাও উল্লেখ করা দরকার যে সাহেব যে কেবল একলাই খেয়েছেন তা' নয়— তিনি সমানে আমার বন্ধুবরকে আহার্য গ্রহণে অনুরোধ জানিয়েছেন এবং বন্ধুও যতদূর সম্ভব তার মর্যাদা রক্ষা করেছেন।

এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে পাশ্চাত্ত্য দেশের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রণালী শতকরা নিরনব্বই ক্ষেত্রেই ঐ রকম অর্থাৎ খাদ্যতান্ত্রিক। খাওয়া দিয়েই তাঁদের দিন আরম্ভ হয়। আমাদের দেশে কিন্তু ঠিক এর বিপরীত। খাওয়া দিয়ে আমাদের দিন আরম্ভ হয় না— খাওয়া আসে অনেক পরে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুকরণে আমাদের দেশেও যাঁরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে বেড্ টি খান তাঁদের বিষয় আমি বারান্তরে আলোচনা করবো।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংঘাতে এসে আমাদের অন্তরের চিন্তাধারায় যেমন পরিবর্তন এসেচে, বাইরেকার আচার ব্যবহার এবং জীবনযাত্রা প্রণালীতেও তেমনি পরিবর্তন হয়েচে। একটা আদান প্রদান এবং মিশলের যুগে এ রকম হওয়াটা অপরিহার্য ব'লে মনে হয়। কিন্তু তৎপূর্বে দিবারম্ভের সনাতন ভারতীয় রীতি কি ছিল দেখা যাক্।

ভারতবর্ষে দিবারম্ভের পদ্ধতি ঈশ্বরের নামোচ্চারণে। এখানকার প্রাতঃস্মরণীয় স্তোত্র এই :—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥

জীবনযাত্রার পথে নবোদিত দিনটিকে কি ভাবে গ্রহণ করতে হবে তারই স্মারক বাণী এই স্তোত্রটির মধ্যে দেওয়া আছে। আমরা দিন আরম্ভ করবো এই কথা জেনে নয় যে আমরা সার্ধদ্বিহস্ত পরিমিত মানুষ— ঝগড়া দ্বন্দ্ব, পরানুকরণ, পরস্বাপরহণ আমাদের ধর্ম। আমরা দিন আরম্ভ করবো এই কথা স্মরণ ক'রে যে আমরা ব্রহ্ম, আমরা ক্ষুদ্র নয় আমরা আনন্দস্বরূপ, মুক্ত— আমরা বদ্ধ নয়। শোক করা আমাদের ধর্ম নয়— আমরা সর্বদা মুক্ত— কোন বন্ধনই আমাদের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করতে পারে না।

এই কথা স্মরণ করলে পরবর্তী যে কথাটা আপনি আপনিই মনে আসে সেটি হচ্চে এই যে আমি যদি ব্রহ্ম, আমি যদি নিত্যমুক্ত তবে আমার সাম্‌নে যে দিনটি ভেসে উঠ্‌চে তাকে আমার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে মিলিয়ে নেব কেমন ক'রে? পরবর্তী স্তোত্রে সেই কথারই উত্তর রয়েছে :—

"লোকেশ চৈতন্য ময়াধিদেব
শ্রীসত্য বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্তয়িষ্যে॥"

হে লোকেশ, হে চৈতন্যময়, হে অধিদেব, হে সর্বব্যাপী বিষ্ণো, আমি সকাল বেলা উঠে তোমারই আজ্ঞায়, তোমারই প্রীতির জন্য সংসারযাত্রার অনুবর্তন করছি। যে দেশের শাস্ত্র এই বিধান দিয়েছেন যে আমাদের যে প্রাত্যহিক জীবন তার মধ্যে আমার কোন ইচ্ছা অনিচ্ছা নেই, আমার কোন কর্তৃত্ব নেই— সে জীবন কেবল শ্রীভগবানের প্রীতির জন্যই গ্রহণ করতে হবে এবং যাপন করতে হবে— সে দেশের লোক যে ক্রমশ বস্তুতে আসক্তিশূন্য হয়ে চিন্ময়ের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে, সে বিষয়ে খানিকটা আশা করা যেতে পারে।

এই রকম ক'রে ভগবানের কথা স্মরণ করা এবং তাঁর পূজা করা ছিল

ভারতবর্ষের দিনারম্ভের প্রাথমিক কর্তব্য। ভগবানকে নিবেদন ক'রে তার পরে সেই প্রসাদ গ্রহণ ছিল রীতি। তা' যদি না করা যায় তবে মানুষের মধ্যে যে দেবতা আছেন তিনি বড় না হ'য়ে বড় হয়ে উঠেন দানব অর্থাৎ রক্তমাংসের শরীর এবং তারি যে ধর্ম, অর্থাৎ জড় ধর্ম। ভগবানকে নিবেদন ক'রে না দিলে কোন খাদ্যদ্রব্যই ভগবান অবধি পৌঁছুতে পারে না কিন্তু সে কোথায়ও ত পৌঁছুবে! তাই সে দেহ অবধি পৌছায়। এবং দেহের যে ধর্ম তাকেই পরিপুষ্ট করে। পাশ্চাত্ত্য দেশে এর পরিচয় সর্বত্র। সুপুষ্ট দেহ সেখানে এবং তারি সঙ্গে সঙ্গে দেহের যে ধর্ম অর্থাৎ সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আরামপ্রিয়তা তারি জন্য কাড়াকাড়ি এবং মারামারি। এই হ'তে বাধ্য। কেননা সে দেশে আহার্যদ্রব্য উৎসর্গ ক'রে দেওয়া হয় দেহকে। তাই প্রাতঃকালে উঠেই বিনা দ্বিধায় খাওয়া আরম্ভ করতে বাধে না।

এইখানে প্রসঙ্গক্রমে আর একটা কথা উঠ্‌বে। সেটা হ'ল এই যে দেহের উদ্দেশে যদি আমার শক্তি সামর্থ্য সবি নিবেদিত হয় তবে দোষ কি? তাতে ত আপাতদৃষ্টিতে দেখছি সুবিধা মন্দ নয়। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" এ কথাও শুনেছি। যারা দুর্বল, যারা অলস, যারা অর্বাচীন তারাই জাগ্রত চোখে দৃশ্যমান দেহটাকে বাদ দিয়ে দেহী বা দেহাতিরিক্ত কোন সত্তার অনুসন্ধানে মত্ত হয়। তার কি কোন প্রয়োজন আছে?

এ সেই চিরন্তন প্রশ্ন যার চিরন্তন নিবৃত্তি আজ অবধি হ'ল না। কেননা প্রশ্নটি আসলে ব্যক্তিগত, (individualistic), এর সমষ্টিগত (collective) সমাধান হওয়া কঠিন। আপন আপন অভিজ্ঞতা থেকে প্রত্যেক মানুষ বল্‌তে পারবে যে সে চায় আনন্দ, সে চায় শান্তি। যদি দেহের চর্চা ক'রে মানুষ সেই আনন্দ, সেই শান্তি লাভ করতে পারতো তাহ'লে দেহীর জন্যে ব্যস্ত হওয়ার কোনদিনই প্রয়োজন হ'ত না। কিন্তু দেখা গেছে এ পথে আনন্দ পাওয়া যায় না— অন্তত স্থায়ী আনন্দ পাওয়া যায় না। ক্ষণস্থায়ী আনন্দের পরে আস্‌বে দুঃখ, আসবে ব্যথা, আসবে অশান্তি। কেননা যে নিজে স্বল্পকালস্থায়ী সে নিত্যকালের আনন্দের বাহন হবে কোথা থেকে? এ পথে যে ভোগের উপকরণ সংগ্রহ হবে তার উপর বহু দেশের মানুষের বহু কালের লোভ। আর তাই নিয়ে দেশে দেশে পরস্পর লাঠালাঠি, হানাহানির অন্ত নেই। তাই ভারতবর্ষ

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে শান্তি যদি চাও তবে ভোগের পথ নয়— ও পথে শান্তি পাওয়া যাবে না। নিবৃত্তি বা ত্যাগের পথ আশ্রয় কর।

আর সাধারণ বুদ্ধিতেও মনে হয় যে জীবনের মূল্য যদি মাত্র এইটুকু হয় যে আমরা দু' দশ বছরের জন্যে পৃথিবীতে আস্‌বো, পরস্পর ভালবাসাবাসি কিংবা ঝগড়া দ্বন্দ্ব করবো এবং তার পর একদিন শূন্যে মিলিয়ে যাব, তবে সে জীবনের অর্থও বেশি নয় এবং তাকে আবাহন ক'রে নিতে বহু আত্মসম্মানজ্ঞান-সম্পন্ন লোক আগ্রহশীলও হবেন না।

সেই কারণে ভারতবর্ষ এই বিশ্ব-প্রহেলিকার রহস্য আবিষ্কারের পথকেই শ্রেষ্ঠ পথ বলে নির্দেশ করেছিলেন। তাঁদের আবিষ্ক্রিয়ার আভাস নীচের শ্লোকে কিছু পাওয়া যাবে ঃ—

"সর্বং জগদিদং ত্বত্তো জায়তে, সর্বং জগদিদং ত্বত্তস্তিষ্ঠতি, সর্বং জগদিদং ত্বয়ি লয়মেষ্যতি, সর্বং জগদিদং ত্বয়ি প্রত্যেতি।"

সমস্ত জগৎ তোমার থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, সমস্ত জগৎ তোমাতেই অবস্থিত, সমস্ত জগৎ তোমাতেই লয় প্রাপ্ত হয় এবং সমস্ত জগৎ তোমাতেই ফিরে আসে।

এই হল ভারতবর্ষের সনাতন বাণী।— এই অদ্বৈতবাদে (unity in diversity) পৌঁছুতে ভারতকে বহু সাধনা করতে হয়েছে। আমরা ঋষিদের সাধনালব্ধ সেই সিদ্ধান্তের উত্তরাধিকারী। জীবনে এই বাণীকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতবর্ষের পক্ষে সত্যিকারের সাধনা।

স্বরলিপি

"ওঁ পিতা নোঽসি"

কথা—বৈদিক স্তোত্র

সুর—৺ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত স্বর অবলম্বনে
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী কর্তৃক লিপিবদ্ধ।

II সা -া । ঋা পা ক্ষপা । গা -া । ঋা -া গা I ধা -া ।
ওঁ ॰ পি তা ॰ নোঽ ॰ সি ॰ পি তা ॰

। পা -ঋা গা । -ঋা -ন্‌া । -ঋা -া সা I সা সা । -ধ্‌া সা -া ।
নো ॰ বো ॰ ॰ ॰ ॰ ধি ন ম ॰ স্তে ॰

। সা -া । -া -া -া I সা -ঋা । গা -পা পা । -ধা র্সা । -া -া -া I
ঽস্তু ॰ ॰ ॰ ॰ মা ॰ মা ॰ হিং ॰ সীঃ ॰ ॰ ॰

I -ধর্ঋা -র্সর্সা । -ধপা গপা -গঋা । -সা -া । -া -া । II
॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I {গা গা । -া গা পা । -ক্ষা ধা । পা ধা র্সা I -া -া ।
বি শ্বা ॰ নি দে ॰ ব স বি ত ॰ ॰

। র্সা র্সা র্সা । -া -া । -া র্সা র্সা I র্সা -না । -র্ঋা -া র্সা ।
দু র্ রি তা ॰ ॰ ॰ নি প রা ॰ ॰ ॰ সু

। র্সা -া । -া -া -া} I গা -া । গা -া গা । -া -া । ঋা -া ঋা I
ব ॰ ॰ ॰ ॰ যদ্‌ ॰ ভ ॰ দ্রং ॰ ॰ ত ॰ ন্ন

I ঋা -ন্‌া । -ঋা -া সা । সা -া । সা সা -া I সা -া । ঋা ঋা -া ।
আ ॰ ॰ ॰ সু ব ॰ ন মঃ ॰ শ ॰ ম্ভ বা ॰

। রা রা। রা সা -রা I গা গা। -া গা গা। রা গা। হ্মা -া হ্মা I
য় চ ম য়ো ০ ভ বা ০ য় চ ন মঃ শ ০ ঙ্ক

I হ্মা পা। গা হ্মা পা। পা -া। পহ্মা ধপা -া I পা পা।
রা ০ য় চ ম য় ০ স্ক০ রা ০ য় চ

। হ্মা পা ধা। ধা -া। ধা ধা পা I ধা না। না -া -া। -ধা -না।
ন মঃ শি বা ০ য় চ শি ব ত রা ০ ০ ০ ০

। -র্রা -া র্সা I র্সা -া। -া -া -া। সা -া। -া -া -া I II
০ ০ য় চ ০ ০ ০ ০ ওঁ ০ ০ ০ ০

সঞ্চয়ন

Goethe কেমন বিজ্ঞানী ছিলেন ?

Goetheকে মহাকবি বলে আমরা জানি। তিনি মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন বলেও আমাদের অস্পষ্ট একটা ধারণা আছে। তাঁর লেখা পড়বার আগ্রহ এবং সুযোগ কচিৎ কখনো কারো দেখা যায়। তাই Goethe যে বিজ্ঞানেরও চর্চা করেছিলেন শুনলে হয় তো অনেকের আশ্চর্য বোধ হবে। বস্তুত Goethe নিজেকে বিজ্ঞানী বলেই বেশি মনে করতেন — তাই নিয়ে তাঁর যথেষ্ট গর্ব এমন কি অভিমান ছিল।

Goethe কেমন বিজ্ঞানী ছিলেন আলোচনা করে Cambridge University Press থেকে অধ্যাপক Sir Charles Sherringtonএর লেখা একটি বই সম্প্রতি বেরিয়েছে। গত ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের Nature সাপ্তাহিকে অধ্যাপক E. N. DAC. Andrade এই বইয়ের সমালোচনা উপলক্ষ্য করে এই বিষয়ে তাঁর নিজের মতামতও প্রকাশ করেছেন। বই-লেখক এবং সমালোচক দুজনেই জগৎবিখ্যাত বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের কষ্টি-পাথরে Goetheর বিজ্ঞান চর্চার মূল্য এই দু'জন যা যাচাই করেছেন তা আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। পাঠকদের বিচারের জন্য তাঁদের মতামত এইখানে উপস্থিত করা গেল।

বিজ্ঞানে অনুরক্ত কবি যে আর কেউ ছিলেন না এমন নয়। Shelley একসময়ে নানারকম রাসায়নিক পরীক্ষার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। Beddoesএর বিজ্ঞান বিষয়ে প্রগাঢ় অনুরাগের কথা শোনা যায়। Shelleyর সমকক্ষ না হলেও ইনিও নিতান্ত সামান্য কবি ছিলেন না, যাঁর অধিকাংশ সময় শরীর গঠন বিজ্ঞানের চর্চাতেই কেটেছে। এঁদের মধ্যে এবং বিখ্যাত কবিদের মধ্যে কেউই কিন্তু বিজ্ঞানের জগতকে খুব বড় একটা কিছু দান করেছেন বলে দাবি করেন না— এক Goethe ছাড়া। Goethe তাঁর বর্ণবিজ্ঞানের চর্চা উপলক্ষ্যে একসময় Eckermannকে বলেছিলেন "কবি হিসেবে আমি আমার কর্মের মূল্য খুব বড় বলে ধরিনা। কিন্তু এ যুগে আমিই যে একমাত্র রং জিনিসটার প্রকৃত প্রকৃতিকে উপলব্ধি করতে পেরেছি এ দাবি আমি করব।" পরবর্তীকালে

তাঁর নিজের কাব্যসৃষ্টির সম্বন্ধে তাঁর মত হয়তো বদলে গিয়ে থাকতে পারে; কিন্তু বর্ণবিজ্ঞানের উপর তিনি যে সকল লেখা লিখেছেন তার গুরুত্ব যে চিরস্থায়ী হবে এ ধারণা তাঁর বরাবর ছিল।

Goetheর বিজ্ঞান-দৃষ্টি ছিল এমন যার থেকে ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া চলেনা। প্রকৃতিকে বুঝতে যাওয়া তাঁর পক্ষে ছিল ব্যক্তিকে বোঝার মতো। সে ব্যক্তি কোন দৈব-পুরুষ হতে পারেন, কিন্তু তাঁর সৃষ্টির এবং পরিকল্পনার যে আনন্দ তা একান্ত মানবীয়। Sherington বলেছেন "For him, surely, the Nature he turned to, and addressed so often, was no impersonal principle, no causal concatenation of material forces. Rather, it was a numinous presence, immanent in Earth and Sky, operating the gates of birth and death." প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে বৈজ্ঞানিক ভাবে বুঝবার একমাত্র উপায় তাঁর কাছে ছিল প্রকৃতিগত ভাবে তাদের লক্ষ করা। ল্যাবরেটারিতে তাদের বিশ্লেষণ করে দেখার অথবা মাপ জোপ করে ফলিত গণিত দিয়ে তাদের ব্যাখ্যা করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এ দিক দিয়ে Goethe ছিলেন Newtonএর বিরোধী। Newton কে তিনি অযথা বহু আক্রমণ করে বিজ্ঞানীদের বিরাগ-ভাজন হয়েছেন। Newton এর মতবাদ, যা হচ্ছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদ, তা তিনি বুঝতেন না। গণিত শাস্ত্রের প্রতি ছিল তাঁর বিরাগ, কারণ তিনি বলতেন, অঙ্ক দিয়ে প্রকৃতির যা সত্য তাকে শুধু চাপা দেওয়া হয়। পরিমাপ এবং গণনার প্রতি তাঁর যে অবিশ্বাস এবং অজ্ঞতা তা তাঁকে অনেক সময় পথভ্রষ্ট করেছে।

জীব-বিজ্ঞান বিষয়ে Goethe র যে সকল লেখা আছে তার বহু অংশ D'Arcy Thompson এর বিখ্যাত গ্রন্থ Growth and Form এ উদ্ধৃত হয়েছে। প্রকৃতিকে তিনি যে এক অভিন্ন অবিভাজ্য জীব হিসেবে দেখতেন তার ফলে তিনি জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সকল সুচতুর Theory উপস্থাপিত করেছিলেন তা যথেষ্টরূপে সমর্থিত না হলেও এখনও লোকে তা নিয়ে আলোচনা করে। Goetheর প্রধান অনুরাগ কিন্তু জীব-বিজ্ঞানে ছিল না— ছিল আলোক এবং বর্ণ-বিজ্ঞানে; এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা যে ভুলের উপর স্থাপিত তা এতই সুগভীর যে তাঁর লেখা "Farbenlehre" থেকে কোনরকম সংগত বা যুক্তিসম্মত অভিমত খুঁজে বার করতে তৎকালীন পদার্থ-বিজ্ঞানীরা অসমর্থ হয়েছেন।

ঘোলাটে জলীয় পদার্থের মধ্যে দিয়ে আলোক রশ্মি চালিয়ে দিলে আলোকের যে সব গুণাগুণ লক্ষ করা যায় তাই ছিল Goetheর বর্ণ বিষয়ক অনুসন্ধানের ভিত্তি। কিন্তু মুশকিল এই যে Goetheর পক্ষে যা ছিল মূল বিষয়, Andrade যাকে বলছেন Scattering Phenomena তা দিয়ে আলো এবং রং এর মূল স্বাভাবিক ধর্মের কোন অনুশীলনই আরম্ভ করা যায়না। Goethe তাঁর লেখার মধ্যে এই Phenomenaগুলিকেই প্রধান স্থান

দিয়েছেন, এর কারণ বোধহয় Scattering এর কারণে রংএর সৃষ্টি বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে খুবই সাধারণ ঘটনা। Goetheর দৃষ্টি অতি সূক্ষ্ম; এবং Scattering এর হেতু তাঁর যে সব রংএর বর্ণনা তা বহুল এবং নিখুঁত। সব রকম রংএর, এমন কি কাঁচের কলমের মধ্যে দিয়ে যে সাত রং বার হয় তারও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা Goethe তাঁর ঐ Scattering Phenomenaর সাহায্যে করেছেন। তার এই সুদীর্ঘ ইতিহাস পড়তে আরম্ভ করলে বোঝা যায় যে তাঁর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণগুলিকে তিনি কিরকম একটানা ভুলের মধ্যে দিয়ে দেখে এসেছেন, এবং সত্যিকারের সমালোচকের চোখ দিয়ে কিছুতেই তাদের দেখতে রাজি হননি। Newton এর শিক্ষার প্রতি Goetheর বিরাগ এতই ছিল যে তাঁর বিরুদ্ধে অযথা কটুবাক্য প্রয়োগ করতে Goethe বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। বহিরবস্থাকে সংযত করে নিয়ে পরিমাণবাচক যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, যার উপর Newton এত জোর দিয়েছেন তা ছিল Goetheর পক্ষে বিরক্তিকর। তিনি রংএর পর্যবেক্ষণ করতেন প্রকৃতির মধ্যে তা যেমন ভাবে ঠিক সেই ভাবেই। Newton হয়ত তাঁর কাছে ছিলেন সেইরকম সমালোচকের মতো যিনি Shakespeareএর মূল্য নিরূপণ করতে চান তাঁর লেখার মধ্যে কোন কোন বিশেষ শব্দ কতবার পাওয়া যায় তাই গুণে। কাব্যের সার তো আর অঙ্কশাস্ত্রের মাপ দিয়ে নির্ণয় করা যায়না!

বিজ্ঞান বিষয়ে Goetheএর শ্রম যদিও আধুনিক বিজ্ঞানের ধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে নিরর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হলেও তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একটা সুসংগতি আছে। Sherrington সেটি ধরে দিয়েছেন এবং তারই থেকে এই মহাকবির মনের ক্রিয়াকে আরো ভালো করে বোঝবার আর একটি পথ খুলে গেছে।

মোহনলাল

আতঙ্ক আত্মকর্তৃত্ব

যুদ্ধের সময় আমাদের বহু বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়। চলিত কথায় বলে 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়'। যুদ্ধই যাদের পেশা তাদের কথা বাদ দিলেও আজকের দিনে আমরা নিয়তই দেখছি যে যুযুধান দেশগুলির 'অসামরিক লোকেরাও' পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধের আনুষঙ্গিক সংকটের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে। বাইরের শত্রু আজকাল অতর্কিতে শত শত যোজন দূর থেকে এসে অগ্নিবৃষ্টি ক'রে যায়; আর ঘরের শত্রু তো আছেই। বর্তমানে আমাদের দেশেও দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। চারিদিকে যে-সব সমস্যা ও সংকট উপস্থিত হয়েছে তার মধ্যে বোধ করি সব চেয়ে শোচনীয় হল ভীতিবিহ্বলতা—

একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় মনোভাব। এই সর্বনাশা দুর্বলতা থেকে নিজেদের কী ক'রে রক্ষা করা যায়, সে কথা আজকের দিনে বিশেষ ক'রে ভেবে দেখা উচিত।

সম্প্রতি Nature পত্রে উক্ত বিষয়ে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ বেরিয়েছে— প্রবন্ধটির নাম Morale। Morale বলতে কী বোঝায় সে সম্বন্ধে প্রবন্ধকার সংক্ষেপে বলেছেন : Morale is a feeling of confidence and competence in the conduct of an enterprise. অর্থাৎ Morale হ'ল যাকে বলা চলে চারিত্রিক দৃঢ়তা—ও আত্মকর্তৃত্বের মনোভাব। আমাদের দেশের প্রয়োজনের দিক থেকে প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়টি এইখানে সংকলন করা গেল।

Morale জিনিসটা সামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে খানিকটা নিয়মানুবর্তিতা ও খানিকটা আবহাওয়ার আওতায় স্বতন্ত্রভাবে গড়ে ওঠে। সত্যিকার সমস্যা হ'চ্ছে 'অ-সামরিক' ব্যক্তিদের নিয়ে। তারা অন্যভাবে তৈরি ; যুদ্ধ ও হানাহানির থেকে কেবল দেহ নয় মনের দিক থেকেও তারা বেশ খানিকটা দূরে সরে থাকে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে বর্তমানে 'অ-সামরিক' লোকদের সঙ্গেও যুদ্ধের সম্বন্ধ নানা দিক থেকে অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। অথচ যুদ্ধ-কালীন অবস্থার সম্মুখীন হ'বার মত শিক্ষাদীক্ষা 'অ-সামরিক' নাগরিকদের নেই। কী করে তাঁরা স্থিরচিত্তে সাহসের সঙ্গে এই দুঃসময়ের মুখোমুখি হ'য়ে যুজতে পারেন তারই উপায় ও নির্দেশ উদ্ভাবন করা দরকার। যে-বিপদ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ তাথেকে হয়তো উদ্ধার পাওয়া কঠিন হয়না এবং কঠিন হ'লেও পাশ কাটিয়ে তাকে এড়িয়ে যাওয়া চলে। কিন্তু বিপদ যখন চতুর্দিক থেকে এসে দেশব্যাপী দুর্যোগের সৃষ্টি করে তখন তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। এই রকম সংকটের অবস্থাতেই Morale এর সমূহ প্রয়োজন, এই অবস্থাতেই প্রয়োজন সংঘশক্তি, সংশয়হীনতা ও সাহসিক মনোভাবের।

এইমাত্র যে-সংঘশক্তির কথা বলা হ'ল তাকে বলা চলে Moraleএর মেরুদণ্ড। Morale গঠনের প্রথম ও প্রধান উপাদানই হ'লো বহুজন সম্মিলিত একটা সামবায়িক প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার অন্তর্গত হতে হ'বে সবাইকেই সমভাবে ; অর্থাৎ এর মধ্যে ধনী দরিদ্র, সরকারী বেসরকারী প্রভৃতি পংক্তিবিভাগ থাকবেনা।

Morale গঠনের একটি প্রধান অন্তরায় হ'ল অধিকাংশের মনে নিজেদের আর্থিক ও বৈষয়িক অবস্থার স্থায়িত্ব রক্ষাসম্বন্ধে ভয়। অন্ন বস্ত্র ও আশ্রয় সম্বন্ধে প্রত্যেকের মনে এই নিঃসহায়তার ভাব না থাকলে বিপদ কালে লোকে অনেক পরিমাণে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে এই দিক থেকে সকলকে কতকটা নিশ্চিন্ত থাকবার মত আশ্বাস দিতে পারলে একটা আত্মকর্তৃত্বের মনোভাব জাগিয়ে তোলা যায়।

Morale সৃষ্টির ভূমিকাতেই প্রয়োজন একটা অনুকূল আবহাওয়া তৈরি করা। নানা অনিবার্য কারণে এদেশের জনাসাধারণের মনে একটা শ্লথ ঔদাসীন্যের ভাব দেখা

দিয়েছে। বোধ করি এই মনোভাবের পিছনে রয়েছে একটা বহুদিনপুঞ্জিত নৈরাশ্যের বোঝা। সে যাই হোক, জনসাধারণকে এই যুদ্ধকালীন দুঃসময়ে আত্মপ্রত্যয়ের পথে আনা, বাইরে-থেকে-চাপানো আইনকানুন বা হুকুম-দিয়ে তৈরি বিধিনিষেধের কর্ম নয়। আতঙ্ক যখন লোকের মনকে অতিমাত্রায় পেয়ে বসে তখন সত্যিই দেশ ও জাতির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই মারাত্মক অবস্থা থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে Morale শিক্ষা ও চর্চার আয়োজন ব্যাপকভাবে করা দরকার।

পূর্বেই বলা হ'য়েছে এই কাজে কৌলিন্যবিচার বাদ দিতে হবে; Morale গঠনে অগ্রণী হতে হ'বে শাসনতন্ত্রের ছোটবড় সবাইকে—দেশবাসীর সুখদুঃখের সহভাগী হ'য়ে। সর্বাংশে সর্বত্র প্রত্যেকের সঙ্গে সহজ বন্ধুভাবের চর্চাদ্বারা ঐক্যের বাঁধন শক্ত হয়। ব্যাপকভাবে আত্মরক্ষার অনুকূলে আবহাওয়া সৃষ্টি হ'লে প্রত্যেকে অপেক্ষাকৃত সহজে তাঁদের আশু স্বার্থকে ত্যাগ করবার কথা ভাবতে পারে। Morale গঠনে নেতা হবেন তাঁরাই, যাঁরা অভিজ্ঞ, দৃঢ়চিত্ত, দূরদর্শী। তাঁরা তাঁদের কথা ও কাজের দ্বারা সবাইকে বুঝিয়ে দেবেন যে বিপদসংকুল অবস্থার মধ্যেও যদি সুশৃঙ্খলায় সম্মিলিতরূপে বিপদের সম্মুখীন হওয়া যায় তবে নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাত্রায় মোটের ওপর বেশি বিভ্রাট ঘটে না। এই আস্থা একবার যদি মানুষের মনে স্থিতি লাভ করে, তবে নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দিয়ে সাধারণকে সাহসের পথে চালনা করা শক্ত হয় না। বহুসংখ্যক লোক যদি এইভাবে দুঃসাধ্য কর্তব্যের সাধনে ব্রতী হয়, তবে অল্পসংখ্যক অনিচ্ছুক লোকদেরও এই পথে আর সবাইকার সঙ্গে যোগ দেবার জন্য আসতে হবে। অন্তরের স্বাধীন ইচ্ছায় তারা শেষ পর্যন্ত নিয়মানুবর্তনের নীতি মেনে নেবে সকর্মক ভাবে। ইংরেজি প্রবন্ধকার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: This sense of fulfilment in unity gives a new steadfastness and energy to each and every member of the pack, it increases altruism and tends to add moral strength to the morale.

তারা তখন ভাবতে শেখে যে: এপথে আমরা একা নই—আমাদের সহযাত্রী সকলেই। আমি আজ যদি চোখ বুজি তবে কাল আমার পোষ্যদের মুখের দিকে তাকাবার লোক রইল। এই ধরনের বিশ্বাস প্রত্যেকের মনে সত্য ক'রে তোলবার কাজে সামান্যমাত্রও ফাঁকি চলবে না। ধনীদরিদ্র, সরকারী বেসরকারী নির্বিশেষে ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কোথাও যদি বিন্দুমাত্র বৈষম্য ঘটে তা হ'লে Morale গঠনের প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। যাঁরা নেতৃস্থানীয় যাঁরা জনসাধারণকে এই সংকটের পথে সাহসিকতার দীক্ষা দেবার ভার নেবেন তাঁদের কথায় ও কাজে ব্যতিক্রম থাকলে চলবে না। কথায় ও কাজে ও সর্বদিকের অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে আন্তরিকতা ও সহযোগিতা থাকা চাই।

সংকট যখন চতুর্দিক থেকে উগ্র হয়ে ওঠে তখন মানুষের মনে 'সর্বনষ্ট' হয়ে যাবার ভয়টাই পেয়ে বসে। 'আমার' বলতে যা-কিছু বোঝায় সে সবই নষ্ট হয়ে যাবে— এই ভাবনাটাই তীব্র হয়ে ওঠে। এই ভীতিবিহ্বলতার সমষ্টিগত ফল সমগ্র দেশকে আত্মরক্ষা ব্যাপারে পঙ্গু ক'রে দেয় ও তারই ফলে ঘটে দেশব্যাপী অনাচার ও বিশৃঙ্খলা। সন্দেহ, দ্বিধা ও সংশয় থেকে উদ্ধার করে সবাইকার মনে একটা সত্যকার ভরসা দিতে পারলেই Morale গঠন সম্ভব আর এ ছাড়া বিপদ থেকে রক্ষা পাবার 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে।'—সুধাকান্ত

বিশ্বভারতী পত্রিকা

প্রথম বর্ষ অষ্টম সংখ্যা

ফাল্গুন ১৩৪৯

সেকালের কাব্যকলা*

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

কাব্যতত্ত্বে এই যে বিভিন্ন সুরবদলের কথা উল্লেখ করলুম এ যে শুধু আকস্মিক নয়, এর পিছনে যে একটি সামাজিক হাওয়াবদল ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কাব্যতত্ত্বের সুরবদলের ধারাবাহিকতায়। সামাজিক ইতিহাসের মূলতত্ত্ব অনুসারে যে কালক্রম আসা উচিত এবং ফলে কাব্যতত্ত্বের ক্রমে ক্রমে যে রূপ ধারণ করা উচিত এখানে তার ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু কাব্যতত্ত্বে এই সুরবদলের সঙ্গে সেকালের অন্যান্য শাস্ত্রেও যে অনুরূপ সুরবদল হয়েছিল, সে কথাটাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বস্তুতঃ কাব্যশাস্ত্রে ধ্বনি এবং তারপর রসের প্রাধান্য এবং শেষের যুগে অলৌকিক রসের কথা— এর পিছনে সেকালের একটি মস্ত মানস ইতিহাস আছে যা উপেক্ষার নয়। সেকালের ন্যায়শাস্ত্রে কয়েকটি প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুটি বড়ো প্রমাণ। এই প্রত্যক্ষের মধ্যে আবার একটি ভাগ অলৌকিক প্রত্যক্ষ। ধ্বনি অলৌকিক প্রত্যক্ষ, না অনুমান দ্বারা গ্রাহ্য সে সম্বন্ধে যাই তর্ক হোক্ সে তবু প্রমাণগ্রাহ্য; সে সম্বন্ধে যুক্তি তর্ক চলে।

* পূর্বানুবৃত্তি

কিন্তু রস যদি একেবারেই ব্রহ্ম হয় তাহলে সে অদ্বৈততত্ত্ব অনুসারে প্রমাণের বাইরে, প্রমেয় নয়। সুতরাং কাব্যতত্ত্বকে যদি সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্বিচার করা চলে তাহলে পণ্ডিতসমাজের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেও এই দর্শনগুলিরও এদিক দিয়ে একটা পুনর্বিচার সম্ভব কি? তত্ত্বের কথা ছেড়ে এবার তথ্যের কথায় আসা যাক্।

সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যতত্ত্বের আলোচনা হতে যে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের সন্ধান পাওয়া যায়, সংস্কৃত কাব্যেও সেই পরিপ্রেক্ষিতের স্বাক্ষর আছে কি? যদি সমাজবিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন হয়, তাহলে তার প্রমাণ তো কাব্যশাস্ত্র হতে কাব্যেই বেশী পরিমাণে পাওয়া উচিত। সে প্রমাণ যে সংস্কৃত কাব্যে আছে শকুন্তলা এবং উত্তররামচরিত এই দুটি নাটকের আলোচনা করলেই তা বোঝা যায়।

শকুন্তলা আর উত্তররামচরিতের গল্পাংশের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য নেই এমন নয়, বরং অনেক জায়গায় শকুন্তলার ছায়া উত্তররামে পড়েছে এমন কথাও বলা চলে। প্রথম পর্যায়ে বিচ্ছেদ, তারপর বিরহ। একটিতে নায়কের স্মৃতিলোপ, অন্যটিতে নায়িকার মনে সন্দেহ। দুটিতেই তিরস্করিণীর ফলে সংশয়চ্ছেদ। তারপরে তপোবনে নায়কনায়িকার পুনর্মিলন। এই পুনর্মিলনে একদিকে একজন ঋষি, অন্যদিকে সন্তানের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এরকম ঘটনাগত ও ভাবগত—এমন কি কোনও কোনও জায়গায় ভাষাগত—সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও স্পষ্ট অনুভব হয় দুটি নাটকের মানসিক আবহাওয়া এক নয়, ও দুটির সামাজিক পারিপার্শ্বিকও এক নয়।

অভিজ্ঞানশকুন্তল পড়লে কেমন একটা ধারণা জন্মায় এ যেন ইংরেজী সাহিত্যের রেনাঁশাঁস যুগের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে—দুয়ে তফাত অনেক, কিন্তু সৌসাদৃশ্যও আছে। এ ধারণার মূলে অন্য কোনও কারণ থাক্ বা নাই থাক্ একটি কারণ নিশ্চয়ই আছে। সেক্স্‌পীয়রের নাটকে ব্যক্তির জয়গান ধ্বনিত হয়ে উঠলেও মধ্যযুগীয় সমাজবোধ তখনও লুপ্ত হয় নি। বরং সামাজিক কারণে যে সময় সেই সমাজবোধে সংকট দেখা দিয়েছিল, সে সময়ই সাম্রাজ্যবিস্তার শুরু হবার ফলে সে সমাজবোধ ভেঙে পড়ে নি, সে সংকটের মধ্য দিয়ে বরং একটি নতুন বৃহত্তর পরিবারবোধ গড়ে উঠেছিল। সেজন্য সেক্স্‌পীরীয় ট্র্যাজেডির নায়কেরা

অদম্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী— তারা সমাজসংহতি ছিন্নভিন্ন করতে চায়। সেইজন্যই মহাবল হয়েও তাদের পতন, কেননা এই বৃহত্তর বোধই তখন nature, fate ইত্যাদি নানা কথায় চলছে। এইখানেই তাঁর ট্র্যাজেডির মূলসূত্র। তেমনই শকুন্তলায় দেখা যায় একটি বৃহত্তর সমাজবোধ আছে, সমাজ একটি বৃহৎ পরিবার এবং রাজা সেই পরিবারের কর্তা। তবুও ব্যক্তি ও সমাজে সংঘর্ষ বেধেছে, কিন্তু সে সংঘর্ষ প্রবল হয় নি। সমষ্টিতেই যে মানুষের স্থিতি ও ধৃতি এ বোধ তখনও স্পষ্ট। তাই শকুন্তলা ট্র্যাজেডি হতে হতেও ট্র্যাজেডি হলো না। কিন্তু এই বৃহত্তর সমাজবোধ নেই বলেই উত্তররামে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সংঘর্ষ এতো প্রবল, কাব্যের নিয়মে সে মিলনান্তক নাটক হলেও বাস্তবিক পক্ষে তা গভীরতম ট্র্যাজেডি ও চরমতম বিদ্রোহ।

এই পরিবর্তিত আবহাওয়ার পরিচয় পদে পদে। নন্দিকেশ্বর, ভরত এবং অন্যান্য নাট্যাচার্যেরা বারবার বলেছেন নাটক হচ্ছে দৃশ্যকাব্য, সে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার লিখিত নির্যাস নয়, প্রয়োগেই তার সার্থকতা। অর্থাৎ নাটক প্রত্যক্ষতঃ সামাজিক, সেইজন্যে দর্শকসভানায়ক হবেন "প্রকৃতিহিত-সদাচারশীলঃ" (নন্দিকেশ্বর, ১৭)। কালিদাস যখন তাঁর গ্রন্থের আরম্ভে বলেন "অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষদিয়ম্" এবং আরও বলেন "আ পরিতোষাদ্ বিদুষাং বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্" তখন স্পষ্টই বোঝা যায় কালিদাসের নাটক তাঁর দর্শকমণ্ডলীর জন্যে, সে নাটক দৃশ্য, শ্রব্য নয়। কালিদাস পুরস্কার আশা করেন তাঁর দর্শকদের কাছ হতে, কিন্তু ভবভূতির সেখানে দারুণ বিরোধ। তিনি কাব্যরচনা করছেন এক দূরভবিষ্যৎ কালের জন্য, যে সময় পাঠকেরা তিনি যা লিখলেন তাই গ্রহণ করবে। আবার সেই commodity-fetishism-এর লক্ষণ! এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই কারণ শকুন্তলা যিনি রচনা করেছিলেন তিনি হচ্ছেন কবি (বর্তমানকবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ—মালবিকাগ্নিমিত্রম্) আর ভবভূতি হচ্ছেন ব্রাহ্মণ (যং ব্রহ্মাণমিয়ং দেবী বাগ্ বশ্যেবানুবর্ততে)। কবিদলভুক্ত হলে তাঁর আভিজাত্যে ঘা লাগে। এই আভিজাত্যগর্ব, যা শ্রেণীবিভাগের ফল, তাঁকে সার্বজনীন কবিধর্ম হতে বিচ্যুত করেছে, ফলে তাঁকে পাঠক সন্ধান করতে হয়েছে সুদূর কালে— কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী। দুয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে আকাশপাতাল পার্থক্য হয়ে

গেলো। কালিদাস তাঁর নাটক সর্বসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করতে দ্বিধা করেন নি, বরং গৌরববোধ করেছেন, কিন্তু ভবভূতির পাঠকশ্রেণী এতই সংকীর্ণ যে সমসাময়িক কালে তা খুঁজেই পাওয়া গেলো না।

তার ফলে দুটি নাটকের মধ্যে বিভিন্ন সুর বেজেছে। প্রস্তাবনার পর কালিদাস তাঁর সূত্রধারের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন ঐ রাজা দুষ্যন্ত আসছেন। যেন তাৎকালিক ঘটনা। কিন্তু ভবভূতির পক্ষে তা সম্ভব হলো না। সেইজন্যে তাঁর সূত্রধার তাঁর পিতৃপুরুষের পরিচয় দেবার পর হঠাৎ বলে উঠলো "এষোঽস্মি কার্যবশাদ্ আযোধ্যকস্তদানীন্তনশ্চ সংবৃত্তঃ", "এই আমি কার্যবশে সেকালের অযোধ্যার লোক হয়ে পড়লুম"। কিন্তু কি এই কার্য যার বশে অতীত কাল হতে নাটকের গল্পসংগ্রহ করতে হলো, নিজেদের অতীতে টেনে নিয়ে যেতে হলো বর্তমানের সমস্ত ছোঁওয়া ছাড়িয়ে, কালিদাসের মতো প্রাচীন কাহিনীকেও সমসাময়িক মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হলো না? এই পলায়নী মনোবৃত্তির মূল কবির সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধে। ভবভূতি তাঁর সমসাময়িকদের ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলতে চান, তাঁর কাহিনী অতীতের, তাঁর পাঠকবর্গ ভবিষ্যতের। ঠিক এই কারণেই দুষ্যন্তের চরিত্র আর রামের চরিত্র অলংকারের কড়া নিয়ম সত্ত্বেও সামাজিক দিক্ দিয়ে এক নয়। দুজনেই রাজা অর্থাৎ সমাজপ্রধান, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে একজনই সামাজিক অপরজন সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষে অবসন্ন। কালিদাসের চরিত্রচিত্রণে এই সামাজিকতার চমৎকার পরিচয় আছে। দুষ্যন্ত যখন প্রথম অঙ্কে তপোবনে প্রবেশ করছেন তখনও তিনি নানাভাবে শুনছেন সেখানেও তিনি সাধারণ মানুষ ন'ন, তাঁর একটি সামাজিক দায়িত্ব আছে। সেখানে তিনি অনুভব করছেন তাঁর মৌর্বীকিণাঙ্ক ভুজ কতদূর রক্ষা করছে, তপোধনদের ক্রিয়ার বিঘ্ন প্রতিহত করছে (রম্যাস্তপোধনানাং প্রতিহতবিঘ্নাঃ ক্রিয়াঃ সমবলোক্য। জ্ঞাস্যসি কিয়দ্ভুজো মে রক্ষতি মৌর্বীকিণাঙ্ক ইতি॥ ১।১২ *)। ঠিক এই কারণেই রাজার প্রেম উদ্দাম হয়ে উঠতে

* এখানে ভুজ শব্দটি একবচন। একবচন কেন, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাঘব ভট্ট বলেছেন "ভুজঃ কিয়দ্রক্ষতি ইতি অন্যসহায়ানপেক্ষত্বম্। একবচনেন তস্মিন্নপি পরানপেক্ষত্বং ধ্বনিতম্।" ভুজ রক্ষা করছে বলার অর্থ অন্য সহায় দরকার করে না। আর একবচন বলার অর্থ হচ্ছে একটি ভুজই যথেষ্ট, সেখানেও অন্য কোন সহায়ের দরকার নেই। এ হচ্ছে সমাজবোধের অপর দিকটি, নায়ক বলশালী, নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা আছে,—আর তা আছে বলেই তার সমাজনেতৃত্ব। পরের যুগে এই বল সমাজের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত, এ যুগে তা সমাজ ধারণে প্রযুক্ত।

পারছে না, প্রথম দর্শনেই তিনি ভবভূতির রামের মতো নায়িকার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে আত্মপ্রসাদলাভ করতে পারছেন না, তিনি ভাবছেন— অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ, আমার আর্য (আর্য কথাটির উপর জোর লক্ষ করার জিনিস) মন যখন এতে অভিলাষী তখন এ নিশ্চয়ই ক্ষত্রের বিবাহের উপযুক্ত। রাজা যখন প্রথম আত্মপ্রকাশ করছেন তখনও তাঁর মন ঐতিহ্য ও পারিপার্শ্বিক ছেড়ে কল্পনার আকাশে নিরঙ্কুশ বিচরণ করতে পারছে না,—

কঃ পৌরবে বসুমতীং শাসতি শাসিতরি দুর্বিনীতানাম্।
অয়মাচরত্যবিনয়ং মুগ্ধাসু তপস্বিকন্যাসু॥ ১।২১

আবার লক্ষ করতে হয় পৌরব কথাটির ব্যবহার। তিনি পুরুর সন্তান। অর্থাৎ তাঁর রাজ্যশাসন এবং তপোধনদের ক্রিয়ারক্ষা একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়, এ তাঁর পিতৃপিতামহক্রমে কার্য, এ তাঁর বংশগত ঐতিহ্য। সমাজে তখনও বংশপরম্পরা সমাজপ্রাধান্যের যুগ অবসান হয় নি— সেকথা সমাজও স্বীকার করতো সমাজপ্রধানেরাও বিস্মৃত হতেন না। মধ্যযুগীয় সমাজবোধের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তেমনই রাজা যখন শকুন্তলাকে প্রেম নিবেদন করছেন, তাঁর সখীদের অভয় দিচ্ছেন, তখন তিনি বলছেন,—

পরিগ্রহবহুত্বেপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্রবসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্॥ ৩।১৭

"আমার বহু বিবাহ হলেও আমার কুলের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে দুটি; সে হচ্ছে সমুদ্রবসনা পৃথিবী, আর তোমাদের এই সখী।" আমাদের যুগের আদর্শে এ প্রেমনিবেদন অদ্ভুত। আমরা আশা করি যে সময় প্রেমিক তার প্রেম জানায় তখন সে শুধু প্রেমিকই, সে রাজা কি ভিক্ষুক সে কথা অবান্তর। যেমন ভবভূতি বলছেন প্রেম হচ্ছে এক অপূর্ব জিনিস, সে অদ্বৈত, সে সুখদুঃখে সমান, সে এতই তীব্র যে সুখ না দুঃখ, বিষের জ্বালা না মোহ কিছুই বোঝা যায় না; সে সময় আত্মস্থ থাকাই কঠিন, নিজের সামাজিক সত্তা কে মনে রাখবে? কিন্তু শকুন্তলায় অন্য ব্যাপার। সেখানে কুলের প্রতিষ্ঠা ছাড়া প্রেমের অন্য কোনও সার্থকতা নেই, সমুদ্রবসনা পৃথীর চেয়ে শকুন্তলার অধিকার একটুও বড়ো নয় (দুটি 'চ' শব্দ ব্যবহারে অধিকারসাম্য প্রতীত হচ্ছে)। আর

পরিগ্রহবহুত্বের কথা স্বীকার করতেও রাজার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, কেননা সেই তো সে যুগের সমাজপ্রধানের লক্ষণ। তাই রাজা এ কথা বলা মাত্র অনসূয়া প্রিয়ম্বদা বলে উঠলেন "নিব্বুদ ক্ষ", 'নিশ্চিন্ত হলাম'। পরে কণ্বও এই ধরনের কথা বলেছেন, বলেছেন যা হয়েছে ঠিক হয়েছে, তার পরের কথা আর বধূর বন্ধুরা বলতে পারে না, তা ভাগ্যায়ত্ত— ভাগ্যায়ত্তমতঃপরং ন খলু তদ্বাচ্যং বধূবন্ধুভিঃ।

এই সমাজবোধ শুধু রাজার চরিত্রে নয়, ও নাটকের সব জায়গায়। রাজার যিনি সহধর্মিণী হবেন তিনি শুধু নায়িকা বা প্রিয়া ন'ন, তাঁরও সামাজিক দায়িত্ব আছে। সেইজন্যে মহর্ষি কণ্ব যখন তাঁকে পতিগৃহযাত্রার সময় আশীর্বাদ করছেন তখন তিনি অন্য কোনও কথা না বলে বলছেন তুমি পুরুর মতো, অর্থাৎ বংশোচিত, পুত্র লাভ করো।

যযাতেরিব শর্মিষ্ঠা ভর্তুর্বহুমতা ভব।
সুতং ত্বমপি সম্রাজং সেব পুরুমবাপ্নুহি॥ ৪।৬

এই শ্লোকটির মধ্যে যে গভীর ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। কণ্বের প্রথম আশীর্বাদ, শকুন্তলা শর্মিষ্ঠার মতো প্রিয় হয়ে উঠুন। এই শর্মিষ্ঠার নাম উল্লেখেরও একটা অর্থ আছে। শর্মিষ্ঠা হচ্ছেন যযাতির স্বাধীন এবং সম্ভবতঃ নিয়মবহির্ভূত প্রেমের বিবাহ, শকুন্তলার ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল। কণ্বের মনে ভয় ছিলো সমাজপ্রধান হিসেবে রাজা বলিষ্ঠ (এবং সে হিসেবে স্বেচ্ছাচারী) হলেও অসামাজিক হবার সাহস তাঁর থাকবে কি না। শর্মিষ্ঠার কাহিনীর ইঙ্গিতই হলো রাজা যেন তাঁর বলিষ্ঠ বিদ্রোহ হতে পশ্চাৎপদ না হন। কিন্তু সেইসঙ্গেই কণ্ব বলছেন বংশের উপযুক্ত সন্তান লাভ করো— অর্থাৎ রাজাদের উপর সমাজের যে দাবি আছে সেই দাবি পালনে তুমি রাজাকে সহায়তা করো। এই ব্যক্তি ও সমষ্টির বিরোধ—এইখানেই ট্র্যাজেডির মূল; আর এই দুয়ের সমন্বয়— সেখানেই নাটকের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন সেই কথাটিকেই একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে, এই বন্ধন ও অবন্ধনেই শকুন্তলার সৌন্দর্য। বাস্তবিক, সে যুগে এই পুত্রলাভের আশীর্বাদের একটি সামাজিক অর্থ আছে, কারণ পুত্র একালের মতো ব্যক্তিক নিরঙ্কুশ প্রেমের

বাধা নয়, সে সমাজরীতির ও ঐতিহ্যের বাহক। বিশেষতঃ যদি রাজপুত্র হয়। সেইজন্যই তপোবনে ঢুকে দুষ্মন্ত প্রথম যে আশীর্বাদ পেলেন সেও পুত্রলাভের আশীর্বাদ, "পুত্রমেবং গুণোপেতং চক্রবর্তিনমাপ্নুহি"। কণ্ব বা গৌতমীর আশীর্বচনগুলিতেও এরকম আভাস পদে পদে। শকুন্তলা বহুদিনচতুরন্তমহী সপত্নী হয়ে বাস করুন, এরকম সপত্নী হওয়ায় লজ্জা নেই বরং গৌরব, যে রাজা পত্নীপ্রেমে রাজধর্ম বিস্মৃত হন তাঁর সহধর্মিণী হওয়ায় কোনও সার্থকতাই নেই।

এই হলো শকুন্তলার এক দিক, কিন্তু একমাত্র দিক নয়। শুধু সমাজবোধই যদি এ নাটকের প্রতিপাদ্য হতো তা হলে এই-ই যথেষ্ট হতো। কিন্তু এরকম অসচেতন সমাজবোধ আদিমতার পরিচায়ক। আর সমাজের প্রতি নির্বিচার আনুগত্যও সেই আদিমতারই সূচক। শকুন্তলার পরিবেশ এ আদিম কালে নয়, তখন জীবনে স্তরভেদ হয়েছে কিন্তু সে স্তরভেদ তখনও নাটকের দানা বাঁধার কাজে সহায়তাই করে সংহতিধ্বংসে উন্মত্ত হয়ে ওঠে না। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি দিক আলোচনা না করলে কি অপূর্ব কৌশলে কালিদাস দুয়ের সমন্বয় ঘটিয়েছেন তা বোঝা যায় না, কালিদাসের কবিকর্মের শ্রেষ্ঠত্বও অনুভব করা সম্ভব হয় না। শকুন্তলায়, সে কারণে, যেমন একটি সুস্থ অথচ সার্বভৌম সমাজবোধ আছে তেমনি তার চাপে ব্যষ্টিকে নিষ্পিষ্ট করা হয় নি, তার ব্যষ্টিসত্তা ও ব্যক্তিত্ব কোথাও খর্ব বা ব্যাহত নয়। ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির সম্বন্ধ তখনও অন্বয়মুখীন, বিরোধমূলক নয়— তাই সংহতির মধ্যেই ব্যষ্টির বিকাশ। যেখানে তার বিপরীত আচরণ সেইখানেই ট্র্যাজেডি।

সেক্স্‌পীরীয় ট্র্যাজেডির নায়কদের যে দুটি লক্ষণ সম্বন্ধে অনেকেই একমত সে হচ্ছে নায়কদের অসাধারণত্ব এবং তাদের অনুভূতির তীব্রতা। ব্র্যাডলির কথায় they are exceptional এবং desire, passion or will attains in them a terrible force. Othello, Lear, Macbeth, Coriolanus are built on the grand scale. কিন্তু এর ফলে ট্র্যাজেডি সহজতর, in the circumstances where we see the hero placed, his tragic trait, which is also his greatness, is fatal to him. শকুন্তলা সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। রাজা দুষ্মন্তের এমন একটি মহনীয়তা ও তেজস্বিতার কথা ইঙ্গিত

হয়েছে যে আমাদের সর্বদাই আশঙ্কা হয় বলিষ্ঠ অনাচার এর দ্বারা সম্ভব। রাজা যখন তপোবনে প্রথম আত্মপ্রকাশ করছেন তখন অনসূয়া প্রিয়ম্বদা স্তব্ধ হয়ে ভাবছেন কে এই মহাপুরুষ যাঁর "মহুর গম্ভীরাকিদী চউরং পিয়ং আলবন্তো পহাবন্দো বিঅ লক্খীয়দি"— যাঁর মধুর গম্ভীর আকৃতি আর চতুর প্রিয় আলাপ প্রভাববান্ বলে মনে হয়। দ্বিতীয় অঙ্কে সেনাপতি রাজাকে দেখে ভাবছেন ইনি "গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্তি" গিরিচর হস্তীর মতো কেবল প্রাণসারটি ধারণ করছেন। ঋষিকুমারেরাও বলছেন ইনি যে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত শ্যামল পৃথিবীকে নগরপরিঘের মত সবল বাহু দ্বারা রক্ষা করবেন তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই, "নৈতচ্চিত্রং যদয়মুদধিশ্যামসীমাং ধরিত্রীম্। একঃ কৃৎস্নাং নগরপরিঘপ্রাংশুবাহুর্ভুনক্তি॥" কিন্তু এই মহাবল রাজার দুদিক দিয়ে দুর্বলতা আছে। প্রথমতঃ তাঁর উদ্দাম প্রবৃত্তি। সামাজিক বন্ধনে সে বাঁধা, না হলে সে উদ্দামতর হয়ে উঠত। কিন্তু সেই উদ্দামতাকে দুঃখদহনের মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ করার পরে প্রকৃত মিলন ঘটলো, প্রথম অঙ্কের দুষ্যন্তের সঙ্গে সপ্তম অঙ্কের দুষ্যন্তের তফাত অনেক।

এই যে দুঃখদহনের মধ্য দিয়ে প্রেমের পরিণতি এর মধ্যে একটি রহস্য আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন হংসপদিকার গানের মধ্যে রাজার যে পাপের সন্ধান পাওয়া যায় তারই জন্যে এই দুঃখদহনের প্রয়োজন। কিন্তু এই "পাপ" শুধু রাজার স্বভাবের মধ্যে নয়, এ সে যুগের সমাজের মধ্যে। পরিগ্রহবহুত্ব এবং মধুকরবৃত্তি সেকালের ধর্ম। কিন্তু কবি তাতে সায় দিতে পারেন নি, সেকালের সামাজিক রীতির কাছে শকুন্তলার মতো একটি সুকুমার বালিকাকে বলি দিতে তাঁর মন ওঠে নি। সেইজন্য শকুন্তলার উপর একদিকে যেমন সামাজিক দাবি আছে তেমনি শকুন্তলা অন্যদিকে বড়ো কোমল, বড়ো মৃদু, বারে বারে কিশলয়, পুষ্পের সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে। সেইজন্য রাজার দুঃখ বিরহ শুধু যে রাজার স্বভাবেরই ফল তাই নয় তার মধ্যে সেকালের সামাজিক রীতিরও সমালোচনা আছে। একদিকে রাজা হচ্ছেন সমাজের প্রতিভূ, অন্যদিকে শকুন্তলা ব্যক্তিক প্রেমের নিদর্শন— এ দুয়ের সংঘাতই হলো শকুন্তলানাটকের মূল সংঘর্ষ। এই সংঘাতের চারপাশেই নাটক দানা বেঁধেছে। তাই প্রথম দিকে যেমন রাজার সামাজিক দিকটাই চোখে পড়ে, তাঁর বিদূষক,

সেনাপতি, মৃগয়া শোভাযাত্রার মিছিলের এক অংশে তাঁর প্রেমের কাহিনী বলা হয়েছে তেমনই নাটকের ষষ্ঠ সপ্তম অঙ্কে আমরা দেখি রাজার মনের ভিতরের কথা। সেখানে তাঁর এই কঞ্চুকী, প্রতিহারী, সেনাপতির ভিড় নেই, সেখানে তাঁর হৃদয়কে খুলে দেখানো আছে। এই হলো শকুন্তলার মূল সমস্যা। কালিদাস এই সমস্যার সমাধান করেছেন দুই দিক্ দিয়ে। একদিকে যেমন রাজাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো, অন্যদিকে তেমনি এই সমস্ত ব্যাপারটি দৈব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের কারণ সেইজন্য নিছক খেয়াল নয়, দুর্বাসার শাপেই দুষ্মন্তের স্মৃতিভ্রংশ। এই দৈবের আবরণে ব্যক্তি ও সমাজের সংঘর্ষ তীব্র হতে পারে নি; ফলে শেষকালে একটি সুষ্ঠু সমন্বয় গড়ে উঠেছে যেখানে দুষ্যন্ত আর শকুন্তলা দুজনেই দুঃখাগ্নিতে বিশুদ্ধীকৃত এবং কারোরই মনে কোনও গ্লানি নেই কেননা সমস্ত ব্যাপারটাই অলৌকিক। তাই যখন শেষকালে ভরতবাক্য উচ্চারিত হলো তার মধ্যে একটি সুষ্ঠু সমাজ-বোধের কথাই আছে, তার প্রথম কথাই হলো "প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ", রাজা যেন এই অভিজ্ঞতার ফলে প্রজাহিতে পরাঙ্মুখ না হন, তিনি যেন অসামাজিক না হন। সেই সুষ্ঠু সমাজবোধ, যার মধ্যে ব্যষ্টি তার বিকাশ খুঁজে পায় অথচ উদ্দাম হয়ে ওঠে না, যার মধ্যে সমষ্টিবোধ থাকে কিন্তু শুধু সমষ্টিবোধই থাকে না, যে সময় ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্বন্ধ সুস্থ ও অন্বয়মুখীন— সেই সুস্থ সমাজবোধই শকুন্তলার শেষ কথা।

এই যে শেষ কথা, নাটকের প্রকৃতি, মেজাজ ও টেক্‌নিকের দিক্ থেকে এর একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে কবিমনের ঠোকাঠুকিতেই যদি কাব্যের উৎপত্তি, তা হলে সাহিত্যের বিভিন্ন রূপায়নের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ সূত্র থাকা সত্ত্বেও তাদের কতকগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও আছে। সম্প্রতি তর্ক উঠেছে সাহিত্যের চিরন্তনতা নিয়ে। সাহিত্য কি কেবল চিরন্তন বিষয়বস্তু নিয়ে, না সে কেবল সাময়িক? বলা বাহুল্য, এ দুটি মতের কোনোটিই অভ্রান্ত নয়। সাহিত্যে এবং জগতে এক হিসেবে সার্বকালিক বলে কিছু নেই-ই, এমন কিছুই গড়ে উঠতে পারে না যা তার পারিপার্শ্বিকের ছোঁওয়া হতে একেবারেই মুক্ত। তেমনি সার্থক সাহিত্যে কেবল তাৎকালিক বলেও কিছু নেই, কেননা সে সাহিত্য, সে সংবাদপত্র নয়। এমন কি, যে

শব্দ নিয়ে তার কারবার সেই শব্দেরও নানা সাময়িক ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও তার একটি সার্বকালিকত্ব আছে, সে হিসেবে সে একটি সীম্বল। বাস্তবিক পক্ষে সাহিত্য তখনই সার্থক হয়ে ওঠে যখন এই সার্বকালিক তত্ত্বটি নানা সাময়িক সংস্পর্শে নতুন নতুন মোচড় খেতে থাকে, নতুন নতুন ভঙ্গিমা, নতুন নতুন ইঙ্গিত ঝলসে ওঠে। তা না হলে কাব্যের বিষয়বস্তু তো বহু পূর্বেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে, চসার ট্রয়লাস-ক্রেসিডা সম্বন্ধে লিখবার পর সে সম্বন্ধে আর সেক্‌স্‌পীয়রের লিখবার দরকার হতো না— মিলন বিরহের গান তো ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস অজস্র গেয়েছেন, তবে আর রবীন্দ্রনাথ কেন। এইখানেই তো কবিমনের বিচিত্র ইতিহাস, এইখানেই সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের বিচিত্র বিবর্তন। এই তত্ত্ব সাহিত্যের মূলতত্ত্ব।

কিন্তু সাহিত্যের যে বিভিন্ন রূপায়ন আছে তার মধ্যে এই সার্বকালিক ও সাময়িকের সম্বন্ধ এক নয়। গীতিকাব্যে সার্বকালিকের উপর ঝোঁক পড়ে বেশী; কিন্তু সেখানে সে সাময়িক-নিরপেক্ষ নয়, সাময়িকের চাপ সেখানে অত্যন্তই বেশী, কিন্তু সম্ভবতঃ পরোক্ষ। অর্থাৎ সব সময়ে বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রত্যক্ষতঃ সাময়িকের সন্ধান না-ও পাওয়া যেতে পারে, যদিও সে চাপ কবিতায় না হলেও কবির উপর সবসময়েই বর্তমান। উপন্যাসের বেলা ঠিক বিপরীত ব্যাপার। উপন্যাস প্রধানতঃ সাময়িক, কিন্তু সার্থক উপন্যাসের মধ্যে অন্ততঃ পরোক্ষভাবে একটি রসধ্বনি থাকে যা তাকে সর্বকালের পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেয়। উপন্যাসও কেবল সংবাদপত্রের কাহিনী নয়। নাটকের বেলা বিচিত্র সংমিশ্রণ। নাটকে গল্পও আছে, কিন্তু কাব্যও আছে, কোনোটিকেই বাদ দেওয়া চলে না। সে হিসেবে সে জীবনের সুন্দর প্রতিচ্ছবি। কবি কাব্যও রচনা করেন, কিন্তু তা বলে তিনি সংসারধর্ম থেকেও বঞ্চিত ন'ন, অসুখের সময় তাঁকেও চিকিৎসা করাতে হয়, শোক দুঃখ সহ্য করতে হয়, সাধারণ মানুষের সকল দায়িত্বই গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু সেকারণে তাঁর কবিজীবন আর সাধারণ জীবন বলে কোনও দাঁড়িটানা সম্ভব নয়, দুটি ওতঃপ্রোতঃ ভাবে জড়িত। বরং সেই জড়িয়ে যাওয়াতেই তাঁর কবিত্ব বিকশিত হয়, জীবনে বিচিত্রতর অভিজ্ঞতার সুযোগ হয়, মন বাড়ে। তেমনি নাটকে। দুটি দিক্‌ই আছে, শুধু পাশাপাশি নেই, একেবারে জড়িয়ে আছে,—মানুষের মনের মতন,

কবির চিত্তের মতন এই দুটি দিক পরস্পর পরস্পরকে উজ্জ্বল করে' সাহিত্যকে সার্থক করে তুলছে। সেইজন্যে সাহিত্যের অন্যান্য রূপায়ন সবসময়েই সাময়িক ঘটনার চাপে নিয়ন্ত্রিত বা উদ্বুদ্ধ হলেও সেই সাময়িকতা কোথায়ও অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, কোথায়ও বা কিছু পরোক্ষ। কিন্তু নাটকে এর সুষ্ঠু সংমিশ্রণ না হলে সে নাটক সার্থক হয়ে ওঠে না। এখানেও, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, বন্ধন ও অবন্ধন—এই দুয়ের সংগমস্থলেই নাটক সার্থক। কিন্তু এই সংমিশ্রণও সম্ভব নয় যদি না ব্যক্তিমানসের সঙ্গে সমাজমানসের একটি সুস্থ সম্বন্ধ বজায় না থাকে, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির একটি সুষ্ঠু যোগাযোগ না গড়ে ওঠে। এলিজাবেথীয় নাটকের সার্থকতার রহস্য নির্দেশ করতে গিয়ে কডওয়েল বলেছেন Elizabethan poetry tells a story. The story always deals with men's individualities as realised in economic functions— it sees them from the outside as "characters" or "types". But in the era of primitive accumulation, bourgeois economy has not differentiated to an extent where social "types" or "norms" have been stabilised. Bourgeois man beleives himself to be establishing an economic role by simply realising his character. The instinctive and the economic seem to him naturally one. সেকালের সামাজিক অবস্থা ঐতিহাসিক অর্থে বুর্জোয়া সমাজের অনুরূপ ছিল কিনা জানি না (যদিও থাকে, তা হলেও সে এযুগের বুর্জোয়াসমাজ নিশ্চয়ই নয়, একটা আপাতঃসাদৃশ্যই ছিল— যেরকম সাদৃশ্য ইতিহাসের কম্বুরেখায় বারবার দেখা যায়), সেইজন্য এ মন্তব্য শকুন্তলা সম্বন্ধে নিঃসংকোচে প্রয়োগ করা চলে না। তবে এ কথা ঠিক যে শকুন্তলার নাটক হিসেবে সার্থকতার মূল কারণ কবির নাটকোচিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং সমাজবোধ।

উত্তররামে দেখি ঠিক বিপরীত ব্যাপার। প্রস্তাবনার পর যখন নাটক আরম্ভ হলো সে সময় রামচন্দ্রকে সামাজিক জীব বলে চিত্রিত করা হয় নি। তিনি দুষ্মন্তের মতো সমাজ-সচেতন ন'ন, সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর অতীত তিক্ত। তাই নাটকের আরম্ভেই দেখি নতুন প্রেমের আনন্দ (উচ্ছ্বাস বলছি না) নেই, আছে সীতার মন খারাপ হওয়ার কথা। রাম রাজকার্য থেকে

অবসর নিয়ে সীতার মন ভালো করবার চেষ্টায় নিযুক্ত, কিন্তু সেখানেও বনবাসের ও সীতাহারানোর স্মৃতি তাঁকে অসামাজিক করে তুলেছে। নাটকের প্রথমেই আমরা জনসাধারণ সম্বন্ধে একটি কটূক্তি পাই— তারা দুর্জন (যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ। অতি দুর্জন এব বক্তব্যম্। ১।৮)। রামচন্দ্র বলছেন, "এতে হি হৃদয়মর্মচ্ছিদঃ সংসারভাবাঃ", সংসারের রীতিনীতি মর্ম ছেদন করে। রামচন্দ্রের প্রেমের মধ্যে সেকারনে সমাজসচেতনতার চিহ্ন মাত্র নেই, সে প্রেম কৈশোরক উদ্দামতায় উচ্ছ্বসিত। আপাতঃসাদৃশ্যের জোরে শকুন্তলাকে যদি ইংরেজী সাহিত্যের রেনাশাঁস যুগের সঙ্গে তুলনা করা যায় (এরকম তুলনা কখনই সর্বাঙ্গীণ হতে পারে না) তা হলে উত্তররাম রোমান্টিক যুগের কাব্য। রামচন্দ্রের প্রেমে তীব্রতা আছে, আত্মবিস্মৃতি আছে, সমাজ তাঁর হৃদয়ে ব্রণের মতো কষ্টদায়ক। রামচন্দ্র বর্তমান ছেড়ে অতীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, সমসাময়িক সমাজ তাঁর অপ্রিয়। প্রথম অঙ্কেই তাই অতীত স্মৃতির চর্বণ।

সময়ঃ স বর্তত ইবৈষ যত্র মাং
সমনন্দয়ৎ সুমুখি গৌতমাপিতঃ।
অয়মাগৃহীত-কমনীয়কঙ্কণ-
স্তব মূর্তিমানিব মহোৎসবঃ করঃ॥ ১।১৮

"এ যেন ঠিক সেই মুহূর্ত আবার ফিরে এলো যে মুহূর্তে মূর্তিমান উৎসবের মতো তোমার কাঁকনপরা হাতটি গৌতম আমার হাতে সমর্পণ করেছিলেন।" সেদিন চলে গেছে, "তে হি নো দিবসা গতাঃ," অতীতের জন্য তাই আক্ষেপ। বাধা পেয়ে তাই প্রেম দুর্বার হয়ে ওঠে, বোঝা যায় না তা সুখ না দুঃখ, মনে হয় all ecstasy is death.

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতিবা দুঃখমিতি বা
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি চ সংমীলয়তি চ॥ ১।৩৮

রামচন্দ্রের এই কৈশোরক প্রেম সম্ভবতঃ কৈশোরক বলেই ক্রম-পরিণতিহীন, প্রথম অঙ্কেও যেমন সপ্তম অঙ্কেও তেমন। তৃতীয় অঙ্কে রাম দণ্ডকারণ্যে

পুনরাগমন করেছেন, সীতাও অদৃশ্য ভাবে এসেছেন। পুরোনো স্মৃতির পীড়নে রামের ক্ষণে ক্ষণে অশ্রু, ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছা। সীতাকে এই দৃশ্য দেখানোর প্রয়োজন ছিলো, কেননা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া সীতার সংশয় ঘুচতো না। সেই দৃশ্য দেখার পর সীতা বলছেন "অহং এব্ব এদস্স হিঅঅং জানামি, মহ এসো", আমি এঁর হৃদয় জানি, ইনিও আমার হৃদয় জানেন। কিন্তু লোকারাধনার জন্য জানকীকেও ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত নই, রামচন্দ্রের এরকম মৌখিক ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও রাম বা সীতা কেউ-ই এই নির্বাসন ব্যাপারটিকে সহজ মনে গ্রহণ করতে পারছেন না, এমন কি সে যদি সামাজিক প্রয়োজনে হয় তা হলেও নয়। উত্তররামের শেষের দিকে লব কুশের সঙ্গে চন্দ্রকেতুর যুদ্ধের কাহিনী আছে। লবকুশ রাজার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে রাজী নয়, ব্যক্তিবিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ব্যাপারটা চূড়ান্ত নাটকীয়। চন্দ্রকেতু লক্ষণের পুত্র, রাজবংশের একমাত্র বংশধর। প্রচলিত ঐতিহ্য রক্ষার ভার তার উপর। লবকুশ হচ্ছে নির্বাসিতা সীতার সন্তান, ব্যক্তিবিদ্রোহের প্রতীক, সমাজকে অস্বীকার করাতেই তাদের উৎসাহ। তারা রাজার সন্তান, কিন্তু তারা ছদ্মবেশী— অন্যপক্ষে যোগ দিয়েছে। প্রত্যেক বিপ্লবের আগেই দেখতে পাওয়া যায় প্রচলিত রীতিতে যাঁরা সমাজ-প্রধান তাঁদেরই এক অংশ স্বশ্রেণী ত্যাগ করে অন্য শ্রেণীতে যোগ দেয়, ফলে বিপ্লব জোর হয়ে ওঠে। মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের অবসান কালে নতুন ধনিক সম্প্রদায়ের অন্ততঃ কয়েকটি সভ্যও সামন্ততন্ত্র থেকে খসে আসে, শ্রমিকবিপ্লবের গোড়ায় নেতৃত্ব সম্ভবতঃ স্থূল মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কুল-খোয়ানো সভ্যদের হাতে।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে ভবভূতির টেকনিকও স্বতন্ত্র। শকুন্তলা আর উত্তররাম একসঙ্গে পড়লে যে তফাতটা সবচেয়ে চোখে পড়ে সে হচ্ছে উত্তররামে পরিহাস ও চটুলতার অভাব। পরিহাস তখনই সম্ভব যে সময় কবির বীণায় সপ্তস্বর বাজে— এই সপ্তস্বরের কোনটা বা মূল স্বর, কোনোটা বা চিকারী। কিন্তু যখন একটিই সুর বাজে এবং সে সুর অত্যন্তই চড়া তখন আর চিকারী লাগে না, তখন ব্যাপারটা অন্যরকম। ভবভূতি (এবং রোমান্টিক কবিরা প্রায় অধিকাংশই) তাঁর বক্তব্য সম্বন্ধে এতো বেশী সীরিয়াস যে পরিহাস সেখানে

অসম্ভব। সেইজন্যে উত্তররামের ভাষা গম্ভীর, কঠিন, সমাসবহুল। শব্দ-যোজনার বেলাও একই ব্যাপার। যে যুগে সুস্থ সমাজবোধ বজায় থাকে সে যুগে সাধারণতঃ সজীব vital শব্দ ব্যবহারের ঝোঁক পড়ে, কেননা তাতেই সেকালের ভাবের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে। কিন্তু বর্তমান যখন কবির পক্ষে অপ্রীতিকর তখন vital শব্দের পরিবর্তে ঝোঁক পড়ে abstractionএর দিকে, শব্দগুলিকে তার পারিপার্শ্বিকের ছোঁওয়া হতে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা। শব্দ জিনিসটা সামাজিক; কিন্তু কাব্য যখন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার লিখিত নির্যাস তখন শব্দকেও অসামাজিক করার চেষ্টা দেখা দেয়। তাই প্রত্যেক শব্দের তাৎকালিক আবরণের মধ্যে যে একটি সূক্ষ্ম সার্বকালিক অবস্থা আছে তারই উপর জোর পড়ে। শকুন্তলার সপ্তম অঙ্কে যখন বিচ্ছেদের পর প্রথম শকুন্তলা রাজার সামনে আসছেন, তখন এই শ্লোকটি আছে—

বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণী।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি॥ ৭।২১

"তিনি পরিধূসর বসন পরে আছেন, নিয়মপালনের ফলে তাঁর মুখ শুকনো। মাথায় একটি বেণী। আমি অত্যন্ত নির্দয়, কিন্তু তিনি শুদ্ধশীলা, আমার দীর্ঘ বিরহকে ব্রতের মতো ধারণ করেছেন।"

অনুরূপ অবস্থায় উত্তররামে একটি শ্লোক আছে—

পরিপাণ্ডুদুর্বলকপোল সুন্দরং দধতী বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্তিরিববা শরীরিণী বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী॥ ৩।৪

"জানকী বনে আসছেন, ঠিক যেন করুণের মূর্তি, বা শরীরিণী বিরহব্যথা। তাঁর মুখ বিলোলকবরী; পাণ্ডু ও দুর্বল কপোলটিতে তাঁর মুখ আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।" দ্বিতীয়টিতে প্রথমটির ছায়া সুস্পষ্ট, কিন্তু তফাতও সুস্পষ্ট। প্রথমটিতে 'শুদ্ধশীলা' শব্দটিতে এমন একটি ইঙ্গিত আছে যাতে মনে হয় শকুন্তলার মনে বিরহ ততো গভীর ক্ষত জন্মায়নি, অন্ততঃ সীতার যেমন, শকুন্তলার অভিযোগ ততো গভীর নয়, কারণ নির্বাসন ব্যাপারটায় রাজার খেয়ালই একমাত্র দায়ী নয়— যেন শীলশুদ্ধির প্রকাশই হচ্ছে বিরহব্রত ধারণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এরকম কোনো ইঙ্গিতই দ্বিতীয় শ্লোকটিতে নেই, উপরন্তু আছে 'করুণ' শব্দটিকে এমন abstract ভাবে ব্যবহার যা প্রথম শ্লোকটির

কোথায়-ও খুঁজে পাওয়া যায় না। আশ্চর্যের কথা, যেখানেই ভবভূতির কোনো রসের দৃশ্য বর্ণনা করবার দরকার হয়েছে, তিনি স্পষ্টতঃ সেই রসের নাম উল্লেখ না করে পারেন নি। আকারে ইঙ্গিতে রস গড়ে তুলে তিনি তৃপ্ত ন'ন, স্পষ্ট abstract রসটির নাম না করলে তাঁর তৃপ্তি হয় না—

১। অনির্ভিন্নো গভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাক প্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ॥ ৩।১

২। বীরাণাং সময়ো হি দারুণরসঃ স্নেহক্রমং বাধতে॥ ৫।১৯

৩। কথং বাভ্যনুজানাতু সাহসৈকরসাং ক্রিয়াম॥ ৫।২১

৪। বীরো রসঃ কিময়মেত্যুত দর্প এব॥ ৬।১৯

বলা বাহুল্য এরকম অকাব্য শকুন্তলার ত্রিসীমানায় নেই। দুয়ে তফাত অনেক। এ তফাত শুধু প্রতিভার তফাত নয়, দৃষ্টিভঙ্গীরও তফাত। কাব্যের সুরবদলের সঙ্গে সামাজিক হাওয়াবদলেরও লক্ষণ মেলে। কালিদাস শুধু যে বড়ো কবি তাই নন, তাঁর উপযুক্ত পাঠকসমাজও ছিল। তবু শ্রেণীবিভাগ হয়েছিলো এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে বিরোধের একটু একটু সূচনা দেখা যাচ্ছিলো তার প্রমাণ শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান ব্যাপারটিতে কবিকে লৌকিক সমাজ ছেড়ে দৈবে আশ্রয় নিতে হলো। অবশ্য সেখানেও বিচার্য, সেক্‌সপীয়রের অলৌকিক যেমন সত্যিই অলৌকিক কিনা, তেমনি সেকালের সামাজিক পরিবেশে ও সেকালের শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কারের পটভূমিকায় ঐ দৈব নিছক দৈব, না সামাজিক আশা আকাঙ্খা বা বিরোধ প্রকাশ করবার একটা সহজ উপায় মাত্র। কিন্তু সে প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও কালিদাসের মহিমা কমে না। ভবভূতির মধ্যে এর কোনো চিহ্নই নেই, সে সময় ক্ষয়িষ্ণুতার চিহ্ন অত্যন্ত পরিস্ফুট, পাঠকের সঙ্গে কবির কোনও সুস্থ সম্বন্ধ, এমন কি কোন সম্বন্ধই, প্রায় নেই, যদি বা কিছু থাকে তাও প্রচণ্ড সংঘর্ষমূলক। দুই কবির সমাজ এক নয়।

আরও পরের যুগের কাব্যগুলির এই পদ্ধতিতে আলোচনা করলে এই ক্ষয়িষ্ণুতার ক্রমশঃ বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ভবভূতির মধ্যে ক্ষয়িষ্ণুতার চিহ্ন থাকলেও যে অসাধারণ তীব্রতা ও আস্ফালন আছে তা হতে অন্ততঃ এইটুকু প্রমাণ হয় তাঁর অন্ততঃ কিছু বলবার ছিল যদিও সে কথাটা তাঁকে বেশ

চেঁচিয়েই বলতে হয়েছে। সেহিসেবে তাঁর কবিধর্ম অন্ততঃ খানিকটা ছিল, তার স্বরূপ যাই হোক্ তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভারবি হতে মাঘ, মাঘ হতে নৈষধে এবং অন্যান্য কাব্যে যে স্রোতটি প্রবাহিত হলো সেটি ক্রমশঃই ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে— অনেকক্ষেত্রে তাতে শুধুই কারুকাজের অক্ষম চেষ্টা আছে কিন্তু বলার কথা কিছুই নেই। সে বিস্তৃত আলোচনা করার অবসর এখানে নেই, কিন্তু সেকালের সমাজবিবর্তনও যে একটি বিশিষ্ট পদ্ধতিতে হয়েছিল সে কথা কাব্যের প্রমাণ হতেও স্বীকার করতে হবে।

৬

আবার আমাদের গোড়ার কথায় ফিরে আসা যাক্। আমাদের বিচার্য বিষয় ছিলো সংস্কৃত সাহিত্য শুধুই কি একটি বৃন্তহীন পুষ্পের মতো আপনাতে আপনি বিকশিত, না তারও একটা মূল আছে এবং সে মূল সে যুগের মাটিতে প্রবিষ্ট। এই প্রশ্নের বিচার করতে হলে একটি বৃহত্তর প্রশ্ন উঠে পড়ে, সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কি। এর বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, কিন্তু সংক্ষেপে বলতে হলে, সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, এ দুয়ের সম্বন্ধ সবসময়েই আছে, কোনও যুগে বিরোধমুখে, কোনও যুগে অন্বয়মুখে। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক সজীব হলেও প্রত্যক্ষ নয়, কেননা দুয়ের মাঝখানে সাহিত্যকার থাকেন। সেইজন্যে নিছক সৃষ্টির কাজে সৃষ্টিকর্তা একলা, সেখানে তিনি অদ্বৈত। এইখানেই সাহিত্যের বৈচিত্র্য— তার মধ্যে একটি চিরন্তনতা আছে যা তাকে সংবাদ-পত্রের দৈনিক মৃত্যু হতে রক্ষা করে, আবার তার মধ্যে পাঠকসমাজের সঙ্গে এমন একটি যোগ আছে, এমন একটি সুখ দুঃখ বেদনার স্পন্দন আছে যার জোরেই কবি তাঁর স্বধর্মপালনে সক্ষম হন। সেইজন্যে মানুষের মন যেমন বদলায় (তার জন্যে সামাজিক কাঠামো বদলানো অবশ্য প্রয়োজনীয়) তেমনি চিরন্তনতার মূল সূত্র থাকলেও কাব্যের চেহারা বদলাতে থাকে, তার ভঙ্গীটাই সর্বাঙ্গীণ নতুন হয়ে ওঠে। তা যদি না

হয় তাহলে বুঝতে হবে সে সাহিত্য সাহিত্যই নয়, অর্থাৎ তার মধ্যে কবি ও পাঠকের কোনও সহিত-ত্ব নেই, সে হচ্ছে কোনও এক কবির একান্ত ব্যক্তিগত প্রলাপ মাত্র। তাতে তাঁর মানসিক শান্তি হতে পারে কিন্তু কাব্যের ইতিহাসে এবং পাঠকসমাজে তার কোনও স্থান নেই। একালের সাহিত্য সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু এখনও সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে কথা উঠলেই একটা উদাস হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতির অলস রোমন্থন ছাড়া আর অন্য কোনও সার্থকতা আছে বলে আমরা প্রায় মনে করি না। এতে সংস্কৃত সাহিত্যের মহৎ অপমান। সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে সে সাহিত্যে কি কি হাওয়া বদল হলো এটি ভালো ভাবে না বুঝলে তার প্রকৃত মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নয়। সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব ও কাব্যের এ আলোচনায় এইটুকুই বলবার চেষ্টা করেছি বর্তমানে আমরা যে সাহিত্যতত্ত্বে বিশ্বাস করি সংস্কৃত সাহিত্য তার ব্যতিক্রম নয়-ই, বরং চমৎকার উদাহরণ। জগতের নানা প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে এতো দীর্ঘ জীবন এবং এতো সুরবদল আর কোথায়ও আছে কিনা সন্দেহ, অর্থাৎ একটা সাহিত্য এতোকাল সামাজিক ভাবে সার্থক ছিল কিনা সন্দেহ। শুধু যে কাব্য ও কাব্যতত্ত্ব হতেই এই কথা প্রমাণিত হয় তাই নয়, আমার বিশ্বাস সেকালের মানুষের অন্যান্য ভাবব্যঞ্জনা ও মানস রূপায়নের ক্ষেত্রগুলিতেও এইরকম সুরবদল ও হাওয়াবদলের পরিচয় আছে। অন্ততঃ ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, অদ্বৈতবাদ এবং অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের মধ্যে প্রমাণ সম্বন্ধে যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিয়েছে তার মধ্যে একটা সামাজিক হাওয়াবদলের আভাস মেলে বলে মনে হয়। সে কথা পণ্ডিতদের বিচার্য।

কিন্তু এ যুগের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার যে সুবিধে আছে প্রাচীন সাহিত্যের তা নেই। সেখানে সামাজিক ইতিহাস কাব্য ও কাব্যতত্ত্ব হতে অনুমিত, তার স্বকীয় বিবরণ জানা নেই। সেইজন্য ঐতিহাসিক দিক্ দিয়ে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে, ব্যক্তিগত মতের চাপে সাহিত্যের খেয়ালমাফিক ব্যাখ্যা করে মনগড়া ইতিহাস রচনাও চলে। এ বিষয়ে সকল সত্যসন্ধ সমালোচকের সাবধান হওয়া দরকার। তবে আমার কৈফিয়ত এই যে সংস্কৃত সাহিত্যে যে রীতিতে বিবর্তন হয়েছে বলে আমার ধারণা তা

অন্যজায়গাতেও হয়েছে, বরং সেইটেই সামাজিক বিবর্তনের স্বাভাবিক ভঙ্গী। দ্বিতীয়তঃ কাব্যের প্রমাণ যে ইতিহাসেও গ্রাহ্য, এমন কি যখন অন্য কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না সে সময়ও গ্রাহ্য, এ কথা বড়ো বড়ো ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেন। "There is nothing new or startling in the proposition that every civilization creates an individual artistic style of its own ; and, if we are attempting to ascertain the limits of any given civilization in any dimension, either spatial or temporal, we find, as a matter of fact, that the aesthetic test is the surest as well as the subtlest....Art [in some cases] speaks in clearer accents than either Politics or Economics."— এ হলো টয়েনবীর মত (Toynbee : Study of History, Vol. III, p 378)।

পাইকপাড়া
কলিকাতা

"সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশান"

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

আমি ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত নই। সুতরাং সেল্‌ফ্‌ (self) আর ডিটার-মিনেশান (determination) এই শব্দদুটি ইংরাজী ভাষায় যে কতদিন থেকে আছে তা বলতে পারি নে। তবে এটা নির্বিঘ্নে বলা যায় যে ও-দুটি শব্দ ইংরাজী ভাষায় নিতান্ত নূতন নয়। কিন্তু সেল্‌ফ্‌ (self) ও ডিটারমিনেশান্ (determination) এ-দুটি শব্দ নূতন না হলেও, সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশান (Self-determination) এই সমাসবদ্ধ পদটি জন্মগ্রহণ করে গেল ১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দের ইয়োরোপীয় মহাসমরের সময় যখন ইয়োরোপের সম্রাজ্যিক নেশানরা বেশ একটু বেকায়দায় পড়েছিলেন। কেবল জন্মগ্রহণ করে তাই নয়, পরাধীন জাতিদের চোখের সামনে ওটি একটি অপূর্ব সুন্দর সুকুমার শিশু মূর্তিতে আবির্ভূত হয়।

সে যা-হোক্, ইয়োরোপের পক্ষে সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশান এই শব্দটি অর্বাচীন হলেও ঐ পদটির মধ্যে যে ভাববস্তু আছে তা এই ভারতবর্ষের কাছে নতুন নয়। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের চিন্তাধারার মধ্যে একটি সত্য স্থান পেয়ে এসেছে যেটার নাম দেওয়া হয়েছে অধিকারবাদ।

কিন্তু সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশান ও অধিকারবাদ আমি এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করছি ব'লে মনে করা ঠিক হবে না যে ও-দুয়ের রূপ রঙ রস এক, ওর একটি আর-একটির পর্যায়শব্দ, অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে synonym। আমরা অনেকেই অবশ্য আজ মার্কস্ ও ফ্রয়েড্, এলিয়ট ও এজরা পাউণ্ডের কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গিতে মুহ্যমান। কিন্তু আমাদের এই অতি নিকটের ভারতবর্ষের ধ্যান-নেত্রে ও জ্ঞাননেত্রে এমন একটা গভীরতা আছে যার পরিচয় ইয়োরোপ আজ পর্যন্ত দিতে পারে নি, কাল পরশু তরশুও যে দিতে পারবে তার কোনো চিহ্ন আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ইয়োরোপের চিন্তাধারা তার বিশ্বমানবের হিতৈষণা সমস্ত যেন কেমন একটা বাইরের বৃত্তের চারপাশেই ঘুরপাক খাচ্ছে — জগতের অন্তরে প্রবেশ করবার যেন তার সামর্থ্য নেই— তার প্রবেশ-পথই

যেন তার জানা নেই— সেই আন্তর জগতের কথা যেন তার খেয়ালেই নেই। ভারতের ভাস্কর্য ও চিত্রকলা আর ইয়োরোপের ভাস্কর্য ও চিত্রকলা যখন পাশাপাশি রেখে দেখি তখন ভারতের ধ্যাননেত্র ও জ্ঞাননেত্রের এই গভীরতা স্পষ্ট দেখতে পাই। মানবতার দিক থেকে সূক্ষ্ম বোধের দিক থেকে ভারতবর্ষের একটা সহজ শ্রেষ্ঠত্ব আছে ইয়োরোপের মানুষের চেয়ে। অথচ হীনতাবোধ, ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স্ (inferiority complex) আজ আমাদের মজ্জায় মজ্জায় এমনি কায়েমী হ'য়ে গেছে যে সে-কথা আমরা স্মরণে আনতে পারি নে, কিম্বা স্মরণে আনলেও তার ঠিক ঠিক অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি নে। ফলে ইয়োরোপের কোনো কিছুকে বিচার ক'রে দেখবার কথাই আমাদের মনে ওঠে না। তাই তার ভাসা ভাসা কথাকে বড় ফিলসফি, অর্ধ সত্যকে পরম সত্য, ও নানাক্ষেত্রে কিম্ভূতকিমাকার পরীক্ষাকে প্রগতি ব'লে মনে করতে আমাদের কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না। তাই আগে থেকেই আমরা ঠিক ক'রে ব'সে আছি বিশ্ব-সভ্যতায় আমাদের স্থান হবে তল্পিবাহকের। যেন ভারতবর্ষ এই পৃথিবীর এক পক্ষে গোধন এবং অন্য পক্ষে ক্যাম্পফলোয়ার (camp follower)। কী গৌরব-গরিমাপূর্ণ জীবন ভারতমাতার, সুতরাং তাঁর সন্তানদের। প্রশ্ন হতে পারে যে পতিত জাতির এমন আত্ম-গরিমা প্রকাশের মূল্য কি? কিন্তু পতিত জাতির পক্ষেই তার সত্য আত্মগরিমা স্মরণ করবার প্রয়োজন আছে। কেননা তার উন্নত হবার জন্যে প্রথম ও প্রধান যে পরিবর্তন শুরু হওয়া দরকার সেটা মনস্তাত্ত্বিক অর্থাৎ সাইকোলজিক্যাল (Psychological)। মন যেখানে হীনতাবোধের দ্বারা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স দ্বারা অভিভূত হ'য়ে থাকবে মুহ্যমান হ'য়ে থাকবে আত্মার ঐশ্বর্য সেখানে কোনো দিন পূর্ণরূপে বিকশিত হ'য়ে ওঠবার পথ পাবে না।

কিন্তু আমার কথা এই যে অধিকারবাদ ও সেল্‌ফ্-ডিটারমিনেশান, এর একটা আর-একটার প্রতিরূপ নয়। এদের গোত্র এক কিন্তু গুণের তারতম্য আছে। আজকার বাঙালী জীবনের একটা ঘরোয়া উপমা দিয়ে বলা যেতে পারে, ও-দুটো একই পরিবারের কিন্তু যেন ওর একজন ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট আর একজন কেরানী।

অধিকারবাদ যখন বলি তখন তার সাথে সাথে যুক্ত থাকে একটা

নৈসর্গিক সামর্থ্য। কিন্তু সেল্‌ফ-ডিটারমিনেশানের সঙ্গে সে-রকম কিছু যুক্ত নাও থাকতে পারে। সুতরাং ওর প্রথমটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক বা আত্মিক আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে নৈতিক বা ব্যবহারিক মাত্র। এবং এ-দুয়ের মধ্যে গভীরতাটা অধিকারবাদের পক্ষেই আছে— ওটা একটা গভীরতর দৃষ্টির ও সত্যতর ব্যবস্থার কথা।

সে যা-হোক্ এখানে বক্তব্যটা অধিকারবাদ নিয়ে নয়, ঐ সেল্‌ফ্‌-ডিটার-মিনেশান নিয়ে। ইংরাজী ভাষার এই সমাসবদ্ধ পদটি আজ এ-দেশে কারো কারো গলা থেকে এমনি সুমধুর কীর্তনের সুরে বের হচ্ছে যে মনে দারুণ সন্দেহ না জেগে যায় না। এঁদের কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন মানবজীবনে ঐ শব্দটিই বৈক্তিক সামাজিক রাষ্ট্রিক আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক সর্বাবস্থায় সর্ব রকমের ব্যাধির একমাত্র স্বপ্নলব্ধ মহৌষধ— আর কিছুই দেখবার বা ভাববার নেই। এর সুচিকাভরণেই সব ঠাণ্ডা— একেবারে কৈবল্যলাভের প্রগাঢ় শান্তি।

কিন্তু ব্যাপারটা অমন অনাবিল সহজ সরল মোটেই নয়— গোড়াতেই ওর একটা মহাভুল র'য়ে গেছে।

মহাভুলটা হচ্ছে এই যে সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশান ব্যাপারটা কারো পক্ষেই একক ঐকান্তিক অর্থাৎ অ্যাব্‌সোলিউট (absolute) হ'তে পারে না। অর্থাৎ সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশানের বাংলা যদি করি আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তবে এই আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি কারো পক্ষেই ঐকান্তিক, অন্য সব কিছুই নিরপেক্ষ হ'তে পারে না।

কথাটা বিশদ ক'রে বলছি।

মানব-সৃষ্টির আদিমতম কালের চিত্র আমাদের কারো মানসনেত্রের সুমুখেই নেই। কিন্তু কল্পনা করা যাক যে কোনো এক কালে অতি আদিম যুগে মানুষ অসভ্য বন্য বর্বর অবস্থায় একা একা ঘুরে বেড়াত। এই সময়ে সেই মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি ছিল একেবারেই ঐকান্তিক যাকে ইংরাজীতে বলে অ্যাব্‌সোলিউট্‌। তখন সে যা খুশি তা করতে পারত— কেননা তখন সে যেমন আর কারো উপর নির্ভর ক'রে থাকত না, তেমনি অন্য কেউও তার উপর নির্ভর ক'রে থাকত না। সুতরাং কোনোখানেই তার কোনো

বাধ্যবাধকতা ছিল না— তাই তার স্বাধীনতা ছিল বাধাবন্ধহীন। দাবি ও দায়িত্ব এ দুটোই তখন ছিল শূন্যলোকে। সুতরাং তখন সেই মানুষ যদি জাহান্নামেও যেতে চাইত তবে আর সবাই নির্বিবাদে বলতে পারত— "স্বচ্ছন্দে চলে যান মশাই।" কিন্তু তারপর একদিন দেখা গেল যে এই একক মানুষ পারিবারিক হ'য়ে উঠেছে। অর্থাৎ সে স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিজন নিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে দাবি ও দায়িত্ব শূন্যলোক থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। যে-মুহূর্ত থেকে মানুষ পারিবারিক হ'য়ে উঠল সেই মুহূর্ত থেকে তার যা খুশি তা করবার অধিকারে গণ্ডি পড়ল। তখন থেকে সে এমন কিছু কামনা করবার এমন কোনো কর্ম করবার অধিকার হারাল যাতে ক'রে তার পরিবারের অন্য কারো ক্ষয় ক্ষতির সম্ভাবনা। কিন্তু তার আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি এতটাই ব্যাপক রইল যে অন্য পরিবারের ক্ষতি বা অনিষ্ট ক'রে তার নিজ পরিবারের পুষ্টি করবার পক্ষে কোনো নৈতিক বাধাই তার মনে দেখা দিল না। সমস্ত ব্যাপারটা পারিবারিক সুখ সুবিধাতেই আরম্ভ আর পারিবারিক সুখ সুবিধাতেই শেষ। কিন্তু কালক্রমে বহুপরিবার মিলিত হ'য়ে গোষ্ঠী গ'ড়ে উঠল। তখন কোনো ব্যক্তির বা কোনো পরিবারের এমন কিছু করবার বা এমন ভাবে চলবার অধিকার লোপ পেল যাতে অন্য কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো পরিবারের অনিষ্ট ঘটে। অর্থাৎ মূল তত্ত্বটা— অন্যের অনিষ্ট করবার কারো অধিকার নেই— এই তত্ত্বটার রাজ্য আরো খানিকটা বৃহত্তর হ'য়ে উঠল। এখানেও সেল্‌ফ্-ডিটারমিনেশানের মারফত অনিষ্ট করা চলে কিন্তু তা অন্য গোষ্ঠীর, অন্য গোষ্ঠীভুক্ত পরিবার বা ব্যক্তির। আমার সেল্‌ফ্-ডিটারমিনেশান এখানে আমার গোষ্ঠীর ক্ষয় ক্ষতি বাঁচিয়ে করলেই হ'ল— অন্য গোষ্ঠীর যদি তাতে ক্ষতি হয় তবে তাতে কিছুই আসে যায় না। কালক্রমে আবার বহু গোষ্ঠী একত্র হ'য়ে বৃহত্তর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হ'ল। তখন একটা আরো বৃহত্তর লোকসমষ্টির অনিষ্ট বাঁচিয়ে চলবার দায়িত্ব সেই সমাজের প্রত্যেক সভ্যের ঘাড়ে পড়ল। অর্থাৎ প্রত্যেকের সেল্‌ফ্-ডিটারমিনেশান যা খুশি তা করবার অধিকারের স্থান আরো সংকীর্ণ হ'ল। সে যা-হোক্, কালক্রমে আবার বহু সমাজ একত্র হ'য়ে এক বৃহত্তর মানব-সমষ্টির উদ্ভব হ'ল এবং জাতি দেশ নেশানের বা ভৌগোলিক সীমার জন্ম দিল। মানব-জাতির

সামাজিক বা রাষ্ট্রিক বিবর্তন আজ এইখান পর্যন্ত এসে পৌঁছেচে। আমরা আজ এই দেশ জাতি নেশান বা ভৌগোলিক সীমানার যুগে বাস করছি। যদিও এই সীমানাকেও বাড়িয়ে অতিক্রম ক'রে এক মানব-জাতিকে আবিষ্কার করবার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা আজ দেখা দিয়েছে। "সবার উপরে মানুষ সত্য—" এই ফরমুলা কারো কারো মনে আলোর রেখা ফেলেছে। কিন্তু এটাকে সত্য ক'রে তোলবার পক্ষে একটা প্রবল অন্তরায় হচ্ছে বৈশ্য-মনের বস্তু-বিশ্বের জন্য দুর্বার লোভ। এই লোভ যতদিন পর্যন্ত আসর অধিকার ক'রে থাকবে ততদিন পর্যন্ত জাতি বা নেশান বৃহত্তর কোনো সুখ মহত্তর কোনো আনন্দের উপাদান খুঁজেই পাবে না। সুতরাং এক মানব-জাতি আবিষ্কারের প্রচেষ্টাও বিফল হবে। প্রতিদিনের মানুষ হাতের একটা পাখি বনের দুটো পাখির আশায় ছাড়ে না। সে যা-হোক্‌, বলছিলাম যে আমরা আজ এই দেশ জাতি নেশান বা ভৌগোলিক সীমানার যুগে বাস করছি। এখন এই যে তত্ত্ব— কারো ক্ষতি করবার কারো অধিকার নেই— এই তত্ত্বের রাজ্য আগের চাইতে আরো কিছু বিস্তৃত হ'য়ে পড়েছে। এখন আমি আর এমন আত্মনিয়ন্ত্রণ বা সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশান করতে পারি নে যাতে আমি যে দেশ জাতি নেশান বা ভৌগোলিক সীমানায় বাস করছি তার কোনো ক্ষতি বা অমঙ্গল ঘটে। এখনো অন্য দেশ জাতি নেশান বা ভৌগোলিক সীমানার ক্ষতি ক'রে আমার বা আমার দেশের বা জাতির বা ভৌগোলিক সীমানার পুষ্টি সাধন করতে পারি, কেবল পারি তাই নয়, করলে আমার যশ দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হ'য়ে পড়ে। কিন্তু যে দেশ বা ভৌগোলিক সীমানায় আমি বাস করছি তার সম্পর্কে আমার বা সেখানকার আর কারো অবাধ স্বাধীনতা নেই; সেটা সর্ব দেশে সর্ব জাতিতে স্বীকৃত। তাই রাজদ্রোহ দেশদ্রোহী হাইট্রিজ্‌ন্‌ (High treason) এই কথাগুলির জন্ম হয়েছে। তাই প্রত্যেক দেশে পেনাল কোডের বিস্তৃত ধারার রচনা হয়েছে। সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশান কথাটা উচ্চারণ করলাম আর সব কিছুর সমাধান হ'য়ে গেল, বা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি দাখিল করলাম আর যা খুশি করবার অধিকার সাব্যস্ত হ'য়ে গেল, তা একেবারেই নয়। তাই বলছিলাম যে, আত্মনিয়ন্ত্রণ বা সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশান পরম ব্রহ্মের মতো একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ বা ঐকান্তিক বা অ্যাব্‌সোলিউট্‌ নয়।

অথচ কোনো কোনো মহলে আজ এই সেল্‌ফ্-ডিটারমিনেশান মন্ত্র আউড়িয়ে কিস্তি মাৎ করবার চেষ্টা চলছে।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কেবল সেল্‌ফ্-ডিটারমিনেশানের বলে কিস্তি মাৎ বা কেল্লা ফতে হয় না। কেননা অন্য বহু কাজে লোকের বেয়াড়া সেল্‌ফ্-ডিটারমিনেশান বেয়াড়াপনা সুরু ক'রে দেয়। তাই আজ বছর পাঁচেক ধরে জাপানের এমন সুন্দর সেল্‌ফ্-ডিটারমিনেশান চীনে শুদ্ধ অবুঝ চীনাদের জন্য খাবি খাচ্ছে— এবং শেষ পর্যন্ত যে বাঁচবে তা মনে হয় না। এমন কি তার পূর্বতন সেল্‌ফ্-ডিটারমিনেশান অর্থাৎ মাঞ্চুকুয়ো নিয়েও গোলমাল বাধতে পারে। তাই হিটলারের সেল্‌ফ্-ডিটারমিনেশান তাঁকে এমন অবস্থায় এনে ফেলেছে যে আজ সারা পৃথিবী তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলেও এমন লোক মিলবে না যে ঐ হিটলারের জুতোয় পা ঢুকোতে রাজী হবে। সুতরাং সেল্‌ফ্-ডিটারমিনেশান উচ্চারিত হ'তে শুনেই ভয় পাবার দরকার নেই। কেননা কি বিপক্ষে কি স্বপক্ষে ওটা আজ নির্বিবাদে নির্জলা ভাবে প্রমুক্ত হবার সম্ভাবনা নেই।

তত্ত্বের দিক থেকেই এতক্ষণ সেল্‌ফ্-ডিটারমিনেশানকে দেখা গেল। কিন্তু ব্যক্তির দিক থেকেও একটা বিশেষ কথা এ-সম্বন্ধে বলবার আছে। কতকগুলি লোক আছে যাদের সম্পর্কে আত্মনিয়ন্ত্রণ বা সেল্‌ফ্-ডিটারমিনেশান একেবারে গ্রাহ্যই নয়। এই লোকগুলি হচ্ছে— এক নম্বর যারা শিশু; দুই নম্বর যারা পাগল; আর তিন নম্বর যারা হীন ও সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। আপাতত এই তিন রকমের ব্যক্তির কথাই আমার মনে পড়ছে।

ওর সঙ্গে এই ভাষ্যটুকুও মনে রাখা ভাল নইলে ওর আসল অর্থ আদায় হবে না। ভাষ্যটুকু হচ্ছে এই যে— শিশু কেবল বয়সেই হয় না, বুদ্ধিতেও হয়— আর পাগল যে পাগলা-গারদেই আছে তাই নয় তার বাইরেও থাকতে পারে এবং আছেও।

আশা করি কেউ আবার হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে বসবে না যে শিশুদের আত্মনিয়ন্ত্রণে অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এবং তার প্রমাণ স্বরূপ বল্‌বে না যে শিশুদের নবশিক্ষার প্রণালী— কিণ্ডারগার্টেন মণ্টিসেরি কিম্বা সোভিয়েট রাশিয়ার খেলার ভিতর দিয়া শিক্ষা— এ-সবই তো শিশুদের আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি।

কিন্তু ঐ সব নব শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে শিশুদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি নেই। ও সব হচ্ছে বড়দের পক্ষ থেকে শিশুদের মনস্তত্ত্বের অর্থাৎ চাইল্ড সাইকলজির (Child Psychology) একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার— ওই সবের মধ্যে তারি পরিচয়।

কিন্তু থাকুক শিক্ষা-তত্ত্বের আলোচনা। বলছিলাম সেলফ্‌-ডিটার-মিনেশানের কথা। এতক্ষণে তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছ কোন্ আসল কারণের জন্যে আজ আমি ঐ কথা উত্থাপন করেছি।

পাকিস্থানের সঙ্গে আজ এই সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশান বা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি এসে যুক্ত হয়েছে যুক্তি হিসেবে।

কিন্তু যুক্তি হ'লেই যে ও-যুক্তির যৌক্তিকতা বাড়বে তা নয়।

আমি একটু আগেই বলেছি যে সমাজে তিন শ্রেণীর ব্যক্তির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবির কোনো অধিকার নেই। সুতরাং পাকিস্থানওয়ালাদের ও-যুক্তি মেনে নেবার পূর্বে এইটে ধার্য হওয়া দরকার যে তাঁরা (১) শিশু নন, —বয়েসে ও বুদ্ধিতে, (২) পাগল নন কিম্বা (৩) হীন সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নন। যদি প্রমাণিত হয় যে তাঁরা ঐ তিন শ্রেণীর কোনো শ্রেণীর অন্তর্গত নন তবেই শুধু তাঁদের সম্পর্কে ঐ আত্মনিয়ন্ত্রণ যুক্তির সারবত্তা মানা চলবে— নইলে নয়।

কিন্তু মনে করা যাক্ যে পাকিস্থানওয়ালারা ঐ তিন শ্রেণীর কেউ নন এবং ধরা যাক যে তাঁরা অতি সজ্জন ব্যক্তি। হীন ও সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি এঁদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না এবং ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর জন্য এঁরা হামেশাই গলদশ্রুলোচন। এখন এই প্রশ্ন উঠবে যে ভারতবর্ষ নামক যে ভৌগোলিক সীমানার মাঝে প্রায় চল্লিশ কোটি লোক বাস করছে, পাকিস্থানের নির্ধারণে সেই ভৌগোলিক সীমানার ও সেই চল্লিশ কোটি লোকের কোনো অনিষ্ট ঘটবার কারণ হ'তে পারে কি না। তবে এঁদের মতে ভারতবর্ষ এক নেশান নয়। এমন কি বাংলার হিন্দু মুসলমানও এক নেশান নয়। কিন্তু ভারতের, এক প্রান্তের বাঙালী মুসলমান অপর প্রান্তের পেশোয়ারী খাঁসাহেবদের সঙ্গে এক নেশান। এঁদের কুদরতে আজ যদি গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কিমোরা বা ল্যাব্রেডরের রেড্ ইণ্ডিয়ানরা ইসলাম গ্রহণ করে তবে তারাও

বাঙালী মুসলমানের সঙ্গে এক নেশান হ'য়ে যাবে। কিন্তু পাকিস্থানীদের দুর্ভাগ্যক্রমে সে-কাল আর নেই যখন বাদশাদের এক কথায় রাতকে দিন আর দিনকে রাত বানানো চলত। সে যা হোক্, ভারতবর্ষ এক নেশান হোক্ বা না-হোক্, ভারতবর্ষ যে একটা ভৌগোলিক সীমানা এ-সম্বন্ধে কোনোই তর্ক উঠবে না। এ-দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা এমনি সুস্পষ্ট যে কোনো আত্মারাম সরকারও তা অস্পষ্ট ক'রে তুলতে পারে না। আমি আগেই বলেছি যে মানুষের রাষ্ট্রিক বিবর্তন আজ দেশ জাতি নেশান বা ভৌগোলিক সীমানায় এসে পৌঁছেচে। হিন্দুভারত অধিকাংশ সময়ে নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত থাকলেও হিন্দুর সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল ভারত-জোড়া। সেই সে-কালেও অর্থাৎ রেলওয়ে এরোপ্লেন টেলিফোন টেলিগ্রাফহীন যুগেও হিন্দু-মন সারা ভারত জুড়ে— কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা দ্বারকা থেকে নীলাচল— অতি সহজে বিচরণ করত, আর আজ তো তা করেই। তাদের মনের এই গতি কৃত্রিম নয়, বানানো নয়, শুধু কাগজে কলমে নয়। মুসলমান ক্রীশ্চানরাও যদি আপনাদের ভারতীয় ব'লে মনে করেন— মনে না করবার নৃ-তত্ত্বের দিক থেকে কোনো কারণই নেই, এবং এটা তাঁদের জন্মের ভূমি তো বটেই— তবে তাঁদের মনও তাই করবে অন্ততঃ তাই করা উচিত। কেননা ঐটেই সত্য ও সহজ এবং মন বুদ্ধি আত্মার পক্ষে শুভ, উপরন্তু সাংসারিক হিসেবেও লাভজনক, অপিচ রাষ্ট্রিক হিসেবে নিরাপত্তা-জ্ঞাপক। সুবৃহৎ জন্ম-ভূমির বৃহৎ রাষ্ট্রের এই সব সুখ সুবিধা ত্যাগ করতে চান এঁরা— এই পাকি-স্থানীরা। কিন্তু কেন? তার একটা সুষ্ঠু সুস্থ ও শুভ কারণ থাকা দরকার অর্থাৎ যদি এঁরা শিশু পাগল কিম্বা হীন সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দ না হন। কিম্বা এঁরা বিশ্ববাসীকে ত্যাগ-ধর্ম শিক্ষা দেবার জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হয়েছেন? তাই যদি হয় তবে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এঁদের কথা অমান্য ও অপ্রমাণ্য।

পাকিস্থান যদি ঐ ভৌগোলিক সীমানা ভারতবর্ষকে কোনো রকমে জখম করে, ওর মধ্যে যদি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার কোনো সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে তবে ওটা আর বিবেচ্য প্রস্তাব থাকে না, ওটা চলে যায় পেনাল কোডের সীমানার মধ্যে— হয়ে ওঠে দেশদ্রোহিতা, হাই ট্রিজন্ (High

treason)। তখন যে রাষ্ট্রনেতার রাজনীতির ক খ জ্ঞানও আছে এবং যিনি ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর মঙ্গলকামী তিনি ঐ প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করবেন। সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশানের দাবি তাঁকে ভয় পাইয়ে দেবে না বা তালকানা করবে না। পূর্বেই বলেছি সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশান কোনো ক্ষেত্রেই অ্যাব্‌সোলিউট নয় অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি অন্য সব কিছুই নিরপেক্ষ হ'য়ে থাকতে পারে না।

একতাই বল— সংহতি কার্যসাধিকা। সুতরাং এই কথাটা সর্বদা মনে রেখো যে বিদেশীই হন আর স্বদেশীই হন যিনি যে কোনো অজুহাতেই হোক্ না কেন ভারতবর্ষের এক-রাষ্ট্রত্ব নষ্ট করতে চান তিনি কদাপি ভারতবাসীর সুহৃদ নন।

মুসলমানদের কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে স্বাধীনভারতে হিন্দুরা মুসলিমদের উপরে অত্যাচার করবে।

যেন হিন্দুরা তাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে অন্য ধর্মের লোকদের উপর অত্যাচারে বীভৎস উদাহরণ দেখিয়ে এসেছে— তার রেকর্ড স্থাপন করেছে— পরধর্মের উপর অত্যাচারে যেন তারা একাধারে হিরণ্যকশিপু ও হিটলার।

কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেই যে এই বিংশ শতাব্দীতে টেলিগ্রাফ টেলিফোন রেডিও এরোপ্লেনের যুগে, এক মানবজাতি আবিষ্কারের প্রচেষ্টার যুগে, লীগ অব নেশান্‌স্‌ ওয়ার্লড ফেডারেশানের পরিকল্পনার যুগে এই হিরণ্যকশিপু ও হিটলাররা মুসলিমদের উপর অত্যাচার চালাবে তবে তার প্রতিকার মুসলমানদের ভারতবর্ষ নামক ঐ ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে থেকেই করতে হবে। নয় কোটি মুসলমানের হাতে তার প্রতিকারের উপায় নিশ্চয়ই আছে — অন্ততঃ থাকা উচিত। আর তা যদি না থাকে তবে হাজার পাকিস্থানও তাঁদের ঐ একাধারে হিরণ্যকশিপু ও হিটলারের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

কিন্তু থাক এ-সব তর্কাতর্কি। পাকিস্থানের মধ্যে আসল সত্যিকারের মজাটা হচ্ছে এই যে, যে-দুই উপায়ে পাকিস্থান সম্ভব হতে পারে সেই দুই উপায়ের কোনো এক উপায়ে যদি পাকিস্থান জন্মলাভ করে, তবে পাকিস্থানীদের কাছে ঐ পাকিস্থানের বিশেষ কোনো মূল্য থাকবে না।

কথাটা একটা হেঁয়ালির মতো মনে হ'তে পারে কিন্তু আসলে তা নয়। ওটা স্পষ্ট একটা যুক্তির কথা। তাই বলছি।

এক নম্বর— পাকিস্থান সম্ভব হ'তে পারে, যদি ইংরাজ-রাজ দয়া ক'রে তা গড়বার অনুমতি দেন এবং তার ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে রাজী হন। ঝুঁকির কথা বলছি এই জন্যে যে বঙ্গভঙ্গের সময় যে রকম আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল পাকিস্থানের জন্যে সেই রকম আন্দোলন সারা ভারত জুড়ে আরম্ভ হবে ব'লে আমার বিশ্বাস। সে যা-হোক্ ইংরাজরাজ যদি ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে পাকিস্থানের অনুমতি দেন তবে তিনি সেই পাকিস্থানে চূড়ার উপর ময়ুরপাখার মতো বিরাজ করতে থাকবেন, এতে সন্দেহ নেই। কেননা জনবুলের আর যে দোষই থাক না কেন তিনি যে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান এ-অপবাদ কস্মিন কালে কেউ তাঁকে দিতে পারবে না। সুতরাং ইংরাজ সেখানে থাকবেন এবং ভালো ভাবেই থাকবেন। সুতরাং পাকিস্থান-মাতব্বরদের পাকিস্থানে ব'সে যা তা করবার সুযোগও থাকবে না। সুতরাং পাকিস্থানের আসল মূল্যও লোপ পাবে। কেননা পাকিস্থানের যে নগদানগদি কোনো লাভ নেই, বরং ক্ষতিরই সম্ভাবনা আছে এটা বালকেও বোঝে— ওর লাভ হচ্ছে ভবিষ্যতের সুদূর-প্রসারী সম্ভাবনায়। ওর লাভ হচ্ছে যদি ওর আশ্রয়ে শুষ্কপ্রায় প্যান্-ইস্‌লামিজম্‌এর বীজটি সরস হয়ে আবার অঙ্কুরিত হ'য়ে পল্লবিত হ'য়ে বিরাট বিটপীরূপে পৃথিবী জুড়ে শিকড় বিস্তার করে আকাশ ফুঁড়ে মাথা তোলে। কিন্তু যে-মুহূর্তে ইংরাজ-রাজ টের পাবেন যে পাকিস্থানে প্যান্‌ইসলামিজ্‌ম্‌এর তান্ত্রিক সাধনা চলছে সেই মুহূর্তে তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যাদি সৎগুণাবলী শুকিয়ে উঠবে। কেননা প্যান্‌ইস্‌লামিজ্‌ম্ ইয়োরোপীয় নেশানদের পক্ষেও এমন একটা রসবস্তু নয় খোল করতাল বাজিয়ে দুই বাহু তুলে যার কীর্তন তারা জুড়ে দিতে পারে। স্পেনে মুর এবং বলকানে তুর্করা অনেক দিন রাজত্ব করেছে। ইয়োরোপের সেটা ভুলতে পারা সম্ভব নয়।

আর দুই নম্বর— পাকিস্থান সম্ভব হয় যদি আজ আবার কোনো স-ট্যাঙ্ক স-বম্‌বার আধুনিক নাদির শা বা আহমদ শা আবদালীর আবির্ভাব হয়। কিন্তু তা যদি হয় তবে সমগ্র ভারতবর্ষটাই বাদশাহী স্থানে পরিণত হ'তে পারবে— সুতরাং পাকিস্থানের কোনো প্রশ্নই থাকবে না। কাজেই দেখতে

পাওয়া যাচ্ছে দুই পরিস্থিতিতেই পাকিস্থানের আর কোনো বিশেষ তাৎপর্য থাকবে না।

কিন্তু একথা উঠতে পারে— হিন্দুদের সম্মতি নিয়েও তো পাকিস্থান হ'তে পারে। না, সেইটেই কেবল পারে না।

পাকিস্থান-চিহ্নিত অংশের হিন্দুরা তো এতে সম্মত হ'তে পারেই না, এর বাইরের হিন্দুরা যদি সম্মত হয় তবে বুঝতে হবে যে হিন্দুর জয়চাঁদের যুগ এখনও গত হয় নি। যাদের কিছুমাত্র কল্পনা নেই, কিসের অর্থ কি হয় তার সম্যক জ্ঞান নেই, তারাই কেবল মনে করতে পারে পাকিস্থান সম্ভাব্য হিন্দুর সম্মতি নিয়ে। আমি ভারতবর্ষের ভিতর বাহিরের রাষ্ট্রিক নিরাপত্তার কথা ভাবছি নে, পাকিস্থানের ভাবী সুনিশ্চিত অর্থসংকটের কথা তুলছি নে কিম্বা ঘরোয়া বিবাদের আন্তঃপ্রাদেশিক কলহ খিটিমিটির কথাও উত্থাপন করছি নে। ও-সবের কোনো সমাধান হ'লেও হ'তে পারে। কিন্তু ও-সব প্রশ্ন উঠবার আগেই এমন একটা বাধা আছে যা দুরতিক্রম্য নয়— একেবারে অনতিক্রম্য। সকল বাধার সমাধান হতে পারে কিন্তু সে-বাধার নিরাকরণ কোনোদিন হবার সম্ভাবনা নেই। বাধাটা কি তা বলছি।

ধরা যাক্,—পাকিস্থানের জরিপ অনুসারে বাংলাদেশ পাকিস্থানের মধ্যে পড়ে। এখন, বাংলাদেশ যদি পাকিস্থানে পরিণত হয় তবে বাঙালী হিন্দুদের পক্ষে ওর আসল তাৎপর্যটা হবে এই যে বাঙালী হিন্দু কলমের এক খোঁচায় তার স্বদেশ তার মাতৃভূমিকে হারাবে।

বাংলায় ইসলামের বয়েস ছ' সাতশ বছরের বেশি নয়। আর বাঙালী হিন্দু পুরুষানুক্রমে এই দেশে বাস ক'রে এসেছে হাজার দুই— আড়াই— তিন বছরের কম তো নয়ই। বাঙালী হিন্দুর এই এতদিনকার স্বদেশ কলমের এক আঁচড়ে উবে যাবে। কেননা তখন তা হ'য়ে উঠবে পাকিস্থান— ইসলামীস্থান —পবিত্র ইসলামভূমি। তখন আর সে

"ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি"

কিম্বা—

"নমো নমো নমো সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি

* * * *

মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভ'রে"

এ-রকম কথা বলতে পারবে না— এবং বললে তা পরিহাসের মতো শোনাবে আর তার হৃদ্‌পিণ্ডের গা বেয়ে রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়বে। আকবর বাদশা রাণা প্রতাপের জন্মভূমি আক্রমণ করেছিলেন অস্ত্র দিয়ে মাটির জগতে এবং তার প্রতিক্রিয়া মেবারবাসীর মনে কি রকম হয়েছিল তা আমরা জানি। আজ পাকিস্থানীরা বাঙালী হিন্দুর স্বদেশ আক্রমণ করছেন আইডিয়া দিয়ে মনোজগতে, এর প্রতিক্রিয়া অন্যরূপ হবে তা মনে করবার কোনো কারণই নেই।

যে বাঙালী হিন্দু প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগে লঙ্কা জয় করেছিল, পরবর্তী কালে আনামে রাজ্য স্থাপন করেছিল, সারা দ্বীপময় ভারতে সভ্যতা বিস্তার করেছিল; এই সেদিনও পরাধীনতার পাষাণ-চাপের তল থেকেও যে বাঙালী হিন্দুর বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্যে গিয়ে ধর্মের জয়-পতাকা উড়িয়ে এসেছেন, যে বাঙালী হিন্দুর রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে বাঙালীর সাহিত্যকে বিশ্বের সভায় গৌরবের আসনে বসিয়ে দিয়েছেন, যে বাঙালী হিন্দুর প্রাণৈশ্বর্য আজও মলিন হয় নি নিস্তেজ হয় নি, তা তেমনি সৃষ্টিক্ষম রয়েছে, পৃথিবীর মানচিত্রে সেই বাঙালী হিন্দুর স্বদেশের কোনো চিত্র থাকবে না। ভবিষ্যতের কথা বলতে পারি নে কিন্তু আজ পর্যন্ত যে বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতা তার শিল্প কলা বাণিজ্য প্রায় সব বাঙালী হিন্দুর দান এ-কথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না। কিন্তু সেই বাঙালী হিন্দুর স্বদেশের কোনো হিসেব বিশ্বমানবের মন-চিত্রে আর পাওয়া যাবে না। কেননা তখন তারা সবাই হবে ইসলামভূমি-বাসী। বাঙালী হিন্দু আর ভারতমাতারও সন্তান থাকবে না কেননা তারা হবে পাকিস্থানের মুসাফির।

কোনো বুদ্ধি-সর্বস্ব রাষ্ট্রনেতা বলতে পারেন যে এ-সব ভাব-প্রবণতার কথা।

কিন্তু ভাব-প্রবণতার কথা সব মিথ্যা কথা আর বুদ্ধির তৈরি কথা সব সত্য কথা এটা কোন্ দিব্যদৃষ্টি ঋষির আবিষ্কার? আসলে ভাব-প্রবণতার কথা সব মিথ্যা কথা আর বুদ্ধির তৈরি কথা সব সত্য কথা এটা আজ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় নি এবং মানুষের সমাজে তা প্রমাণিত হবার সম্ভাবনাও নেই। আর শুধু

ভাব-প্রবণতার কথাই বা কেন? বাস্তব দিকের কথাও আছে। পাকিস্থান যদি তার আপন স্বরূপে আসল তাৎপর্যে সফল হয়ে ওঠে তবে সেখানে হিন্দুদের জ্ঞান গুণ গরিমা বিদ্যা বুদ্ধি যোগ্যতা থাকলেও বাস করতে হবে অপ্রধান হয়ে। অথচ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম দুঃখ কষ্ট ভোগ বাঙালী হিন্দুরাই করেছে বেশি। সে-সবের সমাপ্তি হবে এই পরিহাসে? তারপর পাকিস্থান যদি আরো উন্নতির শিখরে আরোহণ করে এবং সেখানে কোনো এক জবরদস্ত রাষ্ট্রনেতার আবির্ভাব হয় তবে— কে বলতে পারে!— হয় তো সেখানে হিন্দুদের অবস্থা ক্রমে ক্রমে কতকটা দাঁড়াতে পারে যেমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে আজ হিটলারের জার্মানীতে ইহুদীদের।

অবশ্য একটা প্রস্তাব এই হতে পারে যে পাকিস্থানেও হিন্দুদের নাগরিকের সকল রকমের ডেমোক্র্যাটিক অধিকার থাকবে।

কিন্তু তাই যদি হয় তবে পাকিস্থানের মানেই বা কি দাঁড়াবে, ওর মূল্যই বা কত হবে আর ওর মর্যাদাই বা কোথায় থাকবে? পাকিস্থান-প্রয়াসীদের অন্তরে অন্তরে যদি এমন ডেমোক্র্যাটিক মনোভাবেরই জোর থাকে, তাঁদের শোণিতে ও মজ্জায় ডেমোক্র্যাটিক মন্ত্রই ধ্বনিত হ'তে থাকে এবং পাকিস্থানের চতুঃসীমায় ডেমোক্র্যাটিক ফুরফুরে মলয় হাওয়াই বইতে থাকে তবে পাকিস্থান সৃষ্টির দরকারটা কি? অন্ততঃ তার জন্যে দেশের বুকে এতটা বিক্ষোভ ও বিষ সৃষ্টি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আসলে হিন্দুস্থানের বুকে পাকিস্থান আর সেই পাকিস্থানের বুকে হিন্দুদের সকল রকমের ডেমোক্র্যাটিক অধিকার— এ-দুটো স্বতঃবিরোধী তত্ত্ব। পাকিস্থান-প্রয়াসীরা সমগ্র ভারতের মালিকানা স্বত্ব ছেড়ে দেবেন অথচ তাঁদের তৈরি সংকীর্ণতর পাকিস্থানের সীমানাতেও হিন্দুদের নাগরিকের সর্ব প্রকারের ডেমোক্র্যাটিক অধিকারও থাকবে অর্থাৎ সেখানেও হিন্দুরা মুসলিমদের সঙ্গে সমান প্রভুত্ব করবে (কেননা ও-কথার অর্থ তাই হয়) পাকিস্থানের নেতাদের এতটা বেহিসেবী না মনে করাই যুক্তিযুক্ত।

মাইনরিটি রাইট্‌স্ (Minority rights) ব'লেও একটা কথা উঠেছে। আপনার স্বদেশ হারানোর বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মাইনরিটি রাইট্‌স্— কথাটা এত বেশি মাত্রায় হাস্যরসাত্মক যে ও-নিয়ে মাত্র হাস্য পরিহাস চলে— তর্কাতর্কি চলে না।

আর তর্কাতর্কি যদি করতেই হয় তবে বলি যে, ঐ মাইনরিটি রাইট্স্‌ — ওটা হচ্ছে অকিঞ্চন ও অশক্ত জনের স্বর্গলোক। কিন্তু যে-হিন্দু বিদ্যা-বুদ্ধিতে জ্ঞান-গরিমায় সর্ব রকমের যোগ্যতায় পৃথিবীর যে-কোনো জাতি বর্ণ ধর্মের মানুষকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে সেই হিন্দুর পক্ষে ঐ স্বর্গলোক লোভেরও নয় আগ্রহেরও নয়। বিদ্যা বুদ্ধির কথা উঠবে না, গুণ গরিমার প্রশ্ন চলবে না, কুশলতা যোগ্যতার হিসাব থাকবে না কেবল সংখ্যায় কয় লক্ষ কম ব'লে বাঙালী হিন্দু, যে তার স্বদেশকে— কেবল মাটির জগতের স্বদেশ নয়, মনোজগতের স্বদেশকেও— হাজার হাজার বছরের শিক্ষা দীক্ষা শিল্প কলা সভ্যতা ভব্যতা দিয়ে সাজিয়েছে, সেই তার আপন স্বদেশে তাকে মাইনরিটি হয়ে থাকতে হবে এর মনোহারিত্ব তাকে কোনোদিনও বুঝিয়ে দেওয়া যাবে না।

মাইনরিটি রাইট্স্‌ এর আসল নাম হচ্ছে পুওর রিলেশান্স্‌ রাইট্স্‌ (Poor relations' rights)। বাঙালী হিন্দু তা মানতে রাজী হবে না কোনো কালে। কেননা ওটা তার সম্পর্কে সত্য নয়। বাঙালী হিন্দু কারো পুওর রিলেশান নয়। কেননা তাদের জন্মভূমি যেমন সম্পদশালী তাদের চিত্তভূমিও তেমনি বিত্তবান।

পরিশেষে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বাঙালী হিন্দুরা তাদের সোনার বাংলা তাদের স্বদেশ তাদের মাতৃভূমির জন্য যেমন উতলা বাঙালী মুসলমান পাকিস্থানের জন্যেও তো তেমনি উতলা হ'তে পারে। তখন? অর্থাৎ দুই পক্ষের সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশানে যখন সংঘর্ষ হয় তখন?

তখনই প্রশ্ন এসে উদয় হয় সত্যাসত্যের ন্যায় অন্যায়ের কল্যাণ অকল্যাণের অর্থাৎ মানুষের মানবতার তার বিবেকের তার শুভবুদ্ধির। আর তাই হয় ব'লেই রক্ষা— নইলে মানুষের সমাজও হয়ে উঠত রেড্‌ ইন টুথ্‌ অ্যাণ্ড্‌ ক্ল (Red in tooth and claw)।

পণ্ডিচেরি।

চেনাশোনা

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

এত কাল যার সঙ্গে ঘর করছি, এক এক দিন তার দিকে তাকিয়ে মনে হয় না কি— কতটুকু এর চিনি!

তেমনি স্বদেশের।

স্বদেশকে আরো একটু চিনতে চাই বলে বেড়াতে যাই। বেড়ানো বলতে বুঝি চেনাশোনা।

২

এমনি এক চেনাশোনার যোগাযোগ ঘটেছিল ঠিক চার বছর আগে। আমরা বেড়াতে যাচ্ছি শুনে বম্বে থেকে শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া লিখলেন তাঁর অতিথি হতে।

বম্বে যতবার দেখেছি ততবার নতুন লেগেছে। তার সম্বন্ধে আমার মোহ চিরদিনের। ভারতে বাস করে কতকটা বহির্ভারতের স্বাদ পাওয়া যায় একমাত্র সেই দ্বীপটিতে। সমুদ্রগামী পোত। বিস্তীর্ণ নীলাম্বু। দিগ্বলয়ে বহুদর্শী সহ্যাদ্রি। দিগ্বিদিকে নানা দেশের নরনারী। কত সাজ, কত রং, কেমন বাহার। মনে হয় আধাআধি বিদেশে এসেছি, এবার জাহাজে উঠতে পারলে পুরোপুরি বিদেশ। দেশেরও এমনতরো বিচিত্র সঞ্চয়ন আর কই?— ভারত দেখতে যাদের সময় নেই তারা যদি শুধু বম্বে দেখে, তাহলে ভারতদর্শনের ফল হয়।

শ্রীমতী সোফিয়ার স্বামী সেই প্রসিদ্ধ ওয়াডিয়া, যিনি গত মহাযুদ্ধের মধ্যভাগে হোমরুল আন্দোলন করে মিসেস বেসান্টের সঙ্গে অন্তরীণ হয়েছিলেন। পরে ইনি পৃথক হয়ে যান, পৃথক একটি সংস্থা সংগঠন করেন। ইনি পারসী, এঁর সহধর্মিণী ফরাসী, কিন্তু উভয়েই গভীরভাবে ভারতীয়। স্বামী পরেন মোটা খদ্দরের পায়জামা পাঞ্জাবী, স্ত্রী মিহি খদ্দরের শাড়ি। এঁদের সঙ্গে এক বাড়িতে স্বতন্ত্র থাকেন যে কয়টি পরিবার ও ব্যক্তি, তাঁদের কেউ ইংরাজ, কেউ আমেরিকান, কেউ নরওয়েজিয়ান, কেউ

পারসী। এঁরা সকলে কিছু ভারতীয় ধারায় জীবনযাপন করেন না, বৈদেশিক পদ্ধতিও চলে। তবে ভারতীয়তার মর্যাদা মানেন। টাউনসেণ্ড আপিস থেকে ফিরলে খদ্দরের পাঞ্জাবী পায়জামা পরে ভারতীয় হয়ে যান। টেনব্রুকের ছেলে তাই পরে ইস্কুলে যায়, মাথায় একটা গান্ধী টুপি। ছেলেটি গুজরাতী পড়ে, তার বোনটি তো পরিষ্কার গুজরাতী বলে।

ওয়াডিয়ারা নিরামিষাশী। শুধু তাই নয়, তাঁদের খোরাক খাদি ভাণ্ডারের ঢেঁকিছাঁটা বা হাতে-ছাঁটা চালের ভাত। তার সঙ্গে সংগতি রেখে ডাল তরকারি ফলমূল চাপাটি। আমাদের জিজ্ঞাসা করা হলো আমরা কোন রীতি পছন্দ করি। আমরা ছিলুম ঘোর আমিষাশী, কিন্তু অপাংক্তেয় হতে ইচ্ছা ছিল না। তাই ওঁদের রীতি বরণ করলুম। ভাগ্যক্রমে দেশী পোষাক সঙ্গে ছিল। নইলে আমার ময়ূরপুচ্ছ আমাকে নাকাল করত।

পাণ্ডে নামে এক ভদ্রলোক এসে আমাদের তত্ত্বাবধান করেন। ঠাওরেছিলুম কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ। চেহারাটাও অনেকটা সেইরকম বা তার চেয়ে ভালো। কিন্তু শুনে অবাক হলুম তিনি পারসী। পারসীদের নাম যে পাণ্ডে হয়, তা কী করে জানব? পরে একটি পারসী বিবাহে বরযাত্রী হয়ে পংক্তিভোজনে বসে দেখি পরিবেশকরা অবিকল রাঁধুনি বামুন। অথচ পারসী। পারসীদের সবাই বড়লোক নয়। এমন কি মধ্যবিত্তও নয়। পাছে পরে লিখতে ভুলে যাই সেইজন্যে এখনি বলে রাখি যে, নেমন্তন্ন খেয়েছিলুম কলাপাতায়, যদিও টেবলের উপর। পারসীরা যে গোঘ্ন তা বোধ হয় অজানা নয়, কিন্তু ক'জন খোঁজ রাখেন যে তারা উপবীতধারী? তাদের বিয়ের মন্ত্র অংশত সংস্কৃত।

পাণ্ডে মহাশয়ের কাছে ছিল সেদিনকার খবরের কাগজ। পড়লুম পণ্ডিত জবহরলাল নেহরুর প্রত্যাবর্তন সমাচার। পরের দিন তাঁকে আজাদ ময়দানে অভ্যর্থনা করা যাবে। মনঃস্থ করলুম যাব। শুনতে হবে তাঁর স্পেনের অভিজ্ঞতা।

পৃথ্বীশ দাশগুপ্ত তখন বম্বেতে কাজ করেন, তাঁকে পাক্ড়ানো গেল। তিনি ও আমি আজাদ ময়দান অর্থাৎ এসপ্লানেড ময়দানে গিয়ে রবাহূতদের

ভিড়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু দাঁড়াতে দিলে তো? কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার, পরনে খাকী শার্ট হাফ-প্যান্ট, পুলিসী স্বরে বললেন, "বৈঠ্ যাও।" রামরাজ্যে কেউ কাউকে 'আপনি' বলবে কি না বোঝা গেল না, অন্তত ভলান্টিয়ারের মুখে তার নমুনা ছিল না। বোধ হয় পোষাকটার স্বভাব এই যে পরলেই মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। লঙ্কায় গেলে যদি রাক্ষস হয়, তবে খাকী পরলে খোক্কস্ হয়।

ঘাসের উপর পা মেলে দিয়ে আরাম করে বসবার মতো জায়গা যতক্ষণ খালি ছিল ততক্ষণ আমরা পণ্ডিতজীর প্রতীক্ষা করলুম। মঞ্চের উপর অধিষ্ঠিত স্থানীয় নেতারা জনতার ধৈর্য বিধান করতে গান জুড়ে দিলেন; তাতেও ধৈর্য রক্ষা হয় না দেখে শঙ্কররাওজী শুরু করে দিলেন বক্তৃতা। বাগ্মী বলে তাঁর প্রসিদ্ধি আছে, অযথা নয়।

আমাদের পাঠ্য জুটে গেল একখানি কমিউনিস্ট পত্রিকা। সেখানি কিনতে হলো একটি নীলকৃষ্ণ স্কার্ট পরা বালিকার কাছে। মেয়েটি পারসী কি মুসলিম কি হিন্দু তা বুঝতে দেওয়া হয়তো সাম্যবাদীদের নীতিবিরুদ্ধ। অথবা যে-কোনো প্রকার ভারতীয়তাই তাঁদের পক্ষে আপত্তিকর ফাসিস্টতা। আমার কিন্তু ধারণা, যে কারণে জাতীয় পতাকাধারীর অঙ্গে খাকী হাফ-প্যান্ট ও শার্ট, সেই একই কারণে রক্ত নিশানধারিণীর পরিধানে স্কার্ট। কারণটা আর কিছু নয়, শাসক ও শোষককুলের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি। আমরা ইংরাজকে চাইনে, কিন্তু ইংরাজীকে চাই। আমরা কায়ায় ইংরাজ নই, কিন্তু মনোবাক্যে ইংরাজ।

তা কমিউনিস্টরা উদ্যোগী বটে। বাঘের ঘরে ঘোগের মতো কংগ্রেসী জনসভায় সাম্যবাদী ইস্তাহার। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের— অন্তত কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর— নিন্দাবাদ। তখনো আন্দাজ করিনি যে, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গৃহবিবাদের উদ্যোগপর্ব চলেছে। তখনো ত্রিপুরীর ঢের দেরি।

অন্ধকার হলো। জবহরলালজীর পথ চেয়ে আমাদের মুখচোখ লাল হলো। বেরিয়ে আসছি এমন সময় ব্যাণ্ড বেজে উঠল মনে পড়ে। নহবত নয়। লাউড স্পীকারে শোনা গেল তাঁর গম্ভীর কণ্ঠ, কিন্তু সন্ধ্যার আবছায়ায় স্পষ্ট দেখা গেল না তাঁর দণ্ডায়মান মূর্তি।

রাজপথের উপর খাড়া হয়ে গৃহিণীদ্বয়ের জন্যে অপেক্ষা করছি, তাঁরা ছিলেন মহিলাবিভাগে। এবার রামরাজ্যের পুলিস নয়, সাম্রাজ্যের পুলিস এসে হট্‌তে হুকুম দিল। বাপ রে! সে কী পুলিস সমাবেশ। পণ্ডিতজীর সম্বর্ধনার জন্যে কংগ্রেসমন্ত্রীরা স্বয়ং না আসুন, সান্ত্রী প্রেরণ করেছিলেন অগণ্য। গোরা সার্জেন্ট এমন কড়া পাহারা দিচ্ছিল যে রাস্তায় একটিও পদাতিক ছিল না।

জীবনসঙ্গিনীদের সাক্ষাৎ পেয়ে জীবন ফিরে পাচ্ছি, হেনকালে আলাপ হয়ে গেল জবহরভগিনী কৃষ্ণার সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে আরো দু'একজন মহিলা ছিলেন, বোধ হয় সরোজিনী নাইডু মহাশয়ার ভগিনীও। এঁদের কাছে সংবাদ মিলল যে, দিন দুই পরে ওয়েস্ট এণ্ড সিনেমায় চান ও স্পেন বিষয়ক ফিল্ম প্রদর্শিত হবে। উপস্থিত থাকবেন ও উদ্বোধন করবেন জবহরলাল। টিকিট চেষ্টা করলে এখনো কিনতে পাওয়া যায়, সে ভার দাশগুপ্ত নিলেন। তিনি একটা ঘরোয়া নিমন্ত্রণের জোগাড়ে ছিলেন, কিন্তু শ্রীমতী কৃষ্ণা বললেন তাঁর দাদা দারুণ ব্যস্ত, স্পেনের জনগণের জন্যে এক জাহাজ খাদ্য পাঠানোর দায়িত্ব নিয়েছেন।

৩

ওয়েস্ট এণ্ড সিনেমায় ফিল্ম দুটি দেখানো হলো দুপুরের আগে। চীনের গেরিলা যুদ্ধ। চু তে। মাওৎসে তুং। স্পেনের ধ্বংসলীলা। নো পাসারান। রোমাঞ্চকর দৃশ্য। আমরা তো ছায়ামাত্র দেখে শিউরে উঠছি, ওদিকে ওরা বাস্তবের সঙ্গে হাতাহাতি করছে।

করবার কিছু নেই। শুধু অনুভব করি। সহানুভবী আমরা ঘরশুদ্ধ লোক। কারো মুখে পাইপ, কারো পরনে জর্জেট। বম্বের শৌখিন সমাজের অনেকেই সমুপস্থিত। গান্ধী টুপিও সংখ্যায় কম নয়। আবহাওয়াটা কস্‌মোপলিটান। সামনের সারিতে বসেছিলেন জবহরলাল, উঠে কয়েকটি কথা ইংরাজীতে বললেন। যাঁরা প্রত্যাশা করেছিলেন তিনি তাঁর স্পেনের অভিজ্ঞতা সচিত্র করবেন তাঁরা নিরাশ হলেন। তা বলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। ওটা তো সভা নয়, ওখানে আমাদের কাজ ছবি দেখা। জবহরলালের সঙ্গে ছবি দেখা।

তিনি বাগ্মী নন। তাঁর বক্তৃতা যেন বক্তৃতা নয়, একটু উঁচু গলার কথাবার্তা। সম্ভবত আতশবাজির আর্ট তাঁর অজানা। মনে হলো বেশ সহজ সরল মানুষ তিনি। খেয়ালীও বটে। হঠাৎ এক সময় উঠে গেলেন, শুনলুম তাঁর ভালো লাগে না নিজের প্রশস্তি। সভাপতি না কে যেন সেই সময় তাঁর গুণগান করছিলেন। দেখলুম তিনি বাইরে গিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন।

সেদিন আলাপ হলো কয়েক জনের সঙ্গে। চীন ও স্পেনের জন্যে সত্যিকার মাথাব্যথা যাঁদের, তেমন কারো কারো সঙ্গেও। তাঁরাই এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা, সংগৃহীত অর্থ চীনদেশে পাঠিয়ে তাঁরা মানবের প্রতি মানবকৃত্য করছেন। এই ফ্যাশনেবল জনতায় তাঁদের নিরাভরণ নির্জিত রূপ কেমন একটা করুণ ছাপ রেখে যায়। দরদী হবার অধিকার তাঁদেরই, আমরা তো সংসারী লোক। একটু পুণ্য করতে এসেছি।

পরের দিন আমাদের ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ায়। নিমন্ত্রাতা সরোজ চৌধুরী ক্লাবেই ঘরগৃহস্থালি পাতিয়েছেন। চির-কুমারের পক্ষে ওর চেয়ে আরাম আর নেই। সেকালের বৌদ্ধ বিহারের আধুনিক সংস্করণ এই সব ক্লাব, সঙ্ঘারামের আরাম তথা সঙ্ঘ দুই রয়েছে এতে।

অথচ হুবহু বিলিতী ব্যাপার, অফ ইণ্ডিয়াটুকু প্রক্ষিপ্ত। ক্রিকেট কথাটাও প্রক্ষিপ্ত না হোক, উৎক্ষিপ্ত। কারণ সেখানকার সভ্যেরা কদাচিৎ খেলোয়াড়, অধিকাংশই সামাজিকতার সুযোগসুবিধার দ্বারা আকৃষ্ট। কাজের সময় কাজ, ছুটির সময় ক্লাব, এই মহাতত্ত্ব জগতের প্রতি ইংলণ্ডের দান। পৃথিবীময় যার অনুকরণ হচ্ছে, ভারতে তার অনুকরণ মার্জনীয়।

চৌধুরী সুদীর্ঘকাল বম্বের নাগরিক। একটি ইংরাজ কোম্পানীর জেনারল ম্যানেজার। তথা পার্টনার। কলকাতা হলে এঁর মতো বড়ো সাহেব বোধ হয় বাংলা বলতেন না, কিন্তু বম্বের একটা বিশিষ্টতা হচ্ছে এখানকার স্বাধীনজীবীরা স্বাধীনচেতা। বিদেশীর সঙ্গে সমান হতে গিয়ে এঁরা স্বজাতির নাগালের বাইরে চলে যান না। পক্ষান্তরে পরদেশীর পরশ বাঁচিয়ে গদির উপরে লক্ষ্মীর বাহনটির মতো রাতদিন বসে থাকেন না।

চৌধুরীর ডিনারে এক বাঙালীর মেয়ে আমাকে চুপি চুপি প্রশ্ন করলেন আমার সহধর্মিণীর সীমন্ত রক্তিম কেন ?— আমি বললুম, ও যে সিঁদুর। তিনি

জানতে চাইলেন, সিঁদুর কেন? আমার ধারণা ছিল হিঁদুর সঙ্গে সিঁদুর এমন অবিচ্ছিন্ন যে, ভূভারতে কেউ নয় সে বিষয়ে অজ্ঞ। খোঁজ নিয়ে বোঝা গেল তিনি কোনো দিন বাংলা দেশে যাননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিস্ময় দূর হয় না। বাংলা দেশে না যান, হিন্দুস্থানে তো রয়েছেন। আমার বন্ধুরা ব্যাখ্যা করলেন যে, সীমন্তে সিন্দুর পশ্চিম ভারতের প্রথা নয়, হিন্দুর সঙ্গে ওর সম্বন্ধ প্রাদেশিক সীমান্তেই নিবদ্ধ। তাই তো! পশ্চিম ভারতে এ প্রথা নেই, দক্ষিণ ভারতেও না। উত্তর ভারত সম্বন্ধে নিশ্চিত নই। তবে এটা বঙ্গের বিশেষত্ব। উৎকলেরও। বোধ হয় আসাম ও মিথিলারও। এসব প্রদেশ চীনদেশের নিকটে বলেই কি? চীনদেশ থেকে খাঁটি সিঁদুর আসে বলেই কি? বলিদানের রক্ত কপালে মাখতে মাখতে সেই অভ্যাস থেকে এই অভ্যাস জন্মায়নি তো? তন্ত্রপ্রধান অঞ্চলে এর প্রাদুর্ভাব কি তন্ত্রপ্রভাবের সাক্ষী?

তার পরের দিন বিচারপতি সেন মহাশয়ের সদনে মরাঠী সাহিত্যিকদের আসরে আমার নিমন্ত্রণ। ক্ষিতীশচন্দ্র একদা রবীন্দ্রনাথের "রাজা" নাটকটি রাজভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। "বলাকা"র কয়েকটি কবিতার পদ্যানুবাদও তাঁর সুকৃতি। তাঁর আজকাল অবসর নেই, কিন্তু লেখার হাত এখনো আছে, চিঠিপত্রে ধরা পড়ে। তাঁর বাংলা লেখা তাঁর অন্তরঙ্গদের মনে এই জিজ্ঞাসা জাগায় যে, কেন তিনি এমন ক্ষমতার অনুশীলন করেন না? অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো যে রসপ্রবাহ তাঁর হৃদয় আর্দ্র করেছে, তাঁর আলাপ আলোচনাও সেই রসে সিক্ত। বিচারপতি হয়ে তিনি মথুরাপতি হননি, সব বয়সের ও সব অবস্থার মানুষ তাঁর কাছে অভয় পায়, পায় আন্তরিক অমায়িকতা।

অভ্যাগতদের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন মামা বারেরকর। অন্তস্থ ব। মহারাষ্ট্রে তাঁর নাটকনাটিকার খ্যাতি তাঁকে সর্বজনের মাতুলসম্পর্কীয় করেছে। তাঁর পিতৃদত্ত নাম মামা নয়। মামা বারেরকর, কাকা কালেলকর, দাদা ধর্মাধিকারী— এ ধরনের সার্বজনীন সম্পর্কসূচক নাম মহারাষ্ট্রেই চলে। কেবল সাহিত্যক্ষেত্রে নয়, রাজনীতিক্ষেত্রেও। নানা সাহেব, নানা ফর্দনবীশ, এসব নাম এখন ইতিহাসের পাতায়। মাধব শ্রীহরি অণে মহাশয়কে বাপুজী অণে বলা হয়।

এটি সম্ভব সে প্রদেশের পদবীগুলি মুখুয্যে বাঁড়ুয্যে ঘোষ বোসের মতো

সুলভ নয় বলে। বাংলা দেশের জনপ্রিয় লেখকদের মধ্যে অন্তত জন দুই চাটুয্যে, জন তিনেক মুখুয্যে, জনা পাঁচ ছয় বাঁড়ুয্যে ছিলেন ও আছেন। কাকেই বা মামা বলে ডাকি, কাকেই বা খুড়ো বলে? চাচা ইসলাম ও মামু আহমদ বললে কে কে সাড়া দেবেন? মরাঠী লেখিকারা পিতা ও পতির পদবি অম্লানবদনে আত্মসাৎ করেন। যথা কমলাবাই দেশপাণ্ডে। বাংলায় কিন্তু দেবীদের সংখ্যা তেত্রিশ কোটি না হোক তেত্রিশ তো বটেই। কা দেবী সর্বভূতানাং মাসীরূপেণ সংস্থিতা?

যা হোক, আমাদের মামা একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার। তাঁর সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে কথাবার্তা হলো। মামা বললেন, তাঁর প্রদেশে বাংলার মতো ব্যবসায়িক রঙ্গালয় নেই, যা আছে তা শখের। তাতে অভিনেত্রীর অভাব। মরাঠা মেয়েরা ইদানী সিনেমায় যোগ দিচ্ছেন, তাঁদের অনেকেই কুলাঙ্গনা ও বিদুষী। কিন্তু থিয়েটারে একজনও প্রবেশ করছেন না। মামা চেষ্টা করছেন অন্তত একটি শখের সম্প্রদায় গড়তে। তাতে মেয়েরাও থাকবেন। এ হোলো চার বছর আগের হালচাল। ইতিমধ্যে হাওয়া হয়তো বদলেছে। (ক্রমশ)

বাঁকুড়া

আত্মকথা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বছর ৩।৪ আগে আমার যুবক বন্ধুরা,— যথা, বুদ্ধদেব বোস, অজিত চক্রবর্তী, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আমাকে আমার আত্মকথা লেখবার জন্য পেড়াপিড়ি করেন। আমি তা'তে প্রথমতঃ রাজী হইনি; কারণ আমার জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যার উল্লেখ করলে পাঠকদের কাছে অসাধারণ বলে মনে হবে। শেষটা আমি নির্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হয়ে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ঘোষের নবপ্রকাশিত "রূপ ও রীতি" নামক একটি ক্ষুদ্র পত্রিকায় আত্মকথা লিখতে শুরু করি। ফণীন্দ্রনাথ বালিগঞ্জবাসী, এবং পূর্বে যাদের নাম করেছি, তাদের সকলের দলভুক্ত।

আত্মকথা লিখতে আরম্ভ করি অতি দুঃসময়ে। রবীন্দ্রনাথ তখন একটি ঘোর রোগে আক্রান্ত। পরে তিনি সে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠলেন। তারপর ১৯৪১ সালে উপর্যুপরি আমার জীবনে নানারকম দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল। প্রথমতঃ উক্ত সালের জুন মাসে আমার প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র কালীপ্রসাদ বিমানযুদ্ধে ইংলণ্ডে মারা যায়। তারপর ৭ই অগস্টে আমার জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তার কিছুদিন পরে ২রা অক্টোবর তারিখে আমার শাশুড়ী ৺জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, যাঁর আশ্রয়ে বাস করতুম, তিনিও ইহলোক ত্যাগ ক'রে চলে যান। তার বছর খানেক পূর্বে তাঁর একমাত্র পুত্র এবং আমার শ্যালক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর অপ্রত্যাশিতরূপে যন্ত্রণাদায়ক রোগভোগ ক'রে মারা যান। তিনি বয়সে আমার চেয়ে ছোট ছিলেন। তদবধি আমার শাশুড়ীর সম্পূর্ণ স্মৃতিবিলোপ ঘটে। এমন কি, আমাকেও তিনি দেখলে চিনতে পারতেন না। তার কিছুকাল পরে আমি কলকাতা ত্যাগ ক'রে, পৌষমেলার অব্যবহিতপূর্বে সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে চলে আসি— জাপানী আক্রমণের ভয়ে। এবং আজ পর্যন্ত এখানেই আছি।

মধ্যে গ্রীষ্মকালে দু'মাসের জন্য কলকাতায় ফিরে যাই। তারপর জুনের শেষাশেষি আবার চলে আসি।

আমি কলকাতা থাকাকালীন বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদনের ভার গ্রহণ করতে অনুরুদ্ধ এবং স্বীকৃত হই। এখন ভগ্নহৃদয়ে ভগ্নদেহে শান্তিনিকেতনে বসে গত শ্রাবণ মাস থেকে সেই কাগজের সম্পাদনা পাঁচজনের সাহায্যে, যথাসাধ্য সম্পন্ন করছি। ইতিমধ্যে গত শ্রাবণ পর্যন্ত "রূপ ও রীতি"তে আমার আত্মকথা মাসের পর মাস প্রকাশ করেছি। তারপর সে পত্রিকাও বন্ধ হয়ে গেল, আমার আত্মকথাতেও ছেদ পড়ল। লোকমুখে শুনতে পাই যে, সে কথা সম্বন্ধে কৌতূহল পাঠকসমাজে আজও আছে। তাই ভরসা ক'রে বিশ্বভারতী পত্রিকায় তার জের টানতে প্রবৃত্ত হলুম।

এক এক সময় ভাবি যে, আমি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ছেলে, কোন্ পদ্মাপারে আমার দেশ, আর এই ৭২ বৎসর বয়সে কোথায় উত্তর-রাঢ়ে অর্ধেক মরুভূমির দেশে ঘটনাচক্রে এসে আশ্রয় নিয়েছি!

আমি বুদ্ধদেব বোসের অনুরোধে তার কাগজে আত্মকথা যে কেন লিখিনি, তার একটা নাতিহ্রস্ব কৈফিয়ত প্রকাশ করি। তা'তে যতদূর মনে পড়ে, প্রথমে বলি যে, বাংলা সাহিত্যে আত্মকথা লেখার রেওয়াজ নেই। বঙ্কিম আমাদের নববঙ্গসাহিত্যে নানা বিষয়ে পথপ্রদর্শক, কিন্তু তিনি তাঁর আত্মজীবনী লেখেননি। সবপ্রথমে আমার যা বিশেষ ক'রে চোখে পড়ে, তা' হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। এ বই অতি চমৎকার বই। উক্ত প্রবন্ধে আমি বলি যে, এ বইয়ের ভাষাকে সাত্ত্বিকভাষা বলা যেতে পারে। তথাকথিত সাধুভাষায় লিখিত এইটি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ রচনা। কিন্তু এও রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত নয়,— তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার ক্রমবিকাশের ইতিহাস। যদিচ এর মধ্যে তাঁর বাল্যজীবনের মালমশলা অনেক পাওয়া যায়। তারপর কবি নবীন সেনের "আমার জীবন" প্রকাশিত হয়। এ বইখানি সেন মহাশয়ের, জীবনচরিত হলেও একখানি নভেল-বিশেষ। আর সেন মহাশয় হচ্ছেন এ নভেলের একমাত্র নায়ক।

আমি ছেলেবেলায় একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের আত্মজীবনী পড়ি; তার দু'-চার কথা আমার এখনো মনে আছে। তিনি লিখেছেন তাঁর বাল্যজীবনে—

দেলদুয়ারে হচ্ছে জ্বরের মালখানা
বাবুরা দিচ্ছে সাগুদানা—

আর তাঁর বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে, তিনি কর্তার ঘোড়া দেখলে ঘোমটা টানতেন। তারপর অন্য একটি মহিলার লিখিত আর একখানি আত্মজীবনচরিত পড়েছি। সেটি ঢাকা জেলার জনৈক ব্রাহ্মণকন্যালিখিত কেশববাবুর সমাজের ব্রাহ্মদলভুক্ত হবার এবং তার সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আনুপূর্বিক ও মনোজ্ঞ বিবরণ। এর থেকে আমার মনে হয় যে বাংলা ভাষায় আত্মজীবনী লেখেন শুধু মেয়েরা,— তাও পূর্ববঙ্গের।

উক্ত প্রবন্ধে আরও বলি যে, পাঁচ থেকে শুরু ক'রে সত্তর বৎসর পর্যন্ত জীবনের অধিকাংশ স্মৃতি বিলুপ্ত হয়েছে। এখন সেই সব লুপ্ত স্মৃতির পুনরুদ্ধার ক'রে আত্মজীবনী লিখতে হলে Goethe-র মত তার নাম দিতে হয় "সত্য ও মিথ্যা"। তবে আমার মনে হয় যে, নিজের জীবনে অতীত ব'লে কিছু নেই। যা আছে, তা একটি প্রকাণ্ড বর্তমান। যদিচ বর্তমান ব'লে একটি মুহূর্তও নেই। যাকে আমরা বলি বর্তমান, সে হচ্ছে অতীত এবং ভবিষ্যতের একটি কাল্পনিক সন্ধিক্ষণ মাত্র।

আত্মকথা লিখতে আরম্ভ ক'রে অবধি যে সূত্র ছিঁড়ে গিয়েছিল, তাকে আবার জোড়া দিতে একটা মস্ত গিঁঠ দিতে হল। এখন থেকে যা লিখব, এই গিঁঠটি হচ্ছে তার প্রস্থানভূমি।

"রূপ ও রীতির" সম্পাদক আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যে, বিলেত যাবার পূর্ব পর্যন্ত যেন আমি এক পর্যায়ে লিখি।

এম. এ. পাশ করবার পর আমি প্রায় দু'বৎসর বেকার বসেছিলুম। কিছুদিন পর আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে, State Scholarship নেব কি না, তাই জানবার জন্য একখানি পত্র পাই। এ বৃত্তি তারই প্রাপ্য যার বয়স পঁচিশ বৎসরের কম। আমি উত্তরে লিখি যে, আমার বয়স পঁচিশের দু'এক মাস বেশি। এ কথা লেখার দরুন রেজিস্ট্রার ম্যান্ সাহেব আমার উপর বিরক্ত হন। আমি তাঁর অতিশয় প্রিয় ছাত্র ছিলুম। এর পর বহরমপুর কলেজের প্রিন্সিপালের চাকরি নিতে রাজী কি না জানবার জন্য তিনি আমাকে চিঠি লেখেন। কিন্তু আমি রাজী হই নি। তার কিছুদিন

পর তিনি আমাকে কুচবেহার কলেজের প্রিন্সিপালের পদগ্রহণের প্রস্তাব করে লেখেন ; তার বেতন মাসিক ৫০০ টাকা। দাদা আমাকে এ চাকরি নিতে পেড়াপিড়ি করেন। কিন্তু আমি ইতস্ততঃ করতে লাগলুম। বাবা তখন কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন। দাদা তাঁকে এ প্রস্তাবের কথা বলেন। বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার এ চাকরি নিতে আপত্তি কি ?—আমি বললুম, পরের চাকরি করতে আমার মন সরে না। বাবা বললেন, প্রমথ যখন বিবাহ করেনি, তখন তার অনিচ্ছায় আমি তাকে পরের চাকরি নিতে বাধ্য করতে চাইনে। তাই ম্যান্ সাহেবের এ প্রস্তাবও আমি অগ্রাহ্য করলুম।

কলেজ থেকে বেরিয়েই ৫০০৲ মাইনের চাকরি কেন যে আমি প্রত্যাখ্যান করলুম, তা' বলতে পারিনে। সম্ভবতঃ কর্মবিমুখতাই এর প্রকৃত কারণ।

তারপর আমি জনৈক প্রসিদ্ধ অ্যাটর্নি আশুতোষ ধরের আফিসে articled clerk হই। এবং বিলেত যাওয়া পর্যন্ত নামমাত্র সেই আফিসেই কাজ করি।

আমি প্রথম থেকেই অ্যাটর্নির আফিসের চেহারা দেখেই ভড়কে যাই। এত ধুলো, আর র‍্যাকের উপর এত মোটা মোটা ও এত জীর্ণ খাতা ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। আইন হয়তো বই প'ড়ে শেখা যায় ; কিন্তু আইনের কাজকর্ম কি ভাবে চলে, তার অভিজ্ঞতা এই আফিস থেকেই আমি অর্জন করি। আর নানারকম লোককে দেখি। তারা প্রায় সকলেই বাঙাল এবং সম্পত্তি কেনাবেচা ও বন্ধক দেবার দালাল। তাদের ভিতর কেউ সৎলোক নয়, এবং নানারকম জুয়োচ্চুরি করতে প্রায় সকলেই প্রস্তুত। এমন কি, একের সম্পত্তি অন্যের বলে বন্ধক দিতেও পিছপাও নয়। আমি এই আফিসের দলিল ঘাঁটতে ঘাঁটতে আবিষ্কার করি যে, কলকাতার কোনো বড় বাড়ি দু'তিন পুরুষের বেশি এক পরিবারের সম্পত্তি থাকে না। আদি মালিকরা প্রায় আর্মানী, ইহুদী বা ইংরেজ। আর আমি অনেক ধনী ছোক্‌রাকে দেখেছি, যারা পাঁচ ছয় বছরের ভিতর পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা কাপ্তেনি করে উড়িয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়েছে। অ্যাটর্নির আফিসে কাজ ক'রে idealist হওয়া যায় না। এই কারণেই বোধহয় আমি idealist লেখক নই।

সে যাই হোক্, আমি এম. এ. পাশ করবার পর নানাস্থানে, যথা দার্জিলিং, আসানসোল, সীতারামপুরে ঘুরে বেড়াই। দার্জিলিং যাই বরফ দেখবার জন্য, আর সীতারামপুর প্রভৃতিতে ছোটখাটো কয়লার খনি দেখবার জন্য। অথচ বেকার সময়টাতে আমি কতকটা স্বশিক্ষিত হই। এই সময় আমি আবার সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করি। ইস্কুলে মুখস্থ করেছিলুম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা ও কলেজে ব্যাকরণকৌমুদী। এ দু'খানি ব্যাকরণের যে অংশ আমার মনে ছিল, তাতে সংস্কৃত পাঠের বিশেষ সাহায্য হয়েছিল।

আমি Manzato নামক জনৈক ইতালীয় violinist-এর কাছে ইতালীয় ভাষা শিখতেও আরম্ভ করি। তিনি লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানতেন না। সুতরাং তাঁর স্ত্রী আমাকে পড়াতেন। মহিলাটি ইংরিজী জানতেন না। ফলে আমি ইতালীয় ভাষায় কথোপকথন করতে বাধ্য হই।

এই সময়ে আমি দু'বার মধ্যপ্রদেশে রাইপুর যাই। আমার ভাগ্নী প্রিয়ম্বদা দেবীর স্বামী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানকার একজন বিশিষ্ট উকিল ছিলেন। একবার তাঁদের বাড়ীতে একমাস থাকি, আর একবার দু'দিন।

ইতিমধ্যে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজশাহী যাই। লোকেন পালিত তখন সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সম্ভবতঃ দিন পনেরো আমরা দু'জনে তাঁর অতিথি হয়ে থাকি। পরে আমরা নাটোর ফিরে আসি। আমার উদ্দেশ্য ছিল আমার নিজগ্রাম হরিপুরে যাওয়া, এবং রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য কলকাতায় ফিরে যাওয়া। নাটোরে বোধহয় আমরা দিন সাতেক থাকি। নাটোরের মহারাজার সঙ্গে কিছুদিন পূর্বে কলকাতায় আমার পরিচয় হয়। আমি একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী বসেছিলুম, এমন সময় চাকর এসে খবর দিলে যে, দুটি বাবু এসে হলঘরে বসে আছেন। দাদা বল্লেন— প্রমথ, দেখত কে। আমি ঘরে ঢুকে দেখি যে, একজন অতি সুপুরুষ এবং তাঁর বেশভূষা অতি পরিপাটি। তিনিই হচ্ছেন নাটোরের ভূতপূর্ব মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন রাজশাহীর উকিল অক্ষয় মৈত্র, "পলাশীর যুদ্ধে"র লেখক। আমি আর মহারাজা উভয়েই প্রথম দর্শনে পরস্পরের love-এ পড়ে যাই। এবং সেইদিন থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমরা অতি অনুরক্ত এবং

অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলুম। মহারাজা ছিলেন দূরসম্পর্কে আমার আত্মীয়। এবং আমাদের উভয় পরিবারের বহুকাল থেকে অতিশয় ঘনিষ্ঠতা ছিল। বাবার শৈশবে মাতৃবিয়োগ হয়। তাই তিনি বাল্যকালে তাঁর মাসি মহারানী কৃষ্ণমণির কাছে নাটোরে লালিত পালিত হন। এবং নাটোররাজের যখন ভগ্নদশা উপস্থিত হয়, তখন আমার ঠাকুরদাদা ও মহারানী কৃষ্ণমণির ভ্রাতা, এই দুই শালা-ভগ্নীপতিতে মিলে তাঁদের সম্পত্তি রক্ষা করবার চেষ্টা করেন। এসব আমার শোনা কথা। তবে আমার ঠাকুরদাদা যে এই ব্যাপারে নাটোরে জেলে গিয়েছিলেন, এ কথা সত্য। এই সব কারণেই নাটোর-রাজপরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের সম্পর্ক এত দৃঢ় হয়েছিল। দাদা বিলেত যাবার পর রানী কৃষ্ণমণির পুত্রবধূ ও বাবার মাতৃস্থানীয়া রানী শিবেশ্বরী, দাদাকে বিলেত থেকে ফিরিয়ে আনতে ও প্রায়শ্চিত্ত করতে বাবাকে আদেশ করেন। বাবা তাতে অস্বীকৃত হওয়ায়, তিনি আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তখন আমি হেয়ার ইস্কুলে এণ্ট্রাস ক্লাসে পড়ি। তারপর থেকে আমাদের দুই পরিবারের পরস্পরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। আর আমি এম. এ. পাশ করবার পর যুবক জগদিন্দ্রনাথ রায় নিজে থেকে আমাদের বাড়ীতে এসে সেই ভাঙা সম্পর্কে আবার জোড়া লাগান।

আমরা রাজশাহী যাবার অব্যবহিত পরে মহারাজা সেখানে এসে উপস্থিত হন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা অক্ষয় মৈত্র এবং তিনি লোকেন পালিতের বাড়ীতে আসতেন, আমাদের সঙ্গে গল্পসল্প করতে। এই সময়ে আমরা আবিষ্কার করি যে, মহারাজার ভদ্রতা অসাধারণ। ভূভারতে এমন জিনিস নেই, যা নিয়ে আমরা আলোচনা না করতুম। সে আলোচনায় মহারাজাও যোগ দিতেন। এই সূত্রে আমরা আরও আবিষ্কার করি যে, মহারাজা অতি বুদ্ধিমান। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের শরীর খুব ভাল ছিল না। তিনি সন্দেহ করতেন যে, তাঁর হৃদ্‌রোগ হয়েছে। আমি সে ভয় কখনো পাইনি। আমার মনে হতো সেটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ mood মাত্র, যাকে তিনি হৃদ্‌রোগ ব'লে ভুল করতেন।

সে যাই হোক, আমাদের এই সান্ধ্যসম্মিলনে লোকেন আর আমি ঘোর তর্ক করতুম। তার কারণ, লোকেনের সঙ্গে আমার কি সাহিত্য, কি আর্ট

কি ফিলজফি,— কোনো বিষয়েই মতের মিল ছিল না। লোকেন মধ্যে মধ্যে Mill's Examination of Hamilton আমাদের পড়ে শোনাতে চেষ্টা করত ;— যা আমার অসহ্য বোধ হত, এবং রবীন্দ্রনাথেরও তাই। আমি একটি কথায় তার Mill পড়া বন্ধ করে দিই। আমি একদিন তাকে জিজ্ঞাস করি— Mill কে? তার উত্তরে সে বলে,— Mill কে তুমি জান না? আমি উত্তর করি, এর নামও কখনো শুনিনি। লোকেন বললে, তাহলে তোমার কাছে Mill পড়া ব্যর্থ। আমার একথা শুনে রবীন্দ্রনাথ ঈষৎ হাস্য করলেন। এর পর লোকেনের Mill পড়া বন্ধ হ'ল। রবীন্দ্রনাথ রাজশাহীতে কোনোরূপ লেখাপড়া করতেন না। কিন্তু মনে মনে একখানি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করতেন। সে বইয়ের নাম পঞ্চভূতের ডায়ারি; যাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় এবং আমাদের তর্কের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। লোকেনের সঙ্গে তর্কে আমার মতামতের অনুকূল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং মহারাজ।

রাজশাহী থেকে নাটোর ফিরে আসবার পর দাঁতের ব্যথায় রবীন্দ্রনাথ অতি কাতর হয়ে পড়েন। এবং মহারাজ যদু লাহিড়ী নামে তাঁর একটি আমলাকে তাঁর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করেন। যদু তিন দিন তিন রাত অবিরত তাঁর শুশ্রূষা করে। রবীন্দ্রনাথ ভালো হয়ে উঠলে তিনি ও আমি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করবার সংকল্প করি। কারণ ইতিমধ্যে আমি বাড়ি থেকে চিঠি পাই যে, হরিপুরে ওলাউঠার প্রকোপ হয়েছে, আমার সেখানে যাওয়া উচিত নয়। এম. এ. পাশ করবার পর যে দু'বৎসর আমি বাড়ি বসেছিলুম, সে দু'বৎসরে আমি নানারকম অভিজ্ঞতা অর্জন করি। ছিলুম কলেজের ছোক্‌রা, হয়ে উঠলুম একটি সামাজিক যুবক। আমি ছেলেবেলা থেকেই সংগীতপ্রিয় ছিলুম। মহারাজা ছিলেন যথেষ্ট সংগীতজ্ঞ, ও চমৎকার মৃদঙ্গ এবং বাঁয়াতবলা-বাজিয়ে। আমি মহারাজার সঙ্গে তাঁর সমবয়স্থ কলকাতার বহু লোকের পরিচয় করিয়ে দিই। এবং তিনিও বাংলার বহু পাড়াগেঁয়ে বড় জমিদারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। ফলে বাংলাদেশের idle rich দলের হালচাল সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল হই। মহারাজ এ দলের ভিতর unique ছিলেন। কথাবার্তায় তিনি ছিলেন অতি সুরসিক, এবং repartee-তে সিদ্ধহস্ত, একরকম ধনুর্ধর বললেই হয়। আমি তাঁর সঙ্গে এ বিষয় আপোষে তলোয়ার খেলতুম।

কিন্তু আমরা পরস্পরের উত্তর-প্রত্যুত্তরে কখনো পরস্পরকে আঘাত করিনি। এর থেকে যেন কেউ মনে না ভাবেন যে, আমি সোজা কথা বাঁকা করে বলতে মহারাজার কাছে শিখেছি। আমি আসলে কৃষ্ণনাগরিক। আমি অল্প বয়স থেকেই কথার মারপ্যাঁচ কা'কে বলে তা জানতুম।

আমরা রাজশাহী গিয়েছিলুম বোধহয় শীতকালে। তারপর গ্রীষ্মকালে তৃতীয়বার দার্জিলিং যাই, আর ৩।৪ মাস সেখানে থাকি। সঙ্গে ছিলেন বৌঠান (প্রতিভা দেবী), আমার দিদি (প্রসন্নময়ী দেবী) এবং আমার একটি পিসতুতো ভাই প্যারীমোহন সান্ন্যাল। এক মাস আমি একরকম ঘোড়ার উপরেই ছিলুম। বর্ধমান স্টেটের ম্যানেজার ফণী মুখুজ্যের ছুটি ঘোড়া ছিল; একটি স্টেটের, অপরটি তাঁর নিজস্ব। একটিতে চড়তেন ফণী, আর একটিতে আমি। আমরা দুজনে সকালসন্ধ্যা ঘোড়া দাবড়ে ঘুরে বেড়াতুম। কখনো যেতুম সিঞ্চল, কখনো যেতুম দার্জিলিঙের সন্নিকট কোন-না-কোন চা-বাগানে। সে সব জায়গায় থাকত অসংখ্য জোঁক। আমাদের পায়ে পট্টি জড়ানো থাকত, কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে দেখতুম পট্টির উপরেও জোঁক ঝুলছে। আমি ভাল ঘোড়সওয়ার ছিলুম না, কিন্তু ঘোড়া থেকে অদ্যাবধি কখনো পড়িনি। তার একটি কারণ আমার শরীর ছিল হাল্কা, আমি জিনের উপর শরীরের balance রাখতে পারতুম। দার্জিলিঙে ঘোড়ায় চড়া বোধহয় নিরাপদ। আমি পরে অসম্ভব স্থূলকায় বাঙালী ভদ্রলোকদের ভুটিয়া টাট্টু ঘোড়ায় যাতায়াত করতে দেখেছি। সে যাত্রায় প্যারীদাদা আমাদের সঙ্গে একটি টাট্টুতে চড়ে রঙ্গিত যান। রঙ্গিত দার্জিলিং থেকে বোধহয় ১০।১২ মাইল দূরে, ও আগাগোড়া ওৎরাই। অবশ্য তাঁর সইস ঘোড়ার লেজ ধরে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়চ্ছিল। তিনিও নিরাপদে রঙ্গিত নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছলেন। রঙ্গিতের উপর সেকালে দড়ির কিম্বা বেতেমোড়া একটি ঝোলানো ব্রিজ ছিল, যেটি পার হয়ে সিকিমে যাওয়া যেত। সিকিমের মেয়েরা দেখতে অতি সুন্দর।

এবার দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে অল্পদিনের ভিতর বিলেত যাই।

শ্রীনিকেতন*

শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশের একটি নিভৃত অনুর্বর ভূমিখণ্ডে যিনি একদা শ্রী ও লক্ষ্মীর আসন প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেছিলেন, এই গৈরিক মাটির বুকের ভিতর থেকে যিনি সোনার ফসল ফলাবার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং সুদীর্ঘ দিনের কর্মসাধনায় সেই স্বপ্নকল্পনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করেছিলেন, এখানে আপনাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সকলের আগে সেই প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করি। সত্য বলতে কি, বাংলাদেশের সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, বিশেষভাবে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের সঙ্গে তাঁর স্মৃতি এমন অচ্ছেদ্যসম্বন্ধে যুক্ত যে, আমাদের বিশেষত এখানকার কোনো উদ্যোগ-অনুষ্ঠানই যে তাঁকে ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে, একথা এখনও মন সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। তবু; মহাকালের মুষ্টিচিহ্ন এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে তাহাকে স্বীকার না করেও উপায় নেই! সেই স্বীকৃতি মনে রেখে এবং কবিগুরুর ধ্যান ও আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করে আজকের এই সাংবৎসরিক শুভকর্মে যেন আমরা প্রেরণা লাভ করতে পারি।

এই শুভকর্মে পৌরোহিত্য করতে আহ্বান করে আপনারা আমাকে যে-সম্মান দান করেছেন তার জন্য আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বহুদিন দূর থেকে আপনাদের এই নীরব নিভৃত কর্মসাধনার কথা শুনে এসেছি; কবির পল্লীশ্রী, সমাজশ্রীর কল্পনার বাস্তব রূপান্তরের এই সুকঠিন প্রয়াসের ইতিহাস কানে এসে পৌঁছেছে; আজ তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবার যে সুযোগ পেলাম, তার জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের এই দুর্গত শ্রীহীন নিরানন্দ দেশে আপনারা যে লক্ষ্মীর আসন প্রতিষ্ঠা করেছেন, শ্রী ও আনন্দ ফিরিয়ে আনবার প্রয়াস করেছেন,—দেশে এমন হৃদয়হীন, আশাহীন, কল্পনাবিহীন কে আছেন এর প্রতি যাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ নেই? দেশের ও দশের জাগ্রত চেষ্টা, সহায়তা ও সমর্থনে আপনাদের কর্মসাধনা জয়যুক্ত হউক, এই প্রার্থনা করি। আমার ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে যদি আমি আপনাদের কোনো কাজে লাগতে পারি, আমি তৃপ্ত ও কৃতজ্ঞ হব, একথা কি বলার অপেক্ষা রাখে!

একদিন রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের ইতিহাস থেকে এ সত্য উদ্‌ঘাটন করেছিলেন যে, এদেশের প্রাণকেন্দ্র রাষ্ট্র ও রাজশক্তির মধ্যে নয়, সে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত আমাদের সমাজের মধ্যে। রাষ্ট্র ও রাজশক্তি বারবার ভেঙে পড়েছে, বারবার তার প্রভাব নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, কিন্তু তা আমাদের চিরবহমান গ্রাম্য সমাজকে স্পর্শও করতে

* গত ২৩শে মাঘ শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে সভাপতির অভিভাষণ।

পারেনি; রাষ্ট্র ও রাজশক্তির পতনেও সমাজের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগেনি। গ্রামের কৃষকের কুটির থেকে নগরের অট্টালিকা পর্যন্ত আমাদের সমগ্র জীবনকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধারণ করে রেখেছিল আমাদের গ্রাম্যসমাজ। ধর্ম ও অর্থের যে সামঞ্জস্যবিধানের উপর এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে-আদর্শ ছিল এই সমাজের পশ্চাতে, সেই বিধান ও আদর্শ একদিন কবির চিত্তকে আকর্ষণ করেছিল। স্বদেশী যুগে বাংলাদেশে যখন নবজীবনের জোয়ার এল, তখন তিনি ইতিহাসের এই শিক্ষাকে নিজের কল্পনায় সঞ্জীবিত করে "স্বদেশী সমাজ" প্রতিষ্ঠার এক বিরাট আয়োজন করেছিলেন। একটা প্রাথমিক পরিকল্পনা এবং কর্মপদ্ধতিও তিনি দেশের সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, রাজা ও রাষ্ট্র আমাদের বিদেশী, এ কথা সত্য সন্দেহ নেই; দেশের ও দশের কল্যাণে তার স্বার্থ নেই, মনও নেই; কিন্তু সমাজ আমাদের নিজের, আমাদের সমাজ কখনো রাজার শাসন স্বীকার করেনি; বরং এক সময়ে রাজাকে এবং রাষ্ট্রকে নিজের শাসন মানিয়েছে; সেই সমাজ গড়ে তুলবার ভার আমাদের নিজেদের হাতে, সেখানে আমরা রাজা বা রাষ্ট্রনির্দেশ মানব না। এ কথাও তখন তিনি বলেছিলেন, এই সমাজের প্রাণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত গ্রামে, নগরে নয়, যেখানে রাজা ও রাষ্ট্রশক্তি তাদের প্রতাপের ধ্বজা তুলেছে সেই নগরজীবনের মধ্যে নয়। তাঁর বক্তব্য নিয়ে তখন সেই উৎসাহ-উদ্দীপনার দিনে করতালির অভাব হয়নি; কিন্তু সেই পদ্ধতি ও পরিকল্পনা নিয়ে কর্মরূপান্তরের সূচনা তখনও দেখা যায়নি। তারপরেও বহুদিন এ বিষয়ে কেউ উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন নি। আজ কবির "স্বদেশী সমাজ"-এর পরিকল্পনা গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে!

কিন্তু কবি নিজে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁর অনেক সাধনার ইতিহাসই স্বতন্ত্র, নিঃসঙ্গ, একক সাধনার ইতিহাস; এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দেশ তাঁর রচিত কল্পনা ও পদ্ধতি গ্রহণ করেনি, কিন্তু তিনি তা কখনও পরিত্যাগ করেননি, এইটেই উল্লেখ করবার মতন। জমিদারির কাজে তাঁকে বহুদিন নদীবহুল পূর্ব ও উত্তর বাংলার নানা জায়গায় নৌকায় ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। বাংলা দেশ তখন কবির কাছে তার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেছিল; সেই সময়ে তিনি দেশের একটি রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন— রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে সে-রূপ কিছু কিছু দেখেছেন। কিন্তু কর্মের ভিতর দিয়েও কবি সে-রূপ কিছু কিছু ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। হয়তো সে-প্রয়াস অস্ফুট ও ক্ষীণ, কিন্তু যত ক্ষীণ ও অস্ফুটই তা হোক, তার পিছনে একটা আদর্শ ছিল, প্রয়াসের একটা আন্তরিকতা ছিল। দুঃখের বিষয়, তার সঙ্গে আমাদের দেশবাসীর পরিচয় খুব নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ নয়। সেই সময় তিনি জমিদারির একাধিক জায়গায়, একাধিক বার চেষ্টা করেছিলেন, বর্তমানের নানা প্রয়োজন ও নানা পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে আমাদের পল্লীসমাজের শ্রী ও সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনতে; তার জন্যে তিনি অনেক আর্থিক

ক্ষতি ও অন্যান্য অসুবিধা স্বীকার করেছিলেন। তাঁর এই সব প্রয়াস আজও বাংলা দেশে অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত। যাই হোক, এই প্রয়াসের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। নানা কারণেই তা দীর্ঘ আয়ু ও ব্যাপ্তি লাভ করতে পারে নি। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করা ভুল হবে, পল্লীসমাজের শ্রী ও সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনবার যে-কল্পনা একদিন তাঁর চিত্তকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তিনি তা বিস্মৃত হয়েছিলেন।

বেশ কিছুদিন পর যখন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় ধীরে ধীরে বিশ্বভারতীতে বিবর্তিত হবার সূচনা দেখা গেল এবং বীরভূমের এই প্রান্তরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ উত্তর জীবনের বাস ও কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন এবং এই আশ্রমকে ঘিরেই তাঁর দেশ ও সমাজগত মনন-কল্পনার রূপায়ন আরম্ভ হল, তখন আবার যৌবনের সেই স্বপ্নকল্পনা মনকে অধিকার করল। সুরুল গ্রামটিকে কেন্দ্র করে ইতিপূর্বেই কিছু কিছু চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল, বিশেষভাবে স্বর্গত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার এবং কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের সহযোগে; কিন্তু দেশলক্ষ্মীর যে শ্রী ও আনন্দের রূপ তিনি কল্পমানসে দেখেছিলেন, তার একটি স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ রূপভূমিকা প্রতিষ্ঠার সুযোগ এ পর্যন্ত তিনি পাননি। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিকেতনে সেই রূপভূমিকার প্রতিষ্ঠা হল। শ্রীনিকেতনের পশ্চাতে আমাদের পল্লীশ্রীর সমাজশ্রীর সৌন্দর্য ও আনন্দের সেই কবিকল্পমানস সর্বদা ক্রিয়াশীল। যে দৈন্যময় ও নিরানন্দ জীবন তিনি এই পরাধীন দুঃখাপহত দেশে দেখেছিলেন, যে পরনির্ভরতা যে দুর্বলতা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন, তারই প্রতিকার তিনি খুঁজেছিলেন এই পল্লীসমাজ ও পল্লীশ্রীর পুনরুদ্ধারের মধ্যে, সঙ্ঘশক্তির উদ্বোধনের মধ্যে। শ্রীনিকেতন এই সন্ধানের ভূমিকা মাত্র। এখানে যে হলকর্ষণ-উৎসবের সূচনা তিনি করেছিলেন, যে পল্লীমেলার প্রবর্তন করেছিলেন, নানা দেশী বিদেশী, প্রাচীন ও আধুনিক উপায় ও উপকরণের সাহায্যে কৃষিকে সঞ্জীবিত করতে ও সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের জীবনে আনন্দোদ্বোধনের চেষ্টা করেছিলেন তার সব কিছুর পশ্চাতে, সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের, সমস্ত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে যে শ্রী ও আনন্দের কল্পাদর্শ রয়েছে একথা কর্মের মোহে আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই। শ্রীনিকেতন মামুলী প্রথাগত agricultural farm নয়, কিংবা co-operative society মাত্রই নয়; প্রাণহীন অনুষ্ঠান বা কর্মপদ্ধতির স্থান এখানে নেই, কর্মতালিকা বা বার্ষিক বিবরণীতে কর্মসাফল্যের পরিমাণ দেখানোই শ্রীনিকেতনের উদ্দেশ্য নয়, অন্তত কবির সে কল্পাদর্শ ছিল না বলেই আমার ধারণা।

এ কথা সহজেই বলা যায় দেশের ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য পুনরুদ্ধারের সমস্যা এতই বৃহৎ, এত সর্বব্যাপী যে এই ধরনের ক্ষুদ্র এবং আদর্শমূলক চেষ্টা সে-সমস্যাকে স্পর্শও করতে পারে না। বৃহৎ ভাবে দেশব্যাপী কোনো চেষ্টা করতে না পারলে এ ধরনের জাতীয় সমস্যার কোনো সমাধানই করা যায় না। এই জাতীয় যুক্তি আমরা বারবার শুনেছি এবং এ-ও

জানি এই ধরনের যুক্তির আড়ালে আমাদের বহু সমস্যা চাপা পড়ে আছে, বহু প্রয়াস অনারব্ধ রয়ে গেছে। এই ধরনের যুক্তিতে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল না। তিনি একথা স্থির জেনেছিলেন, দৃঢ় বিশ্বাসে এবং অন্তরের প্রেরণা নিয়ে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ কেন্দ্রই নিজের শক্তি-প্রয়োগের যোগ্য ক্ষেত্র। যত ক্ষুদ্র যত সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ হোক সে ক্ষেত্র, তাতে শক্তির অপমান নেই; অপমান সেই শক্তির অপচয়ে, সর্বোপরি তার অপব্যবহারে। শ্রীনিকেতনের কর্মপরিসর ক্ষুদ্র তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র পরিসরে একটা বৃহৎ আদর্শ রূপলাভের চেষ্টায় ব্যাকুল, এই পরিসরের মধ্যে প্রচেষ্টার একটা আন্তরিকতা, বৃহৎ একটা সমস্যাকে তার স্বরূপে দেখবার একটা সমগ্র দৃষ্টি যে রয়েছে, এইটেই লক্ষ করবার।

আজ দেশের রাষ্ট্রশক্তি সর্বব্যাপী। যে দিকে তাকানো যায়, সেই দিকেই রাষ্ট্রের সুদীর্ঘ বাহু বিস্তৃত। নানা ঐতিহাসিক, নানা অর্থনৈতিক কারণে আমাদের সমাজের সেই প্রভুত্ব ও প্রতাপ আর নেই; রাষ্ট্রনিরপেক্ষ সমাজের সেই স্বাধীনতা আজ আর নেই। বিদেশী অথবা স্বদেশী রাষ্ট্রকে একধারে রেখে, তার সর্বব্যাপী অস্তিত্ব ও প্রতাপকে অস্বীকার করে সমাজসংগঠন, এক কথায়, স্বদেশী সমাজ গড়ে তোলা আজ বোধ হয় আর সম্ভব নয়। একেবারে রাষ্ট্রনিরপেক্ষ হয়ে পল্লীশ্রীর পুনরুদ্ধারও বোধ হয় আর সম্ভব নয়। যে-সমাজ ছিল আমাদের প্রাণকেন্দ্র, সেই সমাজকেও আজ সহস্র বন্ধনে বেঁধেছে সহস্রবাহু রাষ্ট্র। কাজেই আজ রাষ্ট্রের প্রায় আমূল পরিবর্তন ছাড়া এবং সেই পরিবর্তিত ও বিবর্তিত রাষ্ট্রের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া যে কল্পাদর্শ ছিল কবির মনে তার সম্পূর্ণ রূপায়ন বুঝি সম্ভব হবে না। তবু আমি মনে করি, যে রাষ্ট্র ও রাজশক্তির অধীনে আমরা বাস করি, এই পল্লীশ্রী ও সৌন্দর্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় তাদের সজাগ রাখার জন্যে, তাদের চিত্তে চেতনা সঞ্চারের জন্যে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। দেশের সম্মুখে শ্রীনিকেতনের কল্পাদর্শ তুলে ধরে রাখার প্রয়োজন আছে। দেশজোড়া দৈন্য ও নিরানন্দের অন্ধকারের মধ্যে কোথাও কোথাও মাটির প্রদীপটি যদি অনির্বাণ শিখায় দীপ্যমান না থাকে, তাহলে আমরা আশার আলো দেখব কোথায়, কোন্ উৎস থেকে সঞ্জীবনরস আহরণ করব, উদ্দীপনা লাভ করব? কর্মসাফল্যের পরিমাণ অন্যত্র হয়তো বেশী, অন্য প্রতিষ্ঠানে হয়তো কর্মরূপও অন্যপ্রকার, কিন্তু কল্পনা ও আদর্শের এমন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ প্রকাশ শ্রীনিকেতনের বাইরে আর কোথায় আছে এই বাঙলা দেশে?

এ কথা ভেবে দুঃখ ও লজ্জা হয়, এদেশের রাষ্ট্র ও রাজশক্তি দেশের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগত কর্ম সাধনার প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে সজাগ নয়, সহায়কও নয়; এবং শ্রীনিকেতনে আপনাদের কর্মসাধনার পশ্চাতে যাঁর অর্থানুকূল্য আপনাদের কর্মে ইন্ধন জুগিয়েছে তিনি একজন মহানুভব বিদেশী— আমি শ্রীযুক্ত এল. কে. এল্‌ম্‌হার্স্টের (L. K. Elmhirst) কথা বলছি। তিনি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র সন্দেহ নেই; কিন্তু তাঁর আনুকূল্য আমাদের দৈন্য ও লজ্জাকেই

বৃহৎ ও মহৎ কল্যাণাদর্শে আমাদের অবিশ্বাসকেই আরো প্রকট করেছে। এ সম্বন্ধে দেশ সচেতন হউক, দেশের বিত্তশালী সম্প্রদায় আরো মুক্তহস্ত হউন, তাঁরা আমাদের চিত্তদীনতার লজ্জা হতে আমাদের মুক্ত করুন, এই প্রার্থনা করি।

এই সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে যে-সব অনুষ্ঠানের উদ্যোগ হয়েছে, তার দুটি অঙ্গের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কৃষি ও শিল্পের যে শ্রী ও সৌন্দর্যের দিকে আপনারা দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তার দিকে সহজেই আমাদের সকলের চোখ পড়বে। কিন্তু আপনারা যে সমবায়সমিতি গড়ে তুলেছেন এবং তাকে কেন্দ্র করে পল্লীসমাজকে যে ভাবে পুনর্গঠনের চেষ্টা করছেন, তা আমি নানাদিক থেকেই উল্লেখ-যোগ্য মনে করি। সমবায়সমিতি বাংলাদেশে নানা জায়গায়ই রয়েছে এবং সরকারী বাৎসরিক রিবরণীতে তাদের সুদীর্ঘ কর্মতালিকা পাঠ করে আমরা এক ধরনের আত্মপ্রসাদও লাভ করি, কিন্তু বেশির ভাগ সমিতিই প্রাণহীন। তারা যন্ত্রমাত্র। এর একমাত্র কারণ এদের পশ্চাতে কোনো কল্পাদর্শের প্রেরণা নেই। কিন্তু আপনাদের সমিতির সঙ্গে আপনাদের সামাজিক পরিবেশের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা, আত্মীয়তা লক্ষ করে আমি তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হয়েছি। বস্তুত যন্ত্র পরিচালনা করতে গিয়ে আমরা অনেক সময়ই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের কথা, তার সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কথা ভুলে যাই। রবীন্দ্রনাথ বারবার চেয়েছিলেন মানুষের সঙ্গে মানুষের এই সম্বন্ধের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে, প্রাণহীন যন্ত্রের ভিতরে ফেলে তাদের দুঃখ-দুর্গতির, তাদের সুখ ও ঐশ্বর্যের বিচার না করতে। কেবলমাত্র অর্থসাহায্য করে মানুষের উপকার করতে যাওয়া মনুষ্যত্বের অপমান; মনুষ্যত্বের বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করাই মানুষের চরম উপকার এবং মনুষ্যত্বের চরম সম্মান। রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষা আপনাদের সমবায় প্রতিষ্ঠানের ভিতর জাগ্রত; এটা দেখে আমি যথার্থ আনন্দলাভ করেছি।

আর একটি জিনিস, আপনাদের মেলার উদ্যোগ। মেলা আমাদের দেশের একটি অতি পুরাতন সর্বজনীন অনুষ্ঠান এবং এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রেই আমাদের সমাজের সকল বর্ণের, সকল স্তরের, পরিপূর্ণ প্রকাশের সুযোগ ঘটেছিল। এই মেলাতেই আমরা জাতির প্রাণস্পন্দন সব চেয়ে বেশী অনুভব করতে পারি। এই মেলাই জাতের শ্রী ও আনন্দের প্রকাশ। আমাদের জাতির যাঁরা গৌরব তাঁদের স্মৃতিও আমরা চিরকাল বহন ক'রে এসেছি মেলাকে আশ্রয় করেই; ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের মেলা, কেন্দুবিল্বে জয়দেবের মেলার ভিতর দিয়েই আমরা যে শুধু তাঁদের স্মৃতিকেই বহন করেছি তা নয়, দেশের চিত্তধারাকেও বহন ক'রে এনেছি। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের কর্মসাধনার স্মৃতি বহন করবার এবং দেশের চিত্তধারা বহন করবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়ও হচ্ছে এই মেলা। এই মেলাকে যদি আপনারা যথার্থ মেলার, অর্থাৎ জনসাধারণের সৌন্দর্য

ও আনন্দ প্রকাশের প্রাণকেন্দ্র করে গড়ে তুলতে পারেন, তা'হলে সত্যিই দেশের একটা যথার্থ উপকার হবে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আপনারা এ-সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ, তবু কবির আদর্শের অনুপ্রেরণা নিয়েই আমার যা মনে হয়েছে, আপনাদের কাছে তা নিঃসংকোচে ব্যক্ত করলুম।

আপনাদের স্কন্ধে কবির কল্পাদর্শ ও কর্মসাধনার গুরুভার ন্যস্ত ; আমি জানি আপনারা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ। দেশ এ দায়িত্ববহনে হয়তো আপনাদের যথেষ্ট সহায়তা করেনি, তবু এ কথা সত্য যে দেশ আপনাদের এই প্রচেষ্টার সাফল্য ও তার পশ্চাতে যে আদর্শ সক্রিয়, তার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তারা দেখতে চায়, কবির কল্পাদর্শ এখানে পূর্ণাঙ্গ রূপায়ন লাভ করেছে। আমার বিশ্বাস সেই রূপায়নের দিকে আপনারা এগিয়ে চলেছেন। কবির আদর্শ জয়যুক্ত হউক, দেশ ধন্য হউক।

আবার কবিগুরুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে, আপনাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বিনীত বক্তব্য শেষ করছি।

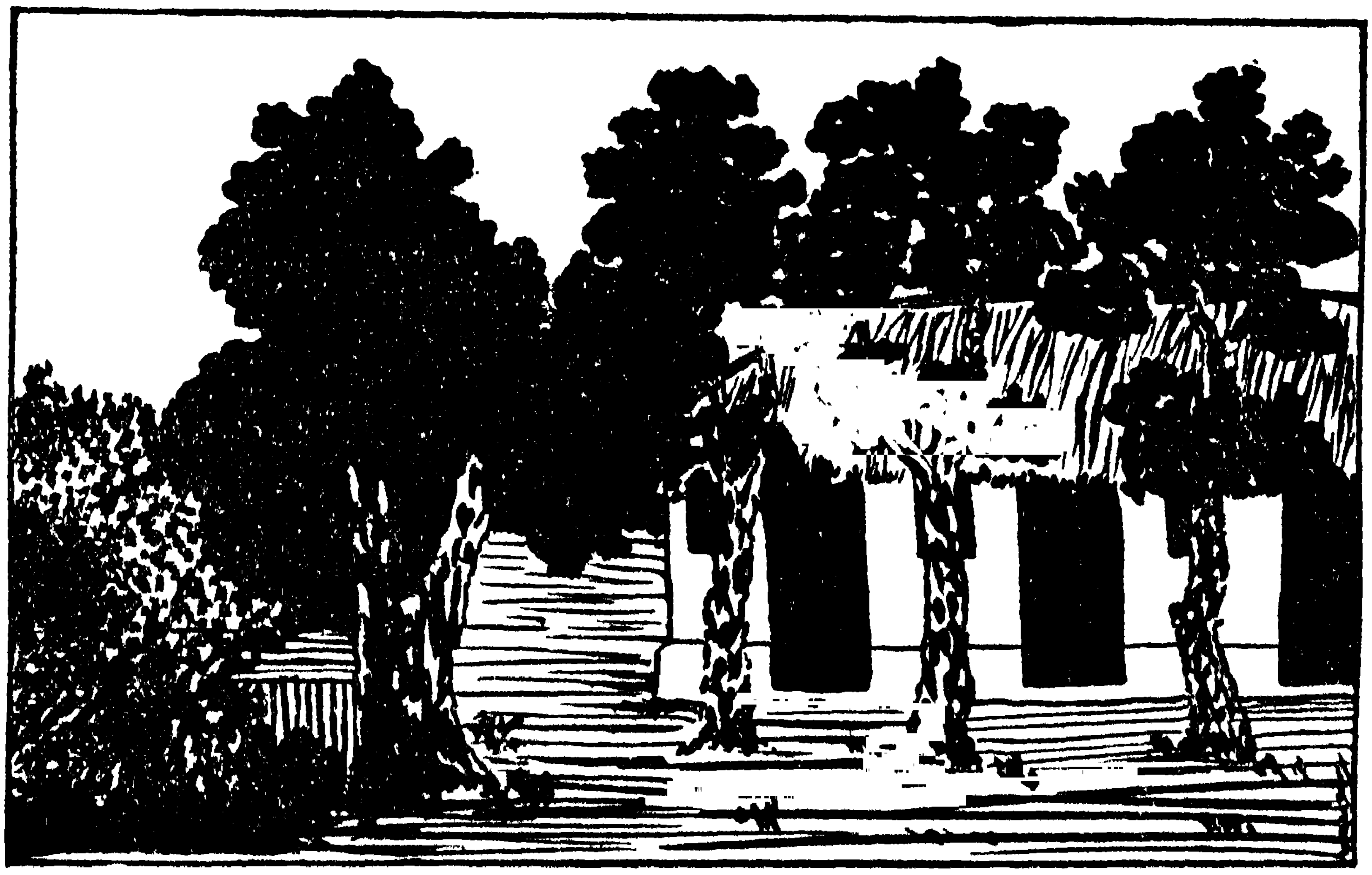

পত্রাবলী

ওঁ ২৩শে চৈত্র [১৩০৯]

[পোস্ট মার্ক—6 Ap. 03]

মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত—

প্রিয় বন্ধু

পর্শু বোলপুর অভিমুখে যাত্রা করিতেছি। হয় পর্ব্বত মহম্মদের নয় মহম্মদ পর্ব্বতের কাছে যাইবে--- হয় আমি কলিকাতায় নয় আপনি বোলপুর আসিয়া আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইবে। আমার কলিকাতায় যাইবার সম্ভাবনা আছে। রেণুকা[১] তাহার মাতুলের[২] তত্ত্বাবধানে এইখানেই থাকিবে।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

ওঁ Thomson House

Almora

শুক্রবার [২৫ বৈশাখ ১৩১০]

[পোস্ট মার্ক—8 My. 03]

প্রিয় বন্ধু

আলমোরায় পৌঁছিলাম। অতি দুর্গম পথ। অনেক কষ্ট দিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে পথে রেণুকা ভাল ছিল। আজ তাহার শরীর ভাল নাই— কিছুদিন বিশ্রামের পর বুঝা যাইবে, জায়গাটি ভাল, বাতাসটি বেশ, বাড়িটি আরামের। চারিদিকে ফল ফুলের বাগান ফলে ফুলে পরিপূর্ণ। ঘর অনেক আছে। আপনি নিজেকে দ্বিগুণিত ত্রিগুণিত করিয়া আনিলেও প্রচুর স্থান পাইবেন। পাহাড়ে উঠিবার পথটি আপনার পক্ষে দুঃখসাধ্য হইবে। আগে থাকিতে ভালরূপ বন্দোবস্ত করা চাই। সময়মত আমাকে লিখিয়া পাঠাইবেন।

১ কবির মধ্যমা কন্যা

২ নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

শৈলেশকে ডাকিয়া গ্রন্থাবলীর তাড়া দিবেন— কোনমতেই তাহাকে আমি সচেতন করিতে না পারিয়া হার মানিয়াছি। আজ অত্যন্ত ক্লান্ত আছি।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

ওঁ

হাজারিবাগ

কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান

[৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩১০]

[পোস্ট মার্ক—17 May, 03]

বন্ধু

এখানে এসে জ্বরে পড়েছি— যত শীঘ্র পারি ঝেড়ে ওঠবার চেষ্টায় আছি —কিন্তু আপাতত অনেকগুলো লেপ কম্বল আমাকে বিছানার সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। ছুটির সময়ে এ অঞ্চলে আস্‌চেন কি? এখানেই স্থান হবে। গ্রন্থাবলীর জন্যে তাগিদ দেবেন। কালের সঙ্গে চালাকি করা কিছু নয়— কখন্‌ দেখব আর সময় পাওয়া গেল না। রেণুকার জ্বর আস্‌চে— বোধ হয় ঈষৎ ভালর দিকে যাচ্চে। আপনার কন্যা কুমারীটি কি করচেন— বঙ্গভাষার শব্দোচ্চারণবিধিতে কি তাঁর প্রথম দীক্ষা আরম্ভ হয়েছে?

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

ওঁ

আলমোড়া

বন্ধু

আপনি ত আমাদের এই ঝরনার জলের রাজ্য হইতে কলের জলের দেশে গেলেন, এখন মনের সুখে এবং শরীরের স্বাস্থ্যে আছেন ত? আমিও কোন সুযোগে যদি সপ্তরথীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই তবে এখনি দৌড় দিই— কিন্তু আমাকে কেবল পাহাড় নয় আমার দুরদৃষ্টও ঘিরিয়াছে। সে যে কবে আমাকে কুলির যোগাড় করিয়া দিবে তাহা সেই জানে। আমার মনটা বোলপুরের জন্য সব চেয়ে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। আপনি সেখানে একবার

গিয়াছেন খবর পাইলে কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। এখন সেখানে কেবল পাঁচটিমাত্র অধ্যাপক আছেন তাহাতে কাজ চলা অসম্ভব। আর একজন ভাল অধ্যাপক যতদিন আসিয়া না জুটেন ততদিন কোন স্বেচ্ছাব্রতীকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারেন। তাঁহাকে হয়ত দুই একমাসের বেশি কাজ করিতে হইবে না, ইতিমধ্যে কাহাকেও না কাহাকেও পাওয়া যাইবে। গরজের সময় তাড়াতাড়ি যেমন তেমন লোক ধরিয়া আনা ঠিক নয় সেইজন্য অধ্যাপক নির্ব্বাচনে এই সময়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। আপনি এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন। আলোক এবং লোক এই দুইয়ের জন্য নিশিদিন তাকাইয়া আছি— দুইই এক জায়গা হইতে একত্রে মিলিয়াই আসে। তাহাদের জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হয়। রাজি আছি— কিন্তু আপাতত কাজ চালাইয়া লইতে হইবে। সেইটুকু ব্যবস্থাও দুরূহ।

রেণুকা দুই তিন দিন একটু ভাল আছে। যদি এই ভাবেই চলে তবে আশাজনক।

একটা S. P. R. স্থাপনের উদ্যোগ করিবেন। জগদীশকে[৩] দলে পাইতে পারিবেন। দুর্গাদাস বাবু বা আর কোন ডাক্তারকেও টানিবেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কমিটিও ভুলিবেন না।

হেমবাবু[৪] এখানে খুসিতে আছেন। তিনি এখানে প্রতিবৎসরেই আসিতে চান। প্রান্তর আমার মন ভুলাইয়াছে পর্ব্বতকে আমি এখনো হৃদয় দিতে পারি নাই।

আপনি হয়ত নিশ্বাস ফেলিয়া কল্পনা করিতেছেন যে, আমরা লম্বা লাঠি হাতে করিয়া পিণ্ডারী গ্লাসিয়ার্স দেখিতে বাহির হইতেছি। কিন্তু ঈর্ষা দূর করুন — আমাদিগকে কোণ হইতে বাহির করে হিমালয়ের অভ্রভেদী চূড়ারও সে সাধ্য নাই— সেই L. R. Shah পর্য্যন্ত যতদূর হয় তাহার উপরে আর নয়— একদিন বাজার পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলাম।

আপনাদের সমস্ত খবর দিবেন। নগেন্দ্র[২] আরামে নিদ্রা দিতেছে।

৩ জগদীশচন্দ্র বসু

৪ হেমচন্দ্র বসুমল্লিক

হেমবাবুর বাড়িতে হেমবাবুরও বোধ করি সেই রকম অচেতন অবস্থা। তবে তাঁহার subliminal consciousness এর কথা ঠিক বলিতে পারি না। ইতি ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

ওঁ

বন্ধু

কমিটির বিচারার্থে অত্রসহ একটি আবেদনপত্র পাঠাচ্ছি— আপনারা কর্ত্তব্য স্থির করবেন। গ্রন্থাবলীর তিনটে ছাপা ফর্ম্মা শৈলেশ পাঠিয়েছে। এবারে দুটি সামান্য ভুল আছে— দুটিই একপাতায় যথা— ৪০ পৃষ্ঠা ১৫ ও ১৭ ছত্রে "ভূজে" ও "দ্রূত" ছাপা হয়েছে। কিন্তু ছাপা কি যথেষ্ট দ্রুতবেগে অগ্রসর হচ্চে? পূজার ছুটির পূর্ব্বে কি প্রকাশ হবে? আজ সোমবার— শনিবারে যদি বোলপুরে গিয়ে থাকেন ত আজ বোধ হয় ফিরেচেন— সমস্ত খবর পাবার জন্যে অনেকদিন থেকে উৎসুক হয়ে আছি। রেণুকা অল্প একটু ভাল আছে— আজ একাদশী। ভুল করেছি। পাঁজি দেখা গেল আজ দশমী। দশমীতে রাণীর অসুখ বাড়ে— আজ ত বিশেষ বাড়ে নি। ৪ঠা শ্রাবণ ১৩১০

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

পুঃ উপাধ্যায় মশায় কি ফিরেছেন? তিনি একবার আলমোড়ায় যদি বেড়াতে আসেন তাহলে তাঁর দিগ্বিজয়ী কাহিনী একবার ভাল করে শুনে নিই।

আমি যদি রাগ করে কখনো
মাথা নেড়ে চোখ রাঙিয়ে বকি—
তোমার খুকী খিল্‌খিলিয়ে হাসে,—
খেলা করচি মনে করে ও কি?
সবাই জানে বাবা বিদেশ গেছে—
তবু যদি বলি "আস্‌চে বাবা"—

তাড়াতাড়ি চারদিকেতে চায়,—
তোমার খুকী এম্‌নি বোকা হাবা!
ধোবা এলে, পড়াই যখন আমি
টেনে নিয়ে তাদের বাচ্ছা গাধা,
আমি বলি "আমি গুরুমশাই"
ও আমারে চেঁচিয়ে ডাকে "দাদা"!
তোমার খুকী চাঁদ ধর্‌তে চায়,
গণেশকে ও বলে যে মা গানুশ!
তোমার খুকী কিচ্ছু বোঝে না মা,
তোমার খুকী ভারি ছেলেমানুষ!

ওঁ

বন্ধু

নানা কারণে শ্রান্ত অবস্থায় থাকতে হয় বলে আপনাদের কাউকে চিঠি লিখে উঠতে পারিনে। কেবল বিদ্যালয়ের জন্যে উদ্বেগের তাড়নায় মাঝে মাঝে আমাকে ঝুঁটি ধরে লেখায়। তা ছাড়া যখনই একটু সুবিধা বোধ করি "নৌকাডুবি" লিখতে হয়— ভয় হয় পাছে কখন্‌ অক্ষম হয়ে পড়ি তখন "নৌকাডুবি" নামটাই সার্থক হবে। অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত লেখা সারা হয়েছে। আজ যদি সময় পাই পৌষ আরম্ভ করব। চৈত্র পর্য্যন্ত লিখে রাখলে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারব। এক একবার মনে হচ্চে গল্পটা এ বৎসর পেরিয়ে যাবে— কিন্তু কোন্‌ পরিণামে গিয়ে যে শেষ হবে তা আমি এখনো কিছুই জানিনে। কলমের হাতেই অন্ধভাবে আত্মসমর্পণ করে চলেছি।

গ্রন্থাবলীতে একটা "শিশুখণ্ড" জুড়ে দেবার যে প্রস্তাব করেছেন সে অতি উত্তম। আপনি তার যে তালিকা দিয়েছেন তার মধ্যে "নদী" কবিতাটি দেখলুম না। "কাগজের নৌকা" বলে একটি কবিতা মুকুলে দিয়েছিলুম—বহুদিনের কথা। সেটা জগদীশের সাহায্যে উদ্ধার করে এর মধ্যে দিতে পারেন। আপনার ভূমিকায় বলে দেবেন যে "শিশু" খণ্ডের কবিতা সবগুলিই যে শিশুদের সম্বন্ধে তা নয়— কতকগুলি শিশুদের পাঠ্য। "বালক" কাগজে "শীতের বিদায়" বলে

একটি শিশুপাঠ্য কবিতা প্রকাশ করেছিলেম। তা ছাড়া "পুরাতন বট" বলেও একটা ছিল। সেটা কিন্তু ছেঁটে ছুঁটে দেওয়া দরকার। গানগুলোর মধ্যেও একবার চোখ বুলিয়ে নেবেন। একটা গান একটি মেয়ের অন্নপ্রাশনে লিখেছিলেম—

ওগো নবীন অতিথি,
তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন!

তা ছাড়া "বল্ গোলাপ মোরে বল্" গানটাও ছেলেদের জন্যে। এই শিশুখণ্ডে "খেলা" এবং "সুখদুঃখ" (ক্ষণিকা) যেতে পারত— কিন্তু সে বোধ হয় লোকালয়ে গেছে। যদি কোথাও "কড়ি ও কোমলের" প্রথম সংস্করণ পান তা'হলে তার মধ্যে থেকে হয়ত দুটো একটা পেতে পারেন। প্রিয়বাবুর[৫] কাছে হয়ত আছে—নয়ত কোনো লাইব্রেরিতে পাবেন।

যতদিন জগদানন্দের[৬] সহকারী কাউকে না পান ততদিন রথী[৭] সন্তোষের[৮] দ্বারা যথাসম্ভব কাজ চালাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। কবিকুসুম এবং সেই লোকটি এলেই আর কোন ভাবনার কারণ থাকে না। তা না হলে পড়াবার খুব টানাটানি চল্‌বে। ইতিমধ্যে রমণীর[৯] সঙ্গে বোধ হয় আপনাদের বিদ্যালয় সম্বন্ধে মন্ত্রণা চল্‌চে। যোগেশচন্দ্র রায়কে একবার চিঠি লিখে জানুন না তিনি অঙ্ক কতদূর শেখাতে পারেন। Science-এর জন্যে দ্বিতীয় লোক না হলেও আপাতত চলতে পারবে। বরঞ্চ ছোট ছেলেরা হাতের কাজ এবং বড় ছেলেরাই Science শিখুক। কি বলেন?

আমার শরীর দিন দুই তিন থেকে কতকটা ভাল আছে। এখানে বর্ষা আরম্ভ হয়েছে। এখানকার বর্ষা খুব রমণীয়। বৃষ্টি বেশি নয়—যতটুকুতে চারিদিক বেশ সরস স্নিগ্ধ শ্যামল হয়ে ওঠে তার বেশি আর আড়ম্বর নেই। দেখ্‌চি এখানকার বর্ষাটা স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল।

কাল একাদশী আস্‌চে। সেই কারণে রেণুকার জন্যে উদ্বিগ্ন আছি। ক'দিন বেশ ভাল চলছিল—হঠাৎ পেটের অসুখ দেখা দিয়েছে। আজ ভাল

৫ প্রিয়নাথ সেন
৬ জগদানন্দ রায়
৭ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার
৯ রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়

আছে। আমার জামাই সত্য[১০] এখানে আস্‌চে—সে এলে আমার ভার অনেকটা লঘু হবে।

গ্রন্থাবলীর যে অংশে ছেলেদের কবিতা বেরবে তার নাম শিশু বা শৈশব না দিয়ে "কিশোর" বা "কুমার" নাম দেবেন। কারণ শিশু অতি ছোট—সব কবিতা ও নামে খাপ খাবে না। যে ক'টা কবিতা লোকালয়ে বের হয়ে গেছে তা "কিশোরে" আবার দিলে ক্ষতি হবে না—কারণ তাতে ক্ষতি আমারই পাঠকের বিশেষ কিছু নয়। গানের মধ্যেও এরকম পুনরাবৃত্তি হবে। বরং এজন্য ভূমিকায় মার্জ্জনা চেয়ে রাখ্‌লেই হবে। "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" কবিতাটা "কিশোর" অংশে না দিলে সমস্তই অসম্পূর্ণ হবে। আমার তালিকাঃ— ফুলের ইতিহাস, সাধ (প্রভাত সঙ্গীত), ঘুম, শীত, স্নেহময়ী, মধ্যাহ্ন, পোড়ো বাড়ি, অভিমানিনী, উপকথা, কাঙালিনী, বিষ্টি পড়ে, সাত ভাই চম্পা, হাসিরাশি, আকুল আহ্বান, মঙ্গলগীতি, পাখীর পালক, আশীর্ব্বাদ, বিম্ববতী, শৈশবসন্ধ্যা, স্নেহস্মৃতি (প্রথম চার stanza চিত্রা), বিসর্জ্জন (অনুবাদ) ৪৭১ পৃঃ, সূর্য্য ও ফুল (ঐ), কাগজের নৌকা (মুকুল), শীতের বিদায় (বালক), পুরাতন বট, নদী (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত), খেলা (ক্ষণিকা), সুখদুঃখ (ঐ), ওগো নবীন অতিথি (গান)।

"কিশোর" খণ্ডের গোড়ার কবিতাটা লিখে পাঠাব। "কিশোর" কোন্ জায়গায় বস্‌বে ?

বিপিন খাবার এনে বারবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবার ভয় দেখাচ্ছে। সকালে খুব বাদ্‌লা হয়ে গেছে। এখন আকাশ ও পর্ব্বত মেঘাচ্ছন্ন। আজ খিচুড়ি হয়েছে। খিচুড়িটা কোনমতেই ঠাণ্ডা চলে না—অতএব বিপিনের ঘন ঘন শাসনবাক্য অবহেলা করতে সাহস হচ্চে না। ইতি ৪ঠা শ্রাবণ ১৩১০

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

পুঃ—সূর্য্য ও ফুলে একটা ভুল আছে। ওর প্রথম লাইনেই আছে "মহীয়সী মহিমা।" মহিমা ক্লীবলিঙ্গ। অতএব তার বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ হবে না। "সুমহৎ" করে দেবেন।

১০ সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (মধ্যম জামাতা)

ওঁ

বন্ধু

নামকরণের ভার আপনার উপর। কতগুলো নতুন কবিতা পেলেন? বোধ হয় সবসুদ্ধ গোটাদশেক হবে। আমি আজকাল শিশুদের মনের ভিতরে বাসা করে আছি। তেতালার ছাদের উপর আমার নিজের শৈশব মনে পড়ছে।

যোগীন্দ্রবাবু লোকটিকে বেশ সংগ্রহ করেছেন। আমাদের বিদ্যালয় বড় বড় ডাল মেলে ক্রমেই বনস্পতির আকার ধারণ করচে—আমার মন পুলকিত হয়ে উঠ্‌চে। বোধ হয় অধ্যাপনা সম্বন্ধে এখন আর কোনো অভাব রইল না।—কেবল ল্যাবরেটারি যথেষ্ট অসম্পূর্ণ আছে সেইটে যদি আস্তে আস্তে ভরিয়ে তুল্‌তে পারেন। রমণীর হাতে ৮০০৲ টাকা দিয়েছি। সে টাকাটা আসলে ল্যাবরেটরির টাকা। কিন্তু পাছে আমার অনুপস্থিতি কালে খরচের টানাটানি পড়ে এই জন্যে সেটা রমণীর হাতে দিয়েছি।

প্রমথবাবু লিখেছেন তিনি তাঁর বার্ষিক দেয় ১৫০৲ এবং তাঁর পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে শুভানুষ্ঠানের দান রমণীর হাতে দেবেন। রমণীকে এই খবরটি দিয়ে রাখবেন।

ভূমিকার প্রুফ আপনাকে পাঠিয়েছি— পেয়েছেন ত? আজ এখানে মেঘাবরণ উন্মুক্ত— হিমালয়ের তুষার-ললাট প্রভাত আলোকে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠেছে। সমস্ত দুঃখ-দুশ্চিন্তার মধ্যেও আমার চিত্ত আনন্দে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। ইতি ১৫ই শ্রাবণ ১৩১০

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

সন্ধ্যা হলে কতদিন মা
দাঁড়িয়ে ছাদের কোণে
দেখেছি একমনে—
চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ে
শাদা কাশের বনে!
মা যদি হও রাজি
বড় হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি!

এপার ওপার দুই পারেতেই
যাব নৌকো বেয়ে।
যত ছেলে মেয়ে
স্নানের ঘাটে থেকে আমায়
দেখবে চেয়ে চেয়ে।
সূর্য্য যখন উঠ্‌বে মাথায়
অনেক বেলা হলে—
আস্‌ব তখন চলে
"বড় ক্ষিদে পেয়েছে গো
খেতে দাও মা" বলে।
আবার আমি আস্‌ব ফিরে
আঁধার হলে সাঁঝে
তোমার ঘরের মাঝে।
বাবার মত যাব না মা
বিদেশে কোন্‌ কাজে।
মা, যদি হও রাজি,
বড় হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

ওঁ

বন্ধু

নামকরণ করে দেবেন। স্থানকরণও আপনার কর্ত্তব্য। আমার কাজ আমি করেছি।

এ কবিতাগুলি কোনো মাসিক পত্রে দিয়ে আমি নষ্ট করতে ইচ্ছা করিনে— শৈলেশকে এই কথা আপনি বুঝিয়ে বল্‌বেন। বেশ তাজা টাট্‌কা অবস্থায় বইয়েতে বেরবে এই আমার অভিপ্রায়। নইলে মাসিক পত্রের পাঠকদের হাতে হাতে যেখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে, অনুকরণকারীদের কলমের মুখে ঠোকর খেয়ে খেয়ে কবিতার জেল্লা সমস্ত চলে যায়। ছেলেদের হাতে যে

পুতুল দেব আগে থাকতেই যদি তার রং উঠে কাপড় ছিঁড়ে নাস্তানাবুদ হয়ে যায় তবে সে কি সঙ্গত হবে?

বিদ্যালয় সম্বন্ধে নূতন খবর কিছু দেবেন না? ইতি ১৭ শ্রাবণ ১৩১০

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

ওঁ

বন্ধু

এই ত ২২টা হল। কিন্তু শৈলেশের হাত থেকে এগুলিকে রক্ষা করবেন। সে যদি এগুলিকে বঙ্গদর্শনের পিলোরিতে চাপিয়ে দেয় তাহলে শুকিয়ে মারা যাবে— এরা নিতান্ত অন্তঃপুরের খেলাঘরের জিনিষ— হাটবাটের জিনিষ নয়।

গ্রন্থাবলীর খবর কি? শৈলেশ ত পলাতক। ভার কার উপর?

আমার কর্ম্মফল গল্পটা কুন্তলীনরা ছাপাচ্চে কি না জানেন? তারা দেখচি শৈলেশকেও হারিয়ে দেবে।

বঙ্গদর্শনকে ভুলবেন না। বিদ্যালয়কে স্মরণে রাখবেন। গ্রন্থাবলীকেও অবহেলা করবেন না। আমাকেও চিঠিপত্র লিখ্‌বেন। এ সমস্ত করে যদি সময় পান তবে ঘরের কাজে এবং বাইরের কাজে মন দেবেন। ইতি ২৩শে শ্রাবণ ১৩১০

আপনার

শ্রীরবীন্দ্র

ওঁ

বন্ধু

আজ কতকগুলো ফর্ম্মা পেয়েছি— তার মধ্যে একটি খুব বড় রকমের ভুল রয়ে গেছে। রূপকখণ্ডে ৩২ পৃষ্ঠায় ১৬ ছত্রে "বাতাস শুধু কানের কাছে" না হয়ে "বাতাস শুধু কাননের কাছে" ছাপা হয়েছে— তাতে ছন্দ একেবারে ভেঙে যায়।

এইগুলো অন্তত সূচীপত্রে যাতে নিবিষ্ট হতে পারে তাই করবেন।

কিম্বা যদি পাতা বদলানো উচিৎ বোধ করেন তাই করবেন। আর ছোট ছোট ভুল মারাত্মক নয়। একটা কেবল দেখ্‌বেন—ঙর জায়গায় যেন ঙ্গ না বসে। যেমন "ভাঙা" না হয়ে "ভাঙ্গা", "রাঙা"র জায়গায় "রাঙ্গা" বসানো ঠিক নয়। বিশেষত আমার অধিকাংশ ছন্দে যুক্ত এবং অযুক্ত অক্ষরে অনেক তফাৎ করে—যদি কোনো 'বাঙ্গাল' "ভাঙা"কে "ভাঙ্গা" পড়ে তাহলে ছন্দও তৎক্ষণাৎ ভাঙ্‌বে। রূপকখণ্ডের ২৮ পৃষ্ঠায় ৯ ছত্রে "প্রাসাদ" শব্দের স্থলে "প্রসাদ" বসেছে। রূপকখণ্ডের ভূমিকার কবিতাটি পাতার ঠিক মাঝখানে বসেনি— নীচে অনেকখানি ফাঁক পড়েছে। বোধ হয় ওর প্রত্যেক চার লাইনের পর একটা করে ফাঁক থাক্‌লে ঐ পাতাটা অনেকটা ভরাট হতে পারত। বিদ্যার্ণবকে[১১] ডেকে "শিশুখণ্ড" আপনি সমাজের ছাপাখানায় ছাপতে পাঠান। শৈলেশকে বলবার দরকার নেই। ভূমিকার কবিতাটা স্মল্ পাইকা এবং অন্য কবিতাগুলি ইংলিশ অক্ষরে ছাপতে বল্‌বেন। "নদী" বইটা যেমন বেশ ফাঁক ফাঁক করে ছাপানো হয়েছিল তেমনি বলে দেবেন।

এখনো ঢের বাকি আছে। পূজোর মধ্যে হবে শেষ হবে এমন আশা করতে পারিনে।

বিদ্যালয়ের খবর পাচ্ছেন? ইতি ২৯শে শ্রাবণ ১৩১০

আপনার
শ্রীরবীন্দ্র

১১ শিবধন বিদ্যার্ণব

বিশ্বভারতী পত্রিকা

প্রথম বর্ষ নবম সংখ্যা

চৈত্র ১৩৪৯

মহর্ষির ডায়েরী*

[পূজনীয় মহর্ষি কর্তামহাশয়ের একখানি কালো বাঁধানো খাতা ঠিক কি সূত্রে আমার হস্তগত হয়, তা' এখন মনে করতে পারছি নে। সম্ভবতঃ শিলাইদহ কাছারির কাগজপত্রের মধ্যে ছিল; কারণ এটুকু মনে আছে যে, তার প্রথমে কিছু কিছু জমিদারির হিসাবপত্র, পরে এই দৈনিক লিপি তাঁর স্বহস্তে লেখা ছিল। তার থেকে আমি একজনকে দিয়ে শেষাংশটির যে নকল করিয়ে রেখেছিলুম, সেটি সেদিন আমাদের পুরনো চিঠির বাক্সে আবিষ্কার করে আনন্দিত হলুম ও সেই আনন্দের অংশ পাঠকদের দেবার আশায় এই ভ্রমণবৃত্তান্তটি প্রকাশ করছি। এটির মূল্য শুধু ঐতিহাসিক নয়; তা ছাড়াও আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি মনোজ্ঞ ভ্রমণকাহিনী সুন্দর সরস সেকেলে ভাষায় পড়তে সকলেরই নিশ্চয় ভালো লাগবে। অবনদাদাও সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, কর্তামহাশয়ের টেবিলে একটি ভালো বাঁধানো কালো চামড়ার খাতা থাকত তিনি দেখেছেন। মূল খাতাটি এখনো পাবার আশা আমার আছে।

শ্রীইন্দিরা দেবী]

আমি ২৫ জ্যৈষ্ঠে আরও উত্তর হিমালয় দর্শনের নিমিত্তে এই শিমলা হইতে যাত্রা করি। প্রায় ২০ ক্রোশ পথ পর্য্যটন করিয়া নারখাণ্ডা নামক পর্ব্বত শিখরে উপস্থিত হই। যদিও উষ্ণ বস্ত্রই গাত্রে ছিল, তথাপি তথাকার শীতল বায়ুতে শীত অনুভব হইতে লাগিল। পর দিবস প্রাতঃকালে ব্রহ্মোপাসনার পর

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডায়ারির কয়েক পৃষ্ঠা।

চা এবং দুগ্ধ পান করিয়া পদব্রজেই চলিলাম। অদূরেই নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম, যেহেতু সে পথ বনের মধ্য দিয়া গিয়াছে। মধ্যে ২ সেই বনকে ভেদ করিয়া রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পথে পড়িয়াছে, স্থানে স্থানে অতি প্রাচীন জীর্ণ-শরীর বৃহৎ ২ বৃক্ষ সকল কাল সহকারে মূল হইতে উৎপাটিত হইয়া, কোনো ২ বৃক্ষ বা কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ভূমিষ্ঠ হইয়া, প্রণত রহিয়াছে, কত তরুণ বয়স্ক বৃক্ষও দাবানলে দগ্ধ হইয়া অসময়ে দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়াছে।

অনেক পথ চলিয়া পরে যানারোহণ করিলাম। এ যানকে এখানকার লোকেরা ঝাঁপান বলে, বাস্তবিক ইহা একটি বড় কেদারা, তাহার দুই পার্শ্বে দুই দীর্ঘ বর্গাতে তাহা সংলগ্ন হইয়া ঝুলিতে থাকে এবং তাহা চারিজন লোকে বহন করে। এখানকার যান পর্য্যন্ত নূতন ব্যাপার। উপমা দ্বারা বুঝান ভার। ঝাঁপানে চড়িয়া ক্রমে আরোও নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম। পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিতে ২ তাহার অধঃতে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল হরিৎবর্ণ ঘন পল্লবাবৃত বৃহৎ বৃক্ষ সকল দেখিতে পাই, তাহাতে একটি পুষ্প কি একটি ফলও নাই, কেবল কেলু নামক বৃহৎ বৃক্ষতে হরিৎবর্ণ এক প্রকার কদাকার ফল দৃষ্ট হয়, তাহা পক্ষিতেও আহার করে না। কিন্তু পর্ব্বতের গাত্রেতে বিবিধ প্রকার তৃণ লতাদি যে জন্মে, তাহারই শোভা চমৎকার। তাহা হইতে যে কত জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সহজে গণনা করা যায় না। শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, নীলবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ— সকল বর্ণেরই পুষ্প যথাতথা হইতে নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে। এই পুষ্প সকলের কোমল আকৃতি, তাহারদিগের সৌন্দর্য ও লাবণ্য, তাহারদিগের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্ত্তমান বোধ হয়। যদিও তাহারদিগের যেমন রূপ তেমন গন্ধ নাই, তথাপি আমরা এই বনমধ্যে একেবারে আঘ্রাণ সুখ হইতে বঞ্চিত না হই, এহেতু সেই করুণাময়ের শাসনে ইহার স্থানে ২ এক প্রকার শ্বেতবর্ণের গোলাপ পুষ্পের গুচ্ছসকল প্রস্ফুটিত হইয়া স্বীয় গন্ধ অকাতরে বিতরণ করিয়া সমুদয় বনকে আমোদিত করিয়াছে। এই শ্বেত গোলাপ চারি পত্রের এক স্তবক মাত্র, এই আকৃতির ঈষৎ রক্তবর্ণ গোলাপও অনেক স্থানে প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহার তাদৃশ গন্ধ নাই। ইহার মধ্যে ২ ষ্ট্র-বেরি (Strawberry) ফল রক্তবর্ণ খণ্ড ২ উৎপলের ন্যায় দীপ্তি

পাইতেছে। স্থানে ২ চামেলি পুষ্প গন্ধ দান করিতেছে, তাহা দেখিয়া "পলতার বাগান" স্মরণ হইল। আমারদিগকে বিমলানন্দে আনন্দিত করিবার নিমিত্তে করুণাময়ের এই উদার সদাব্রত দেখিয়া রসনা আপনা হইতেই তাঁহার করুণা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। আমার এক ভৃত্য এক বনলতা হইতে তাহার পুষ্পিত শাখা আমার হস্তে দিলেক, তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে মন সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য নিরবদ্ধ মঙ্গল-স্বরূপে মগ্ন হইয়া গেল।

"যখন সুগন্ধি রূপ-লাবণ্যবিশিষ্ট কোন মনোহর পুষ্প নিজ হস্তে রাখিয়া তাহার স্রষ্টার নাম ভক্তির সহিত উচ্চারণ করি তখনি তাঁহার উপাসনা হয়।"*

নারকাণ্ডা হইতে ১২ ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিয়া ৩০ শে জ্যৈষ্ঠে মৌলি নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলাম। এই অতীব উচ্চ স্থান হইতে পবদার (?) অভিমুখস্থিত দুই পর্ব্বত শ্রেণীর শোভা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। এই শ্রেণী দ্বয়ের মধ্যে কোন পর্ব্বতে নিবিড় বন, ঋক্ষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাস স্থান, কোন পর্ব্বতের আপাদ মস্তক পক্ক গোধুম ক্ষেত্র দ্বারা স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ২ বিস্তর ব্যবধানে এক ২ গ্রামে ১০।১২টি করিয়া গৃহপুঞ্জ সূর্য্য কিরণে দীপ্তি পাইতেছে; কোন পর্ব্বত উদ্যানের গঙ্গাতীরস্থ ভূমির ন্যায় ক্ষুদ্র ২ তৃণ দ্বারা তাহার (?) তল হইতে চূড়া পর্য্যন্ত ভূষিত রহিয়াছে ও কোন পর্ব্বত একেবারে তৃণশূন্য হইয়া তাহার নিকটস্থ বনাকীর্ণ পর্ব্বতের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

প্রতি পর্ব্বতই আপনার মহোচ্চতার অভিমানে স্তব্ধ হইয়া পশ্চাতে হেলিয়া রহিয়াছে, কাহাকেও শঙ্কা নাই; কিন্তু তাহার আশ্রিত পথিকেরা রাজভৃত্যের ন্যায় সর্ব্বদা সশঙ্কিত যে একবার পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই। সায়ংকাল অবসান হইয়া অন্ধকার ক্রমে সমুদয় ভুবন আচ্ছন্ন করিলেক, তখনও আমি সেই নির্জ্জন পর্ব্বত শৃঙ্গে একাকী বসিয়া আছি, দূর হইতে স্থানে ২ কেবল প্রদীপের আলো মনুষ্য বসতির পরিচয় দিতেছে।

পরদিবস প্রাতঃকালে সেই পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে যে পর্ব্বত বনাকীর্ণ, সেই পর্ব্বতের পথ দিয়া নিম্নে পদব্রজেই আরোহণ করিতে লাগিলাম। পর্ব্বত

* একটী ফারসী কবিতার অনুবাদ।

আরোহণ করিতে যেমন কষ্ট, অবরোহণ করা তেমনি সহজ। এ পর্ব্বতে কেবল কেলু বৃক্ষের বন। ইহাকেও বন বলা উচিত হয় না, ইহা উদ্যান অপেক্ষাও ভাল। কেলু বৃক্ষ দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় ঋজু এবং দীর্ঘ তাহার শাখা সকল তাহার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এবং ঝাউগাছের পত্রের ন্যায় অথচ সুচিপ্রমাণ দীর্ঘ মাত্র ঘন পত্র তাহার ভূষণ হইয়াছে। বৃহৎ পক্ষীর পক্ষের ন্যায় প্রসারিত ঘন পত্রাবৃত ইহার শাখা সকল শীতকালে বহু তুষারভার বহন করে, অথচ ইহার পত্র সকল সেই তুষার দ্বারা জীর্ণ শীর্ণ না হইয়া আরও সতেজ হয় কখন স্বীয় হরিতবর্ণ পরিত্যাগ করে না। ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? . ঈশ্বরের কোন কার্য্য না আশ্চর্য্য। এই পর্ব্বতের তল হইতে তাহার চূড়া পর্য্যন্ত এই বৃক্ষসকল সৈন্য দলের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই দৃশ্যের মহত্ত্ব আর সৌন্দর্য্য কি মনুষ্যকৃত কোন উদ্যানে থাকিবার সম্ভাবনা? এই কেলু বৃক্ষে কোন পুষ্প হয় না, ইহা বনস্পতি, এবং ইহার ফলও অতি নিকৃষ্ট, তথাপি ইহার দ্বারা আমরা বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হই, ইহাতে আল্‌-কাতরা জন্মে। কতকদূর চলিয়া পরে ঝাঁপানে চড়িলাম। যাইতে ২ স্নানের উপযুক্ত এক প্রস্রবণ প্রাপ্ত হইয়া সেই তুষার পরিণত হিমজলে স্নান করিয়া নূতন স্ফূর্ত্তি ধারণ করিলাম এবং পদব্রজেই অগ্রসর হইলাম। বনের অন্তে এক গ্রামে উপনীত হইলাম, পুনর্ব্বার সেখানে পক্ক গোধূম যবাদির ক্ষেত্র দেখিয়া প্রহৃষ্ট হইলাম। মধ্যে ২ অহিফেনের ক্ষেত্র রহিয়াছে। এক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা প্রসন্নমনে পক্ক শস্য কর্ত্তন করিতেছে, অন্য ক্ষেত্রে কৃষকেরা ভাবী ফল প্রত্যাশায় হল বহন দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতেছে। রৌদ্রের জন্য পূর্ব্বের ঝাঁপানে চড়িয়া প্রায় দুই প্রহরের সময় বোচানি নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলাম। মুংরি হইতে ইহা অনেক নিম্ন। এই পর্ব্বতের তলে নগরি নদী এবং ইহার নিকটস্থ অন্যান্য পর্ব্বত তলে শতদ্রু নদী বহিতেছে। বোচানি পর্ব্বতের চূড়া হইতে শতদ্রু নদীকে দুই হস্ত এবং নগরি নদীকে অর্ধ হস্ত মাত্র প্রশস্ত বোধ হইতেছে। এই শতদ্রু নদীতীরে রামপুর নামে যে এক নগর আছে তাহা এখানে অতিশয় প্রসিদ্ধ, যেহেতু এই সকল পর্ব্বতের অধিকারী যে রাজা, রামপুর তাঁহার রাজধানী। রামপুর যে পর্ব্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা ইহার সন্নিকট, তথাপি

তথায় বহুপথ ভ্রমণ করিয়া যাইতে হয়। এই রাজার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর হইবে, এবং ইনি ইংরাজী ভাষাও অল্প স্বল্প শিখিয়াছেন। শতদ্রু নদী এই রামপুর হইতে ভোজ্জীর রাণার রাজধানী ষোহিনী হইয়া তাহার নিম্নে বিলাসপুরে যাইয়া পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া পাঞ্জাবে বহমানা হইয়াছে। গত মাঘ মাসে ভোজ্জীর রাণা তাঁহার নিবাস স্থান ষোহিণীতে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সিমলা হইতে প্রায় দেড় দিন পর্ব্বতে ২ চলিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। তথায় যাইয়া পর্ব্বত তলে কৃষ্ণনগরের জলিঙ্গী নদীর মত এখানকার শতদ্রু নদীর প্রশস্ততা দেখিয়া আশ্চর্য্যযুক্ত হইলাম। ইহার জল সমুদ্রজলের মত নীলবর্ণ, উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার। এখানকার শতদ্রুনদীর পরিষ্কার জলের উপমা বাল্মীকি কবির তমসা নদীর উপমা "সজ্জনানাং যথা মনঃ"। আমি চর্ম্মময় মষকের উপরে চড়িয়া এই নদীর পারেও গিয়াছিলাম, ইহাতে মষক ভিন্ন আর গতি নাই, ইহার জলমধ্যে বৃহৎ ২ প্রস্তর মগ্ন থাকাতে নৌকা চলিতে পারে না। পার হইয়া তাহার তীরে উষ্ণ জলকুণ্ড দেখিলাম। তাহার বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে বর্ষাকালে যেমন ক্রমে নদী বৃদ্ধি হইয়া তাহার আয়তন প্রশস্ত হইতে থাকে, এবং উষ্ণ জলকুণ্ডের স্থান অধিকার করিতে থাকে উষ্ণ জলকুণ্ডও তাহার পার্শ্বে ২ তত অগ্রসর হইতে থাকে, কখন তাহার তীরের আশ্রয় পরিত্যাগ করে না। এই পর্ব্বতবাসী ভূম্যধ্যকারীদের মধ্যে প্রধান রাজা, পরে রাণা পরে ঠাকুর সর্ব-শেষে জমিদার। এখানকার জমিদারেরাই কৃষক। হিন্দুস্থানের জমিদারদিগেরও এই দশা। পর্ব্বতে রাজা ও রাণাদিগের ক্ষমতা অধিক, ইহারাই প্রজাদিগের শাসনকর্ত্তা। রাজা ও রাণাদিগের বিবাহে সখীগণ সহিত কন্যার সম্প্রদান হয়। রাণীর গর্ভের পুত্র রাজা অথবা রাণা হয়। সখীগর্ভের পুত্র রাজপরিবারে থাকিয়া যাবজ্জীবন অন্ন পায়। সখীগর্ভের যত কন্যা, তাহারা রাজকন্যার সখীরূপে পরিচিতা থাকে এবং সেই রাজকন্যারই স্বামীর হস্তে তাহারদিগের জীবন ও যৌবন সমর্পণ কবিতে হয়। কি অনর্থ! কি অনর্থ! রাজা এবং রাণার রাণীও অনেক, সুতরাং সখীও বিস্তর, এক স্বামীর মৃত্যু হইলে ইহারা সকলে বন্দীর ন্যায় কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া যাবজ্জীবন রোদন করিতে থাকে। ইহারদিগের পরিত্রাণের আর উপায় নাই। গতকল্য যেমন মুংগ্রী হইতে

কণিকা অবরোহণ করিয়া আসিয়াছিলাম, অদ্যও তদ্রূপ প্রাতঃকালে এখান হইতে অবরোহণ করিয়া প্রায় মধ্যাহ্ন কালে নগরী নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। এই মহাবেগবতী স্রোতস্বতী স্বীয় গর্ভস্থ বৃহৎ বৃহৎ হস্তিকায় তুল্য প্রস্তরখণ্ডে আঘাত পাইয়া রোষান্বিতা ও ফেণময়া হইয়া গম্ভীর শব্দ করতঃ সর্ব্বনিয়ন্তার শাসনে সমুদ্র সমাগমে গমন করিতেছে। ইহার উভয় তীর হইতে দুই পর্ব্বত বৃহৎ প্রাচীরের ন্যায় অনেক উচ্চ পর্য্যন্ত সমান উঠিয়া পরে পশ্চাতে হেলিয়া গিয়াছে। রৌদ্রের কিরণ বিস্তর কাল এখানে থাকিবার স্থান প্রাপ্ত হয় না। আমি সায়ংকালে এই নদীর সৌন্দর্য্যে মন মগ্ন করিয়া একাকী তাহার তীরে বিচরণ করিতেছিলাম, হঠাৎ উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" পর্ব্বতের উপরে দীপমালা শোভা পাইতেছে। সায়ংকালের অবসান হইয়া রাত্রি যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই অগ্নিও তত ক্রমে ব্যাপ্ত হইল। উপর হইতে অগ্নি বাণের ন্যায় নক্ষত্রবেগে শত সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইয়া নদীতীর পর্য্যন্ত নিমগ্ন বৃক্ষ সকলকে আক্রমণ করিল। ক্রমে একে একে সমুদয় বৃক্ষ স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিরূপ ধারণ করিল এবং অন্ধকার সে স্থান হইতে বহুদূরে প্রস্থান করিল। অগ্নির এই অপরূপ রূপ দেখিতে ২ নদীর সৌন্দর্য্য বিস্মৃত হইলাম, এবং যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব-সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন তাঁহার মহিমা অনুভব করিতে লাগিলাম।

আমি পূর্ব্বে এখানকার অনেক বনে দাবানলের চিহ্ন দগ্ধ বৃক্ষ সকল দেখিয়াছি, এবং রাত্রিতে দূরস্থ পর্ব্বতের প্রজ্জলিত অগ্নির শোভাও দর্শন করিয়াছি কিন্তু এখানে দাবানলের উৎপত্তি, উন্নতি, নিবৃত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া বড় উল্লাসিত হইলাম। সমস্ত রাত্রি এই দাবানল জ্বলিয়াছিল, রাত্রিতে যখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে তখনই তাহার আলো দেখিয়াছি। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি যে অনেক দগ্ধ দারু হইতে ধূম নির্গত হইতেছে এবং উৎসব রজনীর প্রভাত কালের অবশিষ্ট দীপালোকের ন্যায় মধ্যে ২ সর্ব্বভুক্ লোলুপ অগ্নিও ম্লান ও অবসন্ন হইয়া জ্বলিত রহিয়াছে। আমি সেই নদীতে যাইয়া স্নান করিলাম। যদিও কেবল বাগবাজারের খালের মত তাহার প্রশস্ততা, তথাপি তাহার জলের এমত প্রবল বেগ যে তাহাতে অবগাহন করিবার সুবিধা নাই। ঘটীতে করিয়া তাহা হইতে জল তুলিয়া মস্তকে দিলাম। সে জল এমনিই

হিম যে বোধ হইল যেন মস্তকের মস্তিষ্ক জমিয়া গেল। স্নান ও উপাসনার পর কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া এখান হইতে প্রস্থান করিলাম। প্রাতঃকাল অবধি ক্রমিক আরোহণ করিয়া দুই প্রহরের সময়ে দারুণঘাট নামক দারুণ উচ্চ পর্ব্বত শিখরে উপস্থিত হইয়া দেখি যে সম্মুখে আর এক নিদারুণ উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ তুষারাবৃত হইয়া "উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহদ্ভয়" ঈশ্বরের মহিমা উন্নত-মুখে ঘোষণা করিতেছে। আমি আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে দারুণঘাটে উপস্থিত হইয়া সম্মুখস্থিত তুষারাবৃত পর্ব্বত-শৃঙ্গের আশ্লীষ্ট (?) মেঘাবলী হইতে তুষার বর্ষণ দর্শন করিলাম। আষাঢ় মাসে তুষার বর্ষণ শিমলাবাসীদিগের পক্ষেও আশ্চর্য্য, যেহেতু চৈত্র মাস শেষ না হইতে হইতেই শিমলা পর্ব্বত তুষার-জীর্ণ-বসন পরিত্যাগ করিয়া বৈশাখ মাসে মনোহর বসন্ত বেশ ধারণ করে। ২রা আষাঢ়ে এই পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিয়া সিবাহন নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হই। সেখানে রামপুরের রাজার একটি অট্টালিকা আছে, গ্রীষ্মকালে রামপুরে অধিক উত্তাপ হইলে কখন ২ শীতল বায়ু সেবনার্থে রাজা এখানে আসিয়া থাকেন। গ্রীষ্মকালে পর্ব্বত তলে আমারদিগের দেশ অপেক্ষাও অধিক উত্তাপ হয়। পর্ব্বত চূড়াতেই বারোমাস শীতল বায়ু বহিতে থাকে। ৪ আষাঢ়ে এখানে হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৩ আষাঢ়ে ঈশ্বর প্রসাদাৎ নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া পথ-শ্রান্তি দূর করিলাম ইতি।*

* আমি জানতুম না, কিন্তু সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে, মহর্ষির আত্মজীবনীর শেষাশেষি এক পরিচ্ছেদে এই ডায়ারির অনেকাংশ সন্নিবিষ্ট আছে। তবে ঠিক ধারাবাহিক অবিকল এই ভাবে নয়। তাই তৎসত্ত্বেও এই আনুপূর্ব্বিক কাহিনীটি প্রকাশযোগ্য মনে করলুম। এর শালও তাতে যা পাওয়া গেল মনে হচ্ছে সিপাইবিদ্রোহের সময়, অর্থাৎ ১৮৫৭ খ্রীঃ। —শ্রীইন্দিরা দেবী

বনলতা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—আচ্ছা মাসি, তুমি যে সেদিন বললে আমার মতো তোমার আর একটি ছিল, কই মাসি, তার কথা তো আমায় শোনালে না।

—তার কথা তুমি তো শোধাওনি অবু!

—আজ শুধোচ্ছি।

—আচ্ছা, কাছে বোসো, বলি। দেখো অবু, তুমি যেমন আমার দিদির ছেলে, তেমনি, আমাকে যে দিদি বলতো তার কথা শোনো ব'সে থির হয়ে।

—মাসি, তোমাকে যে দিদি বলতো সেই তোমার ছোট বোনের নাম কি ছিল মাসি?

—সে আমার মায়ের পেটের বোন ছিল না অবু; তোমার মা আর আমি দুই বোন।

—তবে?

—সে আমাকে ভালবেসে ডাকতো 'দিদি' ব'লে।

—তার নাম?

বনলতা।—হাঁ অবু, এত খবর জানতে চাও কেন? চুপ ক'রে শোনো বলি।

—মাসি, বনলতা ডাকতেন তোমায় দিদি বলে? আমার মনে হচ্ছে আমি দেখেছি তাঁকে খুব ছোটবেলায়।

—না অবু, তুমি আসবার আগেই সে চলে গেল!

—কোথায়?

—রাজবাড়িতে।

—আর ফিরলো না?

—না আর ফেরেনি বনলতা।

—বেশ নামটি!

—জান অবু, রাজার ভাই তাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে চলে গেল, সেখানে

বনলতা নাম পালটে রাজপরিবারের সবাই তাকে অন্য নামে ডাকতে থাকলো।

—তার দরকার কি ছিল মাসি, বনলতা তো বেশ নাম ছিল।

—ওকে বলে রাজকায়দা ; আদরের নাম উলটে বিজলী বাতির মতো জমকালো নামই পছন্দ করলেন বুড়োরানী, বড়োরাজা, বড়ো বউরানী সবাই। রাজবাড়িতে গিয়ে বৈদূর্যলতা নাম হ'ল বনলতার— ফুলশয্যার রাতের গহনাগাঁটির ঝকমকানি দিয়ে গড়া নাম !

—কি করকরে নাম বৈদূর্যলতা মাসি। বনলতার কথা বলো।

—তাই বলবো অবু, কিন্তু তুমি কথার পর কথা চাপা দিলে বলতে পারবো না।

—ব—ন—ল—তা। আচ্ছা মাসি, তুমি যখন আমার মায়ের কথা বল তখন তোমার কথার ফাঁকে ফাঁকে মাকে দেখতে পাই। বনলতার বেলায় তেমনটি হয় না, তাই তো বারে বারে শুধিয়ে চলতে হচ্ছে—কে ছিল কেমন ছিল সে-মানুষটি !

—সে যেই থাক্, শোনো থির হ'য়ে। তোমার বয়সে আমাকে ডেকে বাবা একদিন বললেন, দামিনী, এই তোর ছোট বোন বনলতা। সেই থেকে বনলতা রইলো আমাদের ঘরের মানুষ হ'য়ে। আমাকে সে জানলো তার দিদি ব'লে। একটি কথাও শুধোতে হয়নি বাবাকে, বনলতা কার মেয়ে, কোথা থেকে এল।

—মাসি, আমার মা তাকে দেখেছিলেন ?

—না।

—কেন ?

—অবু, এইখানকার কথা এইখানেই রইলো। যাও খাওয়াদাওয়া করো।

—না মাসি, আমি আর কোনো কথা তুলবো না সত্যি বলছি।

—দেখো অবু, কথা খেলাপ না হয় !

—অবু, তুমি আমাদের ঘরে আসবার আগে এসেছিল সে বনগাঁ থেকে

জয়নগরে বাবার কোলে চেপে ঘুমন্ত এতটুকুখানি ফুট্‌ফুটে একটি মেয়ে—বনলতা। সে যখন চোখ মেলে চাইতো দেখতেম যেন চাঁদের আলো দুটি পাতার ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে—ভারি সুন্দরী ছিল মেয়েটা। 'বাহারবন্ধ' পরগনার বজরা যেদিন এল তাকে নিতে সেদিনের তার চোখের দৃষ্টি আমি ভুলবো না কোনো দিন। সে বললে—দিদি, আমি তবে আসি। আমি তাকে বুকে আগলে কেবলি কেঁদে ভাসালাম। 'আসি' এই কথাটি ব'লে সে গিয়েছিল অবু, কিন্তু দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস, রয়ে গেল সে 'বাহারবন্ধ' পরগনার রাজাদের অন্দরেই বন্ধ। বাবার মুখে শুনলুম তাদের অন্দরের বন্ধখানায় যে-মেয়ে যায় সে যায়, আর ফিরে আসতে পারে না, আপ্তজনের সাথে দেখাশোনা বন্ধ।

—তুমি তো তাকে দেখতে যেতে পারতে মাসি।

—না অবু, সেও হবার জো ছিল না।

—কেন মাসি?

—তাদের রাজকায়দায় বাধতো। আমরা কেউ যেতে পাবো না এই জেনেশুনেই বনলতার খুড়ো তাকে রাজার ঘরে বিয়ে দিয়েছিল।

—তার পর মাসি, কি হ'ল, আর কোনো দিন তার খবর পেলে না বুঝি?

—খবর আসতো অবু, গহনার নৌকোতে মহাজনের গোমস্তার কাছ থেকে। যখন জয়নগরের ঘাটে লাগতো ফিরতি নৌকো 'বাহারবন্ধ' থেকে ব্যাপারিদের নিয়ে, কত কথাই না বলতো তারা—ভালো মন্দ, সুখের দুঃখের, সেখানের ছোটরানীর। শুনতেম আর কাঁদতেম আর মনকে প্রবোধ দিতেম নানা কথা ভেবে।

—এমন জায়গায় কেন পাঠালে তাকে বিয়ে দিয়ে মাসি?

—বনলতার খুড়ো যে রাজাদের গরিব আত্মীয় ছিল অবু—।

—তোমাকে তো তিনি দিদি বলতেন।

—অবু, মাসি ব'লে যে-জোর তোমার উপর করতে পারি, দিদি হ'য়ে সে-জোর কি খাটে অবু?

—তারপর কি হ'ল বলো।

—তারপর অনেক সাল পরে এলো— একখানি ফটো বনলতার কোলে

একটি একমাসের খোকা। ফটোর উলটো পিঠে বনলতার হাতের লেখা—দিদি, আমার খোকাকে পুষ্যি নিয়ে এরা রাজগদি দিতে চাইছে, আমাকে আর খোকাকে লুকিয়ে তুমি জয়নগরে নিয়ে রাখো, লক্ষ্মীটি; আমি তোমার কাছে গেলে নির্ভয় হই।—বাবাকে দেখালেম লেখাটা, বাবা বললেন, উপায় নেই দামিনী, এত সহজ ভাবিসনে তাকে নিয়ে আসা। 'বাহারবন্ধ' বাড়ি তাদের, বেরিয়ে আসার কপাট খুলে বনলতাকে মুক্তি দিতে তোরও নেই আমারও নেই সাধ্য।

—মাসি, তুমি আমাকে পাঠাও, আমি সেই অসাধ্যসাধন করবো।

—ভাবিসনে অবু, ছেলের জন্যে কেঁদে কেঁদে বনলতা অনেক দিন হ'ল তোর মাকে বড়দিদি বলতে চ'লে গেছে রাজবাড়ি ছেড়ে। দুঃখ করিসনে।

—মাসি, বনলতামাসিকে আমার ভারি দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

—ছবিতে দেখাবো একদিন, আজ মন ঠাণ্ডা ক'রে পড়তে বসগে।

সাহিত্যের রূপ ও সাহিত্যবোধ

মনোমোহন ঘোষ

একটি প্রবাদ চলিত আছে, যিনি কবি তিনি জন্ম থেকেই কবি; গড়ে পিটে কাউকে কবি ক'রে তোলা যায় না। যথার্থ প্রতিভা নিয়ে যিনি জন্মগ্রহণ করেন, সাহিত্য সৃষ্টিতে সাফল্যলাভ ঘটে কেবল তাঁরই; আর তেমন দুর্লভ ক্ষমতা নিয়ে যিনি জন্মান নি তাঁর পক্ষে লিখতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। উক্তিটি খুব সত্য হ'লেও সাহিত্য রচনায় উৎসাহীর দল যে দ'মে যাবেন তা নয়, গদ্যে পদ্যে তাঁদের বিচিত্র রচনাচর্চা চলতেই থাকবে। কারণ, শিল্পের কোনো বিভাগেই খুব ঘন ঘন আবির্ভূত হন না সে সকল কৃতী ব্যক্তি যাঁদের মৌলিক রচনা ইতিহাসের উপর সুস্পষ্ট প্রভাবের চিহ্ন এঁকে চলে। কিন্তু জনসাধারণের রসপিপাসা যে কেবল শ্রেষ্ঠ শিল্পীর রচনা নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে থাকবে তা সম্ভবপর নয়। কি সৌন্দর্য সৃষ্টি, কি সৌন্দর্য উপভোগ, দুয়ের বেলাতেই বৈচিত্র্যের নীতি অপরিহার্য। মানবপ্রকৃতি স্বভাবতই পরিবর্তন ভালোবাসে। তাই, এমন একদল লোকের প্রয়োজন, যাঁরা সর্বোচ্চ শ্রেণীর সৌন্দর্য সৃজন না করতে পারলেও, অন্তত সাময়িক ভাবে মানুষের অন্তর্নিহিত শিল্পস্পৃহাকে সন্তুষ্ট করবার মতো কিছু দিতে পারেন। এঁদের সৃষ্টিতে যে-রস, যে-মনোহারিত্ব সুলভ, তাতে হয়ত মৌলিকতার মাত্রা নগণ্য, কিন্তু গঠনকলার (technique) সুষমা নিয়ে তাঁদের রচনা সাধারণ মানুষের রসস্পৃহাকে তৃপ্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট। মাঝারি যোগ্যতাবিশিষ্ট (mediocre) ব্যক্তিরাই শিল্পের আবহমান ধারাকে (tradition) আশ্রয় দিয়ে যুগ থেকে যুগান্তরে পৌঁছে দেন, যে পর্যন্ত না কোনো প্রতিভাবান্ স্রষ্টার ঘটে পুনরাবির্ভাব। তখনি সেই শিল্পধারা আবার তার গতিভঙ্গী বদল করে। সে প্রতিভাবান্ ব্যক্তির জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে আবার দরকার হয় তাঁদের, যাঁরা অপেক্ষাকৃত স্বল্প ক্ষমতা নিয়ে শিল্পধারার গতি অক্ষুণ্ণ রাখবেন।

শিল্পসৃষ্টির নিয়মকানুন নিয়ে যখন আলোচনা হয় তখন এ শ্রেণীর শিল্পীদের কথাই মনে পড়ে সকলের আগে। যে-সব শিল্পীর কাজে প্রতিভার

স্পর্শ খুব সুলভ নয় তাঁদের বিচারের বেলায় গঠনকৌশলের দিকে দৃষ্টি পড়াই স্বাভাবিক। কারণ এঁরা নিজেরাও প্রায়শ গঠনকলার দিকেই দৃষ্টি দিয়ে থাকেন বেশি। অপর পক্ষে, যথার্থ প্রতিভাবান্ শিল্পীর যে মৌলিক সৃষ্টি, সে ওঠে 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি'। তার সুষমা ও সৌন্দর্যকে হঠাৎ দেখে একান্ত অপূর্ব ব'লে মনে হয়। কোনো গঠনগত (technical) নিয়মকানুন দিয়ে এ অপূর্বতার আবির্ভাবকে নিঃশেষে বুঝে নেওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তা সত্ত্বেও এরূপ বুঝবার চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল না হতে পারে। কারণ, সাহিত্যের রূপটিই নজরে পড়ে তার বিষয়বস্তুর আগে। কী বলা হচ্ছে তা ভালো ক'রে জানবার আগেই জানা যায় কেমন করে বলা হচ্ছে। এ বলার ভঙ্গীটি যদি পাঠককে আকর্ষণ করে তবেই শেষ পর্যন্ত তিনি মনোযোগ দিয়ে উক্ত বিষয়ের রস গ্রহণ করতে প্রস্তুত হন। কাজেই কোনো রচনাকে বিচার করতে হ'লে আগেই দেখতে হবে তার বাহ্য রূপ। এদিক দিয়ে সাহিত্যশিল্পের গঠনকৌশল সম্বন্ধে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কেবল সাহিত্য বুঝবার জন্যে নয়, রচনা করবার জন্যেও গঠনকৌশলের (technique) জ্ঞান অপরিহার্য। এমন কি মৌলিক সৃষ্টি করবার মতো ক্ষমতা যাঁদের আছে তাঁদেরও এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কারণ, দেখা গিয়েছে যে, অনেক খ্যাতনামা লেখকেরও রচনায়, এদিক দিয়ে ত্রুটিবিচ্যুতি আবিষ্কার করা সম্ভবপর।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, সাহিত্যের বিষয়বস্তু বড়ো, না তার বাহ্যরূপ বড়ো। এ একটি বেশ শক্ত প্রশ্ন। প্রাচীনভারতের সমালোচকেরা কাব্যের লক্ষণাদি নিয়ে বহু বাদানুবাদ করে গেছেন, এবং বহু তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে যাঁরা সোজাসুজি বা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন যে, রচনার বাহ্যরূপটিই বড়ো, তাঁরাই হলেন দলে ভারী। কিন্তু শিল্প বা সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে মতবাহুল্য (majority opinion) চালাতে গেলে বিপদের আশঙ্কা আছে। তাই প্রাচীনদের মতটিকে একবার পরখ ক'রে নেওয়ার দরকার আছে। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়, বক্তব্য বিষয় ও বলবার ভঙ্গী এ দুয়ের মধ্যে বিষয়বস্তুরই প্রাধান্য ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যাপার তা নয়। এ যেন দেহ ও প্রাণের সম্পর্কের মতো। বিষয়বস্তু হ'ল রচনার দেহ, আর ভঙ্গীটি তার প্রাণ।

বুদ্ধির সাহায্যে লোকের মনে গৃহীত হ'লেই বিষয়বস্তুর কাজ ফুরিয়ে গেল, কিন্তু তার বিশেষ প্রকাশভঙ্গীটি আমাদের চিত্তে যে-চঞ্চলতা, যে-ভাবাবেগ সৃষ্টি করে তা মানবের জীবনলীলার মতোই রহস্যময় ও গতিশীল ; এ রহস্যময়তা ও গতিশীলতার দ্বারাই সহৃদয় পাঠকের অন্তর রসার্দ্র হয়ে ওঠে। এখানেই সাহিত্যের পরম ও চরম সার্থকতা।

এ কথাগুলিকে দৃষ্টান্ত দিয়ে একটু পরিষ্কার ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করা যাক্। রূপ রস ও বর্ণগন্ধের মাদকতা নিয়ে বসন্তকাল যখন হঠাৎ এসে নিখিল যুবজনের চিত্তে প্রবল আবেগ সৃষ্টি করে, তখন তাদের মনে হয় যে, আজ সকল বাধা বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে জীবনকে ভালো করে উপভোগ করা যাক্। এ ধরনের ভাবটিকে প্রকাশ করতে গিয়েই হয়ত বিদ্যাপতি লিখেছিলেন :

"সরস বসন্ত সময় ভল পাওল
দছিন পবন বহু ধীরে।
সপনহুঁ রূপ বচন এক ভখিএ
মুখ সোঁ দুরি করু চীরে।"

[সরস বসন্ত সময় এসেছে, মলয়পবন ধীরে বইছে ; এমন সময় স্বপ্নের মতো এক বাণী বলছে, (হে তরুণি,) তোমার মুখের ঘোমটা খোলো।]

রসপিপাসু মানবচিত্তকে তরুণীরূপে এবং নানা সংস্কারবন্ধনকে তার সুন্দর মুখের অবগুণ্ঠনরূপে কল্পনা ক'রে অনবদ্য ভাষায় ও ছন্দে বিদ্যাপতি যা বলেছেন, তা শ্রোতার চিত্তপ্রবাহে যে চাঞ্চল্য ও ভাবাতিশয্যের সৃষ্টি করে, শুধু নিরলংকার গদ্যে বক্তব্য বিষয়টি বললে কি সে রকমটি ঘটতে পারত ? কখনই নয়। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, বিষয়বস্তুর চেয়ে রচনাভঙ্গী শ্রেষ্ঠ। বলবার ভঙ্গীটির গুরুত্ব এত বেশি যে, তার বদলের সঙ্গে সঙ্গে বিষয় বস্তুটির রসদানের ক্ষমতা আশ্চর্যজনকরূপে বেড়ে যেতে পারে। যেমন পূর্বোল্লিখিত ভাবটি প্রকাশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে।
আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো,

এই সংগীতমুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।

* * *

অতি নিবিড় বেদনা বনমাঝে রে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে,—
দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া
আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে রে।"

* * *

বিদ্যাপতির গীতাংশটির যা বক্তব্য বিষয় উল্লিখিত গানটির বিষয়বস্তু প্রায় তাই হ'লেও এর ভাষায় ও ছন্দে সেটি এমন এক বিচিত্র রূপ গ্রহণ করেছে যার তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার।

অতএব দেখা গেল যে, সাহিত্যে বাহ্য রূপটির মূল্যই সমধিক। এই রূপের বৈচিত্র্য দ্বারাই সাহিত্যিক নিজের চিত্তসঞ্জাত ভাবকে পাঠক বা শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করে থাকেন।

শিল্পের ইতিহাসই হচ্ছে নূতন নূতন প্রকাশপদ্ধতির আবিষ্কার এবং প্রচারের কাহিনী। একই ভাবের প্রেরণা বিবিধ এবং বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কোনো বিশেষ রকম প্রকাশের রাস্তা সে একান্তভাবে আঁকড়ে থাকতে পারেনি। তাই কালে কালে বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রকাশের ভঙ্গী গড়ে উঠল। প্রত্যেক শিল্পই নিজকে নিবেদন করে তার আপন প্রকাশ ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে; কিন্তু প্রত্যেকেরই লক্ষ্য হচ্ছে প্রয়োজনের সীমার বাইরে এমন কিছু সৃষ্টি করার দিকে, যা তার প্রাণীসুলভ অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য নয়, অথচ যা অন্তর্লোকে এক অনির্বচনীয় তৃপ্তির আস্বাদ এনে দিতে পারে। নিরাবরণ ও নিরাভরণ ভাষা, অন্তত আপেক্ষিক বৈচিত্র্যহীন রচনা মানুষকে কদাচিৎ এমন দুর্লভ সম্পৎ দান করতে সক্ষম। অতএব সাহিত্যশিল্প সম্বন্ধীয় আলোচনায় সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিতে হবে এর রচনাভঙ্গী ও রচনাকৌশলের উপর।

সাহিত্যবোধের জন্যে রচনাভঙ্গীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া অত্যাবশ্যক হলেও তার মানে এ নয় যে, বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে বিচারহীন হ'লেও চলতে পারে। এ কথা সত্যি যে, জাগতিক পদার্থগুলির কিয়দংশকে সাহিত্যের

বিষয় ব'লে আলাদা ক'রে নেওয়া অসম্ভব। মানবজীবন ও তৎসম্পর্কিত সব কিছুই সাহিত্যের বিষয় হ'তে পারে; জীবনের সমগ্র প্রসার গভীরতা ও বৈচিত্র্যকে পরিব্যাপ্ত ক'রে আছে সাহিত্য। সকল অবস্থায় সকল কালের মানুষের অভিজ্ঞতা ভাষা পেয়েছে এ সাহিত্যের ভিতর দিয়ে। মানুষ যা দেখেছে, অনুভব করেছে, চিন্তা করেছে, কল্পনা করেছে, জেনেছে,—যে সম্বন্ধে তার আশা, নৈরাশ্য, ভালোবাসা সে-সমস্তই সাহিত্যের বিষয়। রচনাভঙ্গীর আলোচনা কালে এ সকলের দিকেও লক্ষ রাখা দরকার। কিন্তু এও খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। জীবনের রহস্যভেদ শুধু জীবন দিয়েই করা যায়, কোনো বইএর বা অন্য কারুর উপদেশে নয়। উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য বুঝতে হ'লে ও উপভোগ করতে হ'লে চাই জীবনের অজস্র প্রসার, অফুরন্ত অভিজ্ঞতা এবং সে সঙ্গে পর্যাপ্ত কল্পনাশক্তি। কিন্তু এ সকল হঠাৎ হবার নয়, এজন্যে চাই দীর্ঘকালব্যাপী সাধনা। তবে যিনি সাহিত্যের বাহ্য রূপটিকে আয়ত্ত করেছেন তাঁর পক্ষে এ সাধনা অনেকটা সহজ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তিনি অল্পায়াসেই বুঝতে পারেন যে, রচনাভঙ্গী সাহিত্যের প্রাণ হ'লেও রচয়িতার সঙ্গে সে প্রাণের রয়েছে এক অচ্ছেদ্য যোগ। যদিও বোঝাবার জন্যে সাহিত্যিক রচনাভঙ্গীর বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, তবু শুধু বিশ্লেষণের দ্বারা কোনো রচনার মূল উৎসটি আবিষ্কৃত হয় না। এ উৎস হ'ল সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব। এ ব্যক্তিত্বের মুদ্রাঙ্কন থাকে প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনায়; আর তার থেকেই বোঝা যায় অন্য লেখকের সঙ্গে তাঁর লেখার প্রভেদ। মানুষ তার সর্বোত্তম প্রেরণা থেকে যা লেখে বা যে কোনো শিল্প রচনা করে তারি মধ্যে সে নিজেকে ধরা দেয়। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' তাঁর প্রতিভাময় অথচ চাঞ্চল্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রতিবিম্ব মাত্র। আর রবীন্দ্রনাথের নানাবিধ গদ্য পদ্য রচনায় দেখতে পাই তাঁর সুদৃঢ় অথচ শান্তসুন্দর সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্বকে। যে-সব রচনা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পৎ হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে সে-সকলের যথাযোগ্য আলোচনা করলেই রচনার রূপ ও রচয়িতার ব্যক্তিত্বের সম্পর্কটি ভালো ক'রে বোঝা যেতে পারে, এবং এটি বুঝতে পারলেই সাহিত্যের মূল্যনির্ধারণ ও সাহিত্য-উপভোগ এ দুইই কিয়দংশে সুসাধ্য হ'য়ে আসে।

কলিকাতা

আত্মকথা

(জের)

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

যতদূর মনে পড়ে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর আমি বিলেত যাত্রা করি। ১৭ই অক্টোবর তারিখটা বোধহয় ভুল নয়, কারণ ঐ তারিখেই বছরের পর বছর আমার জীবনে এমন একটা কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা কখনো দুঃখের কখনো বা সুখের কারণ হয়েছে। বিলেত যাওয়াটা আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা কি না, সে বিষয় সন্দেহ আছে। বিলেত না গেলেও আমি এখন যা আছি তাই থাকতুম। আমি বিলেতে কোনো বিশেষ বিষয়ে লেখাপড়া শিখতে যাইনি। দাদা আমাকে বিলেত যাত্রা সম্বন্ধে খুব উৎসাহ দেন। তিনি বলেন, ও একবার বিলেত গেলে he will get a fresh lease of life। আমাকে তিনি বলেন যে, বিলেত গিয়ে যেন কোনো য়ুনিভারসিটিতে ভরতি হয়ো না ; তাহলে তুমি এদেশে যেমন কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছ, সেইরকম পাশ করবার চেষ্টা করবে, আর তাতে তোমার শরীর আরো ভেঙে পড়বে। ব্যারিস্টরী পাশ করা কিছু নয় ; সে পরীক্ষায় তুমি অনায়াসে উত্‌রে যাবে। এর থেকে বুঝতে পারছেন যে, সেকালে আমার দেহ ছিল অতি কৃশ। কিন্তু বিলেতে যতদিন ছিলুম আমি একদিনের জন্যও কোনো অসুখে পড়িনি। অবশ্য আমি কোনো ডিগ্রী নিয়ে ফিরিনি ; ফিরেছিলুম কতকটা হৃষ্টপুষ্ট হয়ে এবং ব্যারিস্টরি পাশ করে।

আমি প্রসন্নমনে বিলেত যাত্রা করিনি। বাবা পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। দেশে ফিরে হয়ত তাঁকে দেখতে পাব না, এই ভয় ছিল। উপরন্তু ৩।৪ বছরের জন্য দেশ ছেড়ে যাবার সময় বোধহয় সকলেরই মন অকারণে খারাপ হয়। আমাকে জাহাজে তুলে দিতে গিয়েছিলেন আমার সেজদা কুমুদনাথ চৌধুরী, আর আমার বন্ধু নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। আমার দাদা আশুতোষ চৌধুরী সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন কি না ঠিক মনে নেই। জাহাজখানি ছোট্ট। ৩৫০০ টনের বেশি নয়। আমাদের

কাপ্তেন পথিমধ্যে আমাকে বলেছিলেন যে, এইখানি বোধহয় P. & O. কোম্পানির সব চেয়ে ভাল জাহাজ। বহুকাল সমুদ্রে ভাসছে; কিন্তু এ জাহাজের কখনো কোনো বিপদ হয়নি। গঙ্গাসাগরের মোহানা পেরিয়ে বেলা ১২টা। ১টায় মহাসমুদ্রে অবতরণ করলুম। মহাসমুদ্র দেখে আমার প্রথমে মহা আনন্দ হয়। বিকেলের দিকে খালাসীরা দেখি মাস্তুল থেকে সব পাল খুলে ফেলছে। আমি কাপ্তেনকে জিজ্ঞেস করলুম, এর অর্থ কি? তিনি বললেন, আমরা ব্যারমেটর দৃষ্টে মনে করছি যে, একটা ছোটখাটো ঝড় আসছে; তাই আগে থাকতে জাহাজকে সামাল করে নিচ্ছি।

বিকেলে ঝড় উঠল। সমুদ্রের জল তোলপাড় করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজও নাচতে শুরু করলে। এ নৃত্য লাস্য নয়,— তাণ্ডব। ঢেউয়ের পিঠে চড়ে, উপরে উঠে পরক্ষণেই নীচে পড়ে। একে বলে "পিচ" করা,— "রোল" নয়। এর ফলে প্রথমে গা-বমি করে, তারপরে শয্যাশায়ী হতে হয়। শরীরের এই অবস্থার নাম সী-সিক্‌নেস্। সে অসুখ যে কি কষ্টকর, যিনি নিজে তা ভোগ করেন নি, তাঁকে কথায় বোঝানো যায় না। আমি সেদিন সন্ধ্যা থেকে শয্যাত্যাগ করতে পারিনি; পরের দিনও অবস্থা প্রায় সমানই ছিল। জাহাজে আরোহী খুব কম ছিল। সবে ৫।৬ জন মাত্র। তার ভিতর আমার পূর্বপরিচিত একটি বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন; নাম শশী মুখুজ্যে। তিনি ভাগলপুরের উকিল এবং W. C. Bonnerjeeর ভগ্নিপতি। তিনি বার বার আমার ঘরে এসে খোঁজ নিতে লাগলেন কেমন আছি। একটি ইংরেজ সহযাত্রী— নাম বোধহয় General Channing— আমাকে এসে বললেন, এ রোগের কোনো ওষুধ নেই; তবে তুমি যদি একটু একটু শ্যাম্পেন sip কর, তাহলে এই বমির ভাবটা কিছু কমে যেতে পারে। অপর এক সহযাত্রী ছিলেন সেকালের মেডিকাল কলেজের প্রিন্সিপাল,— নাম বোধহয় Dr. Birch। তিনি এসে বললেন যে, শ্যাম্পেনে তোমার এ রোগ সারবে না। সমুদ্রের এই তোলপাড় বন্ধ হোলেই তোমার এ অসুখ সেরে যাবে। তার দুদিন পরেই আমরা কলম্বোয় উপস্থিত হলুম। শশীবাবু বললেন, শুনলুম কলম্বোয় আমাদের দিন তিনেক থাকতে হবে। অস্ট্রেলিয়া থেকে একটি জাহাজ আসবে, সেই জাহাজের জনকতক আরোহীকে আমাদের জাহাজে তুলে নিতে হবে। তারপর

তিনি প্রস্তাব করলেন যে, আমাকে তাঁর সঙ্গে গিয়ে Galle Face হোটেলে তাঁর অতিথিস্বরূপ থাকতে হবে। আমি সেই হোটেলে গিয়ে উঠলুম; যদিও সেখানে খরচা বেশি। তিনি আমাকে ও তাঁর পুত্র সতীশকে প্রথম দিনটা কলম্বো ঘুরে দেখতে বললেন। কলম্বোয় দেখবার বিশেষ কিছু নেই; শুধু একটি ছোটখাটো মন্দিরে বুদ্ধমূর্তি দেখে চমৎকৃত হয়ে যাই। এমন শান্ত এবং নির্বিকার মূর্তি আমি পূর্বে কখনো দেখিনি। সন্ধ্যাবেলা আমি ও সতীশ Cinnamon Gardens দেখতে যাই। এবং গুটিকতক ছোটো ছোটো মরকুট্টে গাছ দেখে চলে আসি। হোটেলটি আমার খুব ভালো লেগেছিল। বড়ো বড়ো ঘর, সমুদ্রের ধারে। সেখানে একটি breaker ছিল, আর দিবারাত্র তার আওয়াজ কানে আস্‌ত। আমি এই প্রথম অনুভব করলুম যে, টেনিসনে Break, break, break ছোট্ট কবিতাটি কতদূর সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। যথার্থ কবি ছাড়া আর কেউ এটি লিখতে পারত না। সমুদ্রের তটভূমির গায়ে ঢলে পড়ার অবিরত মৃদুধ্বনি মনকে উদাস করে দেয়।

আমার বাবার বন্ধু শশীবাবু বোধহয় তার পরদিন আমাকে ক্যাণ্ডি নিয়ে যান। ক্যাণ্ডি একটি পাহাড়ের উপর অতি সুন্দর জায়গা। এইখানেই ভগবান বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত আছে। স্থানটি অতি মনোরম। ইংরাজী সভ্যতা এই বৌদ্ধ আশ্রমকে প্রায় আক্রমণ করেছে। বৌদ্ধ মন্দিরের অব্যবহিত পূর্বে দেখলুম একটি মাংসের দোকানে বড়ো বড়ো গোরুর ঠ্যাং ঝুল্‌ছে। এ দৃশ্য দেখে আমার মন একেবারে বিগ্‌ড়ে গেল। মনে হল ক্যাণ্ডি ছিল একটি বৌদ্ধ ক্ষেত্র, ক্রমে হয়ে উঠছে রাবণের রাক্ষসপুরী। আমরা সেইদিনই কলম্বোয় ফিরে এলুম। পরের দিন শশীবাবু আমাকে কলম্বো থেকে কিছু দূরে আর একটি নতুন হোটেল দেখাতে রেলে করে নিয়ে গেলেন। নামটি ঠিক মনে নেই। সেটি একেবারে সমুদ্রের ভিতর থেকে গেঁথে তোলা। ইংরেজরা আরাম জিনিসটা বোঝে। সেইদিনই কিম্বা তার পরের দিনই আমি কলম্বো ত্যাগ করলুম।

রাত ১২টায় জাহাজ ছাড়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমরা ভারত সাগরে ভাসছি। Ceylon সম্বন্ধে আমার ৩।৪ দিনের অভিজ্ঞতা এই :— জনগণ সবই বাঙালীর মত দেখতে। তাদের শরীরে শক্তিও নেই, রূপও নেই।

শুধু ক্যাণ্ডিতে পথ-চলতি নরনারী অপেক্ষাকৃত হৃষ্টপুষ্ট। সিংহলে গাছপালার পাতার রঙ আমাদের দেশের মতো ঘোর সবুজ নয়, কচি পাতার মতো ঈষৎ তামাটে। বোধহয় এই কারণেই সেকালে এই দ্বীপের অপর নাম ছিল তাম্রপর্ণী। ভারত সাগর সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নেই। এ সাগর সে সময় ছিল একরকম প্রশান্ত সাগর। আমি তাই জল ছাড়া আর কিছু দেখিনি; এবং আবিষ্কার করি যে, সমুদ্রের রঙ নীল নয়, সবুজ। আমি সী-সীক্‌নেসের জের টেনে চলেছিলুম। অর্থাৎ সমস্ত দিনই গা-বমি করত। ষ্টীমারের একটা বিশ্রী গন্ধ আছে। বোধহয় এঞ্জিনের কয়লার ধোঁয়া এবং রান্নাঘরের মাছ মাংসরান্নার গন্ধ মিলিয়ে এই অপ্রীতিকর গন্ধের সৃষ্টি হয়। Red Seaর মুখে প্রথম এডেন শহরে গিয়ে নামি। এমন sunburnt শহর আমি পূর্বে কখনো দেখিনি। সমস্ত শহর এবং তার বাড়িঘরদ্বোরের রঙ সব পোড়ামাটির,—অর্থাৎ আমাদের দেশের হাঁড়িকলসির রঙ। রাস্তায় বেদুইন দেখেছি; তারাও দেখতে বাঙালীরই মতো। কেবল তাদের রঙ বোধহয় বাঙালীর চেয়ে ফরসা। কিন্তু রোদের তাতে তাদের চামড়া সব ঝলসে কুঁচকে গিয়েছে।

এডেন ছেড়ে আমরা Red Seaতে প্রবেশ করলুম। তার বিষয় আমার কিছু বলবার নেই। দুপাশে মরুভূমি আর তার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র উপসাগর এবং তার অন্তরে ছোটো ছোটো পাহাড় সব ডুবে আছে। সেই সব জলমগ্ন পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে অগ্রসর হতে হয়। যা আমার বিশেষ করে চোখে পড়ে, সে হচ্ছে যে এই সমুদ্রে আরবরা ছোটো ছোটো ডিঙিতে পাল খাটিয়ে এক হাতে হাল আর এক হাতে পালের দড়ি ধরে তীরবেগে এ-পার ও-পার করছে। আমার এই সব পাল-খাটানো ডিঙি দেখতে খুব ভালো লাগে।

দিন দু' তিন পরে Suez হয়ে আমরা Suez Canalএ ঢুকলুম। এটি হচ্ছে মরুভূমির ভিতর খাল কেটে জাহাজ চলাচলের পথ খুলে দেওয়া। এই খালই Africa ও Asiaর স্থলযোগ ছিন্ন করেছে; এবং য়ুরোপ ও এসিয়ার সঙ্গে জলযোগ স্থাপন করেছে। এই স্বল্পপরিসর নালা পৃথিবীর ইতিহাস নতুন করে গড়েছে। আমি এই Suez Canal-এই নানা জাতের জাহাজ দেখি। তুর্কীদেরও একখানি জাহাজ আমার দৃষ্টিগোচর হয়। য়ুরোপের তুর্কীরা দেখতে প্রায় য়ুরোপীয়দেরই মতো; তফাত এই যে, তাদের মাথায় হ্যাট্‌ নেই, আছে

fez। কিন্তু সম্প্রতি সে প্রভেদও উঠে গেছে। বিকেলের দিকে Port Saidএ পৌঁছলুম। সেখানে গাইডের সঙ্গে শহরটি দেখতে গেলুম। এই গাইডরা নানা জাতের; কিন্তু তারা সকলেই ৪।৫ টা য়ুরোপীয় ভাষায় কথা বলতে পারে। Port Said শহরটি একটি বদ্‌মায়েসীর আড্ডা। সেখানে আছে অসংখ্য গণিকালয়। আর ছোটো ছোটো caféতে বসে দেশের ভদ্রলোক সব কফি খাচ্ছে আর backgammon খেলছে। এরা দেখতে আকারে বৃহৎ, ও বেশভূষায় পরিপাটি। তারা সব উচ্চ শ্রেণীর আরব কি Egyptian বলতে পারিনে।

Port Said পার হয়ে আমরা ভূমধ্য সাগরে গিয়ে পড়লুম। মনে হল যে একটা নতুন পৃথিবীতে এসে পড়লুম। আকাশে আলো কম, এবং বাতাসে শীতের একটু শিরশিরে ভাব আছে। ইটালিকে পাশ কাটিয়ে জাহাজ চল্‌তে লাগল। প্রথম প্রথম দেখেছি শুধু জল। এক জায়গায় কেবল Sicily ও ইটালির মধ্যে দিয়ে যখন জাহাজ এগোতে লাগল,তখন এই দুই দেশের তীরভূমি চোখে পড়ল। তারপর ফ্রান্সের দক্ষিণে Marseilles ছাড়া অন্য কোনো জায়গা দৃষ্টিগোচর হয় নি। আমি লণ্ডন পর্য্যন্ত টিকিট কিনেছিলুম, কিন্তু Marseilles-এই নেমে পড়লুম; লণ্ডন পর্যন্ত বাকি পথটা প্যারিসের ভিতর দিয়ে রেলে যাব স্থির করে। আমার সঙ্গে দুটি সিংহলী যুবকও ঐখানে অবতরণ করলেন। এঁদের জাহাজে পূর্বে কখনো দেখিনি; কারণ তাঁরা ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী, আর আমি ছিলুম প্রথম শ্রেণীর। জাহাজের নিয়মানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীরা প্রথম শ্রেণীর ডেকে আসতে পারে না। অবশ্য প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের গতি অবাধ। এই সিংহলী যুবকদের মধ্যে একজনের নাম Dr. Baba। তিনি যাচ্ছিলেন এডিনবরাতে চিকিৎসাশাস্ত্র ভালো করে শিখতে। অপরটির নাম মনে নেই। তিনি ছিলেন একজন burgher, অর্থাৎ সিংহলের ফিরিঙ্গী, দেখতে কিম্ভূতকিমাকার ও ঘোর শ্যামবর্ণ। ডাক্তারটি ছিলেন ফরসা, আর তাঁর নাক চোখ সব আমাদেরই মতো। তাঁর মা ছিলেন ইংরেজ মহিলা, আর তাঁর মামা ছিলেন প্যারিসে একজন ব্যবসায়ী।

Marseilles হচ্ছে সবপ্রথম য়ুরোপীয় শহর যা আমি দেখি। সেখানে বোধহয় ১২ ঘণ্টা ছিলুম। শহরটি আমার খুব ভালো লাগে। সেখানে

ধুলো নেই, গরম নেই ; বরং একটু শীতই আছে। লোকমুখে শুনলুম যে, ও-অঞ্চলে bise ব'লে একটি হাওয়া আসে, যা সঙ্গে নিয়ে আসে কন্‌কনে শীত। আমার শীতবস্ত্র সব বাক্সপ্যাঁট্‌রায় বন্ধ ছিল, তাই আমি একটি দোকানে গিয়ে একটি ছাতা ও এক জোড়া fur-lined দস্তানা এবং fur-lined চটি কিনলুম। দাম খুব বেশি দিতে হয়েছিল। বিলেতে গিয়ে পৌঁছলে মেজদা আমাকে এই ব'লে ধমকান যে, আমাকে ফরাসী দোকানদার ঠকিয়েছে ; বিলেতে যে জিনিস পাঁচ শিলিংয়ে পাওয়া যায়, আমার কাছে তার জন্যে ৩০ শিলিং নিয়েছে। মেজদা তার পরদিনই Hope Bros.-এর দোকানে ছাতাটি যাচাই করতে নিয়ে গেলেন। ফিরে এসে আমাকে বললেন, তারা বলেছে এত দামী ছাতা আমাদের দোকানে নেই ; উপরন্তু বলেছে যে, এ ছাতার দাম ৩০ শিলিংয়েরও বেশি হওয়া উচিত। বিলেতে যে ৩।৪ বছর ছিলুম, আমি ওই তিনটি জিনিসই ব্যবহার করেছি। দেশে ফিরে এসেছিলুম ছাতাটি নিয়ে। ক্রমে তার কাপড় ছিঁড়ে গেলে আমার ভগ্নিপতি উমাদাস বাঁড়ুজ্যে তার বাঁটটি ছড়ি হিসেবে ব্যবহার করবার জন্য আমার কাছে চেয়ে নেন। Marseilles দেখলুম প্রথম শহর যাকে এক কথায় জীবন্ত শহর বলা যায়। আমরা সেই রাত্রেই ট্রেনে প্যারিস যাত্রা করলুম। সে দেশের ট্রেনে শোবার কোন বন্দোবস্ত নেই। বড় বড় আরাম চৌকির মত সীটে বসে যেতে হয়। সকালবেলা ফ্রান্সের যে-প্রদেশের ভিতর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছিল, সে দেশ অতি মনোরম। দুঃখের বিষয় এই যে, কোন স্টেশনে এক পেয়ালা চা পেলুম না ; পাওয়া যায় শুধু কফি। কফি খাবার অভ্যাস আমার ছিল না। এক পেয়ালা চা না পেয়ে আমার ভারি অস্বস্তি করতে লাগল। আমি চা-খোর নই। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে চা না পেলে ঘুম ভাল করে ভাঙে না। আমি এই তুচ্ছ কথাটির উল্লেখ করলুম এই জন্য যে, আমরা যে যা-ই হই, সকলেই বহু তুচ্ছ অভ্যাসের অধীন। মানুষ যাকে personality বলে, তা কতকগুলি বড় এবং অনেকগুলি ছোটর সমষ্টিমাত্র।

সকালবেলা প্যারিসের Gare de Lyons স্টেশনে একটি ঠিকে গাড়িতে জিনিসপত্র তুলে শহরের একটি বড় হোটেলের অভিমুখে রওনা হলুম। প্রথম প্রথম রাস্তাঘাট ভাল কি পরিষ্কার ছিল না। বড় বড় লরিতে শাকসবজি

তরকারি ইত্যাদি যাচ্ছে। শেষটায় Boulevard des Italiensয় পৌঁছলুম। চমৎকার রাস্তা। দু'পাশে Café Riche প্রভৃতি বড় বড় restaurent। গিয়ে নাবলুম Grand Hotelএ। প্রকাণ্ড হোটেল, এবং আরামের সাজসরঞ্জামের কোন অভাব নেই। দিনটা কি করে' কাটালুম মনে নেই। সন্ধ্যার পর হোটেলের সুমুখেই Opera House-এ গেলুম। আমি বিলিতী সংগীতের কোনকালেই সমজদার ছিলুম না। কিন্তু Wagner-এর Valkyrieএর Overture শুনে মনে হল যেন অন্য এক লোকে চলে গেছি। তিন চার শ' খানা বেয়ালা একসঙ্গে বাজছে নানা ভিন্ন সুরে; অথচ এ-সব সুর পরস্পরে বিবাদ করে না, সকলে মিলেমিশে সংগীতের ঝড় বইয়ে দেয়। এই বিরাট এবং প্রচণ্ড সংগীতে লোকের কান চেপে ধরে তোল্লা তোল্লা করে এমন এক লোকে নিয়ে যায়, যেখানে গানের ৪৯ পবন উন্মত্ত হয়ে তাণ্ডবনৃত্য করছে। এই য়ুরোপীয় যন্ত্রসংগীতের ভিতরকার কথা হচ্ছে ধ্বনির পরিমাণ বাড়ানো; অপরপক্ষে আমাদের দেশের সংগীতের উদ্দেশ্য ধ্বনিকে মৃদু থেকে মৃদুতর করা। এক কথায় য়ুরোপীয় সংগীতের আদর্শ হচ্ছে সুরের multiplication আর আমাদের হচ্ছে division। যাঁরা য়ুরোপীয় সংগীতের সঙ্গে হিন্দুসংগীতের আপোষমীমাংসা করতে চান, তাঁরা এ উভয়ের গোড়াকার কথাটা ভুলে যান। আমি য়ুরোপে থাকতে যখনই Wagner-এর কোন অপেরার অভিনয় দেখেছি যথা Tannhaüser, তখনই আমার এই একই কথা মনে হয়েছে। য়ুরোপীয় সংগীত আসলে যন্ত্রসংগীত, এবং ব্যক্তির সংগীত নয়,—সমষ্টির। Politics-এ যাকে বলে totalitarian, তাই। উল্লাসই হচ্ছে এর প্রধান গুণ। আমি প্যারিসে আর কি দেখেছি, তা আমার ভাল মনে নেই। যদি মনে করতে পারি পরে লিখব। আমি বোধহয় দু'রাত্রি প্যারিসে থেকে তারপর লণ্ডন রওনা হই। সঙ্গে impression নিয়ে আসি শুধু আলোর; এত আলো আমি য়ুরোপের আর কোন শহরে দেখিনি। Parisianরা নিশাচর। এবং সন্ধ্যাবেলায়ই এই শহর জেগে উঠে বিলাসে মত্ত হয়।

চেনাশোনা

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

মালাবার পাহাড়ের সমুদ্রতীর ছোটবড় শিলাখণ্ডে বন্ধুর। সেখানে বিহারের স্থান সংকীর্ণ, স্নানেরও পরিসর নেই। কোনো মতে একটা ডুব দিয়ে উঠে আসা তো স্নান কিম্বা অবগাহন নয়। চেষ্টা করলে সেখানেও প্রোমেনাড নির্মাণ করা যেত, কিন্তু জমির দাম এত বেশী যে বাড়ী তৈরির দিকেই নাগরিকদের ঝোঁক। তা ছাড়া পাহাড় ধোওয়া ময়লা জল সেখান দিয়ে নেমে সমুদ্রের জলে মেশে। সেটা অবশ্য বর্ষায়। অন্য সময়েও নর্দামার সঙ্গে সমুদ্রের প্রচ্ছন্ন সম্বন্ধ থাকায় মাঝে মাঝে একটা পচা গন্ধ ওঠে, নাকে রুমাল দিতে হয়। এইসব কারণে কেউ সমুদ্রের ধারে ফিরে তাকায় না, বাড়ীগুলো পশ্চিমমুখী না হয়ে পূর্বমুখী। তবে সূর্যাস্তের বিশাল মহিমা উপলব্ধি করবার জন্যে বাতায়ন খোলা রাখে। আরব সাগরের সূর্যাস্ত ভারতবর্ষের একটা দৃশ্য।

মালাবার পাহাড়ের অপর প্রান্তের এক কোণে চৌপাটি। সেখানে বালুর উপর পায়চারি করে লোকজনের মেলায় আপনাকে মিলিয়ে দিয়ে সন্ধ্যাবেলাটা কাটে। মরাঠা মেয়েরা যায় খোঁপায় ফুলের মালা জড়িয়ে। সাদা ফুল। মাথায় কাপড় দেওয়ার বিধি কেবল বিধবাদের বেলায় মহারাষ্ট্রে। কারণ তাদের কেশদাম মুণ্ডিত বা কর্তিত। সাদা ফুলের কুণ্ডলী দেখে চমক লাগে, সৌরভে নিঃশ্বাস আকুল হয়। প্রকৃতির দেওয়া এই আভরণের কাছে সোনারুপা নিষ্প্রভ, আতর এসেন্স অকিঞ্চিৎকর। গুজরাতী পারসী ললনারা কিন্তু আমাদেরই মতো লজ্জাবতী ও সাজসজ্জায় কৃত্রিমতার পক্ষপাতী। তা হলেও গুজরাতীদের প্রসাধন তাদের ঐশ্বর্যের পরিচয় বহন করে না, তারা সুসংবৃত হয়েই সন্তুষ্ট। তাদের মধ্যে আমি এমন একটা সুষমার সন্ধান পাই যা নিসর্গেরই দান। মহারাষ্ট্রীয়েরা বহু শতাব্দী ধরে মানুষ হয়েছে পাহাড়ে পর্বতে, গুজরাতীরা সমতলে ও সমুদ্রবক্ষে। পারসীদের বসনভূষণের সমারোহ

বোধ হয় ইরানী উত্তরাধিকার। ধনের সঙ্গে ওর গভীর সম্পর্ক নেই, কেননা ধনিক পরিবারেও আমি অকপট সারল্য লক্ষ করেছি।

যাঁদের মোটর আছে তাঁদের মোটরে করে বেড়ানোর জন্যে মেরিন ড্রাইভ। সমুদ্রের পাড় ধরে এই সড়কটি আগে ছিল না, সমুদ্রকে হটিয়ে দিয়ে তার কবল থেকে যে জমিটুকু উদ্ধার করা হয়, এটি তারই সামিল। এক দিকে আরব সাগরের পশ্চাদ্ উপসাগর, ব্যাক বে। অপর দিকে অত্যাধুনিক হর্ম্য। কোনোটি সদ্য নির্মিত, কোনোটি অসমাপ্ত। কালক্রমে এটি মালাবার পাহাড়েরই মতো ফ্যাশনেবল জনারণ্য হবে, মোটরিস্টদের ভূস্বর্গ।

ব্যাক বে দেখে তৃপ্তি হয় না। আমার ভালো লাগে মুক্ত পারাবার। খিড়কির চেয়ে সদর শ্রেয়। সদরের খোঁজে একদিন আমরা শহরের উত্তরে যাত্রা করলুম, হাজির হলুম জুহুতে। জুহুর সমুদ্র পুরীর মতো অবারিত, প্রশস্ত বালুশয্যা দিগন্তে মিশেছে। দূর থেকে অয়শ্চক্রের মতো দেখায় কি না জানিনে, কিন্তু বেলাভূমি বঙ্কিমাকৃতি। তমালতালীবনরাজি না হোক, নারিকেলসারি ঘন সাজে সেজেছে। পাশাপাশি অনেকগুলি বাংলো, কোনোটি যথেষ্ট জায়গা জোড়েনি, গাছের ছায়ায় ঝাড়ের মতো গজিয়েছে। তাদের এক টেরে ঘোষ বলে একজন ইঞ্জিনিয়ার বাস করেন, কাজ তাঁর জুহুর এরোড্রোমে। ঘোষ তখন কাজে বেরিয়েছেন, খবর পাননি যে আমরা আক্রমণ করছি। ঘোষের কেউ নেই, জুহুর সেই হুহু করা হাওয়ায় নারিকেলের পল্লবমর্মরে তাঁর সেই ঘোষবতী বীণার মতো কুটীরখানিতে চিরন্তন উদয়নের চির নূতন ঝংকার উঠছে— শূন্য মন্দির মোর। শূন্য মন্দির মোর।

মানুষের অদৃষ্টে সুখ নেই। সাধ ছিল জুহুতে ঢেউয়ের পিঠে সওয়ার হয়ে সাঁতার কাটব। শুনলুম ঢেউ যেখানে আছে তত দূর গিয়ে কেউ কেউ আরো দূরে চালিত হয়েছে জলজন্তুর জলপানি হতে। শুনে আর সাঁতার কাটা হলো না। হাঁটুজলে হামাগুড়ি দিয়ে জলকেলি সাঙ্গ করলুম। তার পরে ঘোষের চৌবাচ্চায় আমার তিন বাচ্চার অনধিকার প্রবেশ ও অঙ্গ প্রক্ষালন। তবে দিনটা মন্দ কাটল না। বালুর উপর ঝিনুক কুড়ানো, বাড়ী বানানো, পায়চারি থেকে ছুটোছুটি সবই করা গেল সপরিবারে ও সবান্ধবে। দাশগুপ্তরা ছিলেন, চৌধুরীও।

জুহুর সঙ্গে জুজুর সম্পর্ক কাল্পনিক না বাস্তবিক তা বোঝা যায় না, যখন দেখি জেলেরা ঢেউয়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে, জেলেনীরা জাল ধরে টানছে। ভয়ংকরের প্রতি ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই। ভাবছিলুম নারী তো পুরুষের বহিঃসঙ্গিনীও বটে, শুধু গৃহসঙ্গিনী নয়। শ্রমিক শ্রেণীতে এটা স্বতঃস্বীকৃত, যত বিতর্ক কেবল পরাসক্ত শ্রেণীর বেলায়। পুরুষেরা পরগাছা বলে মেয়েরাও পরগাছা।

সেদিন জুহু থেকে ফিরে বেশ পরিবর্তন করে বরযাত্রী হতে হলো। নিমন্ত্রণ করেছিলেন জহাঙ্গীর ব্যাঙ্কার ও তাঁর পত্নী। তাঁদের পুত্র হোমির শুভ বিবাহ। নিমন্ত্রণপত্রে কন্যার নাম তো ছিলই, ছিল কন্যাকর্তা ও কন্যাকর্ত্রীর নামও। নিমন্ত্রণপত্রটি ইংরাজী ভাষায়। বরের ভগিনী থিয়সফিস্ট, সম্ভবত ওয়াডিয়াদের জ্ঞাতি। তিনিই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন বিবাহ-মণ্ডপে।

পারসীদের বিবাহ হয় এমন একটি স্থানে যেটি বরপক্ষ বা কন্যাপক্ষ কারো নিজস্ব সম্পত্তি নয়। খ্রীস্টানদের যেমন গির্জায় গিয়ে দু'পক্ষের মিলন হয় পারসীদের তেমনি এক বারোয়ারিতলায়। তার মালিক পারসীসমাজ। আমরা যেখানে নীত হলুম সেখানটার নাম অল ব্লেস বাগ। All-Bless একটি ইংরাজী সমাস, মানে সর্বমঙ্গল। শোনা যায় এক পারসী কুবেরের ঐ পদবী ছিল, তিনিই সমাজকে ঐ ভূখণ্ড দান করে গেছেন। আর baug মানে বাঘভালুক নয়, বাগবাগিচা। যেমন আরামবাগ। ভূখণ্ডের উপর মণ্ডপ ও অন্যান্য কয়েকটি ভবন বিবাহকালে ব্যবহার করার অধিকার যে কোনো পারসীর আছে, তবে তার জন্যে অনুমতি নিতে হয় ন্যাসীমণ্ডলীর। বোধ হয় কিছু চাঁদাও দিতে হয় ব্যবহারের বিনিময়ে। এই রকম বাগ বম্বে শহরে আরো কয়েকটি আছে, নইলে এক রাত্রে একাধিক শুভকর্ম অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত।

মণ্ডপের প্রাঙ্গণে সারি সারি চেয়ার, লক্ষ করিনি কোনগুলি কোন পক্ষের। মনে হলো তেমন কোনো সীমানির্দেশ নেই, উভয়পক্ষের যাত্রীযাত্রিণীরা নির্বিশেষে সমাসীন। আমরা গিয়ে দেখি প্রভূত জনসমাগম। প্রায় সকলেই পারসী। ব্যাঙ্কার ও তাঁর সহধর্মিণী এসে অভ্যর্থনা করলেন, ঠাঁই

করে দিলেন সামনের দিকে। তাঁরা যে কেবল ভদ্র তাই নয়, অত্যন্ত সরল ও স্নেহশীল। নানা ভাবে পশ্চিমের অনুকরণ করলেও অন্তরে তাঁরা পুবদেশী। আমার তো এক বারও বোধ হলো না যে ইউরোপে এসেছি। ঠাট বদলেছে, কিন্তু প্রাচ্য আন্তরিকতা তেমনি রয়েছে। তেমনি মাসীপিসীর মতো মানুষটি বরের মা। তাঁর কোথাও একরত্তি মেমসাহেবিয়ানা নেই।

পারসীদের সকলের পরিধানে সাদা পোশাক। আমিই একমাত্র কৃষ্ণ মেষ। সারাক্ষণ কুণ্ঠিত ভাবে বসেছিলুম, কী দেখলুম কী শুনলুম সব স্মরণ নেই। মণ্ডপের তিন দিকে জুঁই ফুলের সাজসজ্জা, এক দিক খোলা। সেটি অবশ্য সামনের দিক। মণ্ডপে আসবার পথে বরের মায়ের সঙ্গে কনের মায়ের ডালিবিনিময় হলো। ডালিতে ছিল শাড়ী, নারিকেল ইত্যাদি। তার পরে বরের মা দিলেন কনেকে উপহার, কনের মা বরকে। তার পরে বর কনে দুজনে বসলেন মণ্ডপের উপর দুখানি উচ্চাসনে। যেন রাজা ও রানী। দুজনের দুদিকে দু' পক্ষের পুরোহিত দাঁড়িয়ে। বরের কাছে কন্যাপক্ষের পুরোহিত, কনের কাছে বরপক্ষের পুরোহিত। পুরোহিত ব্যতীত আরো দুজন ছিলেন, সাক্ষী কিম্বা best men। পুরোহিতেরা পরম উৎসাহে বরকন্যার অঙ্গে তণ্ডুল নিক্ষেপ করতে থাকলেন, উচ্চারণ করতে থাকলেন অবেস্তার মন্ত্র। মন্ত্রের মধ্যে সংস্কৃত ছিল। বোধ হয় দীর্ঘকাল ভারতে বাস করে ওটুকু গ্রহণ করা হয়েছে। অথবা হিন্দু ও ইরানী উভয়েরই পূর্বপুরুষ এক, ভাষাও মূলতঃ তাই। যা হোক, পুরোহিতদ্বয়ের পরাক্রম দেখে স্থির করলুম পরজন্মে পারসী হব না। হলে তো কানে ঢুকবে মন্ত্রের বুলেট, চোখে বিঁধবে চালের কার্তুজ। রাজা হয়ে মজা নেই, যদি রানীর পুরোহিত হিতে বিপরীত করেন।

এর পরে সিভিল রেজিস্ট্রেশন। দেখা গেল পারসীরা কোনো অনুষ্ঠান বাদ দেননি। তা হোক, সবই সংক্ষিপ্ত। হিন্দু বিবাহের তুলনায় সময় লাগল সিকির সিকি ভাগ। মাঝে মাঝে নহবতের বদলে ইউরোপীয় নাচের অর্কেস্ট্রা বাজছিল। শেষ হলো যতদূর মনে পড়ে ইউরোপীয় কণ্ঠসংগীতে। অতঃপর পংক্তিভোজন। সারি সারি টেবল চেয়ার, বিরাট ব্যাঙ্কেট। তবে ঐ যে— কলার পাতায় বিলিতী ফলার। বিলিতী মদিরাও ছিল, খুরিতে কি কাঁচের গ্লাসে ঠিক স্মরণ নেই। হাঁড়ি হাতে রাঁধুনী বামুন গম্ভীর ভাবে চলেছেন

সামনে দিয়ে, হাতা দিয়ে তুলে দিচ্ছেন যার যা দরকার। দেশী বিদেশী হিন্দু খ্রীস্টান বিভিন্ন আচার মিলিয়ে সে এক অপূর্ব সমন্বয়। যেমন কস্‌মোপলিটান বম্বে শহর তেমনি কস্‌মোপলিটান তার অগ্রণী সম্প্রদায়।

হোমি ও তাঁর সদ্যপরিণীতা বধূ ভোজনরতদের তত্ত্বাবধান করে গেলেন। এক সঙ্গে বৌভাত সারা হলো। সময়সংক্ষেপের মতো ব্যয়সংক্ষেপও ঘটল। পারসীদের কাছে আমাদের অনেক শেখবার আছে, তবে ঐ নাচের অর্কেস্ট্রাটি বাজে খরচ। বিদায়কালে ব্যাঙ্কারগৃহিণী ও তাঁর কুমারী কন্যা আমাদের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন সযত্নে। এটি বড় সুন্দর প্রথা। যেমন সুন্দর ঐ যূথিকাবিতান।

সন্ধ্যায় আরম্ভ, রাত দশটায় শেষ। উৎসব বলতে আমি এই বুঝি, যাতে নিদ্রার ব্যত্যয় নেই। পারসীরা কাজের লোক, রাতের ঘুম মাটি হলে দিনের কাজ মাটি হবে, এটুকু বিবেচনা আছে। তাই উৎসবকে অনিয়ম বলে ভুল করেনি। কিন্তু একান্ত নিঃশব্দপ্রকৃতি তারা, এত বড় উৎসবেও কলরব করেনি। আমি কিন্তু হৈ চৈ ভালোবাসি। বিয়ের সময় না হোক, ভোজের সময়।

শহরের সাহিত্যিক ও সাহিত্যে আগ্রহীদের সঙ্গে যাতে আমাদের আলাপ পরিচয় হয় তার জন্যে একটি উদ্যান সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া। যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে গুজরাতী সমালোচক ঝাবেরীর ও গুজরাতী লেখিকা লীলাবতী মুনশীর প্রদেশের বাইরেও সুনাম আছে। লীলাবতীর স্বামী কন্‌হাইয়ালাল কংগ্রেসমন্ত্রীমণ্ডলীর উজ্জ্বলতম রত্ন। তিনি যে গুজরাতী সাহিত্যেরও উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক এ সংবাদ সকলে রাখে না। উপরন্তু তিনি একজন সমাজসংস্কারক। অসবর্ণ বিবাহের পথিকৃৎ। সেদিন তিনি শহরে ছিলেন না।

তৈয়বজী পরিবারের ফৈয়জ ও তাঁর পত্নী সেখানে ছিলেন। বম্বের মুসলমানদের এক প্রকার বিশিষ্ট পরিচ্ছদ আছে, ফৈয়জ তাই পরেছিলেন। আচকানের বদলে আলখাল্লার মতো, ফেজের পরিবর্তে সোনালি পাগড়ি, যত দূর মনে পড়ে। তাঁর পত্নীর পরিধানে শাড়ী। তবে তাতেও বোধ হয় বিশেষত্ব ছিল। শাড়ী আজকাল সকলেই পরেন, কিন্তু পারসীরা যেমন করে

পরেন মুসলমানেরা তেমন করে পরেন না, গুজরাতীরা যে ঢঙে পড়েন মরাঠীরা সে ঢঙে না। ক্রমশ একটা নির্বিশেষ রীতি বিবর্তিত হচ্ছে সেটা বিলেত না গেলে মালুম হয় না। সেখানে ভারতীয় মহিলা মাত্রেরই নিখিল ভারতীয় রীতি।

আর ছিলেন কুমারাপ্পাদের এক ভাই, সস্ত্রীক। এঁরা শ্রমিকদের বস্তিতে কর্মীদের শিক্ষালয় চালান। মিসেস নায়ার। এঁর স্বামী ডাক্তার নায়ার ছিলেন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ, প্রায় সমস্ত সম্পত্তি দান করে গেছেন চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্যে। একটি হাসপাতাল, একটি মেডিকেল স্কুল না কলেজ, এমনি আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান চলে তাঁর সদাব্রতে। কৌয়াসজী জহাঙ্গীর-ভগিনী মিসেস সবাওয়ালা। অল্পবিত্ত পারসী মহিলাদের জন্যে ইনি ও এঁর সহকর্মিণীরা মিলে একটি শিক্ষাসত্র খুলেছেন, সেখানে যত রকম হাতের কাজ শেখানো হয়। হাজার হাজার পারসী দুপুর বেলা আপিসে বসে এঁদের কাছ থেকে কেনা টিফিন খেয়ে এঁদের সাহায্য করেন। বহু পারসী পরিবারে এঁরা কেক বিস্কুট জ্যাম জেলি সরবরাহ করেন। শাড়ী বোনা, শাড়ীর পাড় তৈরি, দরজির কাজ, সূক্ষ্ম সেলাই, মাখন তোলা প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যাপার এঁদের আটটি বিভাগকে ব্যাপৃত রাখে। এই ভাবে অসংখ্য মেয়ে দিনে অন্তত আট আনা রোজগার করে। একটি বাড়ীর চারটি মেয়ে মিলে দিনে দুটি করে টাকা রোজগার করলে মাসে অন্তত পঞ্চাশটি টাকা। দক্ষতা অনুসারে উপার্জন বাড়ে।

পরিচয় দিতে দিতে নিতে নিতে পার্টির হাট ভাঙল। হাটের মতো পার্টিও ভাঙে আরেক দিন জোড়া লাগতে। সেদিন আমাদের নিমন্ত্রণ করে গেলেন শ্রীমতী লীলাবতী মুন্‌শী। মুন্‌শীরা বাড়ী করেছেন ওর্লি শহরতলীতে। সমুদ্রের ধারে প্রোমেনাড, তার ওধারে বাড়ী। কন্‌হাইয়ালাল বাড়ী ছিলেন না, মন্ত্রীর কাজে যন্ত্রের মতো ঘুরছিলেন মফঃস্বলে। সাহিত্য সম্বন্ধে যে দুচার কথা হলো তার এইটুকু স্মরণ আছে যে বাংলার মতো গুজরাতীতেও আধুনিকতার বাহন হয়েছেন প্রাচীন সংস্কৃত। গান্ধীজী যে পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রাকৃত জনের খাতিরে প্রাকৃত ভাষায় লিখতে সে পরামর্শ শিকায় তোলা রয়েছে। উন্নততর ভাব প্রকাশ করতে গেলে দুরূহতর শব্দ ব্যতীত

গতি নেই, এই স্বীকৃতি কেবল বাঙালী লেখকদের মুখে নয়, গুজরাতী লেখকদেরও মুখে। আমি যত দূর দেখতে পাচ্ছি, এই গতিহীনতা থেকে আসবে প্রগতিহীনতা, ঘটবে চক্রগতি। অভিধান থেকে নয়, সাধারণ ব্যবহার থেকে সংগ্রহ করতে হবে চিন্তার বাসা বাঁধবার খড়কুটো। চিন্তা একেই আকাশচারী, তার বাসা বা ভাষা যদি আকাশে হয় তবে মাটির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই থাকে না। মানুষের তা ফানুস ওড়ানো।

এই সময় ক্রিকেট ক্লাব সংলগ্ন ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে খেলা চলছিল হিন্দু মুসলমানে। পেন্টাঙ্গুলার বা পঞ্চকোণী ক্রিকেট বম্বের বিশেষত্ব। সম্প্রতি করাচী প্রভৃতি স্থলেও এর প্রসার ঘটেছে। হিন্দু মুসলমান পারসী ইউরোপীয় এই চারটি দল ছিল আগে, এখন হয়েছে দেশীয় খ্রীস্টান এবং আরো কয়েকটি সম্প্রদায় মিলে পঞ্চম দল। ইংরাজেরা যদিও ভারতের মালিক তবু ক্রিকেটের উপর তাদের ভাগ্য নির্ভর করে না। তারা সচরাচর হারে ও তার দরুন লজ্জার ধার ধারে না। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের এ নিয়ে উত্তেজনার ও মর্মবেদনার অবধি নেই। সারা বছর ধরে তারা দিন গুনতে থাকে কবে খেলা হবে, কবে দিল্লীর সিংহাসন ফিরে পাবে। আমি যেদিন খেলা দেখতে যাই সেদিন হিন্দু মুসলমানে ফাইনাল খেলা, চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ। হিন্দুরা দারুণ হারছিল, এমন অকারণে হারতে কখনো কাউকে দেখিনি। সম্ভবত ক্যাপটেনের উপর রাগ করে তারা নিজেদের নাক কাটছিল। মুসলমানেরা ব্যাট হাতে যেই দৌড় দেয় অমনি মুসলিম দর্শকদের তালে তালে তালি বাজে। হিন্দুর বলে যেই মুসলমান আউট হয় অমনি হিন্দু দর্শকদের করতালিতরঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠে। তালির সাহায্যে যদি খেলোয়াড়দের জিতিয়ে দেওয়া যেত হিন্দু মেজরিটির তালপরিমাণ তালি সেদিন তৃতীয় পাণিপথের শোধ তুলত। কিন্তু পাণির পথে পাণিপথ জেতা যায় না। (ক্রমশ)

পত্রাবলী

মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত—

ওঁ আলমোড়া

[পোষ্ট মার্ক—19 Aug 03]

বন্ধু

রেণুকা এখান হইতে যাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তাহার শরীরও বিশেষ ভাল নাই। আগামী সোমবারে এখান হইতে বাহির হইব। শুক্রবার নাগাদ কাশীতে পৌঁছিব— সেখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া ভাদ্র-মাসের শেষ সপ্তাহে কলিকাতায় পৌঁছিব অনুমান করিতেছি। অতএব ইতিমধ্যে মজুমদার লাইব্রেরি হইতে যেন আমার এখানে কোন প্রুফ প্রভৃতি না আসে। দেখা হইলে অনেক কথার আলোচনা করা যাইবে। ইতি বুধবার

আপনার

শ্রীরবীন্দ্র

ওঁ

বন্ধু

আসুন। আর বিলম্ব না। অনেকদিন আপনার অপেক্ষায় আছি। কিছুদিন এখানে থেকে যাবেন ত? অনেক কথাবার্ত্তা আছে। একবার শৈলেশকে নাড়া দিয়ে মজুমদার কোম্পানির অতলস্পর্শ নিশ্চেষ্টতা মন্থন করে দেখ্‌বেন যদি গ্রন্থাবলীর দুই এক টুক্‌রোও হাতে ঠেকে। গত বৎসর আশ্বিনে গ্রন্থাবলী শৈলেশের হাতে দিয়েছি— এর উপর দিয়ে ছ-টা ঋতু চলে গেল— পৃথিবীতে কত ফসল পাক্‌ল ও মাড়াই হয়ে গোলাঘরে মজুদ্ হল— কিন্তু হায় গ্রন্থাবলী। ইতি ৭ই কার্ত্তিক ১৩১০

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

ওঁ

বন্ধু

গোপালবাবুকে বিদায়পত্র দিয়েছি। তাঁর জায়গায় একটি ড্রয়িং ও সংস্কৃত জানা লোক সন্ধান করে দেখ্‌বেন কি? ১৫ টাকা বেতন ও বাসাহার অনেকের পক্ষে লোভনীয় হবে। বিজ্ঞাপন দিয়ে কোন সুবিধে দেখি নে। ভবেন্দ্র বাবু এবং গোপালবাবু এই দুটি বিজ্ঞাপনের লোক একেবারেই অযোগ্য। নিশিকান্ত[১] এলে ভবেন্দ্র বাবুকে বিদায় করে দিতে হবে— আপনি একবার অজিতকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন নিশিকান্ত কি তাঁর পরীক্ষার পরে নিশ্চয় আস্‌তে পারবেন? তাঁকে কত বেতন দিতে হবে সেটাও ভাল করে জানা দরকার। এখন ভবেন্দ্র বাবুকে ৪০৲ দিচ্চি— নিশিকান্ত বাবুকে তার চেয়ে বোধ হয় বেশি দিতে হবে— কিন্তু কত বেশি দিতে হবে সেটা নিশ্চয় করে জানা চাই।

শৈলেশের সঙ্গে কিছু কথাবার্ত্তা হল কি? গ্রন্থাবলীর কি রকম গতিক বুঝলেন? পটলের জন্যে তাকে টাকা দশেক বেশি দিতে হবে সে কথা তাকে বুঝিয়ে বল্‌বেন।

আপনি কবে আস্‌বেন আমি তার জন্যে পথ চেয়ে আছি। আমার চিত্ত ক্ষুধাতুর। আমার মধ্যে বীররস অতি অল্পই আছে— আমি অবলম্বনের জন্যে উৎসুক— বন্ধুর মধ্যে ঈশ্বরের বন্ধুত্ব প্রত্যক্ষ অনুভব করতে আমি ব্যাকুল। আমাকে আপনি মঙ্গলের সরল পথে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত রাখ্‌বেন।

ময়ূরভঞ্জকে একবার আক্রমণ করব। ভয় হয় পাছে তাঁর সাহায্য দ্বারা আমাদের কাজ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বিদ্যালয়কে কোনমতেই পরাধীন হতে দিলে কল্যাণ হবে না— তা হলেই সে দুর্ব্বল হয়ে অধ্যাত্মপথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। কঠোর পথে কঠিন প্রয়াসের সঙ্গে না চল্‌লে নিদ্রার হাত থেকে আত্মরক্ষা করা শক্ত হয়ে পড়ে। আমি শান্তিনিকেতনের জাল থেকে বিদ্যালয়কে মুক্ত করে রাজ-ইচ্ছা ও রাজৈশ্বর্য্যের জালে যদি তাকে জড়িত করি তাহলে কি তপ্ত কটাহ হতে জ্বলন্ত চুল্লিতে পড়া হবে না? যদি আপনার কোন বন্ধু কোন সুবিধামত

১ নিশিকান্ত সেন বর্ত্তমানে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার

জায়গার সন্ধান জানেন হয় তাহলে খবর নেবেন। নানাদিকে দৃষ্টি না রাখলে কৃতকার্য্য হওয়া যাবে না। জগদীশকেও একবার জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। ১৮ই কার্ত্তিক ১৩১০

আপনার
শ্রীরবীন্দ্র

ওঁ

[পোস্ট মার্ক—8 Jan. 04]

বন্ধু

মঙ্গলবার হয় সকালে নয় বম্বাই মেলে কলকাতায় পৌঁছব। বুধবারে দেখা হবে। রবিবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

মজঃফরপুর

বন্ধু

কাশী থেকে আজ আপনার একটা চিঠি ফিরে এল। কাশী থেকে ফিরে এসে এ কয়দিন খুব চুপচাপ করে আছি। আজ আবার শরীরটা একটু ভাল বোধ হচ্চে।

সত্যেন্দ্র সম্বন্ধে বেশি আশান্বিত হওয়া কিছু নয়। সে লিখেছে শরীর সুস্থ হলেই সে আপনার ওখানে যাবে— হয়ত যাবে এবং বোলপুরেও যাওয়া অসম্ভব নয় কিন্তু মানুষের প্রকৃতি সহজে বদলায় না— ও যে সেখানে দীর্ঘকাল টিঁকে থাক্‌বে এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি নে।

প্রিয় বাবুর বাড়ি গিয়ে তাঁর ছেলের সম্বন্ধে সব কথা যথাসম্ভব স্পষ্ট করে নেবেন। আমার বিশ্বাস সেও দিন কতক বোলপুরে থেকে অস্বাস্থ্য বা অসুবিধা উপলক্ষ্য করে চলে আস্‌বে। আপনার জানা লোক কেউ আছে? যাকে আপনি চালনা করতে পারেন? ক্রমে ক্রমে শিক্ষক সংস্কার করতেই হবে।...

জ্ঞানরঞ্জনের টাকা যদি না পাওয়া যায় তবে রমণীকে বল্‌বেন শৈলেশকে যেন নোটিশ দেওয়া হয় যে ছুটির পর থেকে তাকে আর বিদ্যালয়ে লওয়া হবে না। নোটিশের পর যদি নিতে হয় তাহলে পুনরায় প্রবেশিকার পাঁচ টাকা তাকে দিতে হবে।

সতীশের বাপের জন্য যে কাজ স্থির করেছিলেম সে আর খালি নেই। তাঁকে নিয়ে কি করা যাবে তাই ভাবচি।

অরুণকে[২] দীনেশ[৩] বাবুর হাত থেকে যত শীঘ্র পারেন উদ্ধার করে নেবেন। তার পড়াও হচ্চে না স্বাস্থ্যও নষ্ট হচ্চে। এর ফল আমাদেরই ভুগ্‌তে হবে। ছেলেদের শিক্ষার ভারই যথেষ্ট গুরুতর— তার পরে স্বাস্থ্যের ভার চাপানো আর ত সয় না। বিশেষত খোষ পাঁচড়া একজনের হলে অনেক ছেলেরই হবে।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রতন্ত্র সম্বন্ধে ইতিমধ্যে যা পারেন তাই করবেন— পরের উপর নির্ভর করে থেকে কোনো ফল নেই।

ইংরাজি সোপানের কাপি পাঠাচ্ছি। একবার revise করে নেবেন। অনেক জায়গায় যথেষ্ট উদাহরণ দেওয়া হয়নি সেগুলি পূরণ করবেন— Adverbsগুলি ঠিক খাপ খায় কিনা দেখে নেবেন। কারণ, প্রথম লেখার পর sentenceগুলি স্থানে স্থানে বদল ও কমিবেশি হয়ে গেছে— adverb-গুলির সেই অনুসারে পরিবর্ত্তন হয় নি। পাণ্ডুলিপির যে যে অংশ মার্জ্জিনে এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে সেগুলিকে যথাস্থানে বিন্যস্ত করে নেবেন। ইংরাজি সোপান প্রথম ভাগে subject predicate সম্বন্ধে শিক্ষকদের প্রতি যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে আমার বোধ হচ্চে শিশু পাঠকদের পক্ষে সেটা ঠিক উপযোগী হয় নি— ওটা শমীর[৪] মত ছেলেকে বোঝানো শক্ত। ইংরাজি সোপান ১ম ভাগ খুব ছোট ছেলেদের জন্যেই ত।

আষাঢ় মাসের নৌকাডুবি আপনার প্রতিবেশী শৈলেশের হাতেই আছে— আনিয়ে নিতে এবং ফিরিয়ে দিতে কষ্ট নেই— অতএব সহসম্পাদকের দপ্তর আক্রমণ করবেন। কিন্তু সম্পাদকের ভাণ্ডারে যখন হস্তক্ষেপ করছেন

২ অরুণচন্দ্র সেন (দীনেশবাবুর পুত্র) ৩ দীনেশচন্দ্র সেন

৪ শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৯৪-১৯০৭)— কবির কনিষ্ঠ পুত্র

তখন কেবল ভোগ নয় পূরণ করবার ভারও নিতে হবে। আচ্ছা— জিজ্ঞাসা নিয়েই পড়ুন না কেন।

আপনি আবালবনিতা ভাল আছেন ত? ইতি ২৮শে বৈঃ ১৩১১

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বন্ধু

কলকাতার গোলমালে পাক খেয়ে বেড়াচ্চি।

ত্রিপুরার মহারাজের খুড়ো নবদ্বীপ চন্দ্র বাহাদুর তাঁর দুই ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠাবেন লিখেছেন— আরো দু চারটি ছেলে যাব যাব করচে— অতএব নূতন ঘরের দরকার। এ সম্বন্ধে রমণীর সঙ্গে পরামর্শ করেছি।

ছেলেদের লম্বা শোবার ঘরের পূব দিকে যে চৌকো ভূখণ্ড আছে সেই-খানে পঞ্চাশ জন থাকবার ঘর এখনি আরম্ভ করে দিতে হবে। পাকা ইঁটে কাঁচা গাঁথনি— চাল বিলাতী টালির (২ নম্বর), মেজে একফুটের বেশি উঁচু করবার প্রয়োজন নেই।— জানলা দরজা বড় শয়নালয়ের মত (অর্থাৎ যথেষ্ট হাওয়া খেলা চাই)— প্রত্যেক সারে ১৭ জন করে তিন সার ছেলে শুতে পারে এমন চৌকো ঘর করলে ওখানে ধরবে— ঘর বেশি চওড়া হবার আশঙ্কা যদি হয় তবে মাঝে লোহার পোষ্ট্ এক সার দিলে জায়গা মরবে না— এই ঘরের detailed estimate আশুকে বলবেন অবিলম্বে রমণীকে যেন পাঠানো হয়— জানলা, দরজা, খুঁটি, চালের কাঠ প্রভৃতির মাপ, দর ও মজুরির্ বিস্তারিত বিবরণ চাই। দেরি না হয়। লাইব্রেরির ব্যবস্থা শীঘ্র করা যাচ্চে। আলমারি আজ কালের মধ্যেই পাঠাবার চেষ্টা করব। বইও কিছু কিছু কেনা যাবে।

বাবামশায় শান্তিনিকেতনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেচেন। যদি তাঁর যাওয়া হয় ত বড় ভাল হবে।

তিনি এইমাত্র আমাকে ডেকে পাঠালেন বোধহয় এইজন্যই। অতএব আজ এই খানেই ইতি ৩০ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

আপনার

শ্রীরবীন্দ্র

ওঁ

বন্ধু

কলকাতার গোলমালে চিঠি লেখা ভারি শক্ত।

অক্ষয় বাবুর[৫] চিঠি দেখেছেন? জবাব দেবেন। অচুকে[৬] এন্‌ট্রেন্স কোর্সের বই পড়ানো সম্বন্ধে যা লিখেচেন অন্যায় বলে মনে হয় না। ওদের দলকে আর একটু হাল্কা বই ধরাবেন।

যতীনকে বিনা বাক্যব্যয়ে এবং (বিনা মাশুলব্যয়ে) বিদায় করবেন— ও রকম দৃষ্টান্ত স্কুলে রাখবেন না। যারা "ছাই" কথা বলে বা "ছাই" কাজ করে, "ছাই" ভাবনা ভাবে এবং "ছাই" রকমে থাকে তাদের খুব সংক্ষেপে সারা দরকার।

আমি নিকটে থাক্‌লে আপনাদের কাজের বিক্ষিপ্ততা হয়— এখন প্রত্যেক ছেলের প্রতি যথাযোগ্য বিধান চিন্তা করে খাতায় টুঁকে নিয়ে সেই রকম যদি নিয়মিতরূপে অমোঘরূপে কর্ত্তে থাকেন তাহলে চিন্তার কারণ কিছুই থাক্‌বে না। একএকদিন একএকটি ছেলেকে ছুটির সময় ১৫ মিনিট করে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ভাবটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন। ব্রহ্মবিহারীকে ছাড়বেন না। যে কয়টি দলপতি হয়েছে তাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তারা নিয়ত সচেষ্ট থাকে দৃষ্টি রাখ্‌বেন। শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। সকলেরই থালা ঘটি বাটি আনিয়ে নেবেন।

ছেলেদের নিয়মিত সাহিত্যচর্চ্চা প্রয়োজন— তার ব্যবস্থা করবেন। প্রত্যেক ছেলের সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়েই অর্থাৎ লেখাপড়া, রসচর্চ্চা, অশনবসন, চরিত্রচর্চ্চা, ভক্তিসাধন প্রভৃতি সব তাতেই আপনি ঘনিষ্ঠ যোগ রাখবেন— আপনি তাদের বিধাতার প্রতিনিধি হবেন। প্রত্যক্ষ আপনার সঙ্গে তাদের

[৫] অক্ষয়চন্দ্র সরকার

[৬] অচ্যুতচন্দ্র সরকার (অক্ষয় বাবুর পুত্র)

সর্ব্বাংশের সম্বন্ধ থাক্‌বে এই আমার ইচ্ছা— বলা সহজ করা কঠিন, তবু এইটেই আমাদের বিদ্যালয়ের একমাত্র আইডিয়াল। হৃদয়ের সাহায্যে ছেলে মানুষ করতে হয় কলের সাহায্যে নয় এইটে আদত কথা— কিয়ৎ পরিমাণে কলের দরকার হয়ে পড়েই কিন্তু সে কল আপনি নন্— অন্য শিক্ষকেরা— আপনি যন্ত্রী, আপনি মানুষ।

এই সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক চিন্তা করে আপনার সমস্ত কৃত্য সবিস্তারে টুঁকে নেবেন এবং প্রত্যহ কাজের সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন। শিক্ষকদের যে আদেশ· উপদেশ দেবেন সেটা লিখে রাখবেন এবং পালিত হচ্ছে কি না বারম্বার একটা বিশেষ নিয়মে যাচাই করে নেবেন। অর্থাৎ কোনো কাজই ক্ষণিক উদ্যমে পর্য্যবসিত না হয় তাকে প্রাত্যহিক কাজে নিয়মিত চালিয়ে নেবার জন্য একটা বিধানের যন্ত্র গড়ে নিতে হবে— এবং সেই যন্ত্রের দ্বারা আর সকলকে চালনা করেও নিজেকে কোনোমতে আচ্ছন্ন করতে দেবেন না— আপনি সারথিরূপে মানুষরূপে উপরে দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন— এবং আমি অকর্ম্মণ্য সুদূরে পড়ে থাক্‌ব মাঝে মাঝে আপনার আতিথ্য গ্রহণ করব। আমাকে টানবেন না— আপনাদের এই জগন্নাথের রথের আমি কোনো অংশই নই। আমি দূর হতে এর চালনা নিরীক্ষণ করে আপনার কাছে সানন্দ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব। আপনার কাছে এই আমার সবিনয় নিবেদন। ইতি ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ কলিকাতা

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

৫

বন্ধু

অক্ষয় বাবুকে আশ্রয় দিয়া ভালোই করিয়াছেন— কাজে লাগিবেন। আমাদের বিদ্যালয়ে নানাপ্রকার ফাল্‌তো কাজ আছে— সর্ব্বদাই দুটি একটি ফাল্‌তো লোকের দরকার হয়ে পড়ে। অতএব ওখানে অক্ষয় বাবুর মত ঐ রকম মুসাফের শিক্ষকের যাতায়াত প্রচলিত থাকা ভাল।

আলমারিচতুষ্টয়ের শুভাগমনসংবাদ শুনে খুসি হওয়া গেল। তাদের আকার-আয়তনটা কি রকম বলুন দেখি?

আমার গৃহনির্ম্মাণের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। আশুর উপরে তার দরজার বসাবার ভার দিয়ে এসেছিলেম। সে সম্বন্ধে তার কোন রকমের চেষ্টার লক্ষণ দেখ্‌চেন কি? এ কাজে যাতে তার উৎসাহ হয় আদেশ উপদেশ ও অনুশাসনের দ্বারা আপনি তার ব্যবস্থা করে দেবেন। আপনার নিজের আশ্রম-রচনার সংবাদ কি?

লাইব্রেরিঘরে শিক্ষকদের স্থান করে দিয়ে আপনি একটুখানি নিরালা হতে পেরেচেন কি? তা না হলে আপনি ভাল করে কাজ করতে পারবেন না। ক্ষুদিরামের কাজ কিরকম চলচে? খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি সময়মত চল্‌চে কিনা জান্‌তে উৎসুক আছি।

ছেলেদের মধ্যে (বিশেষত নূতন ছেলেদের মধ্যে) আমাদের বিদ্যালয়ের ভিতরকার আদর্শটি মুদ্রিত করে দেবার বিশেষ চেষ্টা করবেন। আপনি তাদের নিয়মমত নিজের কাছে ডেকে নিয়ে কথাবার্ত্তা কবেন— তাদের সঙ্গে যোগ রাখ্‌বেন। ব্রহ্মবিহারী প্রভৃতিদের ভুল্‌বেন না।

ছাত্ররা কি আজকাল পূর্ব্বের মত শিক্ষকদের সেবায় নিযুক্ত হয়েছে? ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্বন্ধ যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ করে দেবেন।

আমি এখানে যথেষ্ট কুঁড়েমি করেও একটু আধটু সময় পাই— সেই সময়টুকুতে নৌকাডুবি লিখ্‌তে আরম্ভ করেছি। সেটুকু কাজ না করতে পারলে বিশ্রামটা নিষ্কণ্টক হতে পায় না।

রথী দিনু[৭] এতদিনে সম্ভবত আলমোড়া থেকে নেবে আস্‌চে। তাদের, পথের মধ্যে মজঃফরপুর হয়ে যেতে টেলিগ্রাফ করেছি।

ইংরাজি সোপান দ্বিতীয় খণ্ড ছাপা হল কি? শিশুদের ইংরাজি শেখাবার নূতন প্রণালীটাও আমাদের ছাপতে হবে।

আজ তবে ইতি। ১০ই আষাঢ় ১৩১১

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

৭ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[পোষ্ট মার্ক—11 Aug 04]

বন্ধু

বিদ্যালয় নিয়ে ব্যস্ত আছি। অনেক বিশৃঙ্খলা। অক্ষয় বাবু আজ পর্য্যন্ত অনুপস্থিত, নগেন্দ্র বাবু জ্বরে পড়েছেন। ছাত্ররা শাসনাভাবে উদ্ধত। আমার শরীর অপটু।

ইংরাজি সোপান দ্বিতীয় ভাগ আজও না আসাতে ছেলেদের পড়ার অত্যন্ত ক্ষতি হচ্চে। যদি শৈলেশকে ছাপতে দিতেন তবে এর চেয়ে বিলম্ব হত না এবং মূল্য দিতেও হত না— নগদ দামও দেওয়া যাচ্চে অথচ ফলও পাওয়া যাচ্চে না— আমার বাড়ি তৈরির দশা আর কি।

আপনার শরীর কি রকম? আশা করি আপনার ঘরের খবর সব ভাল। ইতি বুধবার

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আগামী রবিবার গিরিধি পালানো স্থির করেছি-- এখানকার কর্ম্ম ও চিন্তাভার সহ্য হবে না।

ওঁ

বন্ধু

এ কয়দিন ভালই আছি। এখানে একটি ঢাকায় পাস করা ওভাসিয়রের সন্ধান লইয়া জানিলাম যে ৩০।৩৫ টাকায় এমন লোক পাওয়া যাইতে পারে যিনি workshop-এর শিক্ষাভার লইতে পারেন। তিনি সর্ভেয়িং ও অঙ্ক শিখাইতে পারিবেন— ড্রাফ্‌ট্‌ম্যানের কাজও শিখাইবেন কিন্তু চিত্রবিদ্যা রীতিমত চলিবে না। যা হউক, সন্ধানে আছি। বোলপুরেই রথী সন্তোষদের জন্য ব্যবস্থা করা যাইবে। ভারতবর্ষের ইতহাসটা যথার্থভাবে উহাদের শেখানো দরকার। ত্রিপুরায় চিঠি লিখিয়া চেষ্টা দেখা যাইবে। আমাকে ইংরাজি সোপান ২য় ভাগ একখানা পাঠাইয়া দিবেন— কারণ ৩য় ভাগ লিখিতে হইবে। বোলপুরে শুনিলাম ২।৩টি ছাত্রের জ্বর হইয়াছে।

ছুটি পর্য্যন্ত কাটিয়া গেলে বাঁচা যায়। এখানে আমি আসার দিন হইতে ঘোরতর বাদল উপস্থিত হইয়াছে। রথী ভাল আছে। ইতি ৫ই ভাদ্র ১৩১১

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বন্ধু

বিদ্যালয়ে ভাল ডাক্তার নিয়োগ সম্বন্ধে আমি নিশ্চেষ্ট আছি মনে করবেন না। আমার দ্বারা যা হতে পারে তা হবেই।

আমি সকল কথা ভালরূপ চিন্তা করে নিয়ে যখন কলকাতায় যাব তখন সুহৃদ্‌গণ মিলে মন্তব্য আলোচনা ও কর্ত্তব্য স্থির করব।

একটা গুরুতর ঘটনা যখন ঘটে ঠিক সেই সময়টা বিচারব্যবস্থার পক্ষে অনুকূল নয়। একটু সময় নিয়ে মনকে শান্ত করে বিদ্যালয় সম্বন্ধে সমস্ত কথা আগাগোড়া স্থির করতে হবে। ইতি ১৪ই ভাদ্র ১৩১১

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বন্ধু

শুভ ঘটনা উপলক্ষ্যে আমার অভিনন্দন গ্রহণ করিবেন। ঈশ্বর প্রসূতি ও নবকুমারীকে নিরাময় করুন।

আশা করি, এতদিনে বিদ্যালয় সম্বন্ধে আপনার উদ্বেগ দূর হইয়াছে। আপনি বিদ্যালয়ের কর্ণধারপদে আছেন। সঙ্কট উপস্থিত হইবামাত্র আপনি যদি হাল ছাড়িবার ব্যবস্থা করেন তবে যাহাদিগকে চালনা করিতেছেন তাহারা বল পাইবে কিরূপে? আপনি স্বভাবতই অত্যন্ত উৎকণ্ঠাপরায়ণ— কিন্তু এ ভাবটা আপনাকে কাটাইয়া উঠিতেই হইবে এবং একথা স্মরণে রাখিতেই হইবে। বর্ত্তমানে যেরূপ ঘটিয়াছে ভবিষ্যতে এরূপ অথবা ইহা অপেক্ষা গুরুতর কিছু ঘটিতে পারে। কাজ করিতে বসিয়া আমরাই যে সমস্ত

বিঘ্ন হইতে অব্যাহতি পাইব এমন অসম্ভব সৌভাগ্য আশা করি না। ইতি ১৭ই ভাদ্র ১৩১১

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

গিরিডি

বন্ধু

আপনি যদি গিরিডিতে আসিতে পারেন ত আমি খুসি হইব। আগামী সোমবারে যতী[৮] ত্রিপুরার মধ্যম রাজকুমারকে লইয়া এখানে আসিতেছেন— তাঁহাদের জন্য একটি বাড়ি ঠিক করিয়াছি, এখানে আপনি আসিলে থাকার কোনো ব্যাঘাত হইবে না— কথাবার্ত্তাও বেশ তৃপ্তিপূর্ব্বক হইবে এবং আমার বিশ্বাস আপনার শরীরটাও একটু স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে। আমি ত দিব্য সুস্থ আছি— এরূপ ঘটনা আমার ইতিহাসে স্মরণীয় দিনের মধ্যে ঘটে নাই। আমি কলিকাতায় যাইবার উৎসাহ বারম্বার সম্বরণ করিয়াছি— সে আবর্ত্তের মধ্যে আমি শীঘ্র কোনো মতেই ধরা দিব না— যাহা ঘটে ঘটুক। নহিলে আমারই আপনাদের কাছে যাওয়া উচিত। আমি সুবোধকে[৯] আপনার কাছে পাঠাইয়াছিলাম— তাহার মুখে আপনার সমস্ত সংবাদ পাওয়া গেল। অন্তঃপুরের খবর ভাল শুনিয়া নিরুদ্বিগ্ন হইলাম। ইতি ২৬শে ভাদ্র ১৩১১

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বন্ধু

একটি ছোট বাড়ি অল্প ভাড়ায় পাওয়া যায়। শোনা গেল তার স্বত্বাধিকারী আপনারি পরিচিত বন্ধু এবং তিনি আপনার জন্যে এই বাড়িটা ঠিকঠাক করতে আদেশ পাঠিয়েছেন অতএব যখন খুসি এসে পড়তে পারেন। কিছু

যতীন্দ্রনাথ বসু ৯ সুবোধচন্দ্র মজুমদার

গৃহসজ্জা এই বেলা থেকে পাঠাতে স্থুরু করবেন— আর ত অধিক বিলম্ব নেই।

শরৎ[১০] মজঃফরপুর থেকে কলকাতায় এসেছে। সে বেলাকে[১১] নিয়ে যাবার পূর্ব্বেই আমি একবার তাদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে চাই। তাছাড়া ছুটি ফুরোবার পূর্ব্বে বোলপুর বিদ্যালয়ের জন্য যথাকর্ত্তব্য এই বেলা করে রাখতে হবে। এবন্ধ, বেচারা শ্রীশবাবু[১২] গৃহস্থ মানুষ, তাঁর প্রতিপাল্য বিস্তর আছে— তার উপরে এবারে তাঁর এখানে অতিথিসমাগমের কিছু বাহুল্য হয়েছিল— এঁকে আর ভারগ্রস্ত করা অন্যায় হবে। আবার সত্যেন্দ্র এখানে আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য দরবার করেছে— আমি আর এঁকে বিব্রত করতে ইচ্ছা করিনে। অতএব আমি শীঘ্রই যাব স্থির করেছি।

কলকাতায় গিয়ে রথীদের পড়ানো সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে পরামর্শ হতে পারবে। ইতি ৬ই কার্ত্তিক ১৩১১

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

বন্ধু

এখানে কিছুদিনের জন্যে সপরিজনে আপনার আসা একেবারে অসম্ভব নয় একথা যখন একবার আপনার কলমের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছে তখন ওটাকে আর ফিরিয়ে নেবেন না— কারণ শাস্ত্রে বলে অসৎ লোকের কথা কচ্ছপের মাথার মত কিন্তু সৎলোকের বচন গজদন্তের মত একবার বেরলে আর ফেরাবার জো নেই। আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না এবং আপনাদেরও অসুবিধে না হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখব। কবে আস্‌বেন অবিলম্বে লিখে পাঠাবেন।

লাহোরের পাত্রটির কথা শঙ্কর[১৩] পণ্ডিত আমার কাছে উত্থাপন করেছিলেন কিন্তু আমি তাতে কর্ণপাত করিনি কোনো পাত্রকে আমি বিলেতে পাঠাতে চাইও নে, পার্ব্বও না,— অতএব ঘোষালের আশা করবেন না।

১০ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী—জ্যেষ্ঠ জামাতা ১১ আসল নাম মাধুরীলতা (১৮৮৬-১৯১৮)—কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা
১২ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ১৩ উদয়শঙ্করের পিতা

যাই হোক্ আপনাদের এখানে আসাটা চাই— বড় বড় ঝড়বৃষ্টি প্রতিদিন মাঠে মারা যাচ্চে— আপনি থাক্‌লে খুসি হতেন। ইতি ২৩ শে বৈশাখ ১৩১২

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[পোস্ট মার্ক—Bolpur 16 My. 05]

বন্ধু

চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেম। অর্শের বেদনায় ভুগচি। আাগামী সপ্তাহে কবে আসবেন লিখে পাঠাবেন। আমার প্রায় শয্যাগত অবস্থা।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি

মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীসমরেশ চৌধুরী।

[এই গানটি শুনতে পাই রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবন পর্যন্ত অতি প্রিয় ছিল। ভানুসিংহের পদাবলীর মধ্যে এটি যে উত্তম স্থান অধিকার করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং শান্তিনিকেতনে এসেও দেখছি এটি খুব লোকপ্রিয়, কারণ ইতিমধ্যে অনেকেই আমার কাছে শিখতে চেয়েছেন। ক্রমে ক্রমে এইরূপ অপ্রকাশিত জনপ্রিয় গান প্রকাশ করবার ইচ্ছা রইল।— শ্রীইন্দিরা দেবী।]

ঋা II {মা মা মা পা। পা -দপা -মপা -দণা I দপা মজ্ঞা -া: -ঋ:।
ম র ণ রে তুঁ হু ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম০ ম ০ ০

॥
[-া]
। -সণ্‌া -সা -া -া I সঋা -জ্ঞমা জ্ঞা ঋা। সা -া -া ঋা} I
০ ০ ০ ০ ০ শ্যা০ ০ ০ ম স মা ০ ন্‌ ম

I সা -া সা সা। সা সা সা সরা I জ্ঞা -া জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞমা -া মা মা I
মে ০ ঘ ব র ণ তু ঝ০ মে ০ ঘ জ টা ০ জূ ট

I মপা -মপমা জ্ঞরা জ্ঞা। রা জ্ঞা রা জ্ঞা I সঋা -জ্ঞমা জ্ঞা জ্ঞা।
র ০ ০ ক্ত০ ক ম ল ক র র০ ০ ০ ক্ত অ

। জ্ঞঋা ঋা সা সা I সা -দা দা দপা। পা -া পা পা I
ধ র পু ট তা ০ প বি০ মো ০ চ ন

I দা ণা পা ণদা। -ণদা পা মা মা I মপা -মপমা জ্ঞরা জ্ঞঋা।
ক রু ণ কো ০ র ত ব মৃ০ ০ ০ ০ ত্যু০ অ০

। সা ঋা জ্ঞা মা I জ্ঞঋা -জ্ঞঋা -সা -া । ঋা ঋপা মা মা I
মৃ ত ক রে দা৹ ৹ ৹ ৹ ন্ তুঁ হু ম ম

I জ্ঞঋসা -রজ্ঞমা জ্ঞা ঋা। সা -া -া ঋা II
শ্যা৹৹ ৹ ৹ ৹ ম স মা ৹ ন্ "ম"

I { সদা -া দা দা। দা -ণা দণা -র্সর্ঋর্জ্ঞা I র্ঋর্সা র্সা র্সা র্সা।
আ ৹ কু ল রা ৹ ধা৹ ৹ ৹ ৹ রি৹ ঝ অ তি

। র্সা র্সা র্সা র্সণদা I দা দর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা। র্রা র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞর্ঋর্সা I
জ র জ র৹ ৹ ঝ র ৹ ই ন য় ন দ উ৹ ৹

I র্সা র্সর্ঋর্জ্ঞা র্ঋা র্ঋর্সা । র্সা র্সা ণদা দা } I দা দা দা দপা ।
অ নু৹ ৹ খ ন৹ ঝ র ঝ৹ র তুঁ হু ম ম৹

। পণা -ণদা পা মা I মদা দা দা দা । দণা -র্সর্ঋা র্সা র্সা I
মা৹ ৹ ধ ব তুঁ হু ম ম দো৹ ৹ ৹ স র

I পা পণা দা দপা । মপা -দণা দা পা I মজ্ঞা -া -া -ঋসা ।
তুঁ হু৹ ম ম৹ তা৹ ৹ ৹ প ঘু চা৹ ৹ ৹ ৹ও

। সা ঋা জ্ঞা মা I জ্ঞা -রজ্ঞমা জ্ঞা ঋা। সা -া -া ঋা II
ম র ণ তুঁ আ ৹ ৹ ৹ ও রে আ ৹ ৹ "ম"

I সা সা সা -া । সা -া সা সরা I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা -া ।
ভু জ পা ৹ শে ৹ ত ব৹ ল হ স ম্

। মা -া মা মা I মপা -পমা জ্ঞা -জ্ঞা। -রা জ্ঞা রা জ্ঞা I
বো ৹ ধ য়ি আঁ৹ ৹ খি পা ৹ ত ম ঝু

I সঋা -জ্ঞমা জ্ঞা জ্ঞা । সজ্ঞা -জ্ঞঋা সা সা I সা -দা দপা পা।
দে৹ ৹ ৹ হ তু রো৹ ৹ ধ য়ি কো ৹ র ৹ উ

। পা পা পা পা I পদা -ণা দা দা । পদা -মপা মা মা I
প র ভু ঝ রো৹ ৹ দ য়ি রো৹ ৹ দ য়ি

I মপা -পমা জ্ঞা জ্ঞঋা । সা ঋা জ্ঞা মা I জ্ঞা -জ্ঞঋা -া -জ্ঞঋা ।
নী৹ ৹ দ ভ৹ র ব স ব দে ৹ ৹ ৹ ৹

। সা -া -া -া I { -সদা দা দা দা । দা ণা দা ণা I
হ ৹ ৹ ৹ তুঁ হু ন হি বি স র বি

I র্সা র্সজ্ঞা র্ঋা র্ঋা । র্সা -া র্সা র্সা I ণদা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া ।
তুঁ হু৹ ন হি ছো ৹ ড় বি রা ৹ ধা ৹

। র্রা র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞঋা I র্সা র্সজ্ঞা র্ঋা র্ঋা । র্সা -ণর্সা ণদা দা } I
হৃ দ য় তুঁ৹ ক ব৹ হু ন তো ৹ ড়৹ বি

I দা দা দা দপা । পণা -ণদা পা মা I মদা দা দা দা ।
হি য় হি য়৹ রা৹ ৹ খ বি অ নু দি ন

। দা ণর্সর্ঋা র্সা র্সণদা I পা পণা দা দপা । মা মপা -দণা দপা I
অ নু৹৹ খ ন৹৹ অ তু৹ ল ন৹ তোঁ হা৹ ৹৹ র৹

I মজ্ঞা -মা জ্ঞা -া । -া -ঋা -সণ্‌সা -া I { সা সা সা সা ।
লে৹ ৹ হ ৹ ৹ ৹ ৹৹৹ ৹ গ গ ন স

। সা সা সা সরা I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞমা মা । মা মা মা মা I
ঘ ন অ ব৹ তি মি র৹ ম গ ন ভ ব

I মপা পমা জ্ঞরা জ্ঞা । রা জ্ঞা রা জ্ঞা I সঋা -জ্ঞমা জ্ঞা জ্ঞঋা ।
ত৹ ড়ি ত৹ চ কি ত অ তি ঘো৹ ৹৹ র মে৹

। -সঋজ্ঞা ঋা সা সা } I সা -দা দা দা । -পা পা পা পা I
৹৹৹ ঘ র ব শা ৹ ল তা ৹ ল ত রু

I দা ণা দা দপা । পণা দপা মা মা I মপা -ণমা জ্ঞা জ্ঞঋা ।
স ভ য় ত০ ব০ ধ০ স ব প০ ০ স্থ বি০

। সা ঋা জ্ঞা মা I জ্ঞঋা -া -া -জ্ঞঋা । -সা -া -া -া I
জ ন অ তি ঘো০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ র্

I { সদা -া দা দা । দা -ণা দা ণা I র্সা র্সর্জ্ঞা র্ঋা র্ঋা ।
এ ০ ক লি যা ০ ও ব তু ঝ০ অ ভি

। র্সা -া র্সা -া I ণদা র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্রা র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞর্ঋা I
সা ০ রে ০ তুঁ হু ম ম প্রি য় ত ম০

I র্সা র্জ্ঞা র্ঋা র্ঋা । র্সা -ণর্সা ণা -দা } I দা দা দা -পা ।
কি ফ ল বি চা ০ রে ০ ভ য় বা ০

। পণদা -া পা মা I মদা দা দা দা । দা ণর্সর্ঋা সা র্সা I
ধা০ ০ স ব অ ভ য় মু র তি০০ ধ রি

I পা -ণা দা দপা । মপা -দণা দা দপা I মজ্ঞা -া -া -রজ্ঞমা ।
প ০ স্থ দে০ খা০ ০০ ও ব০ মো০ ০ ০ ০০০

। -জ্ঞা -ঋা -সণ্সা -া I { দা -া দা দা । দা -ণা দা ণা I
০ ০ ০০০ র্ ভা ০ নু ভ নে ০ অ য়ি

I র্সা -র্জ্ঞা র্জ্ঞর্ঋা -া । র্সা র্সা র্সা সণা I ণদা -র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা ।
রা ০ ধা ০ ছি য়ে ছি য়ে০ চ ন্ চ ল

। র্রা -র্জ্ঞা র্রা জ্ঞর্ঋা I র্সর্ঋা -র্জ্ঞা -র্ঋা -জ্ঞর্ঋা । র্সা -া -া -ণদা } I
চি ০ ত্ত তো০ হা০ ০ ০ ০০ রি ০ ০ ০

I পদা -া দা দপা । পণা -পদা পা মা I মদা দা দা দা ।
জী ০ ব ন০ ব০ ল্ ল ভ ম র ণ অ

। দা ণর্সঋা র্সা -ণদা I পা পণা দা দপা। মপা -দণা দা পা I
ধি ক০০ সো ০০ অ ব তুঁ হু০ দে০ ০০ থ বি

I মজ্ঞা -া -া -রজ্ঞমা। জ্ঞা -ঋা সণ্‌সা ঋা II II
চা০ ০ ০ ০০০ রি ০ ০০০ "ম"

সঞ্চয়

যুদ্ধোত্তর পৃথিবী

পৃথিবীব্যাপী আজ যে লঙ্কাকাণ্ড চল্‌ছে একদিন এর পরিসমাপ্তি ঘট্‌বে। কিন্তু উত্তরকাণ্ডে কি করে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হবে এবং মানবসমাজের কি ভাবে রূপান্তর ঘট্‌বে এইটিই হচ্ছে আজকের দিনে সব চাইতে বড় প্রশ্ন। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এসব মুনিরা দয়া করে যদি মৌনাবলম্বন করতেন তবেই বরং ভালো ছিল; কারণ মত প্রকাশ করতে গিয়ে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ যে সব কথা বলেছেন তাতে কোনো দেশের জনসাধারণই আশ্বস্ত হয়নি বরং অধিকতর চঞ্চল হয়েছে। রাজনীতিক নেতাদের কথা এখন আর জনসাধারণ চোখ বুজে অসন্দিগ্ধচিত্তে গ্রহণ করে না। তারা জানে এসব নেতারা হচ্ছেন চতুরানন অর্থাৎ এঁদের মুখের কথায় চাতুর্যই থাকে বেশী কারণ চতুর্দিক বিবেচনা করে এঁদের কথা বল্‌তে হয়। রাষ্ট্রনেতাদের কথার মধ্যে যে ফাঁক এবং ফাঁকি থেকে যায় তারই মধ্যে সকল সাধু প্রচেষ্টার সমাধি ঘটে। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট আমাদের চতুর্বিধ মুক্তির আশ্বাস দিয়েছেন। মনে রাখ্‌তে হবে যে অনুরূপ আশ্বাসবাণী বিগত মহাযুদ্ধের সময়ও আর্ত পৃথিবীকে শোনান হয়েছিল। কিন্তু ফল কি কিছু হয়েছে? পৃথিবীর আর্তনাদে আজঃগগন বিদীর্ণ।

আমাদের দেশে আপদমুক্তির জন্যে পুরোহিতরা শান্তি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। তাতে আপদ নিবারণ হোক্ বা না হোক্ পুরুতঠাকুরের প্রাপ্যটা মোটা রকমেরই হয়। এতকাল দেখা গিয়েছে পৃথিবীর বিপদমুক্তির জন্যও রাজনীতিকরা তেমনি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা দিয়েছেন; অর্থাৎ কোনো রকমে জোড়াতালি দিয়ে সমস্যার আশু-সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তাতে পৃথিবীর বিন্দুমাত্রও লাভ হয়নি; কিন্তু রাজনীতিকদের স্বার্থসিদ্ধি পুরোমাত্রায় হয়েছে।

এই স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। কিন্তু বর্তমান অপঘাতটাই যাতে পৃথিবীর শেষ অপঘাত হয় সে কথা ভাববার সময় এসেছে। কিন্তু এই বিরাট সমস্যার সমাধান করবেন কে? রাজনীতিকদের উপরে সাধারণের বিশ্বাস নিঃশেষে লুপ্ত হয়েছে। আমরা মনে করি রাজনীতির যুগ দ্রুতনিঃশেষিত। এটা বিজ্ঞানের যুগ। বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের নির্বিকার মন নিয়ে যদি এই বিশ্বসমস্যার সম্মুখীন হন তবেই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে বলে আমরা মনে

করি। দুঃখের বিষয় যুদ্ধরত দেশসমূহে বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের পরীক্ষাগার ছেড়ে অস্ত্রাগারে প্রবেশ করেছেন। যাঁদের শ্রমসাধনায় পৃথিবীর সুখ ঐশ্বর্য মানুষের সহজ আয়ত্তের মধ্যে আস্‌তে পারত তাঁরা কিনা আজ মারণাস্ত্র নির্মাণে নিযুক্ত!

খুব আশার কথা যে দু একজন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি বিশ্বসমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক স্যার জন অর্ Fighting for What? নামক গ্রন্থে বর্তমান জগতের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। স্যার জন একজন খাদ্যতত্ত্ব বিশারদ। বলা বাহুল্য তিনি পৃথিবীর খাদ্যসমস্যাকেই সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে আজকের পৃথিবীতে অর্থনীতিক সমস্যা রাজনীতিক সমস্যার চাইতে গুরুতর। পেটের ভাবনাটা ঘুচলে অন্য দুর্ভাবনা মানুষের জীবনে তেমন বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পারে না। কিন্তু বড় বড় ব্যবসাদার— খাদ্যের যোগান দেওয়া যাঁদের ব্যবসা— তাঁরা সাধারণের ইষ্টের কথা না ভেবে আপন স্বার্থকে দেখেছেন বড় করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে পৃথিবীর নানা দেশে যখন উৎকট খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছিল ঠিক সেই সময়ে International Wheat Committee গম উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। পাছে গমের দাম কমে যায় এই জন্যেই বড় বড় ব্যবসায়ী সন্ত্রস্ত হয়ে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে তৎপর হলেন। সব চেয়ে বিচিত্র ব্যাপার এই যে এ অন্যায় ব্যবস্থা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সমর্থন লাভ করেছিল। এখানে বলে রাখা ভালো যে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আর গবর্নমেণ্টের মধ্যে সম্পর্কটা আমাদের দেশে প্রবাদবাক্যে প্রচলিত মাসতুতু ভাইএর সম্পর্ক। পাছে চাহিদার চাইতে গমের যোগান বেশী হয়ে যায় এই ভয়ে উক্ত Wheat Committeeর ইঙ্গিতে পুঞ্জীকৃত গম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিনষ্ট করা হয়েছিল। ধরিত্রীমাতা সন্তানের কাছে অন্নপূর্ণা মূর্তিতেই ধরা দিয়েছিলেন, কিন্তু মাঝখানে রয়েছে অসাধু ব্যবসাদার। সে মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়েছে। সেই লজ্জাতেই ধরণী আজ দ্বিধা বিভক্ত। দুধের দাম কমে যেতে পারে এই আশঙ্কায় লক্ষ লক্ষ গ্যালন দুধ নর্দমায় গড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নর্দমায় দুধের স্রোত বইয়ে দেবে তবু সস্তা দুধ ক্ষুধিত মানুষের মুখে উঠতে দেবে না!

এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থা দূর করতে হলে স্যার জন অরের মতে ধনিক সম্প্রদায়ের একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন মানুষের তিনটি অভাব দূর করতে পারলে ভাবী কালের পৃথিবী সংগ্রামমুক্ত হবে। এই তিনটি জিনিস হচ্ছে— খাদ্য, বাসগৃহ এবং চাকুরি। স্যার জন বলেন ইংলণ্ডের ন্যায় বিত্তশালী দেশেও খাদ্যবণ্টনের এমন অব্যবস্থা যে জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ছে। সহস্র সহস্র ব্যক্তি আজও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর অব্যবহার্য বস্তিতে কাল কাটাচ্ছে। আর চাকুরিহীনের সংখ্যাও অগণিত। স্যার জন-এর মতে চাকুরি জিনিসটা একটা psychological necessity— মানসিক তুষ্টির সহায়ক। আর এ কথাও মনে রাখতে

হবে চাকুরির ভিতর দিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজের সেবায় নিযুক্ত করা গবর্নমেণ্টেরই কর্তব্য।

খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য গবর্নমেণ্ট এমনভাবে খাদ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে দেবেন যেন প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য ক্রয় করা প্রত্যেক ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত হয়।

যুদ্ধবিরতির পরে অনতিবিলম্বে বস্তিসমূহের উচ্ছেদ করে স্বাস্থ্যকর এবং রুচিসংগত বাসগৃহ নির্মাণ শুরু করতে হবে। এই কার্যে এত শ্রমিকের প্রয়োজন হবে যে বেকার সমস্যার সমাধান আপনিই সহজ হয়ে আসবে।

এতদ্ব্যতীত বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য স্যার জন একটি National Service Corps প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছেন। বয়ঃপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি অন্তত এক বৎসর কাল এই কোরের সভ্য থেকে শিক্ষানবিশি করবে। এক বৎসর শিক্ষানবিশির পরে অনেকেই-নিজের চেষ্টায় চাকুরি পেয়ে যাবে। যারা পাবে না তারা কোরের অধীনে থেকেই নানাবিধ পৌরকার্যে সহায়তা করবে। বিনিময়ে তাদের যথাবিধি ভাতা দেওয়া হবে। বলা বাহুল্য এর ফলে unemployment dole নামক সরকারী ভিক্ষাদান প্রথা বন্ধ হয়ে যাবে।

স্যার জন অর্-এর ত্রিবিধ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য অর্থনীতিক ভিত্তির উপরে রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করা। রাষ্ট্রশক্তির উপরে অর্থনীতির প্রভাব যে বহুবিস্তৃত একথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু স্যার জন একটি কথা বিস্মৃত হয়েছেন যে রাজনীতির উপরে অর্থনীতির যতখানি প্রভাব অর্থনীতির উপরেও রাজনীতির ততখানিই প্রভাব বিস্তৃত হতে পারে। রাষ্ট্রপরিচালনার ভার যাঁদের হাতে তাঁরা আপন ক্ষমতার বলে দেশের অর্থনীতিক ভিত্তিকে অনেকখানি নেড়েচেড়ে দিতে পারেন। অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতির সুষ্ঠু এবং সংগত মিলন যতদিন না ঘটবে বিশ্বসমস্যা সমাধানের সাধুপ্রচেষ্টা ততদিন শৌখিন বাগ্‌বিস্তারেই পর্যবসিত হবে।— ইন্দ্রজিৎ।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

প্রথম বর্ষ দশম সংখ্যা

বৈশাখ ১৩৫০

কুমারসম্ভব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ

সময় লঙ্ঘন করি নায়কতপন
উত্তর অয়ন যবে করিল আশ্রয়,
দক্ষিণের দিক্‌বালা প্রাণের হুতাশে
অধীর হইয়া উঠি ফেলিল নিশ্বাস ॥ ২৫ ॥

নূপুরশিঞ্জন সহ সুন্দরীকুলের
মোহনপদাঘাতের অপেক্ষা না করি
অশোকতরুর কাঁধ অবধি করিয়া
ফুটিয়া উঠিল ফুল পল্লব-সহিতে ॥ ২৬ ॥

কচি কচি নবীন পল্লব-উদ্গমে
সমাপ্তি লভিল যেই নবচূতবাণ,
বসাইল অলিবৃন্দ বসন্ত অমনি
কুসুমধনুর যেন নামাক্ষরগুলি ॥ ২৭ ॥

কর্ণিকার ফুলের এমন বর্ণশোভা,
সৌরভ নাহি রে তার বড় প্রাণে বাজে।
একাধারে সব গুণ বর্তিবে যে কভু
বিধাতার প্রবৃত্তি বড়ই তাতে বাম ॥ ২৮ ॥

মর্ম্মরশবদে যথা জীর্ণ পর্ণ ঝরে
হেন বনে মদভরে উদ্ধত হইয়া

বায়ুর প্রত্যভিমুখে চরিছে হরিণ,
পিয়ালমঞ্জরী হ'তে উড়ি আসি রেণু
করিতেছে তা' সবাকার দৃষ্টির [ব্যাঘাত] ॥ ৩১ ॥

উদ্যতকুসুমধনু সঙ্গে লয়ে৷ [রতি]
সেই ঠাঁই যখন হইলা উপনীত
জীবজন্তু সবাকার মরমে মরমে
কি যে রস সঞ্চারিল, অন্তরের [ভাব]
বাহিরিতে লাগিল সবার সব কাজে ॥ ৩৫ ॥

ভ্রমরীর পিছে পিছে উড়িয়া ভ্রমর
একই কুসুমপাত্রে মধু কৈল পান,
শৃঙ্গ দিয়া কৃষ্ণসার মৃগীর এমনি
দিতেছে গা চুলকিয়া, পরশের সুখে
মুদিয়া আসিছে আঁখি কুরঙ্গিণীটির ॥ ৩৬ ॥

রসাবেশে করিণী হইয়া গদগদ
গণ্ডূষ করিয়া লয়ে৷ পদ্মগন্ধিজল
পিয়াইয়া দিল তাহা প্রিয় মাতঙ্গেরে ॥ ৩৭ ॥

থামে যেই কিন্নরী করিয়া গীতগান
যখন মুখমণ্ডলে পত্রলেখা-ছাপ
উঠিয়া গিয়াছে কিছু শ্রমজল লাগি
ঘুরিছে আঁখি যখন পুষ্পমদভরে,
সেই অবসরটিতে রসিয়া কিন্নর
প্রেয়সীর বিধুমুখ চুম্বে ঘন ঘন ॥ ৩৮ ॥

লতাবধু যতেক কানন-বনময়,
কুসুমস্তবক নব স্তন যা' সবার,
নবকিসলয় আর ওষ্ঠ মনোহর,
বাঁধিল তাহারা সবে গাঢ় আলিঙ্গনে
তরুশাখা সবাকারে, নম্র ফুলভরে ॥ ৩৯ ॥

দিব্য শুনা যাইতেছে অপ্সরীয় গান
তবুও শঙ্করদেব ধ্যানে নিমগন
আপনি আপন প্রভু যে মহাপুরুষ
কোন বিঘ্ন কভু [তারে নারে] টলাইতে ॥ ৪০ ॥

লতাগৃহদ্বারে নন্দী করি আগমন
বাম করতলে এক হেমবেত্র ধরি
অধরে অঙ্গুলি দিয়া করিল সঙ্কেত ॥ ৪১ ॥

নিষ্কম্প অমনি বৃক্ষ, নিভৃত ভ্রমর,
মূক বিহঙ্গম, শান্ত মৃগ-যাতায়াত,
সমস্ত কানন ময় (?) তাহারি শাসনে
....তেমনি (?) রহিল ॥ ৪২ ॥

শুকতারা সমান অযাত্রা মনে গণি'
নন্দীর নয়নপথ এড়ায়ে মদন
নমেরুতরুর ডালপালার আড়ালে
হেরিল মহাদেবের ধ্যানের প্রদেশ ॥ ৪৩ ॥

আসন্ন মরণ নাকি মদনের, তাই
দেবদারুবেদীতে শার্দ্দূলচর্ম্মাসনে
নিরখিল আসীন সংযমী মহাদেবে ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বকায় ঋজু স্থির স্কন্ধ দুই নত
কর দুটি শোভিছে উপর-মুখা তেলো
প্রফুল্ল পঙ্কজ যেন কোলের গোড়ায় ॥ ৪৫ ॥

জড়ানো জটা কলাপে জীয়ন্ত ভুজগ,
দুই ফের করি আর অক্ষমালা কাণে,
গ্রন্থিযুত মৃগছাল আছেন যা' পরি
হইয়াছে নীলবর্ণ কণ্ঠের প্রভায় ॥ ৪৬ ॥

চক্ষে নাহি পলক ; স্তিমিত উগ্র তারা
কিঞ্চিৎ কেবল পাইতেছে পরকাশ,

ভুরুদ্বয়ে বিকারের প্রসঙ্গটি নাই,
নাশিকার অগ্রভাগে লক্ষ্য আছে পড়ি ॥ ৪৭ ॥

জলপূর্ণ জলদ বৃষ্টির নাহি নাম,
অকূল অগাধ সিন্ধু তরঙ্গটি নাই,
নিবাতনিষ্কম্পশিখা প্রদীপ যেমন
এমনি (?) ·· ················ ॥ ৪৮ ॥

জ্যোতির অঙ্কুর যাহা ব্রহ্মরন্ধ্র হ'তে
উঠিয়াছে, পথ পেয়ে মধ্যের আঁখিতে
মৃণালের সূত্র জিনি সুকুমারতর
নবশশধরশ্রীকে করিছে মলিন ॥ ৪৯ ॥

ইন্দ্রিয় হইতে মন ফিরাইয়া আনি
হৃদয়ে স্থাপন করি সমাধির বশে
যে অক্ষয় পুরুষে ক্ষেত্রজ্ঞজন জানে
আত্মাতে, সেই আত্মাকে দেখিছেন তিনি ॥ ৫০ ॥

মনেরো অধৃষ্য যিনি অদূরে তাঁহারে
নিরখি অমন ধারা ধ্যানে নিমগন
এমনি ভয়ে আড়ষ্ট হইল মদন
হাত হৈতে পড়ি গেল ধনুর্ব্বাণ খসি,
কখন যে পড়িল তা' নারিল জানিতে ॥ ৫১ ॥

বীর্য্য নিভনিভ প্রায় এই যে তাহার,
উস্কাইয়া তুলি' তাহা রূপের ছটায়
পাছু পাছু দুই বনদেবতা-সুন্দরী
পর্ব্বতরাজদুহিতা দেখা দিল আসি ॥ ৫২ ॥

পদ্মরাগমণি জিনি অশোককুসুম,
কাড়িয়াছে হেমদ্যুতি কর্ণিকার ফুল,
হইয়াছে সিন্ধুবার মুকুতাকলাপ,
বসন্তকুসুম যত অঙ্গ-আভরণ ॥ ৫৩ ॥

স্তনভারে নত কায় কিঞ্চিৎ অমনি,
তরুণ অরুণরাগ বসনে তাঁহার,
কুসুমস্তবকভরে নম্র, আহা মরি,
সঞ্চারিণী পল্লবিনী যেন গো লতাটি ॥ ৫৪ ॥

খসি খসি পড়িতেছে বকুল-মেখলা,
পুনঃপুনঃ রাখিছেন আটক করিয়া ॥ ৫৫ ॥

ভ্রমর তৃষিত হয়ে নিশ্বাসসৌরভে
বিম্ব-অধরের কাছে বেড়ায় উড়িয়া
চঞ্চলনয়নপাতে উমা প্রতিক্ষণ
লীলাশতদল নাড়ি দিতেছেন তাড়া ॥ ৫৬ ॥

যাঁর রূপরাশি দেখি রতি লজ্জা পায়
অকলঙ্ক সে উমারে নিরখি মদন
জিতেন্দ্রিয় শূলিপ্রতি স্বকাজ সাধিতে
পুনরায় বক্ষে নিজ বাঁধিল সাহস ॥ ৫৭ ॥

এমন সময় উমা ভবিষ্যৎপতি
মহেশের দুয়ারে হইলা উপনীত,
তিনিও পরমজ্যোতি পরমাত্মরূপ
নিরখিয়া অন্তরে ক্ষান্ত হ'লেন যোগে ॥ ৫৮ ॥

ক্রমে ক্রমে প্রাণবায়ু করিয়া মোচন
যোগাসন শিথিল করিতেছেন হর,
ওদিকে ভুজঙ্গ-অধিপতির মস্তকে ফণায়
কষ্টকর ঠেকিতেছে ধরণীর ভার ॥ ৫৯ ॥

নন্দী তাঁর পদতলে প্রণিপাত করি
নিবেদিল এসেছেন শুশ্রূষার তরে
শৈলসুতা, মহেশের ভ্রূক্ষেপমাত্রেই
প্রবেশের অনুমতি হইল বুঝিয়া
নন্দী গিরিনন্দিনীরে পশাইলা তথি ॥ ৬০ ॥

সখী দুটি মহাদেবে করিয়া প্রণাম
উমার স্বহস্তে তোলা পল্লবেজড়িত
হিমসিক্ত ফুলগুলি অর্পিল চরণে ॥ ৬১ ॥

উমাও যেমন তাঁরে করিলা প্রণাম
সুনীলঅলকশোভি নবকর্ণিকার
খসিয়া অবনিতলে পড়িল [অমনি] ॥ ৬২ ॥

অনন্যভাজন পতি লাভ কর বলি'
আশিষিলা মহাদেব, যথার্থ আশীষ।
উচ্চারিত হৈল যদি ঈশ্বরের বাণী
কভু বিপরীত অর্থ না হয় ঘটন ॥ ৬৩ ॥

বহ্নিমুখকামী কাম পতঙ্গ যেমতি
বাণ সন্ধানের অবসর প্রতীক্ষিয়া
মুহূর্ত্তেক আকর্ষিল শরাসনগুণ ॥ ৬৪ ॥

পার্ব্বতী এ হেন কালে তাম্ররুচি করে
লয়্যে গেল মন্দাকিনীপদ্মবীজমালা
ভানুর কিরণে শুষ্ক হয়ে সমর্পিতে ॥ ৬৫ ॥

ভকতবাৎসল্যহেতু যেমন শঙ্কর
লইবেন আদরে পুষ্করবীজমালা
অমনি অব্যর্থ বাণ নাম মন্মোহন
শরাসনে যুড়িল কুসুমশরাসন ॥ ৬৬ ॥

চন্দ্রোদয়-আরম্ভে যেমন অম্বুরাশি,
একরতি অধীর হইল যেই মন
বিম্বাধরশোভিত উমার মুখপানে
ত্রিনয়ন নিবেশিলা শম্ভু একেবারে ॥ ৬৭ ॥

উমাও মনের ভাব নারিলা ঢাকিতে
অঙ্গ যেন বিকসিত কদম্ব কুসুম

লজ্জায় ··· আঁখি সামালিতে নারি
··· ···· ······চারু মুখখানি ॥ ৬৮ ॥

মহাবশী মহাদেব, অন্য কেহ নয়,
মুহূর্ত্তে ইন্দ্রিয়ক্ষোভ নিগ্রহ করিয়া
বিকৃতির কারণ কি জানিবার তরে
করিলা নয়নপাত দিগ্‌ দিগন্তরে ॥ ৬৯ ॥

মদনেরে দেখিলেন— দক্ষিণ অপাঙ্গে
মুষ্টি রহিয়াছে লগ্ন ধনুর্গুণধারী,
বাম পদ কুঞ্চিত, কাঁধের দিক্ নত,
চক্রাকার করিয়া সুন্দর ধনুখানি
টানিয়াছে গুণ, মারে আর কি সে বাণ ॥ ৭০ ॥

বাড়িল শিবের ক্রোধ তপস্যার ভঙ্গে
এমনি ভ্রূভঙ্গ যে, তাকায় মুখপানে
সাধ্য নাই কাহারো, তৃতীয় নেত্র হ'তে
বাহিরিল সহসা জ্বলন্ত হুতাশন ॥ ৭১ ॥

ক্রোধ প্রভু সংহর সংহর— এই বাণী
দেবতাসবার হোতা চরুক্ বাতাসে,
হেতায় মদনতনু ভস্ম অবশেষ ॥ ৭২ ॥*

* কুমারসম্ভব তৃতীয় সর্গের এই অনুবাদ একটি অত্যন্ত পুরাতন জীর্ণপ্রায় পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি সম্বন্ধে পরবর্তী "রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা" প্রবন্ধ (পৃঃ ৬৫৪) দ্রষ্টব্য। তেতাল্লিশটি মাত্র শ্লোকের অনুবাদ পাওয়া গিয়েছে ; তার মধ্যে ৩৭ এবং ৫৫ সংখ্যক শ্লোক দুটির অর্ধাংশমাত্র অনূদিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে অনূদিত শ্লোকগুলি সংখ্যানুক্রমে সাজানো নেই। এখানে সংখ্যানুক্রম অনুসৃত হলো। পাণ্ডুলিপির জীর্ণতাবশত অনেক স্থলে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। যেখানে যেখানে লুপ্ত শব্দ সহজেই অনুমেয় সেখানে অনুমিত শব্দগুলি ব্র্যাকেটে দেওয়া গেল ; সন্দেহস্থলে প্রশ্নচিহ্ন দেওয়া হয়েছে। অন্যত্র ফাঁক রাখা হলো। মূলের পাঠ অবিকল রাখা গেলো। মূলে শ্লোকসংখ্যা দেওয়া নেই। অনেক স্থলে শ্লোকশেষে দাঁড়িচিহ্নও নেই। ওই সংখ্যা ও দাঁড়িচিহ্ন আমাদের।

চৈতের মুহূর্ত

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফাল্গুনের ফুলের খেলা শেষ হ'য়ে আসছে, তখন একদিন দুপুরে উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরে একলা আছি তক্তাপোশের উপর তলায় আমি, নীচের তলায় নূতন সঙ্গী এ বাড়ির পোষা কুকুরটা। সবার আলিস্ ভাঙার বেলা সেটা, কাজের সুরের মাঝে একটুখানি থম্— চুপ হ'য়ে আছে বাড়ি বাগান অঙ্গন মাঠ আকাশ বাতাস সমস্তই, ঘুমিয়ে আছি না জেগে আছি, এই ভাব! বড় বড় কাচবদ্ধ জানালার ওধারে মস্ত বড় নাচঘরটা। যেন প্রতীক্ষা করছে কারো, চাচ্ছে যেন চৈতালির সুরে তালে অকস্মাৎ মুখর হ'য়ে ওঠে, নিঃস্বপ্ন রোদ অনড় শুয়ে বাইরে যাবার দুয়োরগোড়ায় শয়ন বিছিয়ে, আর কেউ নেই কাছাকাছি। ঘড়ি জানালো কখন উৎরে গেল ফাল্গুনের দিন, ঘুমন্ত মানুষ ঘুমের আলিসে আছি তো আছি। দাপ্‌টে এল চৈতালি, খর ঝন্‌ঝনা তুললে নাচঘরের স্ফটিক বাতায়নগুলো একটার পর একটা, চমকভাঙা মন বললে চৈতালির কবিকে এলো খুঁজে চৈতের উতলা বাতাস, ঘুমভাঙা চোখ দেখলে হারিয়ে গেছে কবি, বন্ধ জানালার বাইরে আছাড় পিছাড় করছে কবির ফুলবাগানের তরুলতা, কাচের বাধা ভেঙে তারা যেন আসতে চাইছে খুঁজতে চৈতালির কবিকে। মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা-আকাশ চেয়ে আছে স্নিগ্ধ করুণ দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে, হারিয়ে যাওয়া মানুষের না গাওয়া সুর শূন্য ঘরের শূন্যতা পরিপূর্ণ ক'রে শুনি বলছে—

> 'রোদন-ভরা এ বসন্ত, সখি,
> কখনো আসেনি বুঝি আগে :
> রোদন-ভরা এ বসন্ত .....'

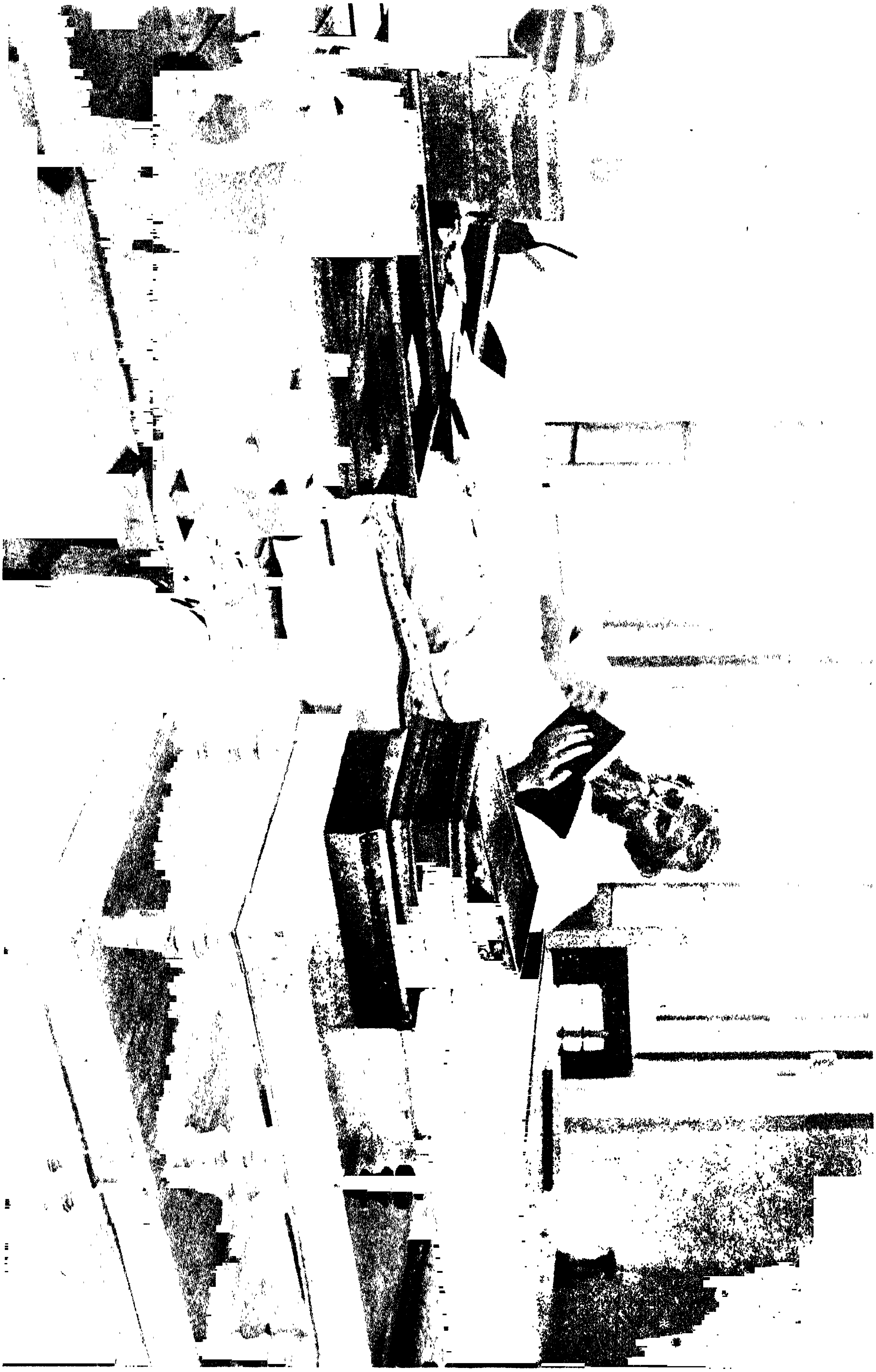

পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[প্রিয়নাথ সেন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু। বয়সে তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে পাঁচ-ছয় বছরের বড়ো ছিলেন। কিন্তু সাহিত্যালোচনায় ও সৌহার্দ্যে উভয়ে ছিলেন সমবয়সী। প্রিয়বাবুর মৃত্যুর দিন (৮ কার্তিক ১৩২৩; ২৫ অক্টোবর ১৯১৬) পর্যন্ত উভয়ের এই বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন ছিল। এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "কলিকাতা নিমতলা ৮ নং মথুর সেনের গার্ডেন লেনে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি তীর্থ ছিল। বাঙ্গালায় সে তীর্থের কথা সকলে জানিত না। এককালে রবীন্দ্রনাথ সে তীর্থের নিত্যযাত্রী ছিলেন। স্বনামধন্য মথুরচন্দ্র সেন মহাশয়ের বংশে একজন সাহিত্যসাধকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি প্রিয়নাথ সেন।" তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা কিভাবে হয়েছিল সেকথা 'জীবনস্মৃতি'তেই আছে। "সন্ধ্যাসঙ্গীত [১৮৮২] রচনার দ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মতো আমাকে কাব্য রচনার বিকাশ-চেষ্টায় প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্বে 'ভগ্নহৃদয়' [১৮৭৮] পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন সাহিত্যের সাত-সমুদ্রের নাবিক তিনি।...তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূর-দিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল।...একদিকে বিশ্ব-সাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্যদিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস— এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত বলা শক্ত।" এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের উপর প্রিয়বাবুর প্রভাব কত গভীর ছিল। এমন অসাধারণ সাহিত্যরসিক হ'লেও বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারে তাঁর দান খুবই কম। তিনি একখানি গ্রন্থও লিখে যান নি; কেবল তাঁর কতকগুলি প্রবন্ধ ও কবিতা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর সতেরো বছর পরে তাঁর গদ্যরচনাগুলি গ্রন্থাকারে সংগৃহীত হ'য়ে "প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি" নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানিতে রবীন্দ্রসাহিত্যের কিছু-কিছু আলোচনা আছে; 'মানসী' এবং 'চিত্রাঙ্গদা'র সমালোচনা-দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথের মধ্যে সর্বদাই চিঠির আদান-প্রদান হ'তো। কিন্তু দুঃখের বিষয় "রবিবাবুর অধিকাংশ চিঠি নষ্ট হইয়া গিয়াছে"। তথাপি "যতগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহা মুদ্রিত করিলে একখানি সুবৃহৎ পুস্তক হয়" (প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি, নিবেদন)। ওরকম কতকগুলি পত্র প্রিয়পুষ্পাঞ্জলির পরিশিষ্ট মুদ্রিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত প্রিয়বাবুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রের সংখ্যা বেশি নয়। তার মধ্য থেকেই কতকগুলি পত্র এই সংখ্যায় প্রকাশিত হ'লো। পত্রগুলিকে যথাসম্ভব কালানুক্রমিক ভাবে সাজানো হ'লো।]

প্রিয়বাবু—

Honeymoon* কি কোনোকালে একেবারে শেষ হবার কোনো সম্ভাবনা আছে— তবে কি না moon-এর হ্রাস বৃদ্ধি পূর্ণিমা অমাবস্যা আছে বটে। অতএব আপনি Honeymoon-এর কোনো খাতির না রেখে হঠাৎ এসে উপস্থিত হবেন। আমি তো বহুকাল বিহারীবাবুর ওখেনে যাইনি— মাঝে মাঝে যাব যাব মনে করি কিন্তু কিছুতেই জড়তা ত্যাগ করে যেতে পারিনে— নগেন্দ্রবাবু একদিন আহ্বান করেছিলেন, গিয়েছিলেম। তাঁকে আমার কাব্যখানাও শুনিয়েছিলেম। সেটা ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিয়েছি, এক ফর্মা ছাপাও হয়ে গেছে। সোম মঙ্গলবারে আমি বাড়িতে থাক্‌ব এবং প্রায় থাকি। আপনি যদি আসেন ত আরও থাক্‌ব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[পোস্টমার্ক—Sholidah 14 Ju. 00]

ভাই

আমিই তোমার তূষ্ণীম্ভাব দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলুম— দুচার কথায় আমার বক্তব্য লিখ্‌তেও যাচ্ছিলুম এমন সময় তোমার পত্র পাওয়া গেল— কেবলমাত্র দীর্ঘসূত্রিতা করে হারা গেল— কারণ এ রকম বিবাদ যে সুরু করতে পারে তারই জিত।

কলকাতায় তোমরা গরমে হাঁসফাঁস করছিলে আমরা তখন নবধান্যাঙ্কুর-শ্যামল উন্মুক্ত মাঠের উদার বাতাসে উত্তরীয় হিল্লোলিত করে পল্লিপথে সান্ধ্যমেঘের স্বর্ণচ্ছটায় অভিষিক্ত মস্তকে গৌরীনদীর সিকতাশুভ্র নির্জন তটভূমিতে সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছিলুম। তোমারও সে সুখভোগে কোন বাধা ছিল না— আমন্ত্রণও ছিল— নিজদোষে কষ্ট পাচ্চ, অতএব এ সম্বন্ধে আমার সহানুভূতি প্রত্যাশা কোরো না।

* রবীন্দ্রনাথের বিয়ের তারিখ ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯০ (৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩)। অন্যত্র প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রের যে প্রতিলিপিটি মুদ্রিত হলো তাতে এই তারিখের উল্লেখ আছে।

ক্ষণিকার চতুর্থ ফর্ম্মার প্রথম প্রুফ আজ দেখে দিলুম— বোধ হয় পঞ্চম ফর্ম্মায় সমাপ্ত হবে— কবিতার সংখ্যা গোটা ৫৫ ।

তুমি মোটা জাতের গোটাকতক সুতার নমুনো সঙ্গে এনো— অর্থাৎ খবর নিয়ো মফস্বলে কি রকম সুতো সাধারণতঃ প্রচলিত। আখের কল সম্বন্ধে মোকাবিলায় তোমার সঙ্গে পরামর্শ করা যাবে— যদি ভাল বোঝো যোগ দিয়ো। সুতা, পাথুরে কয়লা প্রভৃতির কারবার তার চেয়ে অনেক ভাল। তোমাকে এখানে কারবারে বদ্ধ করতে [পারলে] আমিও সুখী হই। কিন্তু একবার আসা দরকার।

অলীকপ্রকাশের সমালোচনা বেশ লেগেছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[পোস্টমার্ক—Shelidah 21 Sep 00 [

ভাই

আঃ কি দুর্য্যোগ! ক'দিন অবিশ্রাম ঝড় ও বৃষ্টি চল্‌চে— খুব ভাল লাগ্‌তে পারত কিন্তু তোমার রাস্কিন প্রবন্ধে ত দেখিয়েছ যে, সৌন্দর্য্যবোধের সঙ্গে যখন ধর্ম্মবোধের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তখন সৌন্দর্য্যভোগকে অবসর দিতে হয়। এই অবিশ্রাম দুর্য্যোগে চারিদিকের লোক্‌সান আর ত দেখা যায় না! বড় বড় আখের ক্ষেত ভূমিশায়ী, শস্যক্ষেত্র প্লাবিত, কূলপ্লাবিনী নদী পুরাতন পল্লী এবং বৃদ্ধ ছায়াতরুগুলিকে গ্রাস করে চলেছে। কোনো দরবারে এর নালিশ নেই, কোনো কোতোয়ালিতে এর প্রতিকার নেই, অন্ধ হাওয়া হাঁ হাঁ করে ছুটে আস্‌চে, অন্ধ স্রোত নৃত্য করতে করতে কি করচে কিছুই জানেনা— আকাশের জলধারা নির্ব্বিচারে অনাবশ্যক ঝরে পড়চে; আমি চুপ করে চোখ বুজে মনকে এই বলে বোঝাতে চেষ্টা করচি যে, আমার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ও ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আমি সমস্ত বিশ্বব্যাপার দেখ্‌তে পাচ্চিনে বলেই প্রত্যক্ষ এবং স্থানীয় এবং ক্ষণকালের লোকসানে এত ব্যথিত হচ্চি; কিন্তু এ ব্যাপারটি যে কি কারণে না হলেই নয় এবং না হলে দূরদূরান্তর এবং কালকালান্তর পর্য্যন্ত তার কি ফল ফল্‌ত তা আমি কিছুই জানিনে— অতএব যতই ব্যথিত হই পীড়িত হই কারো নামে কোন

নালিশ আন্‌ব না— এটা বল্‌বনা যে, আমরা যেটা চাচ্চি সেটা কেন হচ্চে না। আমি এই ঝড়বৃষ্টি দুঃখক্ষতির ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি দেশকালাতীত নির্ব্বিকার শান্তির অন্বেষণ করচি— একাগ্রমনের দ্বারা এই ঝঞ্ঝাবর্ত্ত ভেদ করে ঠিক এর অন্তরতম স্থানে যেখানে অনন্ত স্তব্ধ পরিপূর্ণতা বিপুল নিঃশব্দে নিত্যকাল বিরাজ করচে সেইখানে প্রবেশ করতে চেষ্টা করচি— সেইখানে যেমনি প্রবেশ করা অমনি, আখের ক্ষেত থাক্‌লেই বা ততঃ কিং এবং আখের ক্ষেত গেলেই বা ততঃ কিং। সকল কাজ এবং সকল সুখদুঃখের মধ্যে মনকে সেই জায়গাটাতে বসিয়ে রাখ্‌তে চাই, একদিন হয়ত সফল হব বলে আশা করচি। তখন আমার সমস্ত নালিশ এক মুহূর্ত্তে ডিস্‌মিস্‌ হয়ে যাবে।

তুমি কর্ম্মজালে জড়িত জেনেই তোমাকে আমি আর কোনপ্রকার তাগিদ দিয়ে ব্যস্ত করে তুলিনি। যথাসময়ে যথাবকাশে তুমি আস্‌বে আমি নিশ্চয় জানি — না যদি আস তাহলেও আমার কোন সংশয় নেই— জীবনের এই প্রৌঢ়বয়সে যেখানে স্থিতিলাভ করা গেছে সেখানে আর চ্যুতির আশঙ্কা করিনে।

তোমার রস্কিন প্রবন্ধ কলাতত্ত্বে জীবনবৃত্তান্তে এবং রসসমালোচনায় ক্রমশই সম্পূর্ণতর হয়ে উঠ্‌চে; এইবার এর যথাবিহিত পরিণামের অপেক্ষা করচি।

চন্দ্রমাধব বাবুর চরিত্রে অনেক মিশল্‌ আছে, তার মধ্যে কতক মেজদাদা কতক রাজনারাণ বাবু এবং কতক আমার কল্পনা আছে। নির্ম্মলাও তথৈবচ— এর মধ্যে সরলার অংশ অনেকটা আছে বটে। কিন্তু কোন রিয়াল্‌ মানুষ প্রত্যহ আমাদের কাছে যে রকম প্রতীয়মান সেরকম ভাবে কাব্যে স্থান পাবার যোগ্য নয়। কারণ রিয়াল্‌ মানুষকে যথার্থ ও সম্পূর্ণরূপে জানবার শক্তি আমাদের না থাকাতে আমরা তাকে প্রতিদিন খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত এবং অনেক সময় পূর্বাপর বিরোধী ভাবে না দেখে উপায় পাইনে— কাজেই তাকে নিয়ে কাব্যে কাজ চলে না। সুতরাং কাব্যে যদিচ কোন কোন রিয়াল লোকের আভাসমাত্র থাকে তবু তাকে সম্পূর্ণ করতে অন্তর বাহির নানা দিক থেকে নানা উপকরণ আহরণ করতে হয়। চন্দ্রমাধবে মেজদাদার শিশুবৎ স্বচ্ছসারল্যের ছায়া আছে এবং নির্ম্মলায় সরলার কল্পনাপ্রবণ উদ্দীপ্ত কর্মোৎসাহ আছে— কিন্তু উভয় চরিত্রেই অনেক জিনিষ আছে যা তাঁদের কারোই নয়।

দুর্য্যোগবশতঃ এ চিঠি আজ ডাকে যাবার সম্ভাবনা নেই। অপরাহ্ণ ঘনান্ধকার হয়ে এসেছে, আর ভাল দেখ্‌তে পাচ্চিনে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[পোস্টমার্ক—Shelidah 28 Sep 00]

ভাই

আধিব্যাধিতে যখন তুমি আক্রান্ত এ সময়ে তোমার মঙ্গল ইচ্ছা ছাড়া তোমার প্রতি কোন বিরুদ্ধভাব আমার মনে থাক্‌তেই পারে না—সে সম্বন্ধে তুমি আমার প্রতি নিশ্চিত আস্থা রাখ্‌তে পার। এই সমস্ত দুর্দ্দৈবজাল থেকে মুক্ত হয়ে এখানকার নির্ম্মল শারদশান্তির মধ্যে তুমি আস্‌তে পারলে আমি খুসি হতুম কিন্তু কি করা যাবে বল? আমি অপেক্ষা করতে প্রস্তুত আছি। এক একবার কথা হচ্চে সপরিজনে বোটে করে পদ্মার চরে যাব—সেই প্রস্তাবটা চল্‌চে বলে কবি দেবেন্দ্রসেনকে এখানে আস্‌তে নিরস্ত করা গেছে। কিন্তু তুমি যদি আস্‌তে পার তাহলে আমি অনুরূপ বন্দোবস্ত করি। আমাদের বিদ্যার্ণব মহাশয় আগামী সপ্তাহে বৃহস্পতিবারে শিলাইদহে আসবেন লিখেছেন-সে সময়ে তুমি যদি নিষ্কৃতি পাও তাহলে তাঁর সঙ্গ অবলম্বন করে নির্ভয়ে যাত্রা করতে পার।

দেশ ছেড়ে না পলায়ন করলে প্রবোধচন্দ্রের কাছ থেকে তোমার মুক্তি নেই এ কথা নিশ্চয়।

কুষ্টিয়ায় কোনো ব্যবসায় ফাঁদবার জন্যে তোমার যে ঔৎসুক্য ছিল সেটা কি এখনো আছে? আজ নগেন্দ্র এখানে এসেছে—এই বিষয়ে সে আলোচনা করছিল।

আমি ইতিমধ্যে কেবল একটি মাঝারি সাইজের গল্প লিখেছি আর কিছু করিনি।

গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে—দেখেছ বোধ হয়। দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ হয়নি।

তোমার লেখনী থেকে "রেণু" গ্রন্থের সমালোচনা পাবার জন্যে তার

লেখিকা আগ্রহ প্রকাশ করেচেন— এর থেকে বুঝ্‌তে পারবে তোমার সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতি তাঁর কর্ণগোচর হয়েছে। প্রবোধচন্দ্র যদিবা কখনো তোমার স্কন্ধ পরিত্যাগ করেন, এবার থেকে লেখকদের হাত এড়াতে পারবে না।

নগেন্দ্র গুপ্তর তপস্বিনী পড়ে দেখ্‌লুম। ঠিক হয়নি। স্পষ্ট দেখা যাচ্চে, বাঙ্গলা উপন্যাসে তিনি উন্মুক্ত Realismএর অবতারণা করতে চাচ্চেন। তাতে আমি কিছুই আপত্তি করিনে। কিন্তু সেটা পারা চাই। যেমন নাচতে বসে ঘোমটা সাজে না, তেমনি এ রকম বিষয় লিখতে বসে কিছু হাতে রাখা চলে না। সম্পূর্ণ নির্ভীক নগ্নতা ভাল, কিন্তু স্বল্প আবরণ রাখতে গেলেই আব্রু নষ্ট হয়। এ বইয়ে তাই হয়েছে। গ্রন্থকার সাহসপূর্ব্বক সব কথা পরিষ্কারভাবে শেষপর্য্যন্ত বল্‌তে পারেননি, সেইজন্য তাঁর Selfconscious ভাব প্রকাশিত হয়ে রচনাটাকে লজ্জিত করে তুলেছে। নগেন্দ্রবাবু তাঁর ঘটনা বিন্যাসের স্বাভাবিক পরিণামের পূর্ব্বেই হঠাৎ থেমে যাওয়াতে বোঝা যাচ্চে নিঃসঙ্কোচ নিরাবরণ তাঁর লেখনীর পক্ষে সহজ নয়, ওটা তিনি জবরদস্তি করে করেচেন। ফর্ ইন্‌ষ্ট্যান্স্, সেই বিধবা মেয়েটার সঙ্গে একজন ছোক্‌রার ঘনিষ্ঠতার কথা যদি উত্থাপন করলেন তবে তার অন্ত্যেষ্টি-সৎকার না করে ছাড়লেন কেন? ও রকম স্থলে যা হতে পারে সেটাকে সরলভাবে তার সম্পূর্ণ বীভৎসমূর্ত্তিতে পরিস্ফুট করলেন না কেন? এসব জিনিষ তিনি ছুঁতে ঘৃণা করেন অথচ নাড়তে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেইজন্যে সব কথা ভাল করে প্রকাশ করতেও পারেন নি, ভাল করে গোপন করতেও পারেন নি।

অশোকগুচ্ছ বেরিয়েছে না কি? আমি এখনো পাইনি।

তুমি তোমার সমস্ত বিঘ্নবিপদ কেটে বেরিয়ে এস এই আমি প্রার্থনা করি। ১২ই আশ্বিন ১৩০৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিলাইদহ
কুমারখালি

ভাই

গল্পগুচ্ছ তুমি পাওনি কেন? শৈলেশরা ত সব বাড়ি চলে গেল— তাহলে ওরা ফেরার পূর্ব্বে বই পাবেনা। শৈলেশ ২০।২২শের মধ্যেই

কলকাতায় ফিরবে এবং তার পরে শিলাইদহে আসবে লিখেছে। চাই কি, তুমি তাকে সহায় করে চলে আসতে পার। Budget জিনিষটা সুখকর নয় আমি জানি, বিশেষতঃ cash জিনিষটা যখন দুর্ল্লভ। অতএব তোমার কোষবিভাগের যা হয় একটা গতি করে পদ্মাপারে দৌড় মেরে এস, প্রবোধচন্দ্র এণ্ড্ কোম্পানি পদ্মার ওপারে দাঁড়িয়ে হতাশচিত্তে দলিল আন্দোলন করতে থাকুন।

কার্ত্তিকের ভারতী পাইনি। বোধ হয় এখনো বেরোয় নি। হয় ত কার্ত্তিক মাসেই বাহির হবে।

আজ এই মধ্যাহ্নে শারদরৌদ্রে এবং নিস্তব্ধ শান্তিতে আমার মাঠ ও পল্লী প্লাবিত হয়ে গেছে— আমাকে নেশায় ধরেছে— মাথার মধ্যে রৌদ্রের আমেজ্ মদের মত প্রবেশ করেছে—চোখ অর্দ্ধ নিমীলিত করে সমস্ত পৃথিবীটাকে সোনার স্বপ্নের মত দেখ্‌চি—শস্যক্ষেত্রের সুকোমল সবুজ রংটি আমার মোহাবিষ্ট নয়নপল্লব চুম্বন করচে। আকাশে আজ বিশ্বব্যাপী শারদীয়া পূজার উদ্বোধন দেখ্‌চি— আগমনীর করুণামিশ্রিত রাগিণীতে অনন্ত শূন্য বাষ্পবিজড়িত হয়ে রয়েছে— তোমাদের সহরে এমন নিঃশব্দ নিস্তব্ধ এমন অপরূপ সমারোহের পূজার আয়োজন কোথাও নেই। আমার মনে হচ্চে যেন, আমি বিদেশী সমস্ত কাজকর্ম্ম শেষ করে আজ বাড়িতে ফিরে এসেছি— তাই এমন আকাশপূর্ণ প্রসন্নতা, এমন জগদ্ব্যাপী স্মিতহাস্য। তাই এমন ছুটি, এমন পরিপূর্ণ অপর্য্যাপ্ত রৌদ্ররঞ্জিত অবকাশ।

আজ "রেণু" রচয়িত্রীর একখানি চিঠি পেয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছেন তাঁর লেখা তোমার কেমন লাগ্‌ল। আমি উত্তর দিয়েছি তোমার ভালো লাগ্‌বে—এ সংবাদটা আমি কোথা থেকে পেলুম সে প্রশ্ন তিনি জিজ্ঞাসা করবার পূর্ব্বে বোধ হয় তোমার একটা অভিমত তাঁকে জানাতে পারব। ইতি ১৪ই আশ্বিন [১৩০৭]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[পোস্টমার্ক—Shelidah 2 Oc. 00]

ভাই

ভাল মন্দ এবং মাঝারি বলে কিছু নেই বুঝি? তোমাদের হ্যাপায় পড়ে আমাকে কি কেবল খুব ভালই লিখ্‌তে হবে? তুমি লিখেছ এবারকার

লেখা গল্পটা নিশ্চয় খুব ভালই হয়েছে। তোমরা যদি আমার কাছে কেবলি খুব ভালই আশা করতে থাক তাহলে চলবে না— আশাটাকে ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে রেখে দেবে।

আজ জগদীশ বসুর এক চিঠি পেয়ে ভারি আনন্দে আছি। এবারে তিনি সেখানে খুব বড় রকমের জয়লাভ করে আসবেন তার সূত্রপাত হয়েছে। এবারে তিনি যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করেচেন তাতে বিজ্ঞানের অনেকগুলি প্রাচীন মত উল্টে গিয়ে একটা বৈজ্ঞানিক বিপ্লব উপস্থিত হবে—একবারে মূলতত্ত্বে ঘা দেবে— কেবল Physics নয়, কেমিষ্ট্রি, ফিজিয়লজি এমন কি Psychology পর্য্যন্তে আঘাত করবে। যুদ্ধ ত আরম্ভ হয়েছে। ইলেকট্রিসিটি সম্বন্ধে Prof. Lodge য়ুরোপের মধ্যে একজন মহারথী—জগদীশ বসুর মত বিশেষ রূপে তাঁরই মত খণ্ডন করেছে। সেজন্যে প্রথমে, প্রোফেসার যুদ্ধসাজে সদলবলে এসেছিলেন— কিন্তু জগদীশ বসুর প্রবন্ধ শুনে Prof. Lodge উঠে প্রশংসাবাদ করে বসুজায়ার নিকট গিয়ে বল্লেন— Let me heartily congratulate you on your husband's splendid work. তার পরে তাঁরা ওঁকে ধরে পড়েছেন, যে তুমি ইংলণ্ডে থেকে কাজ কর, ভারতবর্ষে তোমার বিস্তর ব্যাঘাত। ওঁকে সেখানকার একটা বড় য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করবার জন্যে তাঁরা অনুরোধ করচেন—তিনি জন্মভূমির প্রতি মমত্ববশতঃ ইতস্ততঃ করচেন। আমি তাঁকে মিনতি করে লিখেছি, যে জন্মভূমির মোহ যেন তাঁর চিত্তকে তাঁর কাজের সফলতা থেকে বিক্ষিপ্ত করে না দেয়। সেখানে অবসর এবং বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সহায়তা ও সহানুভূতির মধ্যে না থাকলে তাঁর হাতের সুবৃহৎ কাজ সমাধা করতে পারবেন না। তাঁর কৃতকার্য্যতাতেই তাঁর মাতৃভূমির গৌরব। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রাণমনে প্রার্থনা করি তাঁর জয় হৌক্।

ডাক্তারটি যদি ২০ টাকা বেতন নিয়ে এবং আমার এখানে থেকে আহার করে সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে অগ্রহায়ণের আরম্ভ থেকে তাঁকে রাখতে পারি। এখন কার্ত্তিকের অনেকদিন পর্য্যন্ত পূজার ছুটি। আর যদি কুষ্টিয়ায় Practice set up করতে চান ত নগেন্দ্র তাঁকে সাধ্যমত সাহায্য করবে। তুমি এখানে এলে সে সমস্ত আলোচনা হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেদমন্ত্ররসিক রবীন্দ্রনাথ

ক্ষিতিমোহন সেন

সবাই জানেন হীরকমণির অনন্ত দিক এবং তাহার সেই অনন্ত মুখে অনন্তবিধ জ্যোতির ঐশ্বর্য। তেমনি কবি রবীন্দ্রনাথেরও প্রতিভার দিক ছিল অনন্ত এবং তাহার প্রত্যেকটি দিকে ছিল এক এক অপরূপ ঐশ্বর্যদীপ্তি। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের পূর্বেই তাঁহার রচনার মধ্যেও ইহা অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু ১৯০৮ সালে গ্রীষ্মাবকাশের পর যখন শান্তিনিকেতনের সাধনাক্ষেত্রে তাঁহার ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন সাক্ষাতে কবিগুরুর প্রতিভার ও মহত্ত্বের অনন্ত ঐশ্বর্য দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

৩৫।৩৬ বৎসর পূর্বেকার কথা। তখন শান্তিনিকেতন ক্ষুদ্র একটি প্রতিষ্ঠান। অভাব ও দারিদ্র্যের অন্ত ছিল না। কিন্তু অল্প যে কয়জন ছাত্র ও সেবকদের দল সে সময় এখানে আসিয়া জুটিয়াছিলেন, তাঁহাদের গভীর প্রীতিতে এবং গুরুদেবের মহত্ত্বের অজস্রতায় সব দুঃখদারিদ্র্যের উপর নিরন্তর এক আনন্দের বন্যা বহিয়া যাইত। যাঁহারা এখানে সেবার ব্রত লইয়া আসিয়াছিলেন তাঁহাদের কাছে গুরুদেবের দাবিরও তখন অন্ত ছিল না। তাঁহার বিরাট সেই দাবির চোটেই তিনি অনেক বোবাকে বলাইয়াছেন এবং পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করাইয়াছেন।

মনে আছে একদিন বর্ষার সন্ধ্যা। কয়েকজন গুরুদেবের চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া আছি। বর্ষার অজস্রতায় একটি গভীর ভাব সকলের মনকে পাইয়া বসিয়াছে। গুরুদেব বলিলেন, "যদি আমরা প্রকৃতির প্রত্যেকটি ঋতুকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি তবেই আমাদের চিত্তের সব দৈন্য দূর হয়, অন্তরাত্মা ঐশ্বর্যময় হইয়া উঠে। প্রাচীনকালে আমাদের পিতামহেরা হয়তো এই তত্ত্ব জানিতেন। তাই প্রাচীন কালের আয়োজনের মধ্যে ঋতুতে-ঋতুতে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করার যে সব উৎসব ছিল তাহার একটু আধটু অবশেষ এখনও খোঁজ করিলে ধরা পড়ে। আমরাও যদি ঋতুতে-ঋতুতে নব নব ভাবে উৎসব করি তবে কেমন হয়?" আমরা মনে মনে স্থির করিলাম—এই বর্ষাতেই একটি বর্ষা-উৎসব করিতে হইবে।

কিন্তু হঠাৎ কি কারণে গুরুদেব কিছুদিনের জন্য বাহিরে গেলেন। বর্ষা-ঋতু অর্থাৎ শ্রাবণমাস বিদায় লইতে উদ্যত হইল। বীরভূম জেলায় এমনি বর্ষা ক্ষণস্থায়ী, মেঘবাদলও যায় যায়। তখন স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজিতকুমার চক্রবর্তী, শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রভৃতি সকলে মিলিয়া একটা বর্ষা-উৎসবের আয়োজন করা গেল। বর্ষার জন্য বৈদিক পর্জন্য দেবতার বেদি সাজান হইল, ভালো ভালো পর্জন্যস্তুতি উচ্চারিত হইল, তারপর রামায়ণ হইতে বর্ষার বর্ণনা, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের বর্ষাবর্ণনা পড়া হইল, বৈষ্ণব কবিগণের বর্ষার গান, ইংরাজী হইতেও কিছু কিছু বর্ষার কবিতা পাঠ এবং সর্বশেষে গুরুদেবের কাব্য হইতে বর্ষার ভালো ভালো কবিতা পঠিত হইল। দিনুবাবু সদলবলে "অচ্ছা বদ তবসং গীর্ভিরাভিঃ" এই বৈদিক বর্ষাসংগীতটি সুর সহ গান করিলেন। মোটের উপর উৎসবটি ভালই হইল। দিনুবাবু ও অজিতবাবুর পত্রে গুরুদেব দূর হইতেই এই সব খবর শুনিয়া খুব খুশি হইলেন।

কয়েক দিন পরেই গুরুদেব আশ্রমে ফিরিলেন। তখনই তাঁহার মনে-মনে জাগিয়াছে শরৎকালের উৎসব। তাই ১৩১৫, ৩রা ভাদ্র তারিখে তিনি গান বাঁধিলেন "বেঁধেছি কাশেরি গুচ্ছ" ও "অমল ধবল পালে লেগেছে"। ৭ই ভাদ্র গান হইল "আবার নয়ন-ভুলানো এলে"। ইহার প্রাক্তন রূপ ছিল "আমার সফল স্বপন এলে"— তার পর করিয়া দিলেন "আমার নয়ন-ভুলানো এলে"। তখন তিনি প্রকৃতির শুধু হয়তো আনন্দরূপটিই দেখিতেছেন। ক্রমে তাঁহার মনে আসিল একটি গভীর তত্ত্বকথা। বর্ষায় এই পৃথিবী আকাশ হইতে অজস্র রসধারা পায়, শরতে সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধিতে পৃথিবী তাহা ফিরাইয়া দিয়া ঋণ শোধ করে— এই কথাই গুরুদেবের মনের মধ্যে তখন ছিল ভরপুর হইয়া। সেই কথাটাই শারদোৎসবের বীজ-সত্য। সন্ন্যাসী তাই ঠাকুরদাদার কাছে তাঁহার অন্তরের গভীরতম কথাটি বুঝাইয়া বলিতেছেন—

"আমি অনেকদিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন? কিছুই ভেবে পাইনি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি— জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে! বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ দিয়ে করছে! সেইজন্যই ধানের খেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে,

বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ! কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যই এত সৌন্দর্য !"

এই ঋণশোধেরই মানবীয় রূপ দেখা গেল উপনন্দের মধ্যে। সুর-সেনের স্নেহের ঋণ সে বড়ো দুঃখে শোধ করিতেছিল। লক্ষেশ্বরের তর্জনেও উপনন্দ ব্রতভ্রষ্ট হয় নাই। এই মহদ্দুঃখই সাধনার মধ্যে মহনীয়তা সঞ্চয় করে।

গুরুদেব প্রথমে শরতের কয়টি গানই রচনা করিয়াছিলেন। তার পর তিনি ঐ কয়টি গানের সঙ্গে গাঁথিয়া গল্পটি মিলাইয়া দিয়া শারদোৎসব রচনা করিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে অজস্র ধারায় আসিল আরো কয়টি গান ; যথা— "মেঘের কোলে রোদ হেসেছে", "আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়", "আনন্দেরি সাগর হতে", "তোমার সোনার থালায়", "নব কুন্দধবলদল"। ইহার মধ্যে যজুর্বেদ হইতে একটি বেদমন্ত্রও তিনি গ্রহণ করিলেন এবং বন্দীদের রাজপ্রশস্তি "রাজরাজেন্দ্র জয়"— গানটি যে শারদোৎসবে বসাইলেন তাহা পূর্বে একসময়ে প্রসঙ্গান্তরে তাঁহার দ্বারাই রচিত হইয়াছিল। শারদোৎসবের আনন্দটি হইল প্রকৃতির মধ্যে সকল দুঃখ দিয়া প্রেমের ঋণ-শোধচেষ্টা।

বিশ্বসৃষ্টিকে পাইবার জন্য সরল হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ হইল তাঁর "ডাকঘরে"। মানুষের নির্মল সরল মনের মধ্যে বিশ্বনাথের ব্যাকুল ডাক আসে, তাই চিত্তমন হয় ব্যাকুল। সব দরজা জানালা বন্ধ করিয়া সেই ব্যাকুল ডাকটি চাপা দিবার সম্প্রদায়গত চেষ্টার স্বরূপটি দেখাইলেন তিনি "অচলায়তনে"। তারপর অন্তরের অন্তরে চিন্ময় জীবননাথের জন্য প্রেম-ব্যাকুলতা দেখাইলেন তিনি "রাজা"য়। "ফাল্গুনী"তে তাঁহার বসন্তের আনন্দ মহোৎসব। শারদোৎসব হইল শরতের এবং ফাল্গুনী হইল বসন্তের মর্মকথা।

নব-নব রূপরচনায় ও কাব্যসাহিত্য সৃষ্টির দ্বারা তিনি তাঁহার মনের এই সব বড় বড় তত্ত্ব ছোট ছেলেদেরও বোধগম্য করাইতে চাহিতেন। তাই তাঁর ব্যাকুলতার আর অন্ত ছিল না। আমাদের কাছেও তাঁহার দাবি ছিল অনেক। আমাদের শক্তি পরিমিত, তাই নিরুপায় হইয়া আমরাও নিরন্তর তাঁহার কাছে জানাইতাম আমাদের সব প্রার্থনা।

দেখিতাম তখন প্রতিদিন শেষরাত্রিতে ৩টা ৩॥টার সময় তিনি মুক্ত

আকাশের তলে আসিয়া ধ্যানে বসিতেন। আলোক হইলে তখন সেই ধ্যান সমাপ্ত হইত। তাঁহার সেই ধ্যানলব্ধ ঐশ্বর্যের একটু প্রসাদকণার আবেদন তাঁহার কাছে বার বার জানাইয়াছিলাম। একদিন তিনি জানিলেন যে আগামী ১৬ই অগ্রহায়ণ আমার একটি বিশেষ দিন। সেই উপলক্ষে কি আশীর্বাদ তিনি দিবেন সেই কথাই যখন তিনি ভাবিতেছেন তখন তাঁহার কাছে আমি সেই প্রভাত-উপাসনারই একটু প্রসাদ ভিক্ষা করিলাম। প্রভাত-কালের এই ব্রাহ্মমুহূর্তটুকু তাঁহার বড় যত্নের ধন। এই সময়টুকুই একান্তভাবে তাঁহার অধ্যাত্মলগ্ন। তাই যখন তিনি একটু ইতস্তত করিতেছেন তখন আমরা অনেকেই তাঁহার কাছে ঐ একই আবেদন জানাইলাম। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিন্তু অতিশয় সংকোচের সহিত তিনি কিছুদিনের মত রাজী হইলেন।

শীতকাল। অগ্রহায়ণ মাস। শান্তিনিকেতনের মন্দিরের বারান্দায় শেষরাত্রি ৪॥টায় আমরা কয়েক জন একত্র হইতাম। তিনি তারও বহুপূর্বে সেখানে বসিতেন। ৪॥টা হইতে ৫টা আমরা তাঁহার সদ্যপ্রাপ্ত ভাগবত সত্যের কিছু প্রসাদ পাইয়া উঠিয়া যাইতাম। তিনি তাহার পর আরও অনেক ক্ষণ সেই আসনে বসিয়া থাকিতেন। কিছুকাল এইরূপ চলিল। যাঁহারা যাইতেন তাঁহারা তাহাতে খুবই উপকৃত ও তৃপ্ত হইতেন। কিন্তু তিনি আপনার মর্মের এই সব কথা শুনাইতে বড়ই সংকোচ বোধ করিতেন। তিনি কোথাও গেলে বা অন্য কারণে মাঝে মাঝে বাধাও পড়িত। তবু প্রতিদিন প্রভাতের এই ব্যবস্থা বেশি দিন চলিল না। ছয়টি মাস পূর্ণ না হইতেই তিনি নম্রভাবে একান্ত সঙ্কোচ জানাইয়া বিদায় লইলেন। ১৩১৫ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ হইতে ১৩১৬ সালের ৭ই বৈশাখ পর্যন্ত তিনি তাঁহার ঐসব অধ্যাত্ম মুহূর্তগুলির কথা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের ভাষায় এক অমর সম্পদ হইয়া রহিল। ইহার পর তিনি উৎসবে বা বিশেষ কোনো কোনো দিনের উপাসনায় প্রকাশ্যভাবে যাহা বলিয়াছেন তাহার দ্বারাই শান্তিনিকেতনের সেই ধারাকে বজায় রাখা হইয়াছে। প্রত্যুষের সেই প্রসাদবিতরণ আর চলে নাই।

১৯০৮ হইতে গুরুদেবের একটি মহনীয় অধ্যাত্মযুগ তাঁহার সব লেখা

জুড়িয়া দীপ্যমান। তখন ধর্ম, শান্তিনিকেতন, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি পর পর বাহির হইয়া চলিয়াছে। বড় সুসময়েই তাঁহার কাছে আসিয়াছিলাম। ১৩০৯ সালে আবার সেই অগ্রহায়ণ মাস আসিল। এবার তাঁহার কাছে শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ছাত্র সবার জন্যই কিছু বৈদিক মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ চাহিলাম। তিনি বলিলেন কিছু অনুবাদ তিনি পূর্বেই করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা না পাওয়া যাওয়ায় ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে তিনি কথা দিলেন এই কাজে তিনি আবার হাত দিবেন। ৭ই পৌষের উৎসব আসিতেছে, তাহার পূর্বেই কতকগুলি মন্ত্রের অনুবাদ হইলে ভাল হয়। মনে হইতেছে ২২শে অগ্রহায়ণ হইতে সপ্তাহকালের মধ্যে— অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির মধ্যে কয়েকটি বেদমন্ত্রের অনুবাদ আবার হইল। এইগুলিতে সুর দিবার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল। তাই সুর না দিয়া তিনি অনুবাদ বাহির করিতে চাহেন নাই। ইহার মধ্যে "পিতা নোঽসি" (বাজসনেয়ি সংহিতা, ৩৭,২০) মন্ত্রের অনুবাদ— "তুমি আমাদের পিতা" এবং "যদেমি প্রস্ফুরন্নিব" (ঋগ্বেদ ৭,৮৯, ২-৪) মন্ত্রের অনুবাদ— "যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই" এই দুইটি গান রীতিমত প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। য আত্মদা বলদা (ঋগ্বেদ ১০, ১২১,২, অথর্ব ৪,২,১) মন্ত্রের যে অনুবাদটি পূর্বেই তিনি করিয়াছিলেন, তাহা তত্ত্ববোধিনীতে বাহির হইয়াছিল ফাল্গুন মাসে ১৮৯৪ সালে। সেই যুগে আরও কিছু মন্ত্রের অনুবাদ হয়তো তিনি করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা আমরা দেখিতে পাই নাই। তবে ১৯০৯ সালে করা তাঁহার কয়েকটি বৈদিক মন্ত্রের অনুবাদ আমি সযত্নে রক্ষা করিয়াছি। ১৮৯৪ সালের পর আর কোনো বৈদিক মন্ত্রের তাঁহার কৃত অনুবাদ তখনো বাহির হয় নাই। ১৯০৯ সালে যখন আমরা অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে বৈদিক মন্ত্রের অনুবাদে আবার প্রবৃত্ত করাইলাম তখন তিনি প্রথমেই তাঁহার পরম প্রিয় "য আত্মদা" মন্ত্রটিরই পূর্বকৃত অনুবাদের খোঁজ করিলেন। কিন্তু তাহা খোঁজ করিয়া আর পাওয়া গেল না, সেই খাতাখানা পরেও খোঁজ করিয়া আর পান নাই। তাহাতে কোন্ কোন্ মন্ত্রের অনুবাদ ছিল তাহাও জানিনা। সেই পুরাতন মন্ত্রানুবাদগুলি হারাইয়া যাওয়ায় তাঁহার মনে একটা দুঃখ বরাবরই ছিল।

সেই অনুবাদের খাতা না পাইয়া ১৯০৯ সালে পুনরায় "য আত্মদা" মন্ত্রটির

অনুবাদ তিনি করেন। গত চৈত্রমাসের প্রবাসীতে আমার স্নেহভাজন শ্রীমান নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮১৫ শকের (১৮৯৪ খ্রীঃ) ফাল্গুনের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে পুরাতন হারাইয়া যাওয়া অনুবাদটি দিয়াছেন। তাহার আরম্ভ হইল—

আত্মদা বলদা যিনি, সর্ববিশ্ব সকল দেবতা
বহিছে শাসন যাঁর, মৃত্যু ও অমৃত যাঁর ছায়া ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?

১৯০৯ সালের পুনরায় করা অনুবাদের প্রথমটা হইল—

আপনারে দেন যিনি,
সদা যিনি দিতেছেন বল,
বিশ্ব যাঁর পূজা করে
পূজে যাঁরে দেবতাসকল—
অমৃত যাঁহার ছায়া
যাঁর ছায়া মহান্ মরণ—
সেই কোন্ দেবতারে হবি মোরা করি সমর্পণ।

দ্বিতীয় অনুবাদটির মূল লিপি আমার কাছে আছে। তাহা হইতে লইয়াই শ্রীমান্ নির্মল ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন। "তুমি আমাদের পিতা" এবং "যদি ঝড়ের মেঘের মতো" এই অনুবাদছুটিরও কবিগুরুর হস্তলিখিত মূললিপি আমার কাছে আছে। ইহা ছাড়া আরও কয়টি মন্ত্রের অনুবাদ তিনি তখন করেন। এই তিনটি মন্ত্রের অনুবাদ ছাড়া আরও যে কয়েকটি মন্ত্রের অনুবাদ ১৯০৯ সালে তিনি করেন তাহাও আমার কাছে আছে। প্রায়ই এইগুলি আমি তাঁহার কাছে উপস্থিত করিয়া সুর দিয়া বাহির করিবার জন্য তাগিদ দিতাম। তিনিও সুরছাড়া তাহা বাহির করিবেন না বলিয়া এক এক সময়ে সুর দিতেও প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু নানা কাজের তাগিদে মনের মত সুর আর তিনি দিয়া উঠিতে পারেন নাই।

বৈদিক মন্ত্রের সুরের মধ্যে একাধারে সরলতা, গাম্ভীর্য ও মহত্ত্ব থাকা চাই। তাই নিজে কত বার সুর দিতে গিয়াও তাহা নিজেই পছন্দ করেন নাই। প্রতিবারই তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে কথা হইত। দেখিতাম সুর ছাড়া এইগুলি প্রকাশিত করিতে তিনি অনিচ্ছুক। তাই এগুলি এতদিন আমার

কাছেই প্রতীক্ষা করিতেছিল। আর তো তাঁর সুর দিবার সম্ভাবনা নাই, তাই আমি ঐ খাতাখানি তাঁহার তিরোভাবের পরই কয়েক জনকে দেখাইয়াছি। নির্মলচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। এখন কোনো যোগ্য অবসরে এই অনুবাদ কয়টি প্রকাশিত করিতে হইবে। ইহাতে সুর সংযোগের সম্ভাবনা চিরদিনের মত যে তিরোহিত হইল এই দুঃখই মনে রহিয়া গেল।

পূর্বেই বলিয়াছি এই মন্ত্রগুলির পূর্বে তিনি আরও কিছু বৈদিক মন্ত্রের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা আমি দেখি নাই। হয়তো খুঁজিলে পরে তাহা কোথাও মিলিতেও পারে। বৈদিক মন্ত্রের আবহাওয়ার মধ্যেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ধম্মপদের অনুবাদও হয়তো সেই ভাবেই কোথাও আছে। ইহা ছাড়া আমি তাঁহাকে দিয়া ১৯১০ সালের পরে ঋগ্বেদের আরও কয়েকটি মন্ত্রের অনুবাদ করাইয়াছিলাম। তাহার মধ্যে উষার বর্ণনা-মন্ত্র, পর্জন্যের স্তবমন্ত্র, বসিষ্ঠের আরও দুই একটি মন্ত্র আছে। অথর্ববেদটি আমার নিজের অতিশয় প্রিয়। অথর্বের কয়েকটি স্তব আমি তাঁহার কাছে উপস্থিত করাতে তিনিও তাহার অতিশয় প্রশংসা করেন। অথর্ব বেদের ২, ১; ৩, ৩০; ৪, ৩০; অষ্টম কাণ্ডের বিরাটস্তুতি, নবম কাণ্ডের হেঁয়ালিগুলি, দশম কাণ্ডের নৃসূক্ত এবং স্কম্ভসূক্ত, একাদশ কাণ্ডের উচ্ছিষ্ট স্তব এবং মানবদেহের মাহাত্ম্য, দ্বাদশ কাণ্ডের মহীসূক্ত, পঞ্চদশ কাণ্ডের ব্রাত্যসূক্ত তাঁহার খুবই ভাল লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যে কতকগুলি মন্ত্রের তিনি অনুবাদও করেন। উনবিংশ কাণ্ডের অভয় মন্ত্রটি (১৯, ১৫, ৫-৬) তিনি পূর্বেই অনুবাদ করিয়াছিলেন, এবং তাহা এখনও আমার কাছে আছে। অথর্বের "পরিস্থাবা পৃথিবী সদ্য আয়মুপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য" (২, ১, ৪) মন্ত্রটিও তাঁহার খুব ভাল লাগায় তিনি তাহার অনুবাদ করেন। শেষ সপ্তকে এই মন্ত্রটি তিনি চল্লিশ নম্বরের কবিতার প্রারম্ভে (১৩২ পৃ.) বসাইয়াছেন। এই সব মন্ত্রের সবটা তিনি অনুবাদ করেন নাই। তবে মাঝে মাঝে বাছিয়া বাছিয়া যাহা অনুবাদ করেন তাহার পরিমাণও নিতান্ত কম নহে। ১৯, ৯, ১৪ শান্তিমন্ত্রটিও তিনি অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের খাতাখানিও তিনি আর পরে পান নাই। যদি এই খাতাখানি পাওয়া যায় তবে অনেক নূতন সম্পদের সন্ধান মিলিবে। ১৯০৯ সালের পূর্বে এবং ১৯১০ সালের পরে তাঁহার রচিত সবগুলি মন্ত্রানুবাদ একত্রে

প্রকাশিত হইলে বাংলা ভাষায় একটি পরম সম্পদ পাওয়া যাইবে। অমৃতের সাধক প্রাচীন ঋষিদের মহাবাণীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার সীমা ছিল না, সেই শ্রদ্ধার উপযুক্ত সাধনাও তিনি করিয়া গিয়াছেন। সেই আনন্দের ঋণশোধের বৃত্তান্ত সকলের গোচর হইলে তাহাও শারদোৎসবের শরৎপ্রকৃতির ও উপনন্দের ঋণশোধের মতই সুন্দর ও মনোহর হইবে। কারণ সেই সাধনাতে কোথাও বিশ্রাম ছিল না, কোথাও কিছু মাত্র ফাঁকি ছিল না।

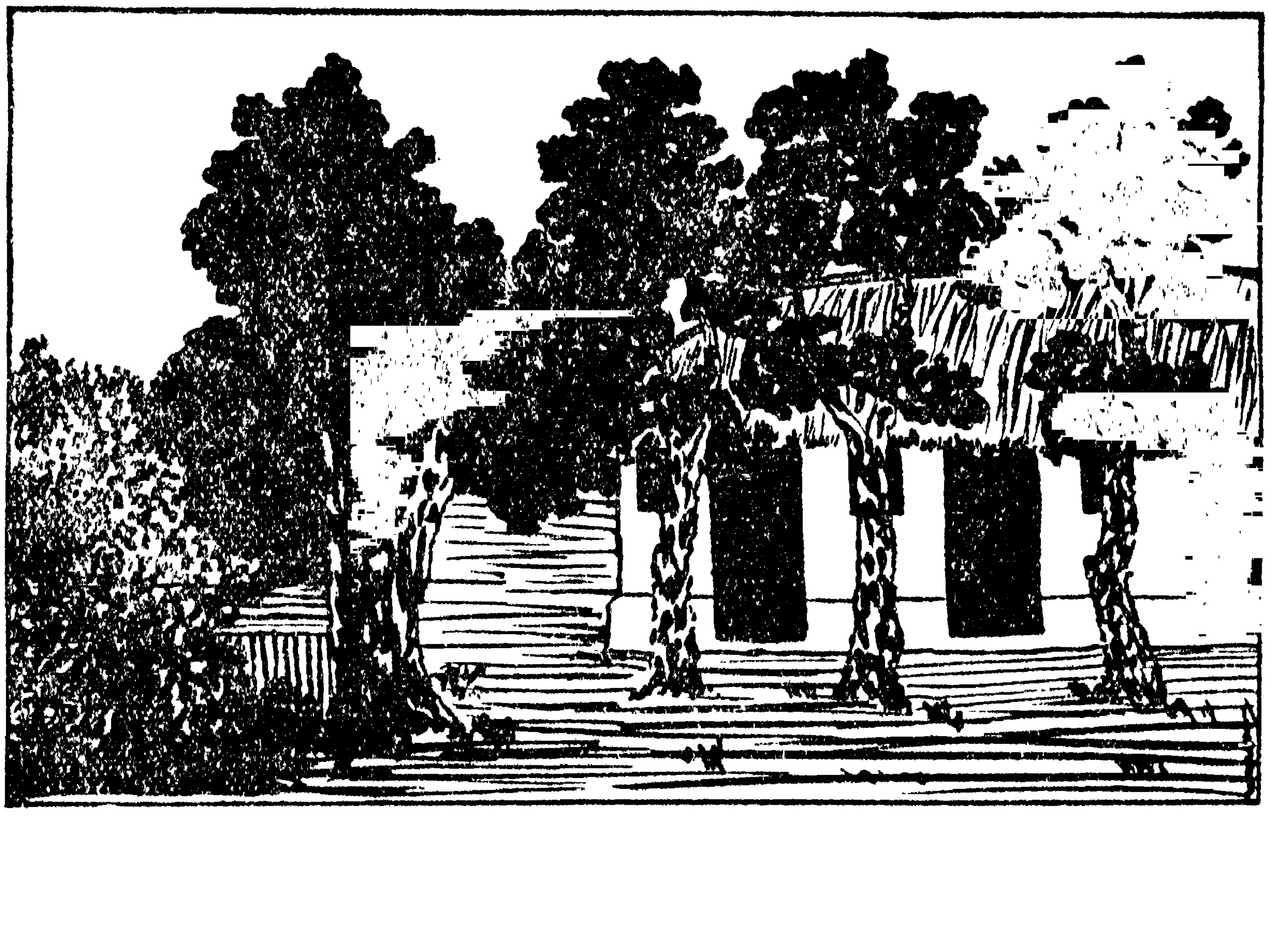

আশ্চর্য মানুষ রবীন্দ্রনাথ

শ্রীহেমলতা দেবী

প্রথম স্বীকার করি কবিকে শিক্ষাব্রতীরূপে। শিক্ষাগুরু রূপেই আমরা তাঁকে প্রথম পেয়েছি। তিনি শুধু আমাদের শিক্ষাগুরু নন, বহুজনের। তাঁর গুরুগিরি পাঠ মুখস্থ করিয়ে বিদ্যা গিলিয়ে শিক্ষার্থীকে বুলি আওড়ানো তোতাপাখি করে তোলা নয়। নিজের সচেতন মন দিয়ে অন্যের মনকে জাগিয়ে তোলার সোনার কাঠি ছিল কবির অবচেতনার মধ্যে। যার মনকে তিনি স্পর্শ করতেন তার অবচেতনায় সাড়া জাগত। এক কথায় কবিকে 'মন-জাগানো' গুরু বলা যেতে পারে। এই ব্যাপারে তাঁর আরও একটু নূতনতর বিশেষত্ব ছিল। শিশু, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলের মনে সাড়া জাগিয়ে তুলতে পারতেন তিনি তার মনের মত হয়ে। গোড়ায় ধরা যাক শিশুদের মনের কথা ফোটানো নিয়ে। শুধু 'শিশু' বইখানি লিখে তিনি শিশুদের মনের খোরাক জোগান নি— কত ভালবাসা দিয়ে তিনি তাদের মনকে গড়ে তুলেছিলেন যারা তাঁর শিক্ষালয়ের শিশুদের প্রতি ব্যবহার দেখেছে তারাই তা জানে। প্রাণ দিয়ে শিশুদের যত্ন করতে চেয়েছেন— যে জায়গায় নিজের হাতে তাদের নাওয়াতে খাওয়াতে পারতেন না সে জায়গায় প্রতি মুহূর্তে শিক্ষালয়ে মাতৃজাতির অভাব অনুভব করতেন গভীরভাবে। শিশুরা মূক— মনের কথা মুখে ফোটাতে জানে না তারা— তাদের অস্ফুট কাকলীর মধ্যে কবি খুঁজে পেতেন তাদের মনের ভাষা। কেউ তাঁর বিদ্যালয়ের শিশুদের যত্ন নিয়ে ভালবেসে আদর করছে, খাওয়াচ্ছে দেখলে তিনি নীরবে কত আশীর্বাদ বর্ষণ করতেন যারা সে আশীর্বাদ পেয়েছে তারাই তা জানে। এক সময়ে কবি একখানি পত্রে তাঁর কোনো আত্মীয়াকে নির্দেশ করে লিখছেন, "—ছেলেদের যত্ন করিতেছেন ও বিদ্যালয়ের জন্য চিন্তা করিতেছেন আপনার পত্রে এই সংবাদ পাইয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। তাঁহাকে আমার আশীর্বাদ জানাইবেন।"*

* শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখিত পত্র (দেশ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৯)

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের গোড়ার দিকে তৎকালীন আশ্রম-অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখিত আর একখানি পত্রে ছাত্রদের প্রতি তাঁর গভীর মনোযোগের পরিচয় সুস্পষ্ট। আশ্রম থেকে দূরে গিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত নন— লিখছেন, "তীব্র শীতের হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই সময়ে ছেলেদের স্বাস্থ্যের প্রতি একটু বিশেষ সতর্ক হইবেন। স্নানের সময় আপনারা কেহ উপস্থিত থাকিয়া ইহাই দেখিবেন যে স্নানের সময় তেল মাখিতে জল ঢালিতে কেহ যেন অনাবশ্যক বিলম্ব না করে। তেলটা খোলা হাওয়ায় না মাখিয়া ঘরে মাখিলেই ভাল হয়। সেই সময় ভাল করিয়া যেন গা ঘসে। এমন করিয়া গা ঘসা আবশ্যক যাহাতে কিছু পরিশ্রম ও শরীরে উত্তাপ সঞ্চার হয়। তাহার পরে দ্রুত আসিয়া জল ঢালিয়া খসখসে তোয়ালে দিয়া গা বেশ করিয়া ঘসিয়া ফেলে। উপাসনার বস্ত্রের সঙ্গে একটা গরম কাপড় পরা বিশেষ দরকার। স্নানের পর ঠাণ্ডা লাগানো কোনোমতেই হিতকর নয়···ছেলেদের সর্দ্দি হইলেই পায়ের তেলোয় গরম সর্ষের তেল মালিশ করানো উচিত।" কবির মন যে মাতৃস্নেহে ভরা এই পত্রে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। নিজের সন্তানদেরও তিনি পিতামাতার জড়িত স্নেহ দিয়ে লালন করেছেন। অকালে পত্নীবিয়োগ হওয়ায় সন্তানদের জীবনে এই যুগ্মস্নেহ কার্যকরী হয়েছিল। শিশু শমী অতি শৈশবে মাতৃহীন হয়। তার প্রতি কবির স্নেহ কী নিবিড় ছিল! তার মৃত্যুতে কবির মর্মবেদনা যারা কাছে ছিল তারাই জেনেছে। কী আশ্চর্য সহিষ্ণুতার সঙ্গে কবি এই দারুণ সন্তানশোক গ্রহণ করেছিলেন ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

শমী ছেলেটি ছিল যে কী সুন্দর— শুধু রূপে নয় মনোমাধুর্যেও যারা তার মনের কথা শুনেছে তারাই জানে। কবির অনুপস্থিতে একদিন দেহলীর দোতলায় বৈকালে শমী বসেছে কবির সামনের ডেস্কে একটা খাতা পেনসিল নিয়ে হিজিবিজি লিখছে কত কি। কবির ঘরটি ঝাড়ামোছা ঠিকমত হয়েছে কিনা দেখবার জন্যে ঢুকেছি সেইসময় সেই ঘরে। আমাকে দেখে শমী বলে উঠল, 'দেখ তো বড়ো বৌঠান, আমাকে ঠিক বাবার মত দেখাচ্ছে কিনা— অনেকটা সেইরকম— না?' বললুম, 'আহা, সিংহের আসনে শেয়াল বসেছে আবার বলছে কেমন দেখাচ্ছে— কী লেখাই লিখছ?' 'যাও, বড়ো

বৌঠান, তুমি একবার বলনা ঠিক বাবার মত দেখাচ্ছে।' বললুম, 'আচ্ছা তাই নয় হোলো। সত্যি করে বল্ তো শমী তুই কাকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসিস।' 'বলব না, বলব না,— সত্যি বলব, তোমার কানে কানে বলি— বা—বা—কে।' টেনে টেনে বলল শমী 'বাবা' নামটা। বললুম, 'তুই বাবাকে এত ভালবাসিস তবে বাবার কাছে শুস্‌নে কেন?' 'তুমি বেশ যাহোক্, বাবা বুঝি কাউকে নিয়ে শুতে পারেন?' বললুম, 'আচ্ছা, কাকামশাই আসুন এবার আমি বলব যে শমীকে নিয়ে আপনি একদিন শোবেন— সে আপনার কাছে বড্ড শুতে চায়।' চেয়ার থেকে উঠে হাত দিয়ে আমার মুখটা চেপে ধরে শমী বললে, 'ভালো হবে না বড় বৌঠান, বাবাকে এসব বললে— তোমার সঙ্গে আমি তাহলে কক্ষনো কথা বলব না দেখো।' কাকামশাই ফিরলে আমি তাঁর কাছে এই গল্প করেছিলুম। তিনি মুচকে একটু হাসলেন কিন্তু চোখ দিয়ে কী যে স্নেহ ঝরে পড়ল ভাষা নাই যে সে স্নেহের ভাব-প্রকাশ করি। কবির শিশুধন এই শমীর মৃত্যুতে তাঁর স্নেহের ধারা যেন বেয়ে পড়ল বিদ্যালয়ের শিশুগুলির প্রতি।

শান্তিনিকেতনে বাসকালে বর্ষায় অজস্র বৃষ্টিধারার মধ্যে কবি ছাতা মাথায় বেরিয়েছেন বিদ্যালয়ের শিশু, বালকগুলির কি দশা হচ্ছে খোঁজ নেওয়ার জন্যে। তখন আশ্রমের ছাত্রদের বাসঘরগুলি সবই ছিল খড়ের। ছেলেরা ঘুমিয়ে আছে, বৃষ্টির জলে তাদের বিছানাপত্র ভিজছে কিনা এই ভেবে কবি অস্থির হতেন। ঘুম ভেঙে কোন কোন দিন দেখেছি জলশপশপে জুতো পরে ভিজে ছাতায় জল বেয়ে পড়ছে কবি ফিরছেন— রাত্রি তখন হবে অনুমান দুটো— শান্তিনিকেতন কুঠীর দোতালায়। পরদিন ভোরে নিজেই নিজের জুতোছাতা রোদে দিচ্ছেন কুঠীর গাড়িবারান্দার ছাদে।

বিদ্যালয়ের ছেলেগুলি তাঁর প্রাণ। অশীতিপর বৃদ্ধ কবি শিশুদের মধ্যে থাকার জন্যে কতখানি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন একটি ঘটনায় সেটি প্রকাশ পেয়েছে। শেষ জীবনে দেহলীতে বাসের জন্যে কবির কি ইচ্ছা! তাঁর 'দেহলী' বাড়িটিতে আমরা তখন বাস করছি। আমাদের কাছে বাড়ির চাবি চেয়ে নিয়ে এলেন নিশ্চয়ই দেহলীতে থাকবেন ভেবে। ঠাট্টা করে বললেন, "মুনীশ্বর* লাঠি নিয়ে তাড়া করবে না তো আমাকে? দাও বাপু কিছু-

* ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয় ভৃত্য

দিনের জন্যে 'দেহলী'টি আমাকে ধার।' বললুম, ' 'দেহলী' তো আপনারি— আমাদের আবার কবে হোলো? আপনার বাড়ি আপনি থাকবেন— তার আবার বলার কি আছে?' দেহলীতে থাকবেন, যখন ইচ্ছা শিশুদের দেখবেন, যখন ইচ্ছা তাদের ডাকবেন এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। বললেন, 'শিশুদের আমি আবার পড়াব পূর্বের মত— তাদের শেখানো আমার শেষ হয়নি।' আরও বললেন, 'শিশুরা তো মনের কথা ফুটে বলতে পারে না,—আমার কাছে যখন ইচ্ছা আসতে পারে না— তাই আমাকেই তাদের কাছে যেতে হবে।'* দেহলীতে বাস করা এখন তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় আমরা জানতুম কিন্তু এতটা চাওয়ার উপর কোনো কথা বলা চলে না ভেবে নিরস্ত হতে হোলো। পাশে বসা একজন বলল, 'দেহলীর যে সিঁড়ি— ওঠা নামা আপনার কর্ম নয়।' কবি বললেন, 'নাইবা নামলুম— একবার উঠব আর নামব না।' পরে কবি নিজেই বুঝলেন দেহলী-বাস আর তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হবে না। তখন পত্রে লিখছেন— "আমি সেদিন ভাবছিলুম মাঝে মাঝে তোমার দোতালাটা অধিকার করে আর একবার শিশুসম্প্রদায়ের নিকটসংসর্গ লাভ করব— সেকথা তোমাকে বলেওছিলুম— কিন্তু নিজেকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা আমার পক্ষে এমন দুঃসাধ্য যে সে ঘটে উঠবে না।"†

সেইসময়ে একদিন শিশুভোজের আয়োজন করা হোলো তাতে কি আনন্দ! দিনেন্দ্রনাথের বাসবাড়ি 'সুরপুরী'তে হোলো ভোজের আয়োজন—

* দেহলী-বাসের উৎসাহে সে সময়ে কবি এতই উৎফুল্ল—শিশুদের দেখাশুনা ও যত্ন নেওয়ার জন্য তাদের ঘরের পাশের কামরায় থাকেন কণা দেবী—তাঁকে দেখেই একদিন কবি বলে উঠলেন, 'ওগো আমি ত এখন তোমাদের কাছাকাছি থাকতে যাচ্ছি।' দেহলীকে নির্দেশ করে বললেন, 'তুমি জানো আমি ঐ বাড়িতেই থাকতুম— শিশুদের কাছে।' কণা দেবী পূর্ববঙ্গের মানুষ, কথায় পূর্ববঙ্গীয় টান থাকা স্বাভাবিক। কবি বললেন, 'কী ভাষায় তুমি শিশুদের গল্প বল, দেখো, আমার শিশুদের যেন বাঙাল করে তুলো না।' কবির মনে তখন শিশু শিশু ঘুরছে। এইখানে একটি গল্প মনে পড়ছে। একটি সাত বছরের বালক তার ঠাকুরদাদাকে জিজ্ঞাসা করছে, 'দাদামশায় তুমি আমাকে কতখানি ভালবাসো?' দাদামশায় উত্তর দিলেন, 'আর কাউকে কখনো কি এত ভালবেসেছি যে বলব কত ভালবাসি?' এই তুলনাটি কবির সম্বন্ধে সুন্দর খাটে। কবির অগাধ কাব্যসমুদ্রেও তাঁর শিশু-ভালবাসার সম্যক নির্দশন দুর্লভ। তাঁর সৃষ্ট আশ্রম বিদ্যালয়ের মাটির বুকে সেটি লেখা আছে। সে অক্ষর যে চেনে, সেই তা পড়তে পারে।

† ২৯ ফাল্গুন, ১৩৪৫

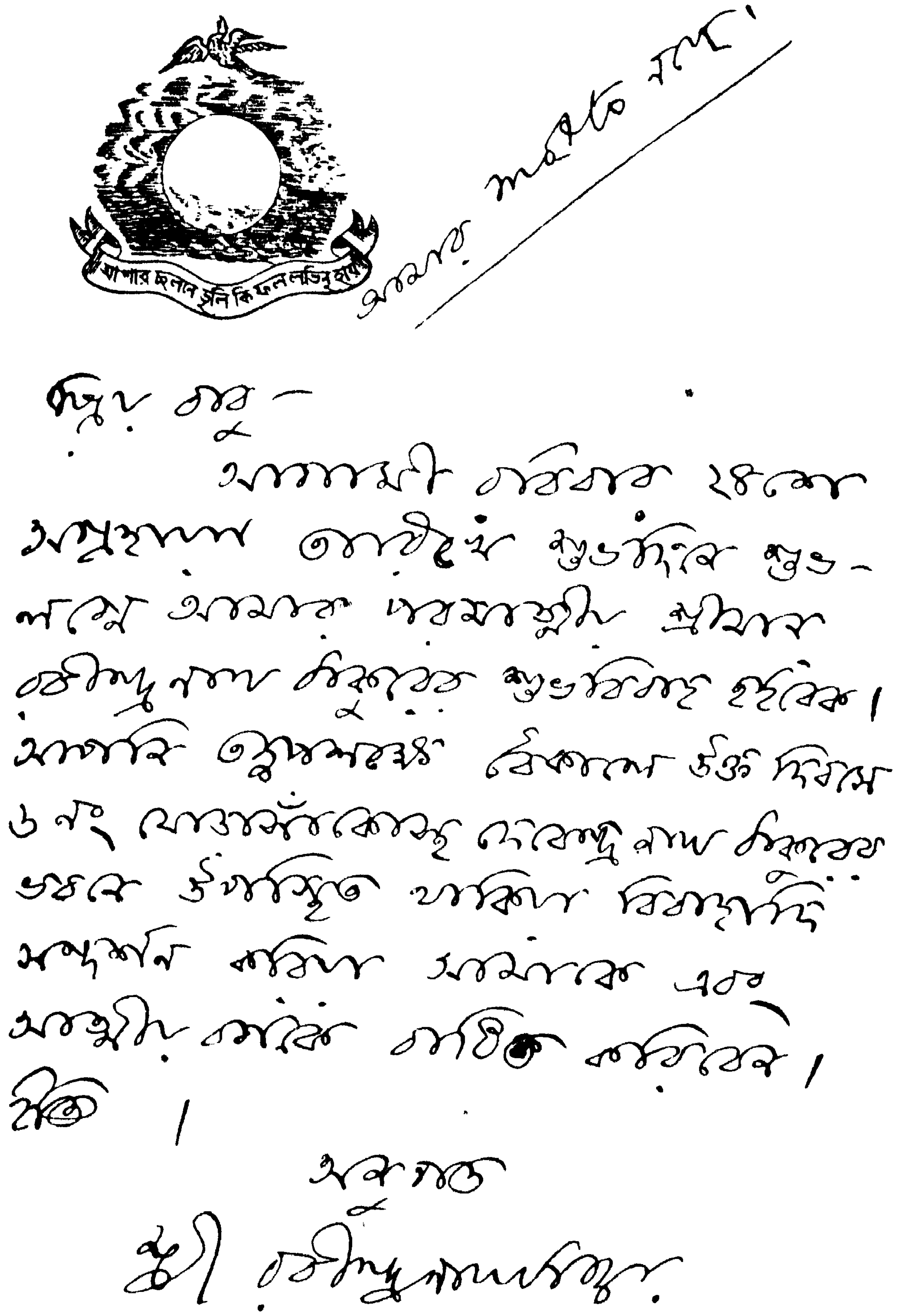

রবীন্দ্রনাথের বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র
প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত

রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ]

কবির আত্মীয়া মহিলারা ও 'গুরুপল্লী'র গুরুগৃহিণীরা কেহ কেহ নিজের হাতে রান্না করলেন। কবির খাওয়ার সময় বৈকাল ছ'টা। থালাবাটিতে খাবার গুলি সাজিয়ে আগে তাঁকে পাঠানো হোলো। কী খুশী! ঘরের খাবার ফেলে শিশুদের খাবারগুলি আগেই মুখে দিতে লাগলেন। যেটা মুখে দেন সেটাই বলেন— বেশ! আসল কথা জিভ দিয়ে স্বাদ গ্রহণের চেয়ে তিনি মন দিয়ে স্নেহের স্বাদ গ্রহণ করতেন বেশী। শিশুভোজের জন্যে সেদিন ঘরে মিঠাই তৈরি হয়েছিল। একটুখানি মিঠাই ভেঙে মুখে দিয়ে বললেন, 'শিশুদের প্রসাদ পাচ্ছি আমি।' বললুম, 'সে কী কথা— আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছে শিশুরা। আপনাকে আগে খাবার পাঠিয়ে তবে তারা ভোজে বসেছে।' ভোজ সেরে শিশুদের উল্লাসমুখর চীৎকার 'গুরুজী কি ফতে' শুনে কবি চোখ বুজলেন। মনে কী ভাব জাগল কে জানে!

কবির জীবন ছিল বেগবান নদীর মতো। সব কিছু মাড়িয়ে সব কিছু ছাড়িয়ে জীবনগতি চলত তাঁর প্রতিনিয়ত। সেই গতির মধ্যে তাঁকে দেখা যাবে কিন্তু তাতে তাঁকে পাওয়া যাবে না। পেতে গেলে তাঁর স্থিতির মধ্যে তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে। বেগবান নদীর দুই পাশের দুই কিনারায় স্থিতি। কবির জীবনগতির একটি কিনারা তাঁর কর্মক্ষেত্র— প্রাণ মন দিয়ে শিশুজীবনকে উন্নত করে তোলা— এক কথায় মানুষকে মানুষ করে গড়ে তোলার যেটি প্রথম সোপান। শিশুদের মন সেই গঠনের বীজবপন ক্ষেত্র— সেইখানেই গোড়ায় জল ঢালতে হবে কবি বারংবার বলেছেন। মঙ্গলকর্মের বৃহৎ ক্ষেত্রই তাঁর স্থিতির ক্ষেত্র। এইখানে নিজেকে যুক্ত করলে কবিকে শুধু দেখা নয় কিন্তু পাওয়া যাবে। এই তাঁকে প্রাপ্তির ঘর। মঙ্গলব্রতের যাঁরা সাধকসাধিকা তাঁরা জানেন, এ ব্রতের শেষ নাই— উদ্‌যাপন নাই। সৃষ্টি যেমন নিয়ত নূতন রূপপ্রসূ, মঙ্গলব্রত সেরূপ নিয়ত নূতন শুভপ্রসূ।

অন্য স্থিতি তাঁর ভূমানন্দময় মহান্ আকাশে যেখানে আত্মা পরমাত্মাতে সম্মিলিত। ধ্যানযোগে কবির সেই সাধনার পথকে উপলব্ধি করা যায়। রাত্রি চারটার ঝাপসা অন্ধকারে ওঠা, মন্দিরের পুবদিকের সামনের চাতালে গিয়ে বসা, উপাসনান্তে কণ্ঠ হতে অনর্গল বাণী ঝরা যারা নিজের চোখে দেখেছে নিজের কানে সে বাণী শুনেছে— কবির ধ্যানের তাৎপর্য তারা কিছুটা উপলব্ধি

না করে পারেনি। সেই বাণীগুলি 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে নিবদ্ধ। 'শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্' কবির ধ্যানের মন্ত্র। এই মন্ত্রে আত্মার ধ্যান করতেন তিনি নিজেও, অন্যকেও উৎসাহিত করতেন ঐরূপ ধ্যানে। ভূপেনবাবুকে লিখছেন — 'যতক্ষণ পারেন মনের মধ্যে এই ধ্যানটি রাখিবেন— শান্তং শিবমদ্বৈতম্।'

পৃথিবীর সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষের চিত্ত এই ধ্যানে সমাহিত হয়। নির্বিশেষ পরমাত্মা মানুষের সমাহিত চিত্তে প্রকাশ পান এই কথা কবির নিজের মুখে শোনা— তাঁর সহস্র রচনাতেও এটি সপ্রমাণ। নির্বিশেষে সমাহিত হবার জন্য তিনি ব্যাকুল হতেন সর্বদা। একখানি পত্রে লিখছেন, "এখন এসেছি সাগরসঙ্গমের কাছে, জীবনটাকে নির্বিশেষের নৈবেদ্য করে নিয়ে।" শেষ জীবনে এই ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। 'ডাক এসেছে' — এই ছিল তাঁর মুখের বাণী শেষের দিকে।

গুরুদেবকে আমার উৎসর্গ

শ্রী তান্ ইউন শান্

"আজকে বিকেলে শুনতে পেলাম, বন্ধু বললে, গুরুদেব মারা গেছেন, আমরা শুনতে পেলাম, তখন সবাই কাঁদতে লাগল।" ৭।৮।৪১

আজকে আমার ইস্কুল ছুটির দিন। আমি বাড়িতে একটা কবিতা লিখেছি :—

"গুরুদেব, গুরুদেব, আমাদের গুরুদেব !
আপনি কোথায় গেছেন ?
গুরুদেব, গুরুদেব, আপনি সত্যি কোরে মোরেছেন ?
গুরুদেব, গুরুদেব, আপনি কেন শান্তিনিকেতনে আসচেন না ?
আপনি হোচ্ছেন শান্তিনিকেতনের মা।" ৮।৮।৪১

উপরের লেখা দুটি আমার ছেলে তান লি-র। সে বিশ্বভারতীর শিশু বিভাগের ছাত্র। গুরুদেবের মৃত্যুর খবর শান্তিনিকেতনে পৌঁছিলে সে এগুলি লেখে,— এ সম্পূর্ণ তার নিজের রচনা, আমরা এর কিছুই বদলাইনি।

এই ছেলেমানুষি-লেখা আমাদের আশ্রমবাসীদের সেই সময়কার অনুভূতি ও মনোবৃত্তির খুব সহজ এবং সরল নিদর্শন। আমরা বড়রা হয়ত এত সহজ করে তা প্রকাশ করতে পারতুম না।

আজ পুরো একবছর হয়ে গেল আমাদের ছেড়ে শ্রদ্ধেয় গুরুদেব চলে গেছেন কিন্তু তাঁর প্রতি আমাদের মনোভাবের কোনোই পরিবর্ত্তন হয়নি। আমরা জানি তাঁর আত্মা আমাদের মধ্যে চিরকাল থাকবেন আর তাছাড়া বিশ্বভারতীর যে বিরাট দায়িত্ব তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন তা আমাদেরই বইতে হবে। আমরা আরও জানি যে শারীরিক মৃত্যু সবারই আছে। জীবন ও মৃত্যু নিয়ে দার্শনিক তত্ত্ব অনেক পড়েছি, এ বিষয়ে বহু গল্পও আমরা শুনেছি। তার ভিতর থেকে একটি ভারতীয় ও একটি চীনদেশীয় গল্প আমি এখানে বলব ;—

ভগবান বুদ্ধ যখন কুশীনগরের শালকাননে মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের শেষ উপদেশবাণী দিয়ে যান। উপদেশশেষে কারুর এই

বিষয়ে কিছু প্রশ্ন বা দ্বিধা আছে কিনা জানতে চাইলে তাঁর শিষ্য অনিরুদ্ধ বলেন, "আপনার শিক্ষার উপর আমাদের কারুরই দ্বিধা বা সন্দেহ নেই কিন্তু ভগবান আমাদের ফেলে এত শীঘ্র চলে যাচ্ছেন এইজন্য আমরা দুঃখিত।" ভগবান বুদ্ধ তখন বলেন, "তোমরা এর জন্য শোক কোরো না। মৃত্যু আমার একদিন না একদিন হতোই। শুধু মিলন হতে পারে না বিচ্ছেদ হবেই। তোমাদের এবং মানবসমাজের কল্যাণের জন্য এইসকল ধর্ম্ম রইল, আমার জীবনধারণের আর কোনও সুফল নেই। জেনে রেখো এই জগৎ চিরস্থায়ী নয়। যেখানে মিলন সেখানেই বিদায়। এর জন্য শোকের কোনই কারণ নেই। নিজের আত্মার মুক্তির চেষ্টা করো। জ্ঞানের আলোয় অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করো। জেনো আমি এই শরীর কোনও কুব্যাধির মতই ত্যাগ করছি। এই শরীর মিথ্যা এবং পাপপূর্ণ, একে ফেলে দাও। এই শরীর বার্ধক্য, জরা, জন্ম এবং মৃত্যুর বিরাট সমুদ্রে নিমগ্ন। কেউ যদি এই শরীর ত্যাগ করে তাহলে তো সে ঘৃণাকে দমন করল। এ তো আনন্দের কথা।" (বুদ্ধ নান্‌জিওর শেষ উপদেশের ১২২ নং সূত্র)

চুয়াং চু চীনদেশের একজন মস্ত বড় দার্শনিক ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁর বন্ধু হুই চু দেখা করতে গিয়ে দেখেন যে চুয়াং চু মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে ঢোল পিটিয়ে গান গাইছেন। হুই চু তো অবাক, তিনি বললেন, "যে এতদিন তোমার সঙ্গে কাটিয়ে তোমার বৃদ্ধ বয়সে তোমায় ছেড়ে চলে গেলো তার জন্য তুমি এক ফোঁটা চোখের জল তো ফেল্‌লেই না উপরন্তু ঢোল পিটিয়ে গান গাইছ?" চুয়াং চু বললেন, "গোড়া থেকে দেখতে গেলে জন্ম বলে কিছুই ছিলো না। শুধু জন্মই নয়, কোনও রকম আকারই ছিল না। শুধু আকারই নয়, কোনও রকম শ্বাসই ছিল না। সব কিছুই একটা অনির্দিষ্ট অবস্থায় ছিল এবং ক্রমশ শ্বাসে পরে আকারে এবং আরও পরে জন্মে পরিণত হলো। এখন আবার মৃত্যুতে পরিবর্তন হয়েছে। এও তো বসন্ত, হেমন্ত, শীত আর গ্রীষ্মের মতই ঘুরে ঘুরে আসছে। যে এখন প্রকৃতির কোলে নিদ্রিত আমি যদি তার জন্য শোক করি তাহলে জীবনকে ভুল বোঝা হবে।" (চুয়াং চু অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।)

এরকম গল্প চীনেতে অনেক আছে। কিন্তু গুরুদেবের মৃত্যুতে

আমাদের শোক এবং দুঃখকে বাঁধবার কোন উপায়ই ছিল না। এটা খুবই স্বাভাবিক সত্য।

৬ই আগস্ট ১৯৪১ গুরুদেবের আশঙ্কাজনক অবস্থার খবর পেয়ে আমি সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় শান্তিনিকেতন থেকে কলিকাতায় তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসে উপস্থিত হই। তাঁর ঘরে প্রবেশ করে দেখি তিনি আহত সিংহের মতো নিশ্বাস ফেলছেন কিন্তু অজ্ঞান। এ দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারিনি। আমি তাঁকে আমার গভীর ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই এবং তাঁর পায়ের কাছে প্রায় দুঘণ্টা বসে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই যে আরও কয়েক বছর তিনি যেন পৃথিবীতে থাকেন। বৌদ্ধমতে আমি কয়েকটি মন্ত্রও পাঠ করি। পরে বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী মহাশয় আমাকে কিছু খাইবার জন্য ডাকিয়া লন এবং নিজের বিছানায় শুইতে দেন। কিন্তু আমি কিছুই খেতে বা সে রাতে ঘুমোতে পারিনি। আমার কখন ডাক আসবে সে জন্যে আমি উৎসুক হয়ে ছিলুম।

তার পরদিন সকালে আমি গুরুদেবকে কয়েকবার দেখি। তাঁর অবস্থার কোনই পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু তাঁর সুন্দর রাজকীয় মুখে অপূর্ব এক দীপ্তি, শরীরে জীবন তখনও বর্তমান। বেলা নয়টার সময় চিকিৎসকেরা পরীক্ষার পর তাঁকে ইনজেক্‌শন দেন এবং আমাদের কিছু আশাও দেন। আমি আশ্বস্ত হয়ে বাইরে যাই— শান্তিনিকেতনে কয়েকটা চিঠি ছাড়বার ছিল আর জেনারেলিসিমো এবং আর একটি বন্ধুকে চীনদেশে তার করলাম গুরুদেবের অবস্থার কথা উল্লেখ করে। কাজ শেষ করে বন্ধু চিউকে নিয়ে যখন জোড়াসাঁকোয় পৌঁছলুম তখন বাড়ির চারিদিক লোকে লোকারণ্য। গুরুদেব মারা গেছেন। ফুল পাওয়া তখন একেবারেই সম্ভব নয়। আমার পাথরের মালা গুরুদেবের হাতে রেখে আমি তাঁর পূজা করি। তাঁকে আমার সেই শেষ পূজা ও নিবেদন।

তাঁর সৎকারের ব্যবস্থা নিমতলা ঘাটে হয়। কাছাকাছি বাজারে কোথাও ফুল পেলুম না, অবশেষে সমস্ত নিউ মার্কেট ঘুরে মাত্র দুটি ফুলের স্তবক নিয়ে নিমতলায় উপস্থিত হলুম। গুরুদেবের মৃত্যুসংবাদ তখন কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে। রাস্তার দুধারে পুরুষ, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও যুবারা

জগদ্বরেণ্য কবিগুরুকে শেষ নিবেদন দেবার জন্য দাঁড়িয়ে। অতি কষ্টে নিমতলা ঘাটের ভিতরে গিয়ে আমি ফুলের স্তবক দুটি তাঁর সৎকারের সময় দিই। একটি দিই চীন ভারতীয় কৃষ্টি সমাজের (Sino-Indian Cultural Society) পক্ষ থেকে এবং অপরটি জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই শেক, প্রেসিডেন্ট তাই চি তাও, ডাঃ এইচ এইচ কুং, চেন লি ফু এবং ডাক্তার চুচিয়া হুয়া এঁদের পক্ষ থেকে। এঁরা সকলেই গুরুদেবের বন্ধু এবং অনুরাগী।

সেদিনকার স্মৃতি আমার মনে আজও গাঁথা রয়েছে এবং চিরদিন থাকবেও। আমার বাবা মারা যান যখন আমার বয়স ছয়। তাঁর মৃত্যুর কিছুই আমার মনে নেই। কিন্তু গুরুদেবের মৃত্যুর সমস্তই আমার মনে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আর সবই ভুলে যেতে পারি কিন্তু সেদিনের স্মৃতি কোনদিন ভুলব না। আহা— শুধু আর একটি বার যদি তাঁর সেই সুন্দর শান্ত মূর্তি দেখতে পেতুম।

গুরুদেব যখন শান্তিনিকেতনে থাকতেন তখন আশ্রমের সকলেই তাঁকে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় দেখতে যেতেন। আমি যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতুম আমার মনে হতো যেন ভালবাসা, দয়া আর শান্তির এক স্বর্গীয় আলোয় তিনি আমাকে ঘিরে দিলেন। পৃথিবীর কত জায়গা থেকে কত লোক তাঁর কাছে আসতেন, কত রকমারী প্রশ্ন করতেন। তিনি তাঁদের প্রত্যেকের প্রশ্নের জবাব দিতেন, এটা ওটা কত-কি তাঁদের দিতেন। আমি দীর্ঘ পনেরো বছর তাঁর সঙ্গে পরিচিত কিন্তু কখনও কোনও প্রশ্ন ক'রতে বা কিছু চাইতে পারিনি। যখনই তাঁকে দেখতুম ভাল মন্দ সবই ভুলে যেতুম। সত্যিই তখন কোনও প্রশ্ন বা কিছু চাইবার কথা আমার মনেই হতো না। কিন্তু তিনি নিজে আমাকে নানারকম প্রশ্ন করতেন। একবার তিনি আমাকে বলেন যে আমার মতে বিভিন্ন জাতির সুন্দরের ধারণা এবং সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি কি প্রকার? আমি নিজে এর ঠিক জবাব দিতে পারি নি তবে চীন দার্শনিক মেনসিয়াসের কথা উল্লেখ করে বলি— আস্বাদের ক্ষমতা প্রত্যেকেরই সমান, শুনিবার ক্ষমতাও প্রত্যেকেরই সমান, তেমনি প্রত্যেকেই সুন্দরকে দেখলে তাকে সুন্দরই বলে। তিনি একটু হেসে বলেছিলেন "না সব সময় তা হয় না।" চীন কবি সুসিমা (চে মোন্ সু) একবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তাঁর সুন্দর চেহারার

বিষয়ে আমাদের আশ্রমের মেয়েদের প্রশ্ন করলে সবাই একবাক্যে তা অস্বীকার করে। আমি তখন গুরুদেবকে বলি, "আপনি ওদের বিশ্বাস করবেন না। ওরা একটু লাজুক তাই এই সত্যটাও অস্বীকার করল।" এতে আমরা সকলেই হেসে উঠেছিলুম। এখন গুরুদেব নেই আর আমার মন তাঁকে কত প্রশ্ন করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু আর তা হবার নয়।

চীনদেশ, চীনদেশবাসী এবং চীনা কৃষ্টির প্রতি গুরুদেবের গভীর ভালবাসা ছিল। চীনদেশ এবং ভারতবর্ষকে তিনি সমান ভালবাসতেন। চীনদেশবাসীদের এবং চীনের কৃষ্টিকে তিনি ভারতবাসী ও ভারতীয় কৃষ্টির সঙ্গে সমান ভালবাসতেন। তিনি চীনের কৃষ্টি এবং সমাজকে অতি গভীরভাবে বুঝেছিলেন। গুরুদেব এবং Bertrand Russell ছাড়া আজকাল আর কেউই চীনকে এরকম চোখে দেখেনি। তবু Russell পশ্চিম-দেশবাসীয়, তাঁর ভালবাসা আমাদের প্রতি এত গভীর এবং সত্য না হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু গুরুদেবের ভালবাসা পূর্বদেশবাসীর অফুরন্ত ও স্বাভাবিক ভালবাসা। গুরুদেব চীনকে এমন কি আমাদের থেকেও ভাল জানতেন। চীন সভ্যতার বিষয় তিনি আমাদের থেকেও পরিষ্কার করে বলতেন। ১৯৩৪ সালে আমি যখন চীনে ফিরি তখন তিনি আমায় বলেন, "আমার চীনে চাএর কথাটা ভুলবেন না। আর আপনাদের দেশের যুবাদের বলবেন যে সোভিয়েট রাশিয়াকে তারা যেন অন্ধর মত অনুসরণ না করে। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি আমার নিজের গভীর শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু অন্ধ অনুকরণে কোনও সুফল নেই বরং ক্ষতিই রয়েছে।" একথা আমার মনে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং এ বাণী আমি আমার দেশবাসীদের জানাই। এত অল্পে এরকম মনোজ্ঞ উপদেশ আর কেউই দিতে পারত না। সেই সময়কার চীনদেশের সকল সত্য এই উপদেশের ভিতর নিহিত ছিল। আর একদিন দেখি তিনি Dr. Lin Yu Tang-এর লেখা "My country and my people" পড়ছেন। আমাকে দেখে বললেন, "বইটা চমৎকার কিন্তু আপনার বোধহয় ভাল লাগবে না।" আমি বলেছিলুম, "আমারও ভাল লাগে কিন্তু আমার দেশের এবং দেশবাসীদের সম্বন্ধে এই বইয়ের সব কিছু প্রযোজ্য নয়।" তিনি তাড়াতাড়ি বলেছিলেন "সেই জন্যেই তো বললুম, আপনার হয়ত ভাল লাগবে না। আমার

হয়তো বলা উচিত ছিল আপনি এ বই পছন্দ করেন না।” সত্যিই গুরুদেব, আপনি আমার দেশকে এবং দশকে চিনেছিলেন। আমার দেশ আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

আজ এক বছর হয়ে গেল গুরুদেব চলে গেছেন কিন্তু আমি তাঁর বিষয় কিছুই লিখতে পারিনি। চীন-ভারতীয় কৃষ্টি সমাজ চীনেতে গুরুদেবের স্মারক বইএ আমার লেখা চেয়েছিলেন, তাঁদেরও আমি কিছু দিতে পারিনি। আমি নিজে নানা কাজে ব্যস্ত ছিলুম আর তা ছাড়া শুধু লেখার ভিতর দিয়ে গুরুদেবের প্রতি আমার ভক্তির প্রকাশ করতে মন উঠত না। কয়েকটি মাসিক পত্রিকায় কিছু লিখেছিলুম বটে তবে তাতে আমি যা লিখতে চেয়েছিলুম তার কিছুই লেখা হয়নি। আজ তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে আমার মনের কথার কিছুটা লিখলুম এবং পরে আর কিছু লিখে একটি পুস্তিকাকারে ছাপাবার ইচ্ছে রইল। গুরুদেবের প্রতি এই আমার ক্ষুদ্র উৎসর্গ।*

শান্তিনিকেতন
৭ই আগস্ট ১৯৪২

* শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ইংরাজী হইতে অনূদিত

নামকরণে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

'ছিদাম মুদী লেনের ২৫ নং বাড়ী'—শহরের লক্ষ লক্ষ বাড়ীর মধ্যে একটি বিশেষ বাড়ী নির্দেশ করার জন্য এর বেশি কিছু সঙ্কেতের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু নিছক প্রয়োজনের অতিরিক্ত আয়োজনই বৈভব, বিলাস ও আভিজাত্যের লক্ষণ। রাম-শ্যাম-যদুর বাড়ীর পরিচয় দিতে অমুক রাস্তার অমুক নম্বর বাড়ী বললেই যথেষ্ট, কিন্তু এই সাধারণরীতিতে দ্বারভাঙার মহারাজার বাড়ীরও পরিচয় দিতে হলে অবশ্যই তার মর্যাদা ও গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং আভিজাত্যের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্য বাড়ীর একটি বিশেষ 'নামকরণ' প্রয়োজন। কোন্ পদ্ধতিতে এই নামকরণ করা হবে? বাংলাদেশের এক যুগ গেছে, যখন এই সমস্ত ছোটখাটো সমস্যা সমাধান করতে আমাদের কিছুমাত্র বেগ পেতে হয়নি, কেননা, তার চেয়ে অনেক বড় বড় সমস্যাও কোনরকম বিচার, বুদ্ধি বা চিন্তা করার পরিশ্রম না করেও অনায়াসে আমরা সমাধান করেছি। আমাদের পল্লীপ্রধান সভ্যতার ঢিলেঢালা নিরুদ্বেগ জীবনের স্তিমিত প্রবাহে অকস্মাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতা জোয়ারের মত এসে পড়ল হুড়মুড় করে, আমাদের নিশ্চল সমাজব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সচলতার অশান্ত বাণী ছড়িয়ে গেল দুর্বার স্রোতোবেগে। চোখের সামনে ছিল রাজার স্বজাতীয়দের চোখঝলসানো জ্বলন্ত আদর্শ। অতএব, মুশকিল কিছুই ছিল না। সর্ববিষয়ে তাদের সমকক্ষ, অর্থাৎ, সমপর্যায়ভুক্ত হবার সাধনা আমাদের চলল পুরোদমে এবং পূর্ণ উদ্যমে।

সুতরাং লাটসাহেবের বাড়ীর নাম যদি হয় 'গভর্নমেণ্ট হাউস,' দ্বারভাঙার মহারাজার বাড়ীর নাম হবে 'দ্বারভাঙা হাউস' এ ত স্বতঃসিদ্ধ। 'টেগোর ক্যাস্‌ল' নামে বৈচিত্র্য থাকতে পারে, কিন্তু নামকরণের মনোবৃত্তি একই। রাজারাজড়াদের কথা ছেড়ে দিলেও অন্যান্যশ্রেণীর লোকদের মধ্যেও বিদেশী নামের ব্যবহার হয়েছে নির্বিচারে। 'ভিলা,' 'কটেজ,' 'লজ,' 'নূক', 'রিট্রিট,' 'স্টেপ এসাইড,' 'স্নোভিউ,' 'লেকভিউ' প্রভৃতি নামের ফলক বিলাতে ইংরাজের বাড়ীতে যেমন, বাংলাদেশে বাঙালীর বাড়ীতেও আজকাল তার চেয়ে কম নেই।

বাড়ীর নামকরণের প্রবৃত্তি প্রাক্-ইংরেজযুগে আমাদের পূর্বপুরুষদেরও যে না ছিল, এমন নয়। কিন্তু এইজন্য তাঁদের বিদেশীয়দের দ্বারস্থ হতে হয়নি। এদেশীয় ভাব ও ভাষা থেকেই তাঁরা নাম নির্বাচন করার কাজটা সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। যদিচ এই ধারা দেশ থেকে একেবারে লোপ পেয়ে যায়নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথই নিঃসন্দেহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করে আমাদের আবার চোখে আঙুল দিয়ে সচেতনভাবে বুঝতে শিখিয়েছেন যে, প্রাচীনকালের

নামগুলির মধ্যে সৌন্দর্য ও রুচিজ্ঞানের পরিচয় আছে। তাই আমরা আজকাল আবার 'আবাস', 'নিলয়', 'আলয়', 'ভবন', 'সদন', 'মঞ্জিল', 'কুটির', 'ধাম', 'পুরী', 'পুর', 'কুঞ্জ', 'মন্দির' প্রভৃতি দ্বারা বাড়ীর নামনির্বাচনে পরিবর্তিত রুচির অধিকতর পরিচয় পাই। উল্লিখিত শব্দগুলির যোগে অতিসহজেই দেশীয় ভাষায় বাড়ীর নামকরণ করা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে এই সহজ পন্থা গ্রহণ করেন নি। শান্তিনিকেতনের বাড়ীগুলিতে তাঁর দেওয়া নামের প্রতি মনোযোগ দিলেই আমরা বুঝতে পারব যে, প্রত্যেক বাড়ীর একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও পৃথক সত্তাকে তিনি নামকরণের দ্বারা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাই নামগুলি যেমন ভাবব্যঞ্জক, তেমনি সৌন্দর্যবোধ ও রুচির পরিচায়ক।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের ফটকের কাছে যে ছোট্ট দোতলা বাড়ীটিতে রবীন্দ্রনাথ বহুকাল বাস করেছেন, তার নাম দিয়েছেন 'দেহলী'। আশ্রমের একেবারে দোরগোড়ায় 'দরজার চৌকাঠে'র মত পড়ে আছে বলেই কি ঐ নাম? 'দেহলী'র সামনে বড় রাস্তার উপরে প্রবেশপথের মুখে 'দ্বারপালে'র মত দাঁড়িয়ে আছে 'দ্বারিক'। শালবীথিকার প্রান্তবর্তী ছাত্রাবাসের নাম 'বীথিকা' হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অধুনা তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত, শুধু তার স্মৃতি সংরক্ষিত আছে কবির এক কাব্যগ্রন্থে। ব্যক্তিবিশেষের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত হয়েও কোন কোন বাড়ী নামাঙ্কিত হয়েছে। অধ্যাপকমণ্ডলীর চা-চক্রের মধ্যমণি ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ, সুতরাং তাঁর স্মৃতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত চা-চক্রের বাড়ীর নাম 'দিনান্তিকা' দেওয়া অত্যন্ত সুসঙ্গতই হয়েছে, বিশেষতঃ দিনান্তেই যখন চা-চক্রের অধিবেশন বসে। আশ্রমে বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার আদিকালে নির্মিত বাড়ীর নাম 'আদিকুটির', পরে এই নামটি বদলে রাখা হয়েছিল 'প্রাক্‌কুটির'। 'বেণুকুঞ্জ'- যে এককালে ছোট্ট বাঁশবনে বেষ্টিত ছিল, অত্যাধুনিক আশ্রমবাসীদের হয়ত তা জানা নেই। আগন্তুক অতিথি অভ্যাগতদের জন্য নির্মিত বাড়ীটি অভিহিত হয়েছে পান্থশালা-নামে। মহাত্মা গান্ধী প্রথমবারে আশ্রমে এসে যে বাড়ীটিতে বাস করেছিলেন, তার নাম বাসবী।

'গৈরিক'-নামকরণের কারণসম্বন্ধে অন্তত তিনটি গবেষণা প্রচলিত। ঐ বাড়ীর পাশেই যে একটি উঁচু মাটির ঢিবি আছে, তাকে 'গিরি'-আখ্যা দেওয়া হয়ত অতিরঞ্জনদোষ, কিন্তু ক্ষীণজলস্রোতমাত্র সম্বল করে 'কোপাই' যে-দেশে নদীর পদমর্যাদা লাভ করতে পারে, মাটির ঢিবি অবশ্যই সেখানে 'গিরি'-গৌরবের অধিকারী। বাড়ীর অপরপার্শ্বে লাল কাঁকরের রাস্তা, হাওয়ায় হাওয়ায় সেখানে যেন হোলিখেলার ধুম, সাদা চুনকামকরা বাড়ীটকে একদিনেই 'গৈরিক'-রঙে রাঙিয়ে দিয়ে যায়। সুতরাং বাড়ীর নাম 'গৈরিক' রাখার এও একটি কারণ হতে পারে। তৃতীয় দলের অভিমত এই যে, গৈরিক রঙ হচ্ছে বৈরাগ্যের রঙ। এককালে গৈরিকে বাস করতেন তিনজন কৌমার্যব্রতী অধ্যাপক, অবশ্য তাঁদের সকলের বৈরাগ্য যে চিরস্থায়ী হয়েছিল, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু ঐ বাড়ীতে অবস্থানকালে

তাঁরা প্রত্যেকেই বৈরাগ্যের গৈরিকভেকধারী ছিলেন এবং ঐসময়েই বাড়ীর নামকরণ করা হয় গৈরিক। দুঃখের বিষয়, এই তিনটি যুক্তিসহ মতের মধ্যে কোন্‌টি গ্রাহ্য, রবীন্দ্রনাথকে সে বিষয়ে কোনদিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি।

আশ্রমের পশ্চিমসীমানা আজকাল 'প্রান্তিক'কে ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে, কিন্তু এককালে ঐখানেই ছিল আশ্রমের শেষপ্রান্ত। 'দৈগন্তিক' কিন্তু আজও একাকী আশ্রমদিগন্তের এককোণে দাঁড়িয়ে নামের সার্থকতা বজায় রাখছে। 'গুর্জরী' নাম থেকেই ধারণা হয়, কোন গুর্জরবাসীর বাস ছিল সেখানে। 'মালঞ্চে' যে বিচিত্র ফুলের পসরা সাজানো, নামের মধ্যেই তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কলাভবনের বাড়ীটিরও যে একটি নাম আছে, তা হয়ত অনেকের জানা নেই। তার অলৌকিক চিত্রসম্পদ দর্শকদের সূক্ষ্ম আনন্দ দান করে নন্দনকাননের রূপলোকে নিয়ে যায় বলেই বাড়ীর নাম রেখেছিলেন 'নন্দন' কি না, তা জানি না, কিন্তু কলাভবনের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর নামটিও কি তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন নেই? ছাত্রীভবন সত্যিকারের 'শ্রীভবন' হয়ে উঠুক, কবির এই শুভেচ্ছা চিরজাগ্রত রয়েছে সেখানে।

রবীন্দ্রনাথ উত্তরজীবনে যেখানে বাস করতেন, এবার 'রবির উত্তরগতি'পথে সেই 'উত্তরায়ণে' আমরা উপস্থিত হতে পারি। সেখানে প্রথমেই চোখে পড়ে সুদৃশ্য 'উদয়ন', তার পাশে 'কোনারক'। যেমন নাম, তেমনি স্থপতি শিল্পের নিদর্শন, আমাদের বণিকসভ্যতাযুগের শ্রীহীন পরিবেষ্টনী থেকে যেন এক নূতনরাজ্যের সীমানায় আমাদের নিয়ে আসে। কবির ধ্যানলোকে যেখানে সৌন্দর্যের সত্য ও শাশ্বতমূর্তি বাণীর বিচিত্র প্রকাশে প্রতিনিয়ত ধরা দিয়েছে, সেই স্মৃতিপূত পরিবেশের ভিতর দিয়ে আমরা 'শ্যামলী'তে পৌছলাম,—সেই মাটির বাড়ী 'শ্যামলী', যাকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন—

"পথের ধারে গাছতলাতে তোমার বাসা, শ্যামলী,
তুমি দেবতাপাড়ায় বেদের মেয়ে;

* * * *

আমি পাকা করে গাঁথিনি ভিত,
আমার মিনতি ফাঁদিনি পাথর দিয়ে তোমার দরজায়;
বাসা বেঁধেছি আল্‌গামাটিতে
যে-চল্‌তি মাটি নদীর জলে এসেছিল ভেসে,
যে-মাটি পড়বে গলে শ্রাবণধারায়।"

মানুষের জীবন নশ্বর, তার আশ্রয়ের জন্য পাকা গাঁথুনির ইটের খাঁচা তৈরি করতে কবির মন্‌সায় দেয় না। তৈরি হল কাঁচা মাটির ভিত-দেয়াল-আর-ছাদ দিয়ে 'শ্যামলী'। সেখানে মাটির ছাদের প্রাথমিক পরীক্ষা পুরোপুরি সফল হল না, তারপর পুনরায় চেষ্টা হল

'পুনশ্চে' মাটির দেয়াল আর পাকা ছাদের। তাঁর বাসের জন্য সর্বশেষে নির্মিত হয়েছিল যে ছোট্ট দোতলা বাড়ী, তার নাম 'উদীচী'।

বর্তমানে আশ্রমে শিক্ষকের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, তাঁদের বসবাসের জন্য বাড়ীঘরও এখানে সেখানে নতুন তৈরি হয়েছে অনেক। আগে ঘরসংসার নিয়ে অল্পসংখ্যক শিক্ষকের বাস করার যে একটি পাড়া গড়ে উঠেছিল, তারই নাম 'গুরুপল্লী'। শ্রীভবনের পাশের পাড়াটি ছিল 'শ্রীপল্লী'। রবীন্দ্রনাথ যখন আশ্রমে চলাফেরা করতে সক্ষম ছিলেন এবং আশ্রমের ঘরবাড়ীর ছক তাঁর দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষগোচর ছিল, সেই যুগের সমস্ত বাড়ী-ঘরেরই তিনি নামকরণ করে গেছেন। পরে আরো বহু বাড়ী তৈরি হয়েছে, তারা এখনো নামহীন।

শান্তিনিকেতনের বাইরেও অনেক বাড়ীর নামকরণ তিনি করেছেন। নাচ, গান, সাহিত্য, অভিনয় ও আনন্দোৎসবের বিচিত্র স্মৃতি-জড়িত জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা'-ভবনে বর্তমানে বিশ্বভারতীর কার্যালয় অবস্থিত। 'মহাজাতি-সদনে'র শুধু নামকরণ নয়, তার আদর্শও রূপ পেয়েছে কবির অপূর্ব ভাষায়। সবাক চিত্রে যুগপৎ রূপ ও বাণীর সম্মিলিত প্রকাশ আমরা পাই, তাই চিত্রগৃহের নাম 'রূপ-বাণী' রাখা যে কত সার্থক, তা এখন অনায়াসেই বুঝতে পারি। গৃহস্বামীর নামের সঙ্গে মিল রেখেও বাড়ীর নামকরণ করেছেন যেমন, নলিনীরঞ্জন সরকারের বাড়ীর নাম 'রঞ্জনী', শান্তিনিকেতনে গৌরীদেবীর বাড়ীর নাম 'গৌরীশঙ্কর'। তা ছাড়াও আছে 'বিরামিকা', 'আরুণি', 'আম্রপালি'।

'ভবন' নামটি রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগকে তিনি 'ভবন' আখ্যায় সূচিত করেছেন। প্রথম পাঠ শুরু যে-স্তরে, সেই বিভাগের নাম 'পাঠ-ভবন' (School Deparment), তারপর 'শিক্ষা-ভবন' (College Deparment), সর্বোচ্চ স্তরে বিদ্যা-ভবন (Research Deparment)। পাঠের সহায়তায়ই আমরা শিক্ষালাভ করে থাকি এবং যথার্থ শিক্ষা লাভ করলে তবেই বিদ্যা আয়ত্ত করা যায়। পাঠ, শিক্ষা, বিদ্যা—শিক্ষার্থীজীবনের এই ক্রমপর্যায়ের তিনটি বিভিন্ন স্তরকে যে নামের সংজ্ঞাদ্বারা অভিহিত করা হয়েছে, তার মূলে একটি গভীর তাৎপর্য্য আছে। সাধারণ শিক্ষার অন্তর্গত এই তিনটি বিভাগ ছাড়াও রয়েছে 'কলাভবন' এবং 'সঙ্গীতভবন'। 'গন্ধর্বভবন' নামটি তিনি প্রথমে প্রস্তাব করে থাকলেও শেষ পর্যন্ত 'সঙ্গীতভবন' নামই প্রচলিত হয়েছে। 'হিন্দীভবন' এবং 'চীনভবন' যথাক্রমে হিন্দী এবং চৈনিক ভাষা ও সংস্কৃতিশিক্ষার কেন্দ্র।

মহর্ষি যেখানে 'প্রাণের আরাম' 'মনের আনন্দ' ও 'আত্মার শান্তি'র সন্ধান পেয়েছিলেন, সেই আশ্রম 'শান্তিনিকেতন' নামে অভিহিত হবে, তার আর বিচিত্র কি? লোকে শান্তির

সন্ধান পায় প্রকৃত জ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে পারলে এবং তার সমস্ত আয়োজনই শান্তিনিকেতনে অবস্থিত। অর্থাৎ, সরস্বতীদেবীর এলাকা সেখানে, কিন্তু লক্ষ্মীর আরাধনাক্ষেত্র রচিত হয়েছে 'শ্রীনিকেতনে'। 'শ্রী'-শব্দটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুধু অর্থসম্পদ নয়, কল্যাণমণ্ডিত অর্থসম্পদকেই আয়ত্ত করার আদর্শ তাতে সূচিত হয়।

'বিশ্বভারতী'র নাম বর্তমানে সর্ববিদিত। "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্" এই বেদ বাক্যটি বিশ্বভারতীর সঙ্কল্পবাক্যের মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। 'যেখানে সমস্ত বিশ্ব এসে একটি নীড় বেঁধেছে', ভারতের প্রাচীন ঋষির এই মহৎ কল্পনা আজ রূপ পেয়েছে বর্তমান যুগের কর্মযোগী কবির সাধনাতীর্থে। সৃষ্টির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্যের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই, তা নিতান্তই আপাতঃদৃশ্য এবং সেই বৈচিত্র্যের বহুমুখী ধারার সমন্বয় সাধন করে বিধৃত আছে একটি মূলগত ঐক্য, এই গভীর সত্যকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবজীবনে যেমন, কর্মজীবনেও তেমনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। 'বিশ্বভারতী' তাঁর সেই সাধনারই একটি উজ্জ্বল প্রতীক। জাতি, ধর্ম, ভাষা, আচার আচরণ ও স্বার্থের বিরোধে মানুষে মানুষে কত দ্বন্দ্ব, কত পার্থক্য, কত অনৈক্য। এই সমস্ত অনৈক্যকে অতিক্রম করে ব্যবহারিক জগতে বিশ্বমানবের যথার্থ ঐক্য ও মিলনকেন্দ্র রচিত হতে পারে একমাত্র ভারতীর পুণ্য বেদিকাতলে, অন্য কোন ক্ষেত্রে নয়, 'বিশ্বভারতী' নামকরণের মধ্যে এই সত্যোপলব্ধি অপূর্ব ব্যঞ্জনায় আত্মপ্রকাশ করে। যে দিক দিয়াই চিন্তা করা যাক না কেন, তাঁর প্রবর্তিত এই অনন্য-সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম-নির্বাচনে 'বিদ্যা'-বাচক অন্য কোন শব্দ গ্রহণ না করে 'ভারতী' শব্দটি মনোনয়ন করা অত্যন্ত চমৎকার হয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে ভারতের একটা আধ্যাত্মিক যোগ সাধিত হোক, কবির এই আন্তরিক ইচ্ছাও হয়ত 'বিশ্বভারতী' নামকরণের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে।

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ যেন নামনির্বাচন কালে নূতন সৃষ্টির স্বাভাবিক প্রেরণায় ভাবগর্ভ শব্দ চয়ন ও বিন্যাস করে শিল্পীর মত ধ্যানমূর্তিকে রূপ দিয়েছেন।

আর এক ক্ষেত্রের নামগুলির উল্লেখ করা যাক। বিশ্বভারতীর পরিচালনার ভার আছে আশ্রমসমিতি, কর্মসমিতি ও সংসদের উপর। কর্মকর্তাদের মধ্যে কর্মসচিব, আশ্রমসচিব প্রভৃতি আছেন। এককালে সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে ছাত্র-পরিচালক আছেন, তাঁরা ব্রতীবালকদল গঠন করেন। ছাত্রীদের প্রনেত্রী আছেন। দানসত্র, অন্নসত্রের কথা আমরা অনেক শুনেছি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনে গ্রামের গরীব ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষাসত্রেরও ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে লোকশিক্ষাসংসদও গঠিত হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, বর্ষামঙ্গল, বসন্তোৎসব, শারদোৎসব ইত্যাদির কথা না বললেও

চলে, কেননা, সকলেই আজকাল এই উৎসবগুলির কথা অল্পবিস্তর জানেন। আশ্রমের 'বৈতালিক' গানের কথাও তাঁদের অবিদিত নেই।

বঙ্গভঙ্গকালে দ্বিখণ্ডিত বাঙালীজাতির ঐক্যবোধ ও মিলন-আকাঙ্ক্ষার নব উদ্বোধন যখন আত্মপ্রকাশে ব্যাকুল, তখন 'রাখীবন্ধন' উৎসবের প্রবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় বিক্ষোভকে চিত্তশুদ্ধির শক্তিমন্ত্রে সংহতি দান করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে পদবী-বিতরণের প্রচলনও তিনিই করেন।

সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্নক্ষেত্রে কত অজস্র পারিভাষিক নাম ও শব্দ সৃষ্টিদ্বারা আমাদের ভাষা ও চিন্তাধারাকে তিনি সমৃদ্ধ করে গেছেন, আমরা আজ হয়ত সে সম্বন্ধে সচেতন নই, কিন্তু তার একটি পৃথক তালিকা গঠন করলে এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত দানের পরিমাপ করা সম্ভবপর হতে পারে।

গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা ও প্রবন্ধগুলির পৃথকভাবে এবং সমগ্রভাবে গ্রন্থগুলির নামকরণেও রবীন্দ্রনাথ এক নূতন ধারা প্রবর্তন করেছেন, তার অজস্রতাও উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তাঁর রচিত পাত্রপাত্রীদের নামের হিসাবই বা কে রাখে? এই সমস্ত নাম আমাদের সাহিত্যে, সমাজে, দৈনন্দিন ব্যবহারে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই পুত্রের নাম কাউকে 'গোরা', 'নিখিলেশ' অথবা 'সন্দীপ' রাখতে দেখলে আমরা মোটেই অবাক হই না। তবে মেয়ের নাম 'গীতাঞ্জলি' রাখাও চলছে শুনলে প্রথমটা কারো কারো একটু খটকা লাগতে পারে বটে, কিন্তু তা থেকে দেশের রুচি কোন্‌দিকে চলছে, তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের বইগুলির নাম আলোচনা করলে নানারূপ চিত্তাকর্ষক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। সেই চেষ্টা না করেও এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। এক নামে প্রকাশিত বইকে অনেক সময় তিনি পরবর্তীকালে অন্য নামে পরিবর্তিত করেছেন, কিংবা একই আখ্যানভাগ গল্পাকারে একনামে পরিচিত কিন্তু নাট্যে রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আবার নামান্তরিতও হয়েছে। যেমন গোড়ায় গলদ—শেষরক্ষা, শারদোৎসব—ঋণশোধ, প্রজাপতির নির্বন্ধ—চিরকুমার সভা, তিনপুরুষ—যোগাযোগ, রাজা ও রানী—তপতী, রাজর্ষি—বিসর্জন, রাজা—অরূপরতন, শ্যামা—পরিশোধ ইত্যাদি। এই সব নাম-পরিবর্তনের কৈফিয়তও অনেকক্ষেত্রেই তিনি নিজেই দিয়েছেন, তা উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। এর থেকে আমরা আর কিছু না হোক, অন্তত এইটুকু অনায়াসেই বুঝতে পারি যে নামকরণ সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত খুঁতখুঁতে প্রকৃতির ছিলেন। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—"নামকে যাঁরা নাম-মাত্র মনে করেন, আমি তাঁদের দলে নই।" অর্থাৎ নামের সঙ্গতি, তাৎপর্য, ভাব ও অর্থসামঞ্জস্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দ্বিধাশূন্য না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই তিনি সন্তুষ্ট হতে পারতেন না। এই কারণেই উল্লিখিত ক্ষেত্রে নাম বর্জন অথবা পরিবর্তন না করে তিনি থাকতে পারেন নি।

আমাদের দেশে স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যবোধের উন্মেষে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দান-যে কত অপরিমেয়, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই তা অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারেন। কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে এই পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা ও আদর্শের উন্মাদনা আমাদের দেশে অত্যন্ত খণ্ডিতভাবে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু স্বাজাত্যবোধকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং আমাদের যথার্থ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে গভীরভাবে সঞ্চারিত করে দিতে রবীন্দ্রনাথই যে সর্বাগ্রগণ্য, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে না। তিনিই আমাদের বুঝতে শিখিয়েছেন যে, শুধু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য পলিটিক্যাল অস্ত্র হিসাবে নয়, স্বাজাত্যবোধকে জাতির মর্মগত আত্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বস্তুতঃ যেখানে ইংরেজদের সঙ্গে কোনপ্রকার বিরোধ, সংগ্রাম বা বাদানুবাদের প্রশ্ন ওঠে না, সেখানেও অন্যনিরপেক্ষ ভাবে যদি স্বভাবতঃই আমাদের স্বাজাত্যবোধ আত্মপ্রকাশ না করে, তবে জাতির জাগ্রত চৈতন্যে তার যথার্থ আসন রচিত হয়েছে বলা যায়.না। এই দিক দিয়ে চিন্তা করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, আমাদের দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য এবং প্রাণধারা অনুসরণ করে বিভিন্নক্ষেত্রে দেশীয় নাম নির্বাচন এবং প্রচলনের দ্বারাও রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বাজাত্যবোধকে উদ্বোধিত করতে কম সাহায্য করেন নি। বস্তুতঃ আমাদের উৎসব, অনুষ্ঠান, সভাসমিতি, সংঘ, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে দেশীয় নামে অভিহিত করার যে-আধুনিক প্রথা, তার প্রবর্তনের মূলে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তার ঢেউ পৌঁচেছে আজ ব্যবসাবাণিজ্যের হাটেও, তাই পথেঘাটের দোকানে 'পান্থপেয়াবাস', 'বিপনি', 'উপানৎসদন', এমন কি,'শ্রীচরণেষু' প্রভৃতি নাম দেখে সময় সময় চমকে উঠতে হয়। এইক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দৌলতে বাঙলাদেশে যে-স্বদেশিয়ানার সূত্রপাত হয়েছিল, আজ দেখতে দেখতে সমস্ত ভারতবর্ষে তা ছড়িয়ে পড়েছে।

মনে আছে, একবার একজন বিহারবাসী ভদ্রলোক শ্রীনিকেতনে কর্মীহিসাবে যোগদান করতে এসেছিলেন। একদিন তাঁর সঙ্গে কথোপকথনচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের গোশালার গোরুগুলির নামকরণের প্রস্তাব করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু চিন্তা করে অনেকগুলি চমৎকার নতুন নাম বানিয়ে বলেন। দুঃখের বিষয়, সেই নামগুলি তখন সংগ্রহ করে রাখা হয়নি।

পুত্রকন্যার নামকরণ সমস্যা নিতান্ত তুচ্ছ সমস্যা নয়। বাঙলাদেশে লোকের মনে যখন দেবদ্বিজে ভক্তি ও ধর্মভাব প্রবল ছিল, তখন দেবদেবীদের নামে পুত্রকন্যার নাম রাখার প্রথা প্রচলিত ছিল, তাতে পুত্রকন্যাদের ডাকতে গিয়ে ইষ্টদেবতা স্মরণের পুণ্যকাজটাও কৌশলে. এবং অনায়াসে সম্পন্ন হয়ে যেত। আর, আমাদের দেবদেবীর সংখ্যা যখন তেত্রিশকোটি, তখন নাম-নির্বাচনের কাজটাও সুকঠিন ছিল না। তারপর ইংরেজরা যখন আমাদের ইষ্টদেবতা হয়ে উঠলেন, সেইযুগের দৌলতে আমরা কতকগুলি

নতুন নাম পেয়েছি, যেমন, 'ডলি', 'রুবি', 'আইভি', 'ডেইজি', 'রমলা' ইত্যাদি। বিদেশের চেয়ার, টেবিল যেমন অজ্ঞাতসারে আমাদের ঘরের কোণে কায়েমী আসন দখল করে বসেছে,তেমনি উল্লিখিত ধরনের কতকগুলি ইংরেজী নামও আমাদের ভাষায় ও ব্যবহারে এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে, সহসা তাদের আর বিদেশী বলে চেনা যায় না।

বর্তমানে ধর্ম ও দেবদেবীতে লোকের বিশ্বাস শিথিল, 'নতুন' একটা কিছুর প্রতি আকর্ষণ এখন প্রবল। সমাজের এই মনোভাব ছেলেমেয়েদের নামকরণপদ্ধতিতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। আধুনিক নামের মধ্যপদলোপ তার একটা নিদর্শন। আরো যে-মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ক্ষেত্রবিশেষে কচিসংসদেই তার নিপুণ আলোচনা হয়েছে, এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মোটকথা, বর্তমান যুগের পিতামাতা সন্তানের জন্য নতুন ধরনের নামকরণ চান, তার জন্য ঘন ঘন অভিধান আলোচনাও চলে, কিন্তু পছন্দসই নতুন নাম আবিষ্কার করা তো সহজ কথা নয়। এই সমস্যা নিয়ে কবিগুরুর দ্বারস্থ হয়েছেন অনেকেই। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখেছেন—"নবজাত কুমারকুমারীদের নাম দেবার জন্য আমার কাছে অনুরোধ এসে থাকে, অবকাশমতো সে অনুরোধ পালন করেও এসেছি।"

প্রাচীন ভারতের বহুবিধ লুপ্তপ্রায় আদর্শ, চিন্তাধারা, রীতিনীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান প্রভৃতির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন নূতন যুগোপযোগীভাবে সেইগুলিকে রূপান্তরিত করে পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেছেন, নামকরণ সম্বন্ধেও তাঁর অনুরূপ মনোভাব ছিল। প্রসঙ্গতঃ তিনি নিজেই এক জায়গায় লিখেছেন—"সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদীগিরিনগরীর নামগুলিই বা কী সুন্দর। নামগুলির মধ্যে একটি শোভা, সম্ভ্রম, শুভ্রতা আছে। সময় যেমন তখনকার পর হইতে ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে, তাহার ভাষা, ব্যবহার, মনোবৃত্তির যেন জীর্ণতা ও অপভ্রংশতা ঘটিয়াছে। এখনকার নামকরণও সেই অনুযায়ী।"

ব্যক্তিগত নাম ডাকবার জন্য, অন্য সকলের থেকে পৃথক করে একজনকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে রাখবার উপায়মাত্র। নামদ্বারা নামের অধিকারীর স্বভাব, চরিত্র, গুণ ইত্যাদি নির্দেশ করা কখনই লক্ষ্য নয়। কবির ভাষায় বলতে গেলে, "ব্যক্তি সম্বন্ধে মানুষের নাম তার বিশেষণ নয়, সম্বোধনমাত্র। লাউয়ের বোঁটা নিয়ে লাউয়ের বিচার কেউ করে না, ওটাতে ধরবার সুবিধে। যার নাম দিয়েছি সুশীল, তার শীলতা নিয়ে আমার কোনো জবাবদিহি নেই।" আমরাও তাঁকে অবশ্যই জবাবদিহি করব না, কিন্তু আমরা শুধু এই কথা বলব যে, সুশীল নাম দেওয়ার অন্তরালে হয়ত তাঁর এই আন্তরিক ইচ্ছা থাকে যে, ছেলেটি সুশীল হোক। নামকরণের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে রুচি ও চিন্তাধারার প্রবর্তন দেশে করে গেছেন, তাই আমাদের লক্ষযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বলতেন যে, বাঙালী ছেলেদের নামের মধ্যে যেন আজকাল

তেজবীর্যের পরিচয় নেই, অত্যধিক কোমল, মোলায়েম ও মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েছে। তাই ছেলেদের নামকরণের সময় তিনি সর্বদাই পৌরুষব্যঞ্জক ভাব ও লালিত্যবর্জিত কঠিন শব্দ নির্বাচন করতেন।

আত্মীয়, অনাত্মীয় বাঙলাদেশের বহু বালকবালিকার নামকরণ রবীন্দ্রনাথ করে দিয়েছেন, তাঁর সেই আশীর্বাদের পরিচয়পত্র ধারণ করে তারা জীবনযাত্রা সুরু করেছে। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া এই ধরনের নামগুলির একটি সংগ্রহতালিকা আমরা এখানে প্রকাশ করছি।—

পুরুষ

অমিয়কুমার, অভিজিৎ, অভীন্দ্রনাথ, কনকেন্দ্রনাথ, কবীন্দ্রনাথ, কিশোরকান্ত, ক্ষেমেন্দ্রনাথ, গীতীন্দ্রনাথ, গেহেন্দ্রনাথ, গৌরেন্দ্রনাথ, দীপক, নবেন্দ্রনাথ, নীতীন্দ্রনাথ, পুরেন্দ্রনাথ, প্রজিৎকুমার, প্রদ্যোৎ, ব্রতীন্দ্রনাথ, যুধাজিৎ কুমার, রথীন্দ্রনাথ, হৈমেন্দ্রনাথ, শমীন্দ্রনাথ, সরিৎকুমার, সুকৃৎকুমার, সুজনেন্দ্রনাথ, সুনৃৎকুমার, সুপ্রতীক, সুপ্রভাস, সুপ্রবুদ্ধ, সুমিত, সুরীন্দ্রনাথ, সৌম্যকান্ত।

মেয়ে

অনুভা, অমলিনা, অমিতা, অরুনিকা, অলকা, কনিকা, জয়িতা, তপতী, নন্দিতা, নন্দিনী, নবনীতা, পিয়ালী, বাসন্তী, মধুরিমা, মধুশ্রী, মাধুরীলতা, মীরা, রুচিরা, রেনুকা, হৈমন্তী, শিপ্রা, শ্রীলা, শ্যামলী, সীমন্তী, সুজাতা, সুনন্দিনী, সুনীপা, সুপ্রিয়া. সুমিতা, সুমিতি, সুসীমা, সুস্মিতা।

রবীন্দ্র-প্রবন্ধের আদি পর্ব

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার গুহ

প্রাক্-বঙ্কিম বাংলাপ্রবন্ধের ভিতর সাহিত্যিক রস দুর্লভ। রামমোহন-প্রবর্তিত বাংলাগদ্যের উপর তখনও পর্যন্ত সৌন্দর্যের পালিশ লাগেনি। কোনো বিশেষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা বা খণ্ডনের জন্যে রামমোহন কলম ধরাতে তাঁর প্রবন্ধ-গুলি হয়েছে যুক্তিতর্কে আচ্ছন্ন; রসসাহিত্যের পর্যায়ে তাদের ফেলা যায় না। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। আখ্যানমঞ্জরী, কথামালা, বা বোধোদয়ের রচনাভঙ্গী আর বিধবাবিবাহবিষয়ক প্রস্তাবের রচনাভঙ্গী— দু'য়ে কত তফাত। যে কারণ রামমোহনের প্রবন্ধগুলিকে রস-সাহিত্যের পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে, সেই একই কারণে বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধগুলিও রস-সাহিত্যের নাগালের বাইরে, যদিও তাঁর শিশুপাঠ্য 'বোধোদয়ে'র ছোট ছোট প্রবন্ধের অনেকগুলিই বেশ সাহিত্যরসপুষ্ট।

প্রকৃত কথা এই যে, কবিতা ও নাটক বাদে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মতন প্রবন্ধের জনকও বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' অনেকগুলি নানা ধরনের সাহিত্যরসপুষ্ট প্রবন্ধ আছে। বাংলাপ্রবন্ধের ধারা-বাহিকতার এবং ইতিহাসের দিক থেকে বঙ্কিমের কয়েকটি প্রবন্ধ উল্লেখ-যোগ্য :— যেমন, 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'শকুন্তলা', 'মিরান্দা ও দেস্‌দেমোনা' ইত্যাদি। এ ছাড়া তাঁর 'বিজ্ঞানরহস্যে' সৌরজগতের কয়েকটি গ্রহ, উপগ্রহ এবং পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু প্রবন্ধ আছে।

এই 'বিজ্ঞানরহস্যে'র জন্ম ১২৯১ সালে, যখন কবির বয়স তেইশ বছর। পুস্তক আকারে বেরোবার আগে এগুলি বঙ্গদর্শনে ছাপা হয়েছিল। শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী বলেছেন ('রূপ ও রীতি') যে কবির সর্বপ্রথম প্রবন্ধ সৌরজগতের সম্বন্ধে লেখা, এবং উত্তরকালে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লেখেন, তার পরিচয় ইতস্ততঃ নানা বইয়ে ছড়িয়ে আছে; এবং এ ছাড়া তিনি মাসিক পত্রিকাতে অনেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিলিতী পত্রিকা থেকে অনুবাদ করে

দিতেন। 'বিশ্বপরিচয়ে' তাঁর বিজ্ঞানের প্রতি শেষ বয়সের টানের সাক্ষ্য আছে। কবির কৈশোরে যে তিনি বঙ্কিমসম্পাদিত বঙ্গদর্শনের একজন লুব্ধ পাঠক ছিলেন, তা জীবনস্মৃতির পাঠকেরা জানেন। এই সব নানা কারণে এ রকম অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, বঙ্কিমের বিজ্ঞানপ্রীতি তাঁর ভাবশিষ্য রবীন্দ্রনাথে সংক্রামিত হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধ সমধর্মী ; যেমন বিবিধ প্রবন্ধের 'উত্তর চরিত', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'শকুন্তলা', মিরান্দা ও দেস্‌দেমোনা'। 'উত্তর চরিতে' বঙ্কিমচন্দ্র ভবভূতির নাটকের বিষয় একটি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কবি তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্যে'র অনুপম সমালোচনা লিখেছিলেন মনে হয়। বঙ্কিমের জীবিতাবস্থায় ১২৮৮ সালে কবি 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' নাম দিয়ে, বঙ্কিমের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেবে'র সমধর্মী একটি প্রবন্ধ লেখেন ; এবং পরে 'প্রাচীন সাহিত্যে' শকুন্তলা ও মিরান্দার আর একবার সমালোচনা করেন। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমের কথা আমি তুলেছি শুধু এই দুই সাহিত্যরথীর প্রাবন্ধিক সাদৃশ্য দেখাবার জন্যে।

বাংলা প্রবন্ধের শৃঙ্খলমোচন বঙ্কিমচন্দ্রই করেন। তিনি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন, তার মধ্যে কিছু সমসাময়িক সমস্যাকে আশ্রয় করে লেখা, যেমন,—'ভারত কলঙ্ক', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা' ইত্যাদি। সমসাময়িক সমস্যা বাদ দিয়েও বঙ্কিম অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন : 'গীতিকাব্য', 'সংগীত', 'ভালবাসার অত্যাচার' ইত্যাদি তার উদাহরণ।

শুধু লিখনভঙ্গীর গুণে উক্ত দুই প্রকার প্রবন্ধকেই বঙ্কিমচন্দ্র রসসাহিত্যের পর্যায়ে তুলেছেন। ধরুন 'মুচিরাম গুড়' কিংবা 'কমলাকান্তের দপ্তর'। যদিও এগুলি সমসাময়িক সমস্যাঘটিত, কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর গুণে পড়তে পড়তে একটা স্নিগ্ধ মধুর রসাবেশে আমাদের মন ভরে ওঠে। এই বই দুটিতে সমস্যাগুলি তাদের গম্ভীর মূর্তি ছেড়ে লঘু চপল পদে এসে আমাদের মনকে একটি চির-কালীন রসধারায় সিক্ত করে দেয়। বাংলাপ্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্র-প্রবন্ধের সংযোগ দেখাবার জন্যেই এই ভূমিকার অবতারণা।

রবীন্দ্র-কাব্যের মতন তাঁর প্রবন্ধের আদিপর্বও কবির বিশ বছর বয়সের ভিতরে লেখা বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই বই দুটি হোল 'বিবিধ

প্রসঙ্গ'[১] এবং 'আলোচনা'[২]। 'বিবিধ প্রসঙ্গের' প্রবন্ধগুলি ১২৮৮ সালের শ্রাবণ থেকে ফিরে বৈশাখ পর্যন্ত দশ মাস ধরে ভারতীতে বেরিয়েছিল। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নাম থেকেই বোঝা যায় যে প্রবন্ধগুলি সমধর্মী নয়। এতে যেমন একদিকে 'বসন্ত ও বর্ষা' (ভাদ্র ১২৮৮), 'প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল' (ফাল্গুন ১২৮৮)-এর মতন গভীর ভাবের প্রবন্ধ আছে, যাদের শুধু ভাষার রূপান্তরে রবীন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণ দীপ্তির সময় রচিত বলে অনায়াসেই চালিয়ে দেওয়া যায় ; অন্যদিকে তেমনি 'শূন্য' (ভাদ্র'৮৮), 'স্ত্রৈণ' (ঐ), 'জমাখরচ' (ঐ)-এর মতন হালকাভাবের প্রবন্ধও আছে ; 'দয়ালু মাংসাশী'র (শ্রাবণ'৮৮) মতন রাজনীতিগন্ধী প্রবন্ধও আছে।

সমগ্রভাবে দেখতে গেলে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বিচিত্র রসভাবে রঙীন। কয়েকটি প্রবন্ধ বাদে (যেমন 'বসন্ত ও বর্ষা', 'প্রাতঃকাল, ও সন্ধ্যাকাল' 'বন্ধুত্ব ও ভালবাসা' ইত্যাদি) অন্যগুলি হালকাসুরে রচিত হওয়াতে নিজেদের আনন্দে নিজেরা যেন নেচে চলেছে। এমন কি 'দয়ালু মাংসাশী'র মতন রাজনীতি-গন্ধী প্রবন্ধও এই দলে পড়েছে। কবি এই প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে উপলক্ষ্য করে খানিকটা রসিকতা করে নিয়েছেন। প্রবন্ধ পাঠের পর ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদকে আমরা মনে রাখিনে, কিন্তু একটি মধুর হাস্যাবেগে আমাদের মন নেচে ওঠে।

গীতিকবিতায় যেমন একটি ভাবের উপরে ছন্দের আবরণ দেওয়া থাকে প্রবন্ধেও তেমনি একটি ভাবকে নানা রসে রসিয়ে তুলতে পারেন। সেই জন্যে এক শ্রেণীর প্রবন্ধকে গদ্যে গীতিকবিতা বলা যেতে পারে। এই প্রবন্ধগুলি 'সন্ধ্যাসংগীতে'র সমসাময়িক (১২৮৮)। এখন প্রশ্ন ওঠে যে এই সব প্রবন্ধের সঙ্গে কি সমসাময়িক রবীন্দ্র-কাব্যের কোন ভাবৈক্য আছে। এবার এ বিষয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

রবীন্দ্র-কাব্যপিপাসীরা জানেন যে, মোটামুটি ১২৮০ থেকে ১২৯০ পর্যন্ত এই দশ বছর কবিগুরুর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দশক। কবি তাঁর অমর সাহিত্যসৃষ্টি প্রকৃতভাবে এই দশকে আরম্ভ করেন। কিন্তু এই দশকের

১। বিবিধ প্রসঙ্গ—রবীন্দ্ররচনাবলী- অচলিত সংগ্রহ, ১ম খণ্ড।

২। আলোচনা—রবীন্দ্ররচনাবলী- অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড।

রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুর কি? 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' থেকে 'সন্ধ্যাসংগীত' পর্যন্ত অনেকগুলি রচনার নাম (যেমন 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়', 'কালমৃগয়া', 'ভগ্নহৃদয়') ও সব গুলির মূল সুর দুঃখের। কিন্তু এই দুঃখ তেমন বিরাট ও গভীর নয়, যেমন পরে তাঁর ছোট গল্পে দেখতে পাই। যে অভিজ্ঞতা থেকে দুঃখের মহনীয়তা আসে, এত কম বয়সে কবির পক্ষে তা লাভ করা সম্ভব হয়নি। তাই উক্ত মূল সুর একটি অত্যন্ত রোমান্টিক দুঃখের, যার উৎপত্তির জন্য পাঠককে ইংরেজি রোমান্টিক কাব্য বিশেষতঃ শেলীর কাব্য অনুসন্ধান করতে হবে। কবির জীবনের এই অংশে বিলাতী কাব্যের প্রভাব খুবই সুস্পষ্ট।

অথচ যেখানে সমসাময়িক রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুর দুঃখের, সেখানে বিবিধ প্রসঙ্গের মূল সুর কখনো গভীর কখনো হাস্যোচ্ছল কিন্তু দুঃখের নয়। এই পার্থক্য কেন? এর একটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। সাহিত্যবস্তু তো কিছু শূন্য থেকে গজায় না, তা কবির অন্তর থেকেই ফুটে উঠতে থাকে, এইজন্যে রচনার সঙ্গে কবির জীবনীরও খোঁজ নেওয়া দরকার। দেখা যাক্ তাঁর জীবনে বিশ বছরের কিছু আগে কি কি ঘটনা ঘটেছিল[৩]। গতানুগতিক ভাবে তাঁকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টায় অভিভাবকেরা বিফল হয়েছেন। যে ব্যারিস্টারি পাশ সে সময়ের বাঙালী ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের সামাজিক প্রতিপত্তির তথা ধনাগমের পথ ছিল, কবি তাঁর অভিভাবকদের সেই আশার আগুনে ছাই চাপা দিলেন। ("একদিন বড়ো দিদি কহিলেন—'আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম যে বড় হইয়া রবি মানুষের মতন মানুষ হইবে, কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল"[৪])। তিনি অভিভাবকদের পরিকল্পিত সাংসারিক বেড়াজাল কাটানোর জন্যে নিজের মনে একটি আরামের নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। কবি তাঁর প্রাক্-সন্ধ্যাসংগীত কাব্যগুলি (যেমন 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়', ১২৮২-১২৮৭) সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে যা লিখেছেন, 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র প্রবন্ধ সম্বন্ধে সে কথা বলা যায়। ("বাড়ীর লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন।

৩ কবিরচিত জীবনস্মৃতি ও প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র জীবনী ১ম খণ্ড।

৪ জীবনস্মৃতি পৃ ১১২।

কোনোদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা না আমার না আর কাহারো মনে রহিল। কাজেই কোনকিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম। সে লেখাও তেমনি। মনের মধ্যে আর কিছুই নাই কেবল বাষ্প আছে— সেই বাষ্পভরা বুদ্বুদরাশি, ··তাহার মধ্যে কোন রূপের সৃষ্টি নাই, কেবল গতির চাঞ্চল্য আছে, কেবল টগবগ করিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া ওঠা, ফাটিয়া ফাটিয়া পড়া"[৫]) কয়েকটি প্রবন্ধ বাদে অন্যগুলিতে ভাবালুতা আছে, কিন্তু সৃষ্টি জমাট বাঁধেনি। এই প্রবন্ধগুলির সঙ্গে এই বিষয়ে যেমন প্রাক্-প্রভাতসংগীত রবীন্দ্র-কাব্যের সাদৃশ্য রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি অনৈক্যও আছে। এগুলি বিয়োগান্ত কাব্য, অর্থাৎ ভাবালুতায় পূর্ণ হোলেও মূল কাঠামো উচ্ছ্বাসময় দুঃখের। কিন্তু প্রবন্ধগুলির মূল সুর আনন্দের। এইখানেই উভয়ের পার্থক্য।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমি স্পষ্ট করে এই একটি কথা বল্‌তে চাই যে, কবিগুরু এ সময়ে যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার প্রায় সমস্তই ভাবপ্রবণতায় পূর্ণ। এটা ভালো কি মন্দ, এক কথায় তার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কয়েক জায়গায় যেমন 'বিবিধ প্রসঙ্গে' সুন্দর লাগে কিন্তু কাব্যনাট্যগুলিতে এই ভাবপ্রবণতা আমাদের অনেকটা মাটির পৃথিবী ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। (যেমন 'বনফুলে')। এই ভাবপ্রবণতার সুরে কবির এ যুগের সাহিত্যসৃষ্টি বাঁধা রয়েছে, তার প্রকাশ বিচিত্র হোলেও মূল সুর ও মূল কাঠামো একই। এদিক দিয়ে দেখলে সমসাময়িক রবীন্দ্র-কাব্য ও 'বিবিধ প্রসঙ্গ' এক জাতেরই।

এখন 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র ভাষা সম্বন্ধে আমার একটু নিবেদন আছে। তার গদ্যরীতি বঙ্কিমী ঢঙের। পাঠক বঙ্কিমের 'বিবিধপ্রবন্ধে'র ভাষার সঙ্গে 'বিবিধপ্রসঙ্গে'র ভাষা তুলনা করুন। 'মনের বাগানবাড়ি' 'বন্ধুত্ব ও ভালবাসা', এদুটির ভাষা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। ছোট ছোট বাক্য, সংস্কৃত কথার বাহুল্যে একটি মিষ্টি ছন্দের দোলায় আমাদের মনকে দোলাতে থাকে।

'বিবিধ প্রসঙ্গে'র সমধর্মী আর একটি বই আছে, তার নাম 'আলোচনা'[৬]। এ বইটির প্রকাশকাল ১২৯২ সাল, অর্থাৎ 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র চার বছর পরে।

৫ জীবনস্মৃতি পৃ ১৩৬।

৬ আলোচনা—রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ ২য় খণ্ড পৃ ১—৫৩।

এর প্রবন্ধগুলি কিন্তু ১২৯০ সালের চৈত্র থেকে ফিরে কার্ত্তিক পর্যন্ত আট মাস ধরে 'ভারতী', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'নবজীবন' প্রভৃতি কাগজে বেরিয়েছিল।

এই বইয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে কবিগুরু জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন[৭] " 'আলোচনা' নাম দিয়া যে ছোট ছোট গদ্যপ্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এককণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে"।

কবি নিজেই 'আলোচনা'র গোড়ার দিকের প্রবন্ধগুলিকে প্রকৃতির প্রতিশোধের মূলতত্ত্বের সঙ্গে সমগোত্রীয় বলেছেন। কাজেই প্রশ্ন ওঠে যে এই নাটকের মূলতত্ত্ব কি? এর উত্তরও কবির মুখ থেকেই শোনা যাক। তিনি নিজেই জীবনস্মৃতিতে বলেছেন যে সন্ন্যাসী যখন সংসারের সংকীর্ণতার গণ্ডির মধ্যে ফিরে এলেন তখন দেখতে পেলেন যে, "ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই তখনই যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যে সীমা নাই। ·· ··· ··· বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন সেখানে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি, কিন্তু যেখানে সৌন্দর্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিত ভাবে, ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেখানে সেই প্রত্যক্ষ বোধের কাছে কোন তর্ক খাটিবে কি করিয়া। এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে আপনার সীমাসিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাস দরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর মধ্যে একদিকে যত সব পথের লোক, যত সব গ্রামের নরনারী, তাহারা আপনাদের ঘরগড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতন ভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে আর একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘরগড়া এক অসীমের মধ্যে কোন মতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই

৭ জীবনস্মৃতি—১ম সংস্করণ (পৃ ১৭১)।

দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল"[৮]।

কবির উক্তি থেকে এটুকু জানা গেল যে 'আলোচনা'র প্রবন্ধগুলির মূল সুর 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সঙ্গে একতারে বাঁধা এবং তা রবীন্দ্র-সাহিত্যে কিছু নতুন কথা নয়।—তা হচ্ছে সীমার ভিতর অসীমের, সান্তের মধ্যে অনন্তের প্রকাশ।— যে সব পাঠক তাঁর 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধাবলী কিংবা ইংরেজী 'সাধনা' পড়েছেন, একথা তাঁদের নিতান্তই জানা কথা। পরবর্তী যুগের রবীন্দ্র-সাহিত্যের আরম্ভ যে কোথায় তাও জীবনস্মৃতির পাঠক জানেন। সেই যে একদিন সদর স্ট্রীটের বাড়ীতে সকালে কবির চোখের উপর থেকে মায়াপর্দা সরে গিয়ে বিশ্বসৌন্দর্য বিকশিত হয়েছিল, যার পরেই তিনি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ('প্রভাত সংগীত') লেখেন এবং অনেকটা এই কারণেই তাঁর প্রাক্-প্রভাতসংগীত কাব্যের উপর যবনিকা পড়ে[৯]। এখানে এই একটা জিনিস লক্ষ করা দরকার যে নিম্নলিখিত বইগুলি প্রায় সমসাময়িক:—'প্রভাতসংগীত' (১২৮৯-৯০), 'ছবি ও গান' (১২৯০), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১২৯১), এবং 'আলোচনা' (১২৯১-৯২)।

কাজেই আলোচনার মূল সুরের জন্য আমাদের আর হাতড়াবার দরকার নেই। কবির উক্তিতেই তার খোঁজ মিলেছে। এই ভাবধারা 'আলোচনা'য় কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাই এবার দেখাবার চেষ্টা করব।

'আলোচনা' সবসুদ্ধ ছ'টি বড় প্রবন্ধের সমষ্টি। যথা 'ডুব দেওয়া', 'ধর্ম', 'সৌন্দর্য ও প্রেম', 'কথাবার্তা', 'আত্মা' এবং 'বৈষ্ণব কবির গান'। এই প্রবন্ধগুলি আবার ছোট ছোট উপপ্রবন্ধে বিভক্ত। উপমা দিয়ে বলা যেতে পারে যে কয়েকটা ছোটপ্রবন্ধের ফুল দিয়ে এক একটা বড় প্রবন্ধের মালা গাঁথা হয়েছে। এ বইয়ের ভাষা আর লিখনভঙ্গী 'বিবিধপ্রসঙ্গে'রই মতন; সেই বঙ্কিমী ঢঙের গদ্য, ধ্বনির প্রসারও থেকে থেকে তালে দুলে উঠছে, অনেকটা নদীর বুকে ডিঙি নৌকোর মতন।

৮ জীবনস্মৃতি—পৃ ১৮৬-১৮৭, ২৪৮-৪৯।

৯ জীবনস্মৃতি—পৃ ২২৬-২৩৬।

এর বিষয়বস্তু অথবা প্রকাশভঙ্গী কিন্তু মোটেই 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র মতন নয়। অবশ্য কয়েকটি বাদে যেমন 'বসন্ত ও বর্ষা', 'প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল'। 'আলোচনা' 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র মতন হালকা রচনা নয়, তার সুর গভীর ও গম্ভীর, প্রায় অতলস্পর্শী বললেও অত্যুক্তি হয় না। এ প্রবন্ধগুলি 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র মতো ফিক্ ফিক্ করে হাসতে থাকে না, বরঞ্চ সেগুলিকে কোন জ্ঞানী পুরুষের রসালো উক্তি বলে মনে হয়।

প্রথম প্রবন্ধ 'ছোটবড়' (ডুব দেওয়া) পড়লে আমরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই। এবং যখন মনে হয় যে কবি এই প্রবন্ধ আজ থেকে ৫৯ বছর আগে রচনা করেছিলেন, যে সময়ে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের একত্রীকরণ হয়নি তখন কবির প্রতিভায় আমরা স্তম্ভিত হয়ে থাকি।— এ প্রবন্ধে 'কাল'কে তিনি অন্য তিনটি আয়তনের (dimension) মধ্যে এমনভাবে রসসিঞ্চিত করে ঢুকিয়েছেন যে শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হয়ে আসে। 'ডুব দেওয়া'র প্রবন্ধগুলিতে তিনি আমাদের প্রত্যেক জ্ঞেয় জিনিসের পিছনে যে অদৃশ্য অসীমতা আছে, তার মধ্যে ডুব দিতে পরামর্শ দিয়েছেন। ডুবব কি ভাবে ?— না প্রেমিকের মতো। আমাদের অনুরাগের সেই স্তরে পৌঁছতে হবে যেখান থেকে বিদ্যাপতির ভাষায় বলতে পারি, 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল'। 'স্বদেশ', 'কেন' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি স্বদেশপ্রেমকে একটা নতুন আলোয় দেখার চেষ্টা করেছেন। 'ধর্মে'র প্রবন্ধগুলিতে তিনি আমাদের অপূর্ণতাকে এমন একটি বিশ্বজনীন সহানুভূতির স্তর থেকে দেখেছেন যে পড়লে আমাদের অপূর্ণতাকে দোষের বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন তা পূর্ণতারই উলটো পিঠ। অর্থাৎ পূর্ণাপূর্ণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পরের কয়েকটি প্রবন্ধে কবি সেই মনোভাবকেই ধর্ম বলেছেন যা দিয়ে আমরা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত নিয়ম সত্যকে মেনে চলি।

'সৌন্দর্য ও প্রেম' প্রবন্ধে তিনি সুন্দরকে চমৎকার ভাবে বুঝিয়েছেন। সুন্দর কি ?— না, আপনার মধ্যে যার আপনার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য। সমস্তটাই ছন্দোবদ্ধ, বিষম কিছুই নেই।— "যথার্থ যে সুন্দর সে প্রেমের আদর্শ, তাহার কোনখানে বিরোধ বিদ্বেষ নাই। ইন্দ্রধনুর রংগুলি প্রেমের রং, তাহাদের মধ্যে কেমন মিল! এই মিলই সুন্দরের নির্যাস। যাহাতে মিল নাই, তাহা

সুন্দর নহে। যাহা সুন্দর তাহার জগতের সাধারণের সহিত আশ্চর্য মিল আছে। আমাদের মনই সৌন্দর্যপিপাসু। এই জন্য সুন্দরকে আমরা অবজ্ঞা করিতে পারি না। এখন যাহাদের মধ্যে এই সৌন্দর্যবোধ নাই, তাহাদের জন্য কে চেষ্টা করিবে?— কবি। তাঁহার কাজই হইতেছে আমাদের মনে সৌন্দর্য উদ্রেক করিয়া দেওয়া।" 'স্বাধীনতার পথপ্রদর্শকে' তিনি কবিদের কাজ সম্বন্ধে কিছু বলেছেন। "কবিরা অমর, কেননা তাঁহাদের বিষয় অমর, অমরতাকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহারা গান গাহিয়াছেন। ফুল চিরকাল ফুটিবে, সমীরণ চিরকাল বহিবে, পাখী চিরকাল ডাকিবে, এবং এই ফুলের মধ্যে 'কবির স্মৃতি প্রবাহিত, এই পাখীর গানে কবির গান বাজিয়া উঠে"। এই সৌন্দর্য ও প্রেম আমাদের যে দেবীকল্পনার মধ্যে একত্রীভূত হয়েছে; সেই দেবী— লক্ষ্মীকে আবাহন করে এইখানে তিনি একটি গদ্য কবিতা লিখেছেন (গদ্যের মতো সাজানো), যাকে কবির সর্বপ্রথম গদ্য কবিতার নিদর্শন হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। 'কথাবার্তা' প্রবন্ধে তিনি 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র একটু জের টেনেছেন (প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল) কিন্তু দুটি সমধর্মী প্রবন্ধে একটি মূলগত পার্থক্য রয়েছে। 'প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল' গভীর দার্শনিক প্রবন্ধ, কিন্তু 'কথাবার্তা'র দৃষ্টিভঙ্গী জ্যোতির্বিদ্যার পটভূমিকায় দার্শনিকতা, অর্থাৎ যে বাঁধা নিয়মে প্রকৃতি চলছে, সেই নিয়মের উপলব্ধি। সাহিত্য রসের দিক থেকে 'প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে'র সুর অনেক উচ্চ গ্রামে বাঁধা। 'আত্মা' প্রবন্ধ-সমষ্টিতে কবি আত্মার অসীমতার বিষয় আলোচনা করেছেন। আত্মবিসর্জনের মধ্যেই আত্মার অমরতার লক্ষণ দেখা যায়, এই আত্মবিসর্জন দিয়ে আমরা অসীমতায় পৌঁছতে পারি। 'বৈষ্ণব কবির গানে' তিনি সৌন্দর্য ও প্রেম প্রবন্ধগুলির মূল বক্তব্যের আবার পুনরুক্তি করেছেন। অর্থাৎ সৌন্দর্য মর্তে সেই স্বর্গের বাণী আনছে যার জয়গান বৈষ্ণব কবিরা করেছেন। স্বর্গের সঙ্গে মর্তের বিয়ে তাঁরা যে সৌন্দর্যসূত্রকে আশ্রয় করে দিয়েছেন, কবি সেই অসীম বিশ্বজনীন সৌন্দর্যের জয়গান এই প্রবন্ধক'টিতে করেছেন।

'আলোচনা'র ভাষা, ভাব ও প্রকাশভঙ্গী এত মনোহর যে অনায়াসে এ প্রবন্ধগুলিকে রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার প্রথম নিদর্শন হিসেবে চালানো যায়। এগুলি 'লিপিকা'র সমগোত্রীয়।

আমি আগেই বলেছি যে রবীন্দ্র-প্রবন্ধের আদি পর্ব 'বিবিধ প্রসঙ্গ' আর 'আলোচনা'য় সীমাবদ্ধ, আর তা কেন সীমাবদ্ধ তার আলোচনাই এতক্ষণ ধরে করা গেল। সমসামিয়ক (১২৮৮) 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'কে এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বই হিসেবে ধরা যায় না, ওটা ভ্রমণসাহিত্য। এর পর আসে 'সমালোচনা'র পালা (১২৯৪)। সমালোচনা ভারিক্কী চালের প্রবন্ধে ভরতি। তার কথা যথাস্থানে হবে।

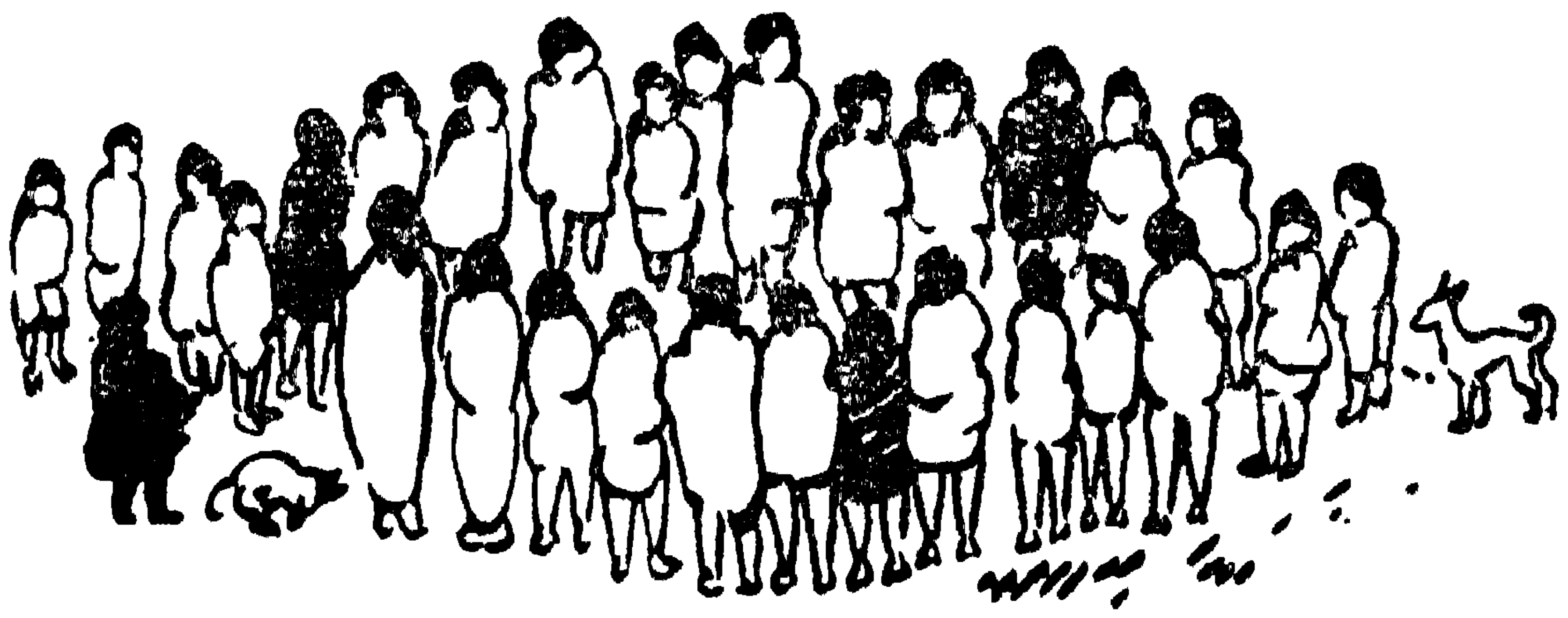

রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক অভিনয়

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার বিলাত যাবার পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্র নাথের 'এমন কর্ম আর করবো না' নামক নাটকে সবপ্রথম 'অলীক বাবু'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন; তখন তাঁর বয়স ষোল কি সতেরো (১৮৭৭)। সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী হাস্য-নট মোলেয়ারের একখানি নাট্য ভাঙিয়া উহা রচিত। রবীন্দ্রনাথ অলীকবাবুর ও তাঁহার নূতন বৌঠান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী শ্রীমতী কাদম্বরী দেবী হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় নামেন। বহু বৎসর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাট্য-খানিকে পুনঃ প্রকাশ করেন, তখন তার নাম দেন 'অলীক বাবু' এবং এখন উহা ঐ নামেই সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত। ১৯০০ সালে ঠাকুর বাড়ীর ড্রামাটিক ক্লাবের তরফ হইতে এই নাটকের পুনরভিনয় হয়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ঘরোয়া' নামে স্মৃতিকথা গ্রন্থে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথ "অনেক অদলবদল করে দিয়ে তার ফরাশী গন্ধ থেকে মুক্ত করলেন। হেমাঙ্গিনীর প্রার্থীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন। হেমাঙ্গিনীকে রাখলেন একেবারে নেপথ্যে—বেরই করলেন না।" মোটকথা মুদ্রিত 'অলীক বাবু'র থেকে এই অভিনয়োপযোগী পাণ্ডুলিপির অনেক অদলবদল হইয়াছিল। প্রিয়নাথ সেন 'অলীক বাবু'র সমালোচনাকালে (সাহিত্য ১০ম বর্ষ ১৩০৬ চৈত্র) অভিনয় সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "রবিবাবু অলীকবাবু সাজিয়াছিলেন; যাঁহারা রবিবাবুর অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে কবিবর শুধু আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের শিরোমণি নহেন, নটচূড়ামণিও বটে।"

বিলাত হইতে তরুণ কবি ফিরিলেন ১৮৮০ ফেব্রুয়ারী মাসে; তখন বাড়ীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গানের সুরের নানারূপ পরীক্ষা করিতেছিলেন—তাঁহার সঙ্গী ছিলেন অক্ষয় চৌধুরী। বিচিত্র সুরকে রূপদানের চেষ্টায় সৃষ্ট হয় 'মানময়ী' নামে গীতনাট্য। আমাদের মনে হয় বাংলা সাহিত্যে গীত-নাট্যের আদি গ্রন্থ এই ক্ষুদ্র 'মানময়ী'। রবীন্দ্রনাথ যখন বিলাত হইতে ফিরিলেন তখন গ্রন্থখানি প্রায় শেষ হইয়াছে এবং বোধহয় অভিনয়েরও ব্যবস্থা প্রায়-

সম্পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং ইহার রচনাসংস্কারে তাঁহার কোনো কৃতিত্ব ছিল না। কেবলমাত্র শেষ গানটি রচনা করিয়াছেন ; গানটি হইতেছে—

"আয় তবে সহচরী
হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি
গাহিবি গান" ইত্যাদি।

ইহার অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ মদনের, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইন্দ্রের ও কাদম্বরী দেবী উর্বশীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। রঙ্গমঞ্চে ইহাই রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় অবতরণ। এই ক্ষুদ্র গীতনাট্যের গল্পাংশ সামান্যই। "উর্বশী ইন্দ্রের প্রতি মান করিয়াছে ; অনেক সাধ্য-সাধনাতেও সে মান ভাঙ্গিল না। মান ভাঙ্গাইবার জন্য মদনকে রতি অনুরোধ করেন। মদন উর্বশীর নিকট উপস্থিত হইয়া ফুলবাণ মারে, তাহাতে উর্বশীর মান ভাঙ্গিয়া যায় ও সে ইন্দ্রের জন্য অধীর হয়। এদিকে বসন্ত মদনকে মদ খাওয়াইয়া তাহার ফুলবাণ চুরি করিয়া তাহাকেই মারে। মদন তাহাতে উর্বশীর প্রেমে মত্ত হইয়া তাহার সহিত প্রেমালাপ করিতেছে, বসন্ত এমনসময় দুষ্টুমি করিয়া উর্বশীর পদানত মদনের কাছে রতিকে ডাকিয়া আনে। রতি মদনকে তিরস্কার করিতে করিতে চলিয়া যায়, মদনও তাহাকে শান্ত করিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়। পরে উর্বশীর মানভঙ্গের জন্য তাহাকে উপহাসপূর্ব্বক সকলে উল্লাস করিতে করিতে ইন্দ্রের সহিত মিলন করাইতে গেল।" (দ্রঃ মানময়ী / গীতি-নাটিকা / কলিকাতা / বাল্মীকি যন্ত্রে / শ্রীকালিকিঙ্কর চক্রবর্ত্তিদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত / ১৮০২ [১৮৮০] পৃঃ ১২। পূর্বাভাস হইতে উদ্ধৃত)। আমাদের মনে হয় এই 'মানময়ী' হইতে রবীন্দ্রনাথ গীতনাট্য রচনার প্রেরণা পান। জীবনস্মৃতির পাঠকগণ জানেন তরুণ কবি বিলাত হইতে ফিরিয়া কিভাবে তাঁহার সময় কাটান। 'ভগ্নহৃদয়' নামে দীর্ঘ কাব্যখানির মাত্র ছয়টি পরিচ্ছেদ বিলাতে ও জাহাজে ফিরিবার পথে এবং অবশিষ্ট সকল পরিচ্ছেদই এখানে রচিত। আমাদের মনে হয় 'রুদ্রচণ্ড' নাটকও এই সময়ের রচনা। সমকালীন 'ভারতী' যুবক কবির বিচিত্র রসরচনায় পূর্ণ। বৎসরকাল এইভাবে কাটিয়া গেল। এমন সময়ে বিদ্বজ্জনসমাগমসভার বার্ষিক অধিবেশনের উপলক্ষ্যে 'বাল্মীকি-

প্রতিভা' গীতনাট্য রচনা করিলেন। ১২৮৭, ২৩ ফাল্গুন শ্রীপঞ্চমীর দিন (৫ মার্চ ১৮৮১) ঠাকুরবাড়িতে ইহার অভিনয় হইল। বিদ্বজ্জনসমাগম (১৮৭৪, ১৮ এপ্রিল) ১২৮১ সালের ৬ই বৈশাখ ঠাকুরবাড়িতে সবপ্রথম আহূত হয়। আনন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইহার নামকরণ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন ইহার প্রধান উদ্যোক্তা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার নবপ্রকাশিত 'পুরুবিক্রম' নাটক হইতে উদ্দীপনাপূর্ণ অংশবিশেষ পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৩ বৎসর। বোধহয় তিনি গানের দলে ছিলেন। (দ্রঃ—ভারতসংস্কার, ২৪ এপ্রিল ১৮৭৪। ব্রজেন্দ্রনাথের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' হইতে উদ্ধৃত। শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ পৌষ। জ্যোতিরিন্দ্র নাথের জীবনস্মৃতি— বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃত)।

'বাল্মীকিপ্রতিভা' নাটিকার মধ্যে বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গলে'র প্রভাব যে আছে তাহা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নির্দেশ করিয়াছেন। 'সারদামঙ্গল' রচনা আরম্ভ হয় ১২৭৭ সালে; অসম্পূর্ণ অবস্থায় উহা কয়েক বৎসরই পড়িয়া থাকে। পরে ১২৮১ সালে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'আর্য্যদর্শন' ১ম বর্ষে উহা প্রকাশিত হয় ও ১২৮৬ সালে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে আসিয়া মুদ্রিত গ্রন্থই দেখিতে পান। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মধ্যে দুইটি গান বিহারীলালের ও অক্ষয় চৌধুরীর রচনা। (দ্রঃ— বিহারীলাল চক্রবর্তী, কবিতা ও সঙ্গীত পৃঃ ১০, গীত নং ৩ 'কোথা লুকালে ত্যেজিয়া আমারে' ইত্যাদি।)

বিদ্বজ্জনসমাগম-সভার বার্ষিক অধিবেশনে তৎকালীন কলিকাতা সমাজের শ্রেষ্ঠমনীষিগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদেরই বিনোদনার্থে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অভিনয়। বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু গুণিজন এই অভিনয় দেখেন। তরুণ কবির এই ক্ষুদ্র নাটিকার প্রভাব সেই সময়েই সাহিত্যক্ষেত্রে অনুভূত হইয়াছিল। হরপ্রসাদ-রচিত 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থাকারে ১২৮৮ সালে প্রকাশিত হইলে 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদক (১২৮৮ আশ্বিন পৃঃ ২৮১ স্যাঃ লিঃ কোং প্রকাশিত) সমালোচনা করিয়া লিখিলেন— "যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' পড়িয়াছেন বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখনও ভুলিতে পারিবেন না। হর-

প্রসাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রবাবুর অনুগমন করিয়াছেন।” ‘বাল্মীকির জয়’ সবপ্রথম ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় বঙ্গদর্শনে (১২৮৭ পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন)। তারপর রবীন্দ্রনাথের ‘বাল্মীকি-প্রতিভা’ প্রকাশিত হইবার পর হরপ্রসাদ তাঁহার গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত ও সংস্কৃত করিয়া প্রকাশ করেন।

বাল্মীকি-প্রতিভাকে আমরা যেভাবে বর্তমানে পাই তাহা ১২৯২এর সংস্কৃত রূপ। এই গীতনাট্যের সফলতায় উৎসাহ বোধ করিয়া রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর আরও একটি গীতনাট্য রচনা করেন। উহার নাম ‘কালমৃগয়া’—দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ তাহার নাট্যবিষয়। ইহাও বিদ্বজ্জনসমাগম উপলক্ষ্যে রচিত ও ১২৮৯ সালের ৯ই পৌষ জোড়াসাঁকোর বাসায় অভিনীত হয়। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অধুনাচলিত বাল্মীকি-প্রতিভার দস্যুসর্দার ও দস্যুদলের অনেক গান ছিল কালমৃগয়ায় রাজবিদূষক ও রাজশিকারীদের শিকারসন্ধানকালের গান।

কালমৃগয়া রচনার তিন বৎসর পরে (১২৯২) রবীন্দ্রনাথ কালমৃগয়ার অনেকগুলি গান বাল্মীকি-প্রতিভার সহিত মিশাইয়া ও নূতন ১৯টি গান সংযোজিত করিয়া নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন। গ্রন্থ লিখিয়াই তিনি তৃপ্ত হন নাই— ইহার অভিনয়ও তিনি করেন। বাল্মীকির সাজে তাঁহার যে ফোটো দেখা যায়, তাহা এই সময়ে গৃহীত বলিয়া আমাদের অনুমান।

রবীন্দ্রনাথের অরচিত নাটকের পরিকল্পনা

[আশ্রমে যখন ছিলাম, গুরুদেবের মৌখিক বক্তৃতার শ্রুতিলিখন নিতে চেষ্টা করতাম এবং যথাসময়ে তা লিপিবদ্ধ করে সংশোধনের জন্য তাঁর কাছে রেখে আসতাম। এর জন্য আলাদা খাতা ছিল নির্দিষ্ট। এরই একটি খাতার মাঝখানে কবে তিনি একটি নাটকের পরিপূর্ণ পরিকল্পনা লিখে রেখেছিলেন, কিছুই জানতে পারিনি। যখন হঠাৎ একদিন চোখে পড়ল, তখন সেই পরিকল্পনাকে নাট্যরূপ দেওয়ার রূপকার আর ইহজগতে নেই।

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমার এই অকালের আবিষ্কারটি দেখাতে গিয়ে তার পশ্চাতের ইতিহাসটুকু জানা গেল। গুরুদেবকে দিয়ে বিশেষভাবে সিনেমার উপযোগী একটি নাটক লিখিয়ে নিতে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথের নিকট ঘন ঘন অনুরোধ কোনো সময় আসে। তিনি গুরুদেবকে এই নির্বন্ধাতিশয্যের কথা জানান এবং তার ফলেই এই নাটকের পরিকল্পনা। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের শেষভাগের সঙ্গে 'দালিয়া'র গল্পাংশ যোগ করলে যে একটি নাটকের উপযোগী চমৎকার উপাদান পাওয়া যেতে পারে, এই সম্বন্ধে গুরুদেব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। নাটকের বিষয়বস্তু ও প্লট মনে মনে স্থির করার পর হাতের কাছে যে খাতাখানি পান, যদৃচ্ছাক্রমে তারই একটি পাতা খুলে ঐ চিত্রনাট্যের সুসম্পূর্ণ ছক তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এঁকে রেখেছিলেন। কিন্তু খাতাটি যে তাঁর নিজের নয় এবং তার মালিক একদিন এসে সেটি চেয়ে নিয়ে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে নাটকের পরিকল্পনাও অন্তর্ধান করবে, এ খেয়াল তাঁর একেবারেই ছিল না। গরঠিকানা খাতার অজ্ঞাত কোণে প্রচ্ছন্ন রইল ভাবী রচনার সঙ্কেতরহস্য, তার মর্মলোকের বাণীরূপ অনুদ্ঘাটিতই রয়ে গেল চিরকালের মত।—শ্রীপ্রভাত চন্দ্র গুপ্ত]

প্রথম অংশ

রাজর্ষি বিংশ পরিচ্ছেদ ৭৮ পৃঃ

বিজয়গড়ের দুর্গ

গোবিন্দমাণিক্যকে রাজ্যচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে রঘুপতির মোগল সৈন্যের অনুসরণ।

দুর্গ আক্রমণকারী সুজার সঙ্গে সাক্ষাৎ ৮১ পৃঃ

বিশ্বাসপরায়ণ বিক্রমসিংহের নির্বুদ্ধিতায় রঘুপতির কাছে দুর্গের সুরঙ্গ পথের সংবাদ আবিষ্কৃত। ২১ পরিচ্ছেদ ৮৩ পৃঃ

সুজা যুদ্ধে পরাভূত ও বন্দী। দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ৮৮

ব্রাহ্মণের চক্রান্তে গোপন সুরঙ্গপথ দিয়ে সুজার পলায়ন। ২৪ পরিচ্ছেদ—

১১২ পৃঃ ২৮ পরিচ্ছেদ— রাজমহলে সুজা। রঘুপতির সঙ্গে কথাবার্তা। মোগলসৈন্য নিয়ে ত্রিপুরা আক্রমণে রঘুপতির যাত্রা।

দ্বিতীয় অংশ

১৭১।১৮৬ পৃঃ ৪২।৪৪ পরিচ্ছেদ। রাজ্যত্যাগী গোবিন্দমাণিক্য চট্টগ্রামে আরাকান রাজের অধীনে। ময়ানী নদীর ধারে কুটীরে তাঁর বাস।

এদিকে শাসুজা আরংজেবের সৈন্য কর্ত্তৃক তাড়িত। তাঁর তিন মেয়েকে ছেলের বেশে সঙ্গে নিয়েছেন। স্থির করেছেন চট্টগ্রামের বন্দরে জাহাজ নিয়ে মক্কায় যাবেন।

বনে কাঠুরিয়া ও শিকারীর দৃশ্য। তারা গোবিন্দমাণিক্যের কুটীরের পথ বলে দেয়।

ফকিরের বেশে শাসুজা গোবিন্দমাণিক্যের দুর্গের কাছে উপস্থিত। গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ১৮৯।১৯৩।১৯৪ আরাকানে সুজার প্রস্থান।

তৃতীয় অংশ

গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড। ৭৯ পৃঃ —

আরাকানরাজের ইচ্ছা তাঁর ছেলের সঙ্গে সুজার বড়ো দুই কন্যার বিবাহ হয়। সুজা অসম্মত, রাজা ক্রুদ্ধ।

ছল করে সুজাকে নৌকাবিহারে রাজার নিমন্ত্রণ। স্থির করেছিলেন ফুটো নৌকোয় সুজাকে ডুবিয়ে দিয়ে মেয়ে তিনটিকে নেবেন।

বিপদের সময় কনিষ্ঠা কন্যাকে সুজা স্বহস্তে জলে ফেলে দেন, জ্যেষ্ঠা আত্মহত্যা করে মরে, সুজার কর্মচারী রহমৎ আলি জুলিখাকে নিয়ে সাঁতার দিয়ে পালিয়ে যায়।

চতুর্থ অংশ

তারপরে দীর্ঘকাল গেছে। আমিনাকে আরাকানী ধীবর উদ্ধার ক'রে মানুষ করেছে। তাকে ডাকে তিন্নি ব'লে; পাড়ার সবাই তাকে জলদেবী বলে পূজা করে। মাছ ধরতে যাবার সময় নৈবেদ্য দেয়, ঝড়ঝাপটের দিনে আশীর্ব্বাদ নিতে আসে।

সেই রকম একটা পূজারী জনতার দৃশ্য অন্তে আমিনার সঙ্গে জুলিখার সাক্ষাৎ। তাদের মধ্যে দালিয়া। ৮০ হতে ৮৪ পৃঃ

জুলিখার সঙ্গে রহমতের পরামর্শ, আমিনাকে দিয়ে আরাকানের যুবরাজকে মারতে চায়। আমিনা ও দালিয়ার তাই নিয়ে কথাবার্তা। ৮৭ পৃঃ

আমিনা ভক্তদের জানিয়েছে যে সে সমুদ্রে ফিরে যাবে। বিদায় সম্ভাবনায় সকলের শোক। শাঁখ কড়ি ঝিনুক প্রবাল প্রভৃতি অর্ঘ্য দান।

শেষ দৃশ্য ৮৭।৮৮।৮৯ পৃঃ

রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা

প্রবোধচন্দ্র সেন

১

ইংরেজি ১৮৭৭, বাংলা ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় "ভারতী" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ঠিক ষোলো; অথচ ওই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই তিনি তার একজন নিয়মিত ও অন্যতম প্রধান লেখক। শুধু তাই নয়; সেই যুগেই কবিতা, গান, প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি সব বিষয়েই কিশোর সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার প্রকাশ দেখা যায়। এই ভারতীর যুগই হচ্ছে আসলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের প্রভাতকাল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম-প্রকাশিত গ্রন্থ 'কবি-কাহিনী'-নামক কাব্যখানি (১৮৭৮), তাঁর প্রথম উপন্যাস "করুণা" (অসমাপ্ত এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত), 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-নামক সুপরিচিত কতকগুলি কবিতা এবং মেঘনাদ বধের সমালোচনা বেরিয়েছিল এই ভারতী পত্রিকাতেই।

প্রভাতের পূর্বে যেমন প্রত্যুষ, ভারতীর পূর্বেও তেমনি 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব'। এই পত্রিকার চতুর্থ বর্ষের (১২৮২) অগ্রহায়ণ-সংখ্যা থেকে রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল'-নামক কাব্যোপন্যাসখানি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হ'তে থাকে। 'বনফুল' যদিও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'কবিকাহিনী'র পরে ১৮৮০ সালে, তথাপি এটিই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ বলে স্বীকার্য ও আদরণীয়। যাহোক্, শুধু কবিতা নয়, রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম গদ্যরচনাও ('ভুবনমোহিনী প্রতিভা'-নামে একখানি কবিতাপুস্তকের সমালোচনা) প্রকাশিত হয় এই জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকাতেই। সুতরাং এই জ্ঞানাঙ্কুরের যুগকে (১৮৭৫-৭৬) রবীন্দ্রপ্রতিভার উষাকাল ব'লে গণ্য করা যায়। সে সময় থেকে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর রচনা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। সুতরাং ১৮৭৫ সালকেই তাঁর সাহিত্যজীবনের আরম্ভ (অর্থাৎ বাংলাসাহিত্যের আসরে তাঁর প্রথম প্রবেশের বর্ষ) ব'লে গ্রহণ করা যায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ থাকে। যেমন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের পূর্বে নেপথ্যবিধান, তেমনি জ্ঞানাঙ্কুরের মারফত সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাবের পূর্বেও ছিল একটি সাধনা ও অভ্যাসের পর্ব। ১৮৭৫ সালের পূর্ববর্তী এই অভ্যাসের পর্বটিকে আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রাক্‌প্রত্যুষ বা অরুণাভাসের যুগ ব'লে অভিহিত করতে পারি। সুখের বিষয়, এই প্রাক্‌প্রত্যুষ কালের সাহিত্যসাধনার কাহিনীটি অস্পষ্ট হ'লেও আমাদের কাছে একেবারে অজ্ঞাত নয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর জীবনস্মৃতিতে এ বিষয়ে অনেকখানি আলোকপাত করেছেন। গাছের যে অংশটা থাকে মাটির উপরে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ যদিও তারই সঙ্গে, তবু তার সবটুকু রহস্য জানতে হ'লে মাটির তলায় নিহিত বীজের ক্রিয়াকলাপের সন্ধানও জানা চাই। আমরা এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রজীবনের ওই অর্ধালোকিত অস্পষ্ট অংশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব।

২

জীবনস্মৃতির গোড়াতেই দেখি, "তখন কর, খল প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি— জল পড়ে, পাতা নড়ে। আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা।" যখন তিনি বানানের পালা শেষ ক'রে প্রথম পাঠের পালা শুরু করেন তখন তাঁর বয়স পাঁচ বৎসর, এ অনুমান বোধ করি অসঙ্গত হবে না। সম্ভবত তার অল্প পরেই তিনি 'কান্নার জোরে' ওরিয়েন্টাল সেমিনারি-নামক ইস্কুলে 'অকালে' ভর্তি হলেন। তখন তাঁর বয়স যদি ধরা যায় ছয় বছর তাহলে সেটা হবে ১৮৬৭ সাল। এই ইস্কুলে তাঁর যেটুকু ইতিহাস পাই, সে হচ্ছে ছেলেমানুষির ইতিহাস। কিন্তু এই ইস্কুলে তিনি বেশি দিন ছিলেন না এবং তার পরেই ভর্তি হন নর্মাল স্কুলে (সম্ভবত ১৮৬৮)। এই ইস্কুলে তিনি "দীর্ঘকাল" (অনুমান ১৮৬৮-৭২) পড়েছিলেন এবং এই সময়েই তাঁর বাংলা শিক্ষার ভিত্তি খুব দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়েছিল। আর, সব চেয়ে বড়ো কথা এই যে, এ সময়েই কবিতারচনারও সূচনা হয়। তিনি যখন তাঁর ভাগিনেয় জ্যোতিঃপ্রকাশের নিকট পয়ার ছন্দের মাত্রাবিন্যাসরীতি শিখলেন তখন তাঁর বয়স 'সাত-আট

বছরের বেশি হবে না' (অর্থাৎ ১৮৬৮-৬৯)। এই সময়ে তিনি একখানি 'নীল কাগজের খাতা' জোগাড় ক'রে তাতে নিজের খুশিমতো কবিতা লিখতে লাগলেন। এই নীলখাতাখানিই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কবির নিজের ভাষায় এই খাতাটিকে করুণাময়ী বিলুপ্তিদেবী বৈতরণীর ভাঁটার স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছেন; তার আর ভবভয় নেই। তাহ'লেও এই খাতাখানির কয়েকটি কবিতার সন্ধান তিনি নিজেই আমাদের দিয়েছেন। তার ফলে আমরা এই খাতাখানির অন্তত ছয়টি কবিতার সংবাদ জানতে পেরেছি। (১) একটি কবিতা ছিল পদ্মের উপর। এটি তিনি নবগোপাল মিত্রকে প'ড়ে শুনিয়েছিলেন এবং তাতে একটা কথা ছিল 'দ্বিরেফ'। মিত্র মহাশয় ওই আনকোরা সংস্কৃত শব্দটি শুনে হেসে উঠেছিলেন, ফলে বালক কবি খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং বোধ করি বাকি দীর্ঘ জীবনেও তিনি এ শব্দটি আর ব্যবহার করেন নি। (২) দ্বিতীয় কবিতাটি ইস্কুলের শিক্ষক সাতকড়ি দত্ত মহাশয়ের উৎসাহে রচিত। তার দুটি পংক্তি জীবনস্মৃতিতে 'দলিলভুক্ত' হ'য়ে আছে।—

মীনগণ হীন হ'য়ে ছিল সরোবরে,
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে॥

(৩) তৃতীয়টি একটি ব্যক্তিগত বর্ণনা। এটিরও দুই পংক্তি বিলুপ্তিদেবীর জাল ছিন্ন ক'রে মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।—

আমসত্ত দুধে ফেলি' তাহাতে কদলী দলি'
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে --
হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক্ নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে॥

(৪) চতুর্থটি একটি নীতিকবিতা, ইস্কুলের শিক্ষক গোবিন্দবাবুর আদেশে রচিত। তাঁরই আদেশে তিনি এটিকে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করেছিলেন। (৫-৬) বাকি দুটি হচ্ছে দুটি ঈশ্বরস্তব। এদুটি কবিতা শ্রীকণ্ঠবাবু মহর্ষিকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। নর্মাল স্কুলে পড়ার সময়েই তিনি মায়ের নির্দেশে রাশিয়ানদের খবর দিয়ে পিতাকে প্রথম পত্র লেখেন (সম্ভবত ১৮৭১ সালে যখন বাদাকসানের অধিকার নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে রাশিয়ানদের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়)।

৩

আনুমানিক ১৮৭২ সালে কি ভাবে সহসা পিতার নির্দেশে রবীন্দ্রনাথের বাংলা শিক্ষার অবসান হলো এবং নর্মাল স্কুল ছেড়ে 'বেঙ্গল একাডেমি'-নামক ফিরিঙ্গি স্কুলে ভর্তি হলেন, সেকথা জীবনস্মৃতির পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। এই তৃতীয় ইস্কুলে পড়ার সময়কার ইতিহাসটা খুবই সংক্ষিপ্ত। এই সময়ে তিনি পূর্বোক্ত নীল খাতাটিকে বিদায় ক'রে দিয়ে একখানা "বাঁধানো লেট্‌স্ ডায়ারি" সংগ্রহ ক'রে তাতে কবিতা লিখতে শুরু করেন। এখানিই রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থের দুটির বেশি কবিতার সংবাদ তিনি আমাদের দেননি। এই দুটি কবিতার কথা একটু পরেই বলছি। কিন্তু এই সময়কার সব চেয়ে বড়ো ঘটনা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন-সংস্কার (১৮৭৩, ফেব্রুয়ারি ৬ ; ১২৭৯, মাঘ ২৫) এবং তৎপরে পিতার সঙ্গে উত্তরভারত-ভ্রমণ ও কয়েকমাস হিমালয়ে (ড্যালহৌসি পাহাড়ে) অবস্থান। এই হিমালয়যাত্রা উপলক্ষ্যেই পথে কিছুদিন পিতার সঙ্গে বোলপুরে শান্তিনিকেতনে থাকেন। এই সময়ই পূর্বোক্ত বাঁধানো লেট্‌স্ ডায়ারিটিতে 'পৃথ্বীরাজ-পরাজয়' নামে একটি বীররসাত্মক কাব্য লেখেন (১৮৭৩, ফেব্রুয়ারি)। হিমালয় থেকে প্রত্যাবর্তন ক'রে বেঙ্গল একাডেমিতে বেশি দিন থাকেন নি। সম্ভবত ১৮৭৪ সালের গোড়াতেই তাঁকে সেণ্ট্ জেবিয়ার্স্-এ ভর্তি ক'রে দেওয়া হয়। এখানেও কোনো ফল হলো না, শীঘ্রই তাঁর ইস্কুলে যাওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু কবিতারচনা বন্ধ হলো না। জীবনস্মৃতিতে ভারতমাতা সম্বন্ধে একটি কবিতার উল্লেখ আছে। এ কবিতাটি সম্ভবত হিমালয় থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৭৩ সালের শেষভাগে রচিত এবং পূর্বোক্ত লেট্‌স্ ডায়ারির অন্তর্গত। এ কবিতাটি সম্বন্ধে স্মরণীয় কথা এই যে, ওটিতে 'নিকট' কথার সঙ্গে 'শকট' কথার মিল দেওয়া হয়েছিল অত্যন্ত অসঙ্গতভাবে, এবং গুণেন্দ্রনাথকে যখন কবিতাটি শোনানো হয় তখন ওই অসঙ্গত মিলের প্রতি লক্ষ্য ক'রে তিনি যে প্রবল হাস্য করেছিলেন তার ফলে শকটের ওই 'নিকট'-সম্পর্ক পূর্বোক্ত 'দ্বিরেফ'-এর মতোই দুর্দশাপ্রাপ্ত হয়েছিল।

এ পর্যন্ত কবি "নিজেই লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশক এই তিনে-এক

একে-তিন" হ'য়ে ছিলেন; তখনও তাঁর কোনো রচনা মুদ্রাযন্ত্রযোগে বৃহত্তর জগতের কাছে প্রকাশের ব্যবস্থা হয় নি। এ সময়ে তাঁর বয়স বারো বছর এবং এখন থেকেই তাঁর রচনা পরিচিতমণ্ডলীর সীমা অতিক্রম ক'রে বাইরে ছড়িয়ে পড়বার উপক্রম করেছে। কিন্তু বলা প্রয়োজন যে, রচনাপ্রকাশের এই উদ্যোগপর্বেও লেখকের অজ্ঞাতবাসই চলেছে। এখন সে কথাটাই বলছি।

১৭৯৬ শকের অগ্রহায়ণ (১৮৭৪ নভেম্বর-ডিসেম্বর) সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা'য় 'অভিলাষ' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়; কিন্তু তার সঙ্গে লেখকের নাম ছিল না, তবে "দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচিত" ব'লে বর্ণনা ছিল। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের ব'লে স্বীকৃত হয়েছে। কবিতাটির প্রকাশকালে তাঁর বয়স তেরো বছর ছয় মাস; কিন্তু ওটি তাঁর বারো বছর বয়সের সময়ে রচিত। সুতরাং এটির রচনাকাল হচ্ছে ১৮৭৩ সালের শেষার্ধ। আমরা জানি ওই সালের প্রথম দিকেই "বাঁধানো লেট্‌স্‌ ডায়ারি"তে কবিতারচনা শুরু হয়। কাজেই 'পৃথ্বীরাজ-পরাজয়' ও 'ভারতমাতা' কবিতার ন্যায় এই 'অভিলাষ' কবিতাটিও উক্ত ডায়ারির অন্তর্ভুক্ত হওয়া অসম্ভব নয়। কবির এই প্রথম প্রকাশিত কবিতাটির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি অমিল পয়ার ছন্দে রচিত। যথা—

জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ!
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।
অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
তত যেন অগ্রসর হ'তে ইচ্ছা হয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক সবগুলি কবিতাই সমিল ছিল ব'লে মনে হয়। মিল দেবার দুঃসাধ্য প্রয়াসে তিনি কি ভাবে 'নিকট' শব্দের পাশে 'শকট' টেনে এনেছিলেন তা আমরা দেখেছি। পরবর্তীকালে বাংলা পদ্যে মিলস্থাপনের রীতিতে তিনি কি অজস্র বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন তাও সর্বজনবিদিত। সেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতাটি যে অমিল ছন্দে রচিত, এইটে চিন্তনীয় বিষয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ সময়ে রচিত তাঁর অনেক কবিতাতেই মিল নেই। সম্ভবত এটা মধুসূদন-প্রবর্তিত, অমিত্রাক্ষর রীতিরই ফল।

যাহোক্, 'অভিলাষ'-রচনার পরেই নাম করতে হয় একটি গানের। এটির প্রথম দুটি পংক্তি হচ্ছে এই—

একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

'জীবনস্মৃতি'-তে এই গানটির উল্লেখ আছে। কিন্তু এটি যে রবীন্দ্রনাথের রচিত, একথা প্রকাশ পেয়েছে মাত্র সেদিন (শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- প্রণীত 'রবীন্দ্রগ্রন্থ-পরিচয়', পৃঃ ৬৩ দ্রষ্টব্য)। এই গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকে (১৮৭৪ জুলাই)। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে,—শুধু যে উক্ত গানের রচয়িতার নামই অপ্রকাশিত থাকল তা নয়, পুরুবিক্রমের প্রথম সংস্করণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামও প্রকাশিত হয় নি। যাহোক্, ওই গানটি পুরুবিক্রম-প্রকাশের কিছুকাল পূর্বেই (সম্ভবত ১৮৭৪ সালের গোড়ার দিকে) রচিত হয়েছিল, একথা মনে করা অসঙ্গত নয়। সুতরাং এটির রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ সেণ্ট জেবিয়ার্স বিদ্যালয়েই ছিলেন, একথা ধরা যেতে পারে। কিন্তু লেট্স্ ডায়ারিটি তখনও ছিল কি না, অর্থাৎ এই গানটি ওই ডায়ারিতেই প্রথম লিখিত হয়েছিল কি না বলা শক্ত।

৪

১৮৭৪ সালটি কবির জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা খুব সম্ভব এই বৎসরেই তাঁর সেণ্ট জেবিয়ার্সে যাওয়া তথা ইস্কুলের পড়াই বন্ধ হয়। জীবনস্মৃতি প'ড়ে মনে হয় ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ হ'লেও গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে 'ঘরের পড়া' আরও কিছুকাল চলে। গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্বন্ধে লিখেছেন, "ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি কোনোমতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া ম্যাক্‌বেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্য-ক্রমে সেটি হারাইয়া যাওয়াতে কর্মফলের বোঝা ঐ পরিমাণে হাল্কা হইয়াছে।"

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ম্যাকবেথের সবটা অংশ হারিয়ে যায়নি। বাংলা ১২৮৭ (ইংরেজি ১৮৮০) সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'ভারতী'তে ম্যাকবেথ-অনুবাদের ডাকিনী অধ্যায়টি পাওয়া গিয়েছে। (রবীন্দ্রগ্রন্থপরিচয়, পৃ: ৬৮)। তার প্রথম অংশটা এরকম—

১ম ডা— ঝড় বাদলে আবার কখন
মিলব মোরা তিন জনে।
২য় ডা— ঝগড়া ঝাঁটি থামবে যখন
হার জিত সব মিটবে রণে।
৩য় ডা— সাঁঝের আগেই হবে সে ত ;
১ম ডা— মিলব কোথায় বলে দে ত।
২য় ডা— কাঁটা খোঁচা মাঠের মাঝ।
৩য় ডা— ম্যাক্বেথ সেথা আস্‌চে আজ।

এই ম্যাকবেথ-অনুবাদের আরেকটু ইতিহাস এই যে, বালক রবীন্দ্রনাথ এটি বিদ্যাসাগর মহাশয় ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে শুনিয়ে এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতির একটি উক্তি বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে এই,— "মনে আছে রাজকৃষ্ণবাবু আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, নাটকের অন্যান্য অংশের অপেক্ষা ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দের কিছু অদ্ভুত বিশেষত্ব থাকা উচিত।" এই মন্তব্য থেকে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ ডাকিনীর উক্তিসহ সমগ্র ম্যাকবেথখানাই একই ধরনের ভাষা ও ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন। ভারতীতে প্রকাশিত ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দে বেশ একটু 'অদ্ভুত বিশেষত্ব' রয়েছে, সমগ্র গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই ওই ভাষা ও ছন্দে অনুবাদ করেন নি। তাই মনে হয় ভারতীতে প্রকাশিত অংশটুকু জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে কৃত প্রথম অনুবাদ নয়। সম্ভবত ওই অংশটুকু পরবর্তী কালে রাজকৃষ্ণ বাবুর উপদেশ অনুসারে পুনর্লিখিত হ'য়ে ভারতীতে প্রকাশিত হয়। এস্থলে বলা প্রয়োজন যে, ভারতীর ডাকিনী-অধ্যায়টির ভাষা ও ছন্দ, এই দুয়েতেই লৌকিক রীতি অনুসৃত হয়েছে। সম্ভবত রবীন্দ্রসাহিত্যে এটিই লৌকিক ছন্দের সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। সেদিক থেকেও এই রচনাটির বিশেষ মূল্য অবশ্য স্বীকার্য।

৫

জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের শিক্ষকতায় রবীন্দ্রনাথ ম্যাকবেথের সঙ্গে সঙ্গে কুমারসম্ভবও পড়েছিলেন, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু ম্যাকবেথের ন্যায় কুমারসম্ভবেরও বাংলা তর্জমা করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে জীবনস্মৃতি নীরব। অত্যন্ত সৌভাগ্যক্রমে ও অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে রবীন্দ্রভবনে ইদানীং একটি পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়েছে, যেটিকে আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন ব'লে নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হয়। পাণ্ডুলিপিখানি স্পষ্টতই একখানি বৃহৎ বাঁধানো খাতা ছিল। কিন্তু এখন সেটির সেলাই খুলে গিয়েছে এবং খোলা পাতাগুলিও অত্যন্ত জীর্ণ দশা প্রাপ্ত হয়েছে। একদিকের শক্ত রঙিন মলাটও পাওয়া গিয়েছে। অন্যদিকের মলাট ও কতকগুলি পাতা পাওয়া যায়নি। এই আশ্চর্য ও মূল্যবান্ পাণ্ডুলিপি-খানির পূর্ণ পরিচয় ভবিষ্যতে দেওয়া যাবে। এস্থলে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এই বাঁধানো খাতাখানি পূর্বোক্ত বাঁধানো লেট্‌স্ ডায়ারি না হলেও তার কাছাকাছি সময়ের, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের তেরো চোদ্দ বয়সের লেখা এই খাতাখানিতে পাওয়া গিয়েছে। যাহোক, বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে প্রয়োজনীয় কথা এই যে, এই খাতাখানিতে রবীন্দ্রনাথের কুমারসম্ভব অনুবাদের খানিকটা অংশ পাওয়া গিয়েছে। তিনি এই সংস্কৃত কাব্যখানির ঠিক কতখানির বাংলা তর্জমা করেছিলেন বলা যায় না। তবে বর্তমান পাণ্ডু-লিপিতে উক্ত কাব্যখানির তৃতীয় সর্গের তেতাল্লিশটি মাত্র শ্লোকের (২৫-২৮, ৩১, ৩৫-৭২) অনুবাদ পাওয়া গিয়েছে। অনূদিত অংশটার আরম্ভ হয়েছে মহাদেবের তপোবনে অকালবসন্ত-সমাগমের বর্ণনা নিয়ে এবং শেষ হয়েছে হরকোপানলে মদনের ভস্মীভূত হবার বিষয় দিয়ে। সমগ্র অনুবাদটার মধ্যে একটা সম্পূর্ণতা আছে ; উপরে শিরোনাম রয়েছে কুমারসম্ভব (সর্গ বা শ্লোক-সংখ্যার উল্লেখ নেই)। এসব কারণে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ হয়তো শুধু ওই অংশটুকুরই অনুবাদ করেছিলেন। এই অংশ থেকে পাঁচটি শ্লোক এবং দুইটি শ্লোকের (৩৭ ও ৫৫) অর্ধাংশ বাদ যাবার কারণ বোঝা গেল না। তবে আধুনিক কালের রুচিপরিবর্তন যে তার একটি কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথকৃত কুমারসম্ভবের অনুবাদটুকু সমগ্রভাবে অন্যত্র মুদ্রিত হলো। এস্থলে নমুনাস্বরূপ তার থেকে একটু অংশ উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া গেল।—

বাড়িল শিবের ক্রোধ তপস্যার ভঙ্গে—
এমনি ভ্রূভঙ্গ যে, তাকায় মুখপানে
সাধ্য নাই কাহারো, তৃতীয় নেত্র হ'তে
বাহিরিল সহসা জ্বলন্ত হুতাশন।
ক্রোধ প্রভু সহংর সংহর— এই বাণী
দেবতা সবার হোতা চরুক বাতাসে,
হেতায় মদনতনু ভস্ম অবশেষ।

কাঁচা হাতের কিছু কিছু লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও বালক কবির অনুবাদে মূলের ভাব ও ভাষা কিরূপ যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে, সেটা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দকেই তিনি কুমার-সম্ভব-অনুবাদের উপযুক্ত বাহন ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। আমার বিবেচনায় এর চেয়ে যোগ্যতর বাহন হ'তে পারত না। শুধু তখনকার দিনের পক্ষে নয়, এখনকার পক্ষেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য।

যে যুগে এই অনুবাদ করা হয়েছে সে যুগে অমিত্রাক্ষর ছন্দই মহাকাব্যের যোগ্যতম বাহন ব'লে স্বীকৃত ছিল। ম্যাকবেথ-অনুবাদেও সম্ভবত এই ছন্দই অনুসৃত হয়েছিল; এই উপলক্ষ্যে ইংরেজি অমিত্রাক্ষর ছন্দের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল। কুমারসম্ভবের সংস্কৃত ছন্দের অমিত্রাক্ষরতাও নিশ্চয়ই তাঁর স্বাভাবিক ছন্দোদৃষ্টিকে আকৃষ্ট করেছিল। কাজেই তাঁর এই সময়কার অমিত্রাক্ষর-প্রীতিতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। আমার মনে হয়, 'পৃথ্বীরাজ-পরাজয়'ও তৎকালীন মহাকাব্যের আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দেই রচিত হয়েছিল।

এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতশিক্ষা সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা বলা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নর্মাল স্কুলে পড়ার সময়েই হেরম্ব তত্ত্বরত্ন মহাশয়ের কাছে তিনি মুগ্ধবোধের সূত্র মুখস্থ করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাতে সংস্কৃতভাষায় তাঁর যে বিশেষ অধিকার জন্মেছিল তা মনে হয় না। কেননা, উপনয়নের সময়কে (১৮৭৩, ফেব্রুয়ারি) লক্ষ্য ক'রে তিনি বলেছেন, "আমি তখন সংস্কৃত জানিতাম না"। কিন্তু তথাপি তৎকালেই তাঁর সংস্কৃত-

শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হ'য়ে গিয়েছিল, একথাও স্বীকার করতে হবে। কেননা, "বাংলা ভালো জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি [সংস্কৃত] শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম।" অন্যত্র আছে, "বাংলা আমাদিগকে এমন করিয়া পড়িতে হইয়াছিল যে, তাহাতেই আমাদের সংস্কৃত শিক্ষার কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল"। ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত যদিও "মুগ্ধবোধ মুখস্থ করা ছাড়া সংস্কৃত পড়ার আর কোনো চর্চ্চা" হয়নি, তবু তিনি যে সংস্কৃত বই নিয়ে একেবারেই নাড়াচাড়া করেননি তা নয়। কেননা, একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গার বোটে বেড়াবার সময় একখানি গীতগোবিন্দ পেয়ে কিভাবে তার ভাব ও ছন্দ আবিষ্কারের আনন্দময় অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেকথা জীবনস্মৃতিতেই পাই। তার পরে শান্তিনিকেতনে বাসকালে ভগবদ্‌গীতার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা ঠিক যে, ১৮৭৩ সালে পিতার সঙ্গে হিমালয়ে অবস্থানকালে উপক্রমণিকা ও ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ পড়ার সময় থেকেই তাঁর যথার্থ সংস্কৃত শিক্ষার আরম্ভ হয়। তার পরে বোধ করি ১৮৭৪ সালে কুমারসম্ভব পাঠ ও তার অনুবাদ। "মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাম্" ইত্যাদি কুমারসম্ভবের শ্লোকটি (১।১৫) কিভাবে তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল, সেকথা জীবনস্মৃতিতে উল্লিখিত হয়েছে।

কুমারসম্ভব ও ম্যাকবেথের অনুবাদের তারিখ সম্ভবত ১৮৭৪ সাল। আমরা দেখেছি পুরুবিক্রমের একটি গান (জুলাই) এবং 'অভিলাষ'-নামক কবিতাটিও (নবেম্বর) ওই সালেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই বৎসরের আরও কিছু রচনা আমরা পাচ্ছি 'শৈশবসংগীত'-কাব্যে। এই পুস্তকের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন, "এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম"। ১৮৭৪ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথের তেরো বৎসর পূর্ণ হয়। সুতরাং এই সালের কোনো কোনো রচনা যে 'শৈশব-সংগীত'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থে কোনো কবিতার সঙ্গে তারিখ দেওয়া নেই; তাই কোন্‌গুলি কোন্ বছরের রচনা তা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। শৈশব-সংগীত সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছা আছে। সুতরাং এস্থলে ওবিষয়ে অধিকতর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

৬

১৮৭৫ সালের প্রথমেই একটি কবিতার সন্ধান পাই, নাম "হিন্দুমেলায় উপহার"। উক্ত সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে হিন্দুমেলার নবম বার্ষিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সর্বসমক্ষে কবিতাটি আবৃত্তি করেন। এই হচ্ছে নিজের রচনা নিয়ে সাধারণ জনসভায় কবির প্রথম উপস্থিতি। কবিতাটি পরে তৎকালীন দ্বৈভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে। এইটেই রবীন্দ্রনাথের নামযুক্ত প্রথম প্রকাশিত রচনা। নমুনাস্বরূপ এই কবিতাটি থেকে একটু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।—

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক ভারতকানন,
চন্দ্র সূর্য হোক মেঘে নিমগন,
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক।

যাক্ ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক।

এই কবিতাটিও আংশিক ভাবে অমিল ছন্দে রচিত, এটা লক্ষ্য করার যোগ্য। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হবার কয়েক দিন পরেই তাঁর মাতৃবিয়োগ হয় (১৮৭৫ মার্চ ৮)। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মায়ের মনে নিশ্চয়ই একটা বেদনামিশ্রিত উৎকণ্ঠা ছিল। কেননা, তখন ইস্কুল-বিমুখ বালককে স্পষ্ট করেই ব'লে দেওয়া হয়েছিল, "আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম বড়ো হইলে রবি মানুষের মতো হইবে, কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল"। রবীন্দ্রনাথও বুঝেছিলেন "ভদ্রসমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে"। তথাপি "মা পুত্রের বিদ্যাবুদ্ধির অসামান্যতা অনুভব করিয়া আনন্দসম্ভোগ করিবার জন্য উৎসুক" ছিলেন এবং পুত্রের পক্ষেও "মার কাছে যশস্বী হইবার প্রলোভন

ত্যাগ করা কঠিন" ছিল। সুখের বিষয়, হিন্দুমেলার কবিতাটি উপলক্ষ্যে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে মা পুত্রের ভবিষ্যৎ গৌরবের প্রথম সূচনাটুকু দেখে যেতে পেরেছিলেন।

বলা প্রয়োজন যে, হিন্দুমেলার এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের নামে প্রকাশিত হ'লেও এটি তাঁর অজ্ঞাতবাসপর্বেরই অন্তর্গত। প্রকাশ্য জনসভায় লেখককর্তৃক আবৃত্তি করা হয়েছিল ব'লে স্বভাবতই এটি লেখকের নামযুক্ত হ'য়ে সাময়িক কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আসলে এটি বেনামী কবিতা প্রকাশের যুগেরই অন্তর্গত। বোধ করি এই বেনামী কবিতা প্রকাশে বড়দাদা এবং জ্যোতিদাদাই তাঁর পথপ্রদর্শক। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের প্রথম সর্গ বঙ্গদর্শনে (১২৮০ শ্রাবণ) বেনামী ভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথেরও প্রথম দুটি গ্রন্থে ('কিঞ্চিৎ জলযোগ' এবং 'পুরুবিক্রম') লেখকের নাম গোপন করা হয়েছিল।

এর পর আমরা যে রচনার সন্ধান পাই তার নাম "প্রকৃতির খেদ"। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৫ সালের জুন মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী'-পত্রিকার ১৭৯৭ শকের আষাঢ় সংখ্যায়। এটিও বেনামী, শুধু "বালকের রচিত" ব'লে বর্ণিত। এর থেকেও একটু নমুনা উদ্ধৃত করলাম।—

অভাগী ভারত হায়, জানিতাম যদি—
বিধবা হইবি শেষে, তাহ'লে কি এত ক্লেশে
তোর তরে অলঙ্কার করি নিরমাণ।
তাহ'লে কি হিমালয়, গর্ব্বভরা হিমালয়,
দাঁড়াইয়া তোর পাশে, পৃথিবীর উপহাসে,
তুষারমুকুট শিরে করি' পরিধান॥

... ...

আবার গাইল ধীরে প্রকৃতি সুন্দরী।
'কাঁদ্ কাঁদ্ আরো কাঁদ্ অভাগী ভারত।
হায় দুখনিশা তোর, হ'ল না হ'ল না ভোর,
হাসিবার দিন তোর হ'ল না আগত।

... ...

প্রভঞ্জন ভীমবল, খুল্যে দাও বায়ুদল,
ছিন্ন ভিন্ন কর্য্যে দি'ক্ ভারতের বেশ।
ভারতসাগর রুষি' উগর বালুকারাশি,
মরুভূমি হয়্যে যাক্ সমস্ত প্রদেশ।

'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতার উদ্ধৃত অংশটুকুর সঙ্গে এই পংক্তিগুলির ভাবগত সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করলে এই দুটি কবিতাই যে একজনের রচনা, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এই দুটি কবিতাতেই হেমচন্দ্রের "ভারতসংগীত" (এডুকেশন গেজেট, ১৭ শ্রাবণ, ১২৭৭) কবিতার প্রভাব সুস্পষ্ট। "প্রভঞ্জন ভীমবল, খুল্যে দাও বায়ুদল" অংশটিতে মেঘনাদবধের ছায়াপাত লক্ষ্য করার যোগ্য। যথা—

তবে দেবকুলনাথ ডাকি প্রভঞ্জনে
কহিলা, "প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে
লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি, শীঘ্র দেহ ছাড়ি'
কারারুদ্ধ বায়ুদলে ; ... ...

এই বৎসরের শেষভাগে প্রকাশিত আরও একটি বেনামী রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "সরোজিনী" (৩০ নবেম্বর ১৮৭৫) নাটকের একটি গান রবীন্দ্রনাথের রচিত, একথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেই আমাদের জানিয়েছেন (জীবনস্মৃতি, পৃঃ ১৪৭)। এই গানটির প্রথম কয়েকটি লাইন এরকম।—

জ্বল্ জ্বল্ চিতা। দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।

৭

এই গান রচনার প্রায় সমকালেই 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতি বিম্ব' পত্রিকার ১২৮২ অগ্রহায়ণ (১৮৭৫ নবেম্বর-ডিসেম্বর) সংখ্যা থেকে 'প্রলাপ' ও 'বনফুল' কাব্য ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হ'তে থাকে। এই 'বনফুল'-প্রকাশের সঙ্গেই

রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাতবাস ও উদ্যোগ-পর্বের সমাপ্তি ঘটল। এর পরে তাঁর অনেক রচনাই ছদ্মনামে বেরিয়েছে (যেমন ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী) এবং ওরকম ছদ্মনাম ব্যবহারের নানা কারণও ছিল। কিন্তু জ্ঞানাঙ্কুরের লেখকশ্রেণীভুক্ত হবার পর একটি ছাড়া তাঁর আর কোনো রচনা বেনামী ভাবে প্রকাশিত হয়েছে ব'লে মনে হয় না। সেটি হচ্ছে লর্ড লিটনের আমলের দিল্লি-দরবার উপলক্ষ্যে রচিত একটি কবিতা। হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কবি এই কবিতাটি পড়েছিলেন, শ্রোতাদের মধ্যে কবি নবীন সেন উপস্থিত ছিলেন। দিল্লির দরবার অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে। কবিতাটি সম্ভবত ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে হিন্দুমেলায় পঠিত হয়েছিল। কবিতাটিতে ইংরেজশাসন ও তৎকালীন রাজভক্তদের বিরুদ্ধে খুবই শক্ত কথা বলা হয়েছিল। বোধ করি এই জন্যই এটি কোনো সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়নি; আইনের বাধায় কোনো গ্রন্থভুক্ত করাও সম্ভব ছিল না। ইদানীং ধরা পড়েছে যে, কবিতাটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) নাটকের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। একটুখানি অংশ উদ্ধৃত করলেই এটির মূল ভাবটি বোঝা যাবে। —

> দেখিছ না অয়ি ভারতসাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
> প্রলয়কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে। ...
> শুনিতেছি নাকি শতকোটি দাস, মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
> সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে? ..
> তখনো একত্রে ভারত জাগেনি, তখনো একত্রে ভারত মেলেনি,
> আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে, বন্ধন-শৃঙ্খলে করিতে পূজা!

'পৃথ্বীরাজ-পরাজয়' থেকে হিন্দুমেলার এই দ্বিতীয় কবিতা পর্যন্ত বহু রচনার মধ্যেই যে একটি স্বাদেশিকতার সুর পাই, তার মূল রয়েছে তৎকালীন সদ্যো-জাগ্রত জাতীয় চেতনার মধ্যে। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ সকলেই ওই স্বাদেশিকতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বস্তুত হিন্দুমেলাই ওই জাতীয় জাগরণের একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমাদের পক্ষে এস্থলে সে বিষয়ের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

৮

'কবিকাহিনী' কাব্যের আরম্ভেই রয়েছে—

শুন কলপনা বালা, ছিল কোন কবি
বিজন কুটীরতলে। ছেলেবেলা হোতে
তোমার অমৃতপানে আছিল মজিয়া।

এখানে কবির নিজেরই কল্পনা-অমৃতপানমুগ্ধ ছেলেবেলাকার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত' দেখতে পাই। এই প্রবন্ধে আমরা কবির ওই কল্পনানিষ্ঠ বাল্যকালের কবিত্বসাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করলাম।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের (১৮৬১-৭৫) প্রধান প্রধান ঘটনাসমূহকে যেন দৃষ্টিক্ষেপমাত্রই সহজে বোঝা যায় এমনভাবে তালিকাবদ্ধ ক'রে নিম্নে সাজিয়ে দিলাম। সবগুলি তারিখ সুনির্দিষ্ট নয়; অনেকগুলি তারিখ আনুমানিক। কতকগুলি ঘটনার তারিখ নিশ্চিতভাবে জানবার উপায় নেই। বাকিগুলির (বিশেষত ইস্কুলে প্রবেশ ও ইস্কুল-ত্যাগের) তারিখগুলি নিশ্চিতভাবে জানা প্রয়োজন।—

মেঘনাদবধ (১ম খণ্ড) প্রকাশ	১৮৬১ জানুয়ারি ৪
রবীন্দ্রনাথের জন্ম	১৮৬১ মে ৭
মেঘনাদবধ (২য় খণ্ড) প্রকাশ	১৮৬১ জুলাই
সত্যেন্দ্রনাথের বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তন	১৮৬৪
দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশ	১৮৬৫
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভ	১৮৬৬
ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে ভর্তি	১৮৬৭
হিন্দুমেলার উদ্বোধন	১৮৬৭ এপ্রিল ১২
নর্মাল স্কুলে প্রবেশ	১৮৬৮
কবিতারচনারম্ভ	১৮৬৯
'নীলখাতা'য় রচনা	১৮৬৯-৭২
'ভারতসংগীত' (হেমচন্দ্র) ১২৭৭ শ্রাবণ ১৭	১৮৭০ জুলাই ১
পিতাকে প্রথম পত্র লেখা	১৮৭১

বেঙ্গল একাডেমিতে প্রবেশ	১৮৭২
বঙ্গদর্শন প্রকাশ	১৮৭২ বৈশাখ
জামাই-বারিক প্রকাশ	১৮৭২
উপনয়ন (১২৭৯ মাঘ ২৫)	১৮৭৩ ফেব্রুয়ারি ৬
শান্তিনিকেতন-দর্শন ও 'পৃথ্বীরাজপরাজয়'-রচনা (বাঁধানো লেট্‌স্‌ ডায়ারিতে) ···	১৮৭৩ ফেব্রুয়ারি
উত্তরভারত-ভ্রমণ ও হিমালয়ে পিতার সঙ্গে অবস্থান	১৮৭৩ মার্চ-জুন
মধুসূদনের মৃত্যু	১৮৭৩ জুন ২৯
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন ও পুনরায় বেঙ্গল একাডেমিতে প্রবেশ ··	১৮৭৩ জুলাই
স্বপ্নপ্রয়াণ ১ম সর্গ (বঙ্গদর্শন, ১২৮০ শ্রাবণ)	১৮৭৩ জুলাই
'ভারতমাতা' ও 'অভিলাষ' কবিতা রচনা	১৮৭৩ শেষার্ধ
'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' প্রকাশ	১৮৭৩
সেন্ট জেবিয়ার্স্‌ বিদ্যালয়ে প্রবেশ	১৮৭৪ জানুয়ারি
'ঘরের পড়া' আরম্ভ	১৮৭৪ জুলাই
কুমারসম্ভব ও ম্যাকবেথ-অনুবাদ	১৮৭৪ শেষার্ধ
প্রথম গান প্রকাশ (পুরুবিক্রম নাটকে)	১৮৭৪ জুলাই
প্রথম কবিতা 'অভিলাষ' প্রকাশ (বেনামী) (তত্ত্ববোধিনী, ১৭৯৬ শক অগ্রহায়ণ) ···	১৮৭৪ নবেম্বর
হিন্দুমেলায় কবিতা আবৃত্তি	১৮৭৫ ফেব্রু ১১
স্বনামে প্রথম কবিতা প্রকাশ— 'হিন্দুমেলায় উপহার' (অমৃতবাজার পত্রিকা, ১২৮১ ফাল্গুন ১৪) ···	১৮৭৫ ফেব্রু ২৫
মাতৃবিয়োগ (১২৮১ ফাল্গুন ২৫)	১৮৭৫ মার্চ ৮
পলাশীর যুদ্ধ প্রকাশ	১৮৭৫
স্বপ্নপ্রয়াণ গ্রন্থ প্রকাশ	১৮৭৫
'প্রকৃতির খেদ' (তত্ত্ববোধিনী, ১৭৯৭ শক আষাঢ়)	১৮৭৫ জুন
'জ্বল্‌ জ্বল্‌ চিতা' গান (সরোজিনী নাটকে)	১৮৭৫ নবেম্বর

জ্ঞানাঙ্কুরে 'প্রলাপ' ও 'বনফুল' কাব্যের ক্রমিক প্রকাশ আরম্ভ

(১২৮২ অগ্রহায়ণ-সংখ্যা, প্রকাশিত ১৪ই ফাল্গুন) ··· ১৮৭৫ নবেম্বর

হিন্দুমেলায় দ্বিতীয় কবিতা পাঠ

(স্বপ্নময়ী নাটকের অন্তর্ভুক্ত, ১৮৮২) ··· ১৮৭৬ ডিসেম্বর

'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশ (১২৮৪ শ্রাবণ) এবং রবীন্দ্রনাথের

পূর্ণোদ্যমে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ ··· ১৮৭৭ জুলাই*

* এই প্রবন্ধরচনায় সাহায্য পেয়েছি এই বইগুলি থেকে— রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি', রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত-সংগ্রহ ১ম খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'রবীন্দ্রজীবনী' ১ম খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 'রবীন্দ্র-গ্রন্থপরিচয়', কালিদাস নাগ-লিখিত 'রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব' (প্রবাসী—১৩৪৯, ফাল্গুন) ইত্যাদি।—পিতার সঙ্গে হিমালয়ে অবস্থানকালে প্রক্টরের সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ থেকে অনেক বিষয় মহর্ষি রবীন্দ্রনাথকে মুখে মুখে বুঝিয়ে বল্‌তেন ; তিনি তা বাংলায় লিখে নিতেন। এখানেই তাঁর বাংলা গদ্য রচনার সূত্রপাত। সম্ভবত অন্যের দ্বারা সংশোধিত হয়ে এই লেখাগুলি তত্ত্ববোধিনীতে (১৭৯৫ শক, জ্যৈষ্ঠ থেকে মাঘ) প্রকাশিত হয়।—রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ১৮৭৬ সালে সেণ্টজেবিয়ার্সে যাওয়া বন্ধ করেন।

সংশোধন

৬০৫ পৃঃ ৩য় পংক্তিতে ১৩০৯ স্থলে ১৯০৯ পড়িতে হইবে

গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

"বিশ্বভারতী পত্রিকা"র পরিচালকবর্গের মতে আমাদের কাগজের আগামী বৈশাখ সংখ্যা রবীন্দ্র-কথায় পূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এবিষয়ে আমি তাঁদের সঙ্গে একমত।

"সবুজ পত্র" রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে প্রকাশিত হয়। তার বহুকাল পরে "বিশ্বভারতী পত্রিকা" তাঁর মৃত্যুদিনে প্রকাশিত হয়েছে। "সবুজ পত্রের" জের "বিশ্বভারতী" টানতে পারেনি— রবীন্দ্রনাথের অভাবে। বলা বাহুল্য "সবুজ পত্রের" মুখ্য লেখক ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের শতমুখী প্রতিভার বিষয়ে আজকাল বহু আলোচনা দেখতে পাই; তার সংখ্যা আমি বাড়াতে চাইনে। কিন্তু সমালোচক হিসেবে তাঁর চরিত্র ও মনের বিশেষ উল্লেখ বড় একটা দেখা যায় না।

বহুকাল পরে তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য' আবার পড়লুম। প'ড়ে আমার যা মনে হল সংক্ষেপে এখানে তাই বলতে চাই।

আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম আলোচ্য ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের প্রতি যে তাঁর অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল তার পরিচয় আমরা তাঁর "জীবনস্মৃতি"তেই পেয়েছি। বঙ্কিমের প্রতিভা নাকি তাঁর মুখাবয়বেই ফুটে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্রকে রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের "মরকতকুঞ্জে" একটি বিদ্বজ্জনসমাগমে প্রথম দেখেন। তাঁর চোখে বিশেষ ক'রে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রখরতা ও গাম্ভীর্য। এর বহুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আমি কখনো বঙ্কিমকে দেখেছি কি না। আমি বলি, আমি তাঁকে মধ্যে মধ্যে গাড়িতে দূর থেকে দেখেছি। তিনি এর পর বল্লেন, তুমি কি লক্ষ্য করেছ যে, বঙ্কিমের ছুরির মত নাক ও কাঁচির মত ঠোঁট?—বাংলায় একটা কথা আছে— বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। বঙ্কিম এই তর্কযুক্তির সাহায্যে তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ'ড়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় "আমাদের মতে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের নায়ক কৃষ্ণ নহেন, তার প্রধান অধিনায়ক স্বাধীন বুদ্ধি,

সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি।" বঙ্কিমের এই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। সমসাময়িক লেখকদের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা অত্যন্ত রূঢ়। ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ লেখক Anatole France তাঁর সমসাময়িক লেখকদের বহু সমালোচনা করেছেন, সেগুলি সংগ্রহ ক'রে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। সে বইখানি অতি সুখপাঠ্য। বঙ্কিমের উক্ত সমালোচনা কিন্তু সংগ্রহ করলে অপাঠ্য হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, সমালোচক হিসেবে তিনি খড়্গধারী ছিলেন। আমি বলি যে তাঁর সমালোচনা হচ্ছে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্য' Anatole France-এর সমালোচনার সমধর্মী। এ-সমালোচনায় লেখকের দোষগুণ দুয়েরই উল্লেখ আছে। দোষের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,— লেখক কেন প্রথম শ্রেণীর লেখক হননি তাই দেখাবার জন্য। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। বঙ্কিমের ভ্রাতা সঞ্জীব যে সুলেখক, তা রবীন্দ্রনাথই প্রথমে মুখ ফুটে বলেছেন। সঞ্জীবচন্দ্র যে অতি সুলেখক, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা অপেক্ষা সঞ্জীবের ভাষা আরও ভাল। তাঁর ভাষার Syntax ঢের বেশি মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ।

রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ ভ্রমণকাহিনীর সৌন্দর্যের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে লেখক হিসেবে সঞ্জীব ধনী, কিন্তু গৃহিণী নন্; যে সব গুণের সদ্ভাবে লেখক বড় সাহিত্যিক হয়, সঞ্জীবের সে সবই ছিল কিন্তু তিনি সাজিয়ে গুছিয়ে কিছুই লেখেন নি। এখানে তিনি একটু ভুল করেছেন। সঞ্জীবচন্দ্রের masterpiece জাল প্রতাপচাঁদ অত্যন্ত গুছিয়ে লেখা। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার উল্লেখ করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর সকল কথায় আমি সায় দিই। সঞ্জীবের নভেলগুলি কিছুই নয়, এ কারণে তিনি পাঠকসমাজে অনাদৃত। তাঁর গল্পও কিম্ভূতকিমাকার, কিন্তু তাঁর ভাষা ভারি নয়। বিহারীলাল চক্রবর্তী বড় কবি নন্ কিন্তু তিনি কবি। তাঁর রচনা সেকালের অন্যান্য কবিতাকারদের মত মিলনান্ত পদ্যমাত্র নয়। তা রবীন্দ্রনাথ কৈশোরেই উপলব্ধি করেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ যে বিহারী-লালের নিকট কতক অংশে ঋণী তাও তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

"রবীন্দ্রনাথ যখন উক্ত প্রবন্ধ প্রথম লেখেন, তখন বিহারীলালের কবিতা সম্পূর্ণ

উপেক্ষিত ছিল, আজও তাই রয়েছে। এর কারণ বাঙালীরা কবিতা কাকে বলে তা জানতেন না। আমি যখন প্রথম দারজিলিং যাই, তখন শিলিগুড়িতে হিমালয়ের বিরাট রূপ দেখে অবাক হয়ে যাই, এবং আমার মুখ থেকে বিহারীলালের ক'ছত্র বেরিয়ে পড়ে। সে যাই হোক, উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গুরু-ঋণ পরিশোধ করেছেন।

আর একখানি বইয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরিচয় করিয়েছেন,—শ্রীমতী শরৎকুমারীর "শুভবিবাহ"। চমৎকার লেখা। কলকাতার ধনী কায়স্থ সমাজের একটি অবিকল চিত্র। একাধারে সত্য এবং চতুরতায় উদ্ভাসিত। এ বইখানি মেয়ের লেখা, এবং স্ত্রীলোক ছাড়া আর কেউ এ পুস্তক লিখতেও পারেন না। আমাদের পুরুষদের অত খুঁটিনাটির চোখ নেই, সে চোখ ছিল হুতোম পেঁচার, আর ছিল রবীন্দ্রনাথের।

সঞ্জীবচন্দ্র ও বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, এবং শ্রীমতী শরৎকুমারী বোধহয় তাঁর সমবয়সী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক কনিষ্ঠ সাহিত্যিকদের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আর্য্যগাথা', 'আষাঢ়ে' ও 'মন্দ্র' তিনি সমালোচনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার যা প্রধান গুণ সেই humour-কেও যে কবিতার পর্য্যায়ে তোলা যায়, এ সত্য রবীন্দ্রনাথের চোখ এড়িয়ে যায় নি। 'হাসির গানে'র তারিফ তিনি প্রথম থেকেই করেছেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয় মৈত্রেয়ের সিরাজদ্দৌলা সর্বপ্রথম তাঁরই চোখে পড়ে। এ-সব লেখককে বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত উপেক্ষা করতেন। সমাজ যে-ভাবে গ'ড়ে উঠেছে, তাতে ভদ্রতা বলে একটি গুণ সর্ব্বজনমান্য ও প্রিয় হয়ে পড়েছে। সাহিত্যে এ সামাজিক গুণের অভাব মোটেই প্রীতিকর নয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর হাকিমী মেজাজ নিয়ে সমসাময়িক লেখকদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেন নি। রবীন্দ্রনাথের লেখায় এ সামাজিক গুণ প্রকট।

ফরাসী গদ্যসাহিত্য যে য়ুরোপে এত প্রসিদ্ধ, তার একটি কারণ বোধ হয় এই যে, সে সাহিত্য এই সামাজিক গুণে বঞ্চিত নয়। অপর পক্ষে ইংরাজী সমালোচনা-সাহিত্য অনেক সময় চোয়াড়ে। রবীন্দ্রনাথ সামাজিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন ক'রে বোধ হয় কখনো সমালোচনা করেন নি। অবশ্য তাঁকে কেউ 'যুদ্ধং দেহি' বললে তিনি তাকে বেয়োকুফ্ বানিয়ে ছেড়ে দিতেন।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

প্রথম বর্ষ একাদশ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০

বিশ্বভারতী

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

(১)

বর্তমান কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে জ্ঞান, বিদ্যা ও সভ্যতার যে আদান প্রদান, সে পরিমাণের কিছু পূর্বকালে কখনো ছিল না। কিন্তু মানুষের এই মানসিক চেষ্টার মধ্যে কেবল একটিমাত্র বিদ্যা দেশ ও জাতির গণ্ডি সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। যাকে সংক্ষেপে বলা যায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বিদ্যার সেই ক্ষেত্রে কর্মীরা সহকর্মীর কাজের গুণাগুণমাত্র বিচার করে। সে কোন্ জাতির লোক, তার গায়ের চামড়ার কি রং,— এ প্রশ্ন অবান্তর। এ বিদ্যা দেশভেদে ভিন্ন নয়, একটিমাত্র বিদ্যার ধারা সমস্ত মানব-সাধারণ। একে বুদ্ধি বা ব্যবহারের ক্ষমতা যার আছে, তার কাছেই এ উন্মুক্ত। মানুষের মন ও বুদ্ধির অন্য যে সব সৃষ্টি, যাদের বলে সাহিত্য, কলা, দর্শন, এমন কি নানা বিজ্ঞান নামেও যারা চলে,— তাদের সম্বন্ধে এমন কথা বলা চলে না। এ সব ক্ষেত্রে দেশ ও জাতি পৃথিবীর মানুষকে গণ্ডি এঁকে ভাগ ক'রে রেখেছে।

এক দেশ ও জাতির মধ্যে প্রতিভার যে সৃষ্টি, সকল দেশ ও জাতি তাকে মানুষের সাধারণ সম্পত্তি জেনে সাদরে গ্রহণ করে না, যেমন করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সকল আবিষ্কারকে। এখানে জ্ঞানী ও গুণীরা স্বদেশী বামনকে বিদেশী অতিকায়ের চেয়ে উঁচু মনে করে। যে সব বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানাভাস মানুষের মন ও সভ্যতা নিয়ে কারবার করে, তার অনেক কর্মী জাতির গর্বে ও সংস্কারের মোহে এমন সত্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অসম্ভব।

এ প্রভেদ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের মনের সহজাত ঔদার্যগুণের ফল নয়। বুদ্ধির যে গড়ন মানুষকে বিজ্ঞান অনুশীলনে প্ররোচনা দেয়, মনের সংস্কার-মুক্ত ঔদার্যের সঙ্গে তার কোনও স্বভাবিক যোগ নেই। এ প্রভেদের মূলে রয়েছে যে জ্ঞান, এ-বিজ্ঞান-বিদ্যার লক্ষ্য তার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। এ জ্ঞানের সত্যাসত্য প্রত্যক্ষ নির্ণয় করা চলে, অথবা গণিতের অঙ্কপাতে পরীক্ষা করা যায়। অর্থাৎ এর বিচারের মাপকাঠি প্রায় সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক। সুতরাং সত্য যেখান থেকেই আসুক, তাকে গ্রাহ্য না ক'রে উপায় নেই। দেশ ও জাতির গর্বে তাকে অনাদর করা চলে না। নিজের যা আছে তাকেই পরের সব-কিছু থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করার আত্মতৃপ্তি এখানে মারাত্মক। কারণ সে রকম আত্মতৃপ্ত কর্মীকে দৃশ্যতই পিছনে ফেলে বিজ্ঞানবিদ্যা চলবে এগিয়ে। যে সত্য প্রত্যক্ষ করা যায়, বা যা বাদ-প্রতিবাদের অতীত পরীক্ষায় টেঁকে— একমাত্র তাকে ছাড়া আর কোনও কিছুকে মর্যাদা দিলে এখানে কাজ অচল হয়। ফাঁকি ধরা পড়তে বিলম্ব হয় না। এ কথা সত্য যে, এই অলঙ্ঘ্য নিয়মের মধ্যে কাজের অভ্যাসে বিজ্ঞানীদের বুদ্ধিবৃত্তিতে যে অকৈতবত্ব ও বিশ্বজনীনত্ব আসে, অন্য কোথাও তার তুলনা নেই। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, এ মনোভাব বেশির ভাগ বৈজ্ঞানিকের নিজের বিশেষ ক্ষেত্রে কাজের অপরিহার্য কৌশলমাত্র। সে গণ্ডির বাইরে অন্য বিষয় সম্বন্ধে মনের প্রসার কি ঔদার্য এ থেকে সূচিত হয় না। এবং বিজ্ঞানের স্ব-ক্ষেত্রেও এই সত্যনিষ্ঠ উদারতা বিজ্ঞানীদের মন শ্রেয় ব'লে স্বীকার করে, অথবা ফললাভের অবর্জনীয় উপায়বোধে মেনে নিতে বাধ্য হয়, তার এখনও পরীক্ষা হয় নাই। আধুনিক বিজ্ঞানের যারা কর্মী তারা প্রায় সকলেই ইউরোপের শ্বেতজাতিসমূহের লোক, অথবা পৃথিবীর অন্যস্থানবাসী ঐ জাতিগুলির শাখা-প্রশাখার লোক। এই শ্বেতজাতি তাদের নিজেদের

ও তাদের সভ্যতাকে পৃথিবীর অন্য সব অশ্বেতজাতি ও তাদের সভ্যতা থেকে বিভিন্ন মনে করে। এই ভিন্নতা-জ্ঞান মোটামুটি এক সভ্যতার এই লোকদের স্বাজাত্যবোধকে দৃঢ় করেছে। সুতরাং বিজ্ঞানের কর্মীদের পরস্পরের প্রতি এই উদারতা সগোত্রের মধ্যে উদারতা— যা খুব কঠিন নয়। অশ্বেতজাতি-গুলির মধ্যে বিজ্ঞানের কর্মীর সংখ্যা এখনও তুলনায় অতি সামান্য। এই অল্পসংখ্যক অসগোত্র কর্মীদের প্রতি ঔদার্যবোধ কঠিন কাজ নয়, আর তার মধ্যে অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্বের একটা আত্মপ্রসাদও আছে। এ অবস্থার যদি বদল হয়, যদি অশ্বেতজাতিগুলির বিজ্ঞানীর সংখ্যা ও তাদের কাজের গুরুত্ব ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের সংখ্যা ও কাজের গুরুত্বের কাছাকাছি আসে বা ছাড়িয়ে যায়, এবং যদি তখনও ইউরোপের বর্তমান রাষ্ট্রিক ও ধনতান্ত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব বহাল থাকে,— তবে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের মনোভাবে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, সে ভবিষ্যদ্বাণী করতে ভরসা হয় না।

সভ্যতা ও কৃষ্টির নানা ক্ষেত্রে মানবজাতিসাধারণের মমত্ববোধের এই অভাবের কারণ সহজেই বোঝা যায়। কবিতা ও সাহিত্য, সংস্কৃত আলংকারিকদের সুকল্পিত পরিভাষায় যার নাম কাব্য, সেখানে ভাষাভেদ জাতিতে জাতিতে গণ্ডিভেদের একটা স্বাভাবিক হেতু। কারণ ভাষা কাব্যের বাহনমাত্র নয়, তার রক্তমাংস। এখানে ভাব ও তার প্রকাশ দুই ভিন্ন জিনিস নয়, এক অখণ্ড বস্তু। এদের ভিন্ন ক'রে দেখতে হয় বুদ্ধির ব্যবহারিক প্রয়োজনে। কিন্তু দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তা, নীতি ও ধর্মের চরমতত্ত্বের বোধ— যা নানা দেশ ও নানা কালের জ্ঞানী ও ঋষিরা চিন্তা ও ধারণা করেছেন, —ভাষায় প্রকাশ হ'লেও মূলত তা ভাষা-নিরপেক্ষ। সংগীত ও চিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য,— শুদ্ধ সুর ও রূপে মানুষের আনন্দের যে প্রকাশ, মোটের উপর তা বিশ্বজনীন। সে আনন্দের অনুভূতির ক্ষমতা যাদের আছে, ভিন্ন কাল ও দেশের প্রকাশ-ভঙ্গীর ভিন্নত্ব সে অনুভূতির কোনও প্রকৃত বাধা নয়। এবং কাব্যের মধ্যেও যেগুলি চরম সৃষ্টি, ভাষান্তরে তাদের শ্রেষ্ঠত্ববোধ লোপ হয় না। যে ভাষায় তাদের সৃষ্টি সে ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্যের তারা চূড়ান্ত নিদর্শন; কিন্তু ভাষার এই সব আশ্চর্য প্রকাশ আশ্চর্য উপায়ে ভাষাকে অতিক্রম ক'রে যায়।

সভ্যতার অতি মহান সৃষ্টিগুলিও সকল জাতির মানুষ যে নিজেদের সাধারণ সম্পদ ব'লে গ্রহণ করে না, তার শেষ কারণ অবশ্য অজ্ঞতা। কিন্তু এই অজ্ঞতার মূলে আছে উপেক্ষা; জাতিগত অন্ধসংস্কার ও গর্ব মনে আত্মতুষ্টির যে অচলায়তন সৃষ্টি করে, তাতে যার প্রতিষ্ঠা। এই পাথরের প্রাচীর থেকে একমাত্র জ্ঞানই অবশ্য মনকে মুক্তি দিতে পারে, বৌদ্ধেরা যাকে বলেন সম্যক জ্ঞান। কিন্তু সে জ্ঞানের স্পৃহা মনে জাগে না, যদি মানুষ মাত্রের সৃষ্টির প্রতি অন্তরে শ্রদ্ধা না থাকে। আবার যে শ্রদ্ধার ভিত্তি জ্ঞান নয়, তারও মূল্য নেই। প্রতিভার এ সব সৃষ্টি বিশেষ কালে বিশেষ জাতির মধ্যেই হয়; কিন্তু এর চেয়ে সত্য আর কী আছে যে সেগুলি সকল মানুষের সাধারণ সম্পদ, জাতিবিশেষের ঘরোয়া সম্পত্তি নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের বড় ব্যবহারিক আবিষ্কারগুলিকে যদি কোনও জাতির লোক অগ্রাহ্য ক'রে কাজে না লাগায় এই ব'লে যে, তারা বিদেশীর আবিষ্কার,— এবং অধিকাংশ স্থলেই তা হবে বিদেশীর আবিষ্কার,— তবে সে জাতি যে নিজেকেই বঞ্চিত করবে, তাতে কেউ সন্দেহ করে না। কিন্তু মানুষের সৃষ্টির অন্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই মানুষ চিরকাল নিজেকে এমনি ধারা বঞ্চিত ক'রে আসছে, ক্ষতির কোনও ভাব মনের কোণেও পোষণ না ক'রে। যদিও সে ক্ষতি ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে কাজে না লাগানের চেয়ে অন্তরতর ক্ষতি, মানুষের মন তার শরীরের চেয়ে যতটা অন্তরতর। পূর্বতনকালের সাফাই আছে যে, জ্ঞানের এ পরিধি বিস্তারের উপায় ও উপকরণের তখন অভাব ছিল। কিন্তু বর্তমানের সে সাফাই নেই। দেশ ও কালের ব্যবধান ঘুচিয়ে আমরা যে সমস্ত পৃথিবীকে এক করেছি, এ গর্ব হবে অতি করুণ পরিহাস, যদি এ সুবিধার সুযোগ কেবল তারাই নিতে পারে যাদের লক্ষ্য নিজের সুখ-সুবিধায় ও ক্ষমতালাভের মত্ততায় সমস্ত পৃথিবীকে করায়ত্ত করা। আধুনিক বিজ্ঞান যে বাহ্যিক সুবিধার সৃষ্টি ক'রেছে, তার মধ্যে রয়েছে: পৃথিবীর সমস্ত জাতির ভাব ও চিন্তার এক অভূতপূর্ব রেনেসাঁসের সম্ভাবনা। সে রেনেসাঁসের প্রেরণা আসবে দুটি একটি সভ্যতার সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয়ে নয়; প্রাচীন ও আধুনিক সকল মানুষের সভ্যতার বড় বড় সৃষ্টিগুলি তার প্রেরণা জোগাবে। এ সম্ভাবনাকে সফল হ'তে দিচ্ছে না প্রতি জাতির জাতীয় অহমিকা। নিজের পরিচিত ও অভ্যস্ত সভ্যতাকে

কেবল সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা নয়, অন্য বিজাতীয় সভ্যতার যে দেবার মতো কিছু নেই, এই দৃঢ় বিশ্বাস। এই অশ্রদ্ধা থেকে আসে অজ্ঞতা, আর অজ্ঞতার ফল অশ্রদ্ধা।

(২)

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর কল্পনা এমন এক প্রতিষ্ঠানের কল্পনা, যেখানে বর্ণজাতি-নির্বিশেষে বিশ্বমানবের প্রতিভার মহান সৃষ্টিগুলি পরস্পরের সঙ্গে সশ্রদ্ধ পরিচয়ে পরিচিত হবে। 'হিউম্যানিটিস্' থাকবে না 'হোয়াইট-ম্যানিটিস্',— সকল মানুষের সভ্যতার রামধনুর রঙ তাকে রঞ্জিত করবে।

• এমন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা হবার যোগ্যতা রবীন্দ্রনাথের ছিল অসামান্য। তিনি ছিলেন মহাকবি, যাঁর কাব্যের কল্পনা বাস্তবের অস্তিত্ব মাত্রের চেয়ে বড়ো সত্য। মানুষের উপর তাঁর ভালবাসা ছিল যেমন উদার তেমনি গভীর। মানুষের মধ্যে যা কিছু বড়, মনে কি চরিত্রে, যে দেশে হোক যে জাতিতে হোক, তাঁর অকৈতব প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। যে সব জাতি সামরিক বলে ও বিত্তার্জনের কৌশলে পৃথিবীর দুর্বল ও অপটু জাতিগুলির উপর আধিপত্য করছে, এমন কোনও জাতির মধ্যে তাঁর জন্ম হয় নি। তিনি জন্মেছিলেন এই আধিপত্যের চাপে পীড়িত এক প্রাচীন সভ্য জাতির মধ্যে। নিজের জাতির শক্তির প্রাবল্য ও সম্পদের আতিশয্য সে জাতির শ্রেষ্ঠলোকদেরও মগ্নচৈতন্যকে আবিষ্ট ক'রে তাদের মনকে যে আশ্চর্য রকমে নানা আকারের নিষ্ঠুরতার অনুভূতিহীন করে, বহু মহত্ত্বের প্রতি অন্ধ করে, রবীন্দ্রনাথে তা সম্ভব ছিল না। এ নিষ্ঠুরতা ও অন্ধতার ভীষণ চেহারা হিট্‌লারিজমের আয়নায় চোখে দেখে ইউরোপের অনেক প্রবল জাতি চম্‌কে উঠেছে। কিন্তু যে বর্ণবৈষম্যের গর্ব দুর্বল অশ্বেতজাতিগুলির প্রতি প্রবল শ্বেতজাতির ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে, হিট্‌লারিজম্ অন্য ইউরোপীয় জাতিগুলির উপর এক ইউরোপীয় জাতির সেই নীতির প্রয়োগ। জর্মান হিট্‌লারিজম্ হোয়াইট্ হিট্‌লারিজমের ইউরোপীয় সংস্করণ মাত্র। এই অন্ধ হৃদয়হীনতার শল্য যে কত তীক্ষ্ণ, রবীন্দ্রনাথের অন্তরের অন্তস্তল তা ভাল ক'রেই অনুভব

করেছিল। কিন্তু তাঁর মহাপ্রতিভার স্বচ্ছ দৃষ্টি, সকল মানুষে তাঁর মৈত্রী বিতৃষ্ণার বিমুখতাকে জয় করেছিল। ইউরোপ যেখানে বড়,— তার বাধামুক্ত সচল বুদ্ধি, সামাজিক মঙ্গলে কর্মোদ্যমের আদর্শ— তাঁর মনের পূর্ণ সায় পেয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের বড় আবিষ্কার ও তত্ত্বগুলি তাঁর কল্পনাকুশল কবি-মনকে নাড়া দিয়েছে। মানুষের লোভ ও নিষ্ঠুরতায় বিজ্ঞানের দাসত্বের তাঁর চেয়ে কঠোর সমালোচক কেউ ছিল না। কিন্তু মানুষের মঙ্গলে বিজ্ঞানের প্রয়োগের বহুমুখী ফল ও সম্ভাবনার দিকে তাঁর দৃষ্টি কখন আচ্ছন্ন হয় নি। তাঁর মহর্ষি পিতার কাছে দেশের প্রাচীন অধ্যাত্মবিদ্যার যে দীক্ষা তিনি পেয়েছিলেন তাতে কোনও আপাত-প্রবল ও আপাত-রম্য ভাব কি কর্ম তাঁকে টলাতে পারতো না। বিদেশী কি দেশী রাঙতাকে সোনা ব'লে ভুল করার সম্ভাবনা তাঁর ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মন ছিল বিচিত্রকল্পনাবিলাসী মহাকবির মন। কিন্তু মানুষের সঙ্গে সাংসারিক কাজে অনভ্যস্তের অপটুতা তাঁর ছিল না। তাঁর পিতা বিস্তীর্ণ জমিদারি পরিদর্শনের যে ভার তাঁকে দিয়েছিলেন, যৌবনের সে শিক্ষা কল্পনাকে বাস্তবে গ'ড়ে তোলার কৌশল আয়ত্তে তাঁর কাজে লেগেছিল।

বিশ্বভারতীর কল্পনা ও প্রতিষ্ঠা এমন লোকেই সম্ভব। যে লোকের বিশ্ব অতলান্তিক ও ভূমধ্যসাগরের চার পাশে আবদ্ধ নয়, হিমালয় ও সেতুবন্ধের মধ্যে যা আছে তাতেই নিঃশেষ নয়। একটি কবিতায় তিনি বলেছেন সকল মানুষের ঘরে তাঁর ঘর আছে, তিনি সেই ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এটি কাব্যের অতিশয়োক্তি নয় ; রবীন্দ্রনাথের মনের যথার্থ ছবি।

(৩)

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী পৃথিবীর সকল দেশের প্রাচীন ও চলতি সভ্যতার প্রত্নতত্ত্ব কি তথ্যসংগ্রহ নয়। প্রত্নতত্ত্ব ও তথ্যসংগ্রহের মূল্য অনেক। কিন্তু সে কাজ বিশ্বভারতীর কাজের আদর্শ নয়। মনের যে কৌতূহল সব দেশের সব জাতির খুঁটিনাটি জানতে চায়, সে পাণ্ডিত্যের ফল জ্ঞানের জন্য হয়ত অপরিহার্য ; কিন্তু সে চর্চা বিশ্বভারতীর কাজের উপায় মাত্র— লক্ষ্য

নয়। বিশ্বভারতীর আদর্শ সভ্যতার মহৎ সৃষ্টিগুলির মধ্য দিয়ে সকল সভ্যতার অন্তরের পরিচয় ও স্পর্শলাভ। যে পরিচয় ও স্পর্শ মানুষের মনের সঙ্গে মানুষের মনের পরিচয় ও স্পর্শ; শুধু জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক নয়। কিন্তু সে পরিচয় মোহহীন বিচারবুদ্ধির পরিচয়। যে ভক্তি দরদী মন সব কিছুকেই 'ভে-রি ইণ্টারেস্টিং' কল্পনায় মুকুলিতচক্ষু হয় সে এখানে পরদেশী। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর আদর্শ শ্রদ্ধাহীন জ্ঞানও নয়, অজ্ঞান ভাবাতিশয্যও নয়।

সকল সভ্যতার সৃষ্টি ও চিন্তার সঙ্গে পরিচয়ের উদ্দেশ্য নয় সব থেকে কিছু কিছু নিয়ে জোড়াতালির 'একলেক্‌টিক্' সৃষ্টি ও চিন্তা বিশ্বসভ্যতা নাম দিয়ে গ'ড়ে তোলা। তিলে তিলে তিলোত্তমা বাহ্য-আকারভক্ত সুন্দ-উপসুন্দদের মনে বিভ্রম জন্মাতে পারে, কিন্তু নূতন সৃষ্টির সে জননী নয়। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর কল্পনা জীবন্ত বীজের কল্পনা, সৃষ্টির প্রাণ-শক্তিতে যা ভরপুর। যা প্রতি সভ্যতাকে সকল সভ্যতার রসে ও আলোতে অচিন্ত্যপূর্ব নূতন সৃষ্টিতে উদ্‌বুদ্ধ করবে। সকল সভ্যতাকে সব সভ্যতার চাপে জীবনহীন পিণ্ডাকৃতি করবে না। বিশ্বভারতীর আদর্শ "বহুরে যা এক করে", কিন্তু সেই সঙ্গে "বিচিত্ররে করে যা সরস"। এক ও বহুর এই বিচিত্র লীলার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবন। তিনি তাঁর জীবন ও তাঁর আদর্শে কল্পিত প্রতিষ্ঠান সকল মানুষকে দান ক'রে গেছেন। মানুষ সে দান গ্রহণের উপযুক্ত হোক।

হাতে খড়ি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাসি, তুমি তো চমৎকার ছবি আঁকতে জানো ? কার কাছে শিখেছিলে আঁকতে, নন্দদার কাছে, না মুকুল দের কাছে, অসিত বাবুর কাছে না দেবী বাবুর কাছে ?

অবু, আমার আঁকা ছবি তুমি দেখ্‌লে কোথায় ?

যদি না ধমকাও তো বলি।

বলে ফেল, ধমকাবো না।

চাংড়া দিদি দেখিয়েছে ঠাকুর ঘরে কুলুঙ্গিতে একটি টিনের বাক্সের মধ্যে তোলা ছিল লাল সুতোয় বাঁধা সোনার তাবিচ। তার মধ্যে কাচের ঢাকন দেওয়া দুটি মুখ— একজন বাঁশি বাজাচ্ছে আর একজন চেয়ে দেখ্‌ছে তার দিকে।

অবু, সে ছবি দেখেছো তুমি !

চাংড়া দিদি ঢাকন খুলে দেখালে তাই তো দেখ্‌লুম ; বল্লে এ তোমার মাসির মা বাপের ছবি, ছেলেবেলায় তুমি এঁকেছিলে। বলো না মাসি কে তোমায় আঁকতে শিখিয়েছিল।

চাংড়া দিদিকে শুধোলে না কেন অবু ? বলে দিতেন যিনি শিখিয়েছিলেন তাঁর নাম।

তুমি বলো না।

না অবু, গুরুজনের নাম মনে মনে জপ করতে হয়, মুখ ফুটে বল্‌তে নেই।

আচ্ছা চাংড়া দিদিকে শুধিয়ে জান্‌বো।

শোন অবু, ছবি আঁকা যদি শিখ্‌তে চাও নন্দদার কাছে, কি অসিতবাবুর কাছে, কি মুকুল দের কাছে শিখ্‌তে যেতে চাও তো বল আমি পত্তর দিয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দেবো বিশ্বভারতীতে, নন্দদা ছবি আঁকতে শেখান খুব ভাল।

না মাসি, তোমাকে যিনি শিখিয়েছিলেন তাঁকে পাই তো তাঁরি কাছে শিখি।

তিনি যে অনেক দূরে গেছেন অনেক দিন হল, এখন আমার কাছে শিখবি অবু ?

শেখাও তো শিখি মাসি।

তবে চাঁই বুড়োকে বল্‌গা একটা ভালো দিন দেখ্‌তে। তোর হাতে খড়ি দিতে হবে।

ওরে বাবা ও মাসি আবার হাতে খড়ি ক, খ এই সব লিখে আরম্ভ কর্‌তে হবে ?

তা হবে না অবু ? ছবিও যে লেখার সামিল।

থাক্ মাসি, তুমি তোমার ছবি লিখ্‌তে শেখার গল্প বলো আমি শুনি। সেলেট, পেন্‌সিল, খড়ি, তক্তি, কাগজ কলম এসব হাতে নিলেই আমার ঘুম পায়।

তবে চুপ করে বসে শোন্‌না বলি— দেখ্ অবু, আমাকে যে সবাই মাসি বলে ডাকে তার কারণ হচ্ছে আমার ডাক নাম ছিল পূর্ণমাসি। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সবাই আমাকে মাসিই বলে আস্‌ছে। বাবা তখন নেই, মা আছেন। তোমার বয়সে একদিন মা বল্লেন, পূর্ণমাসি, শোন্, আমার একটি কথা রাখ্‌বি ? আমি হাঁ না কিছুই বলিনে দেখে মা বলে চল্লেন :

জানিস্ ছোটবেলায় তুই ছবি দেখ্‌তে চাইতিস্। বাইরের ঘরে একটা কি জানি কি কল ছিল তাতে চোখ দিয়ে বস্‌লে কত দেশ বিদেশের ঘরবাড়ি বাগান সব রঙিন ছবির মতো দেখা যেত। সে একদিনের কথা সেই কল নিয়ে তোকে নাড়াচাড়া কর্‌তে দেখে তোকে ভারি ধমকাই। দস্যি মেয়ে বলে পিঠে কিল বসিয়ে, অন্দরে বন্ধ করি। সেই থেকে তোর মুখ দেখ্‌লেই কে যেন আমার মনে এসে ঘা দিয়ে বলে, ওকে ছবি আঁকা শেখানো চাই তোমার। কে এ কথা বলে তা বুঝিনে— অবোধ নারী। বেঁচে থাক্‌তে তিনিও এই কথাই বলতেন। হয়তো এ তাঁরি হুকুম, আসে যায় এখনো, কে জানে। পূর্ণমাসি, বল্ তুই ছবি আঁকা শিখ্‌বি ? —শিখবো, মা।

মাসি, তুমি যে ছোটো মাসি বনলতার কথা বল্‌তে বল্‌তে সেদিন বল্লে তোমার নাম ছিল্ দামিনী ?

অ, অবু, সেইটে বুঝি তুমি মনে করে রেখেছো! শোনো তবে বলি সে যে কাণ্ড হয়েছিল। বিয়ের রাতে ঐ পূর্ণমাসি নাম নিয়ে মন্ত্র পড়্‌তে গিয়ে আমার বর বেঁকে বসলেন, আমি মাসি বলে একে ডাক্‌তে পার্‌বো না। পূর্ণমাসি নামটা যেন মাসি মাসি শোনায়। সেই রাত্রেই আমার নূতন নাম দামিনী দিয়ে বাপ আমাকে সম্প্রদান করেন।

এমন? আচ্ছা বলে যাও মাসি।

মা বিলাসী দাসীকে ডেকে বল্লেন চৈতনকে বল, তস্‌বির কামরা খুলিয়ে ঝাড় পোঁচ করিয়ে রাখে, আমি সে ঘরে পূর্ণমাসিকে নিয়ে ছবি দেখাবো। আমি বল্লেম, মা, ছবি লিখ্‌তে শেখাবে যে সে থাক্‌বে না? মা বললেন পরে আস্‌বে শিক্ষক, আগে নিজে নিজে দেখে শিখ্‌বে, তার পরে অন্যের কাছে বিদ্যে নিতে যাবে—

আমারও ঐ মত, মাসি, তার পর?

তার পর তো মায়ের সঙ্গে সঙ্গে বৈকাল উৎরে সাজগোজ করে ছবির ঘরে গেলেম। পুরোনো বাড়ির সে ঘর তো তুমি দেখোনি অবু—

দেখেছি বই কি মাসি, সেই বাড়ির দখিন ধারে লম্বা ঘর — না উত্তর ধারে!

না তাও না, পশ্চিম বারান্দার ঠিক সামনে!

সে তো আমাদের পড়্‌বার ঘর ছিল! তাহ'লে আমি দেখিনি মাসি, তুমি বলো।

সে ঘর ছিল যেখানে, সেখানটা হয়ে গেছে এখন লোপ, খালি আছে একখানা ভাঙা কপাট, ইঁটখসা একটুখানি দেয়ালে ঝুলে।

দেখেছি মাসি, আমি সে জায়গা দেখেছি মনে হচ্ছে। ঠাকুর ঘরে ওঠবার সিঁড়ির গায়েই এতটুকু একটি কুলুঙ্গি, তাতে আঁটা একটা কুলুপ-দেওয়া দরোজা। হরিদাসী তার মধ্যে ঘুঁটে জমা কর্‌তো।

না, অবু, না, আমার মায়ের বাপের বাড়িতে তুমি দেখোনি অবু।

জয়নগরের বাড়ি দেখেছি আমি। থেকেছি সেখানে, জন্মেছি সেখানে, তুমিই ভুলে গেছ মাসি!

জয়নগরের বাড়ি তো আমার মায়ের বাড়ি নয় অবু, সেটা তাঁর শশুর বাড়ি।

তবে মাসি। আমার মায়ের বাপের বাড়ি ছিল ফুলতলায় রায়দিঘির পাড়ে। এখনো আছে সেটা ভাঙাচোরা অবস্থায় ঝাড়ে জঙ্গলে ঘেরা। তাহ'লে আর কেমন করে দেখ্‌বো মাসি।

হাঁ, তাই বল্‌ছিলেম কি সেই পুরানো বাড়ির পুরানো ছবির ঘর, তার দেয়ালে ছবি, ছাতে ছবি, মেঝেতে ছবি আনাচে কানাচে যেদিকে চাই, যেদিকে যাই সেদিকে ছবি ছিল। সেই ঘরের চাবি আমার হাতে দিয়ে মা বল্লেন, এই ঘর রইলো তোমার। এই চাবি, এই রংএর বাক্স, তুলি, ছবি আঁক্‌বার যা কিছু দরকার, পাবে। এই আমি এখন দায় খালাস হয়ে কাশীবাস করিগে যাই।

কাশীবাস কি মাসি?

তা কী জানি অবু।

আমি জানি মাসি। চৈতন বারুইকে চন্দর কবিরাজ বলেছিল, চৈতন দিন থাকৃতে কাশীবাস করোগে। সেই দিনই পানের বোরজে আগুন ধরিয়ে চলে গেল, আর আসে না। দেখি তার বৌ চন্দর কবিরাজকে ধরে পড়্‌লো। কাশীতে চৈতনের খোঁজ করার খরচা আদায় করে ছাড়ে আর কি। এমন সময় বারুই এসে উপস্থিত কাশী থেকে— দিব্বি হিরিষ্টু পুষ্টু হয়ে। কাশীবাস কর্‌তে গিয়ে লোক প্রায় ফেরে না, ওই একটি মানুষকে দেখেছিলেম ফির্‌তে।

তবে চৈতন কি করে ফির্‌ল অবু?

সে এসে বলেছিল সবাইকে— নন্দি ভিরিঙ্গি তাকে ষাঁড়ে চাপিয়ে কৈলেসে সিংগির খোরাক জোগাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। মা অন্নপূর্ণার মন্দিরে কিছুকাল কলাভোগ খেয়ে গায়ে যখন বল পেলে তখন রাতারাতি গঙ্গা সাঁৎরে উঠলো গিয়ে বলরামপুরের রাজার বাড়ি। সেখানে দ্বারপালকে কুস্তিতে হারিয়ে বাহবা নিয়ে ফিরেছে দেশে চন্দর কবিরাজকে হাতের কসরৎ দেখাতে।

তারপর কি হলো অবু— চন্দর কব্‌রেজের?

তা জানিনে মাসি। শুনেছি ঐ একটি মানুষ কাশীবাস কর্‌তে গিয়ে ফিরেছে, আর কেউ ফেরেনি। তোমার মা তোমাকে ছবি ঘরের চাবি

দিয়ে ভুলিয়ে কাশীবাস করতে গেলেন, তুমি এমন যে বুঝতেই পারলে না।

তোর কথাই ঠিক, অবু, আজ বুঝতে পারছি। আজ এইখানে গল্প থাক কাল শুনো কেমন?

তাই হবে মাসি।

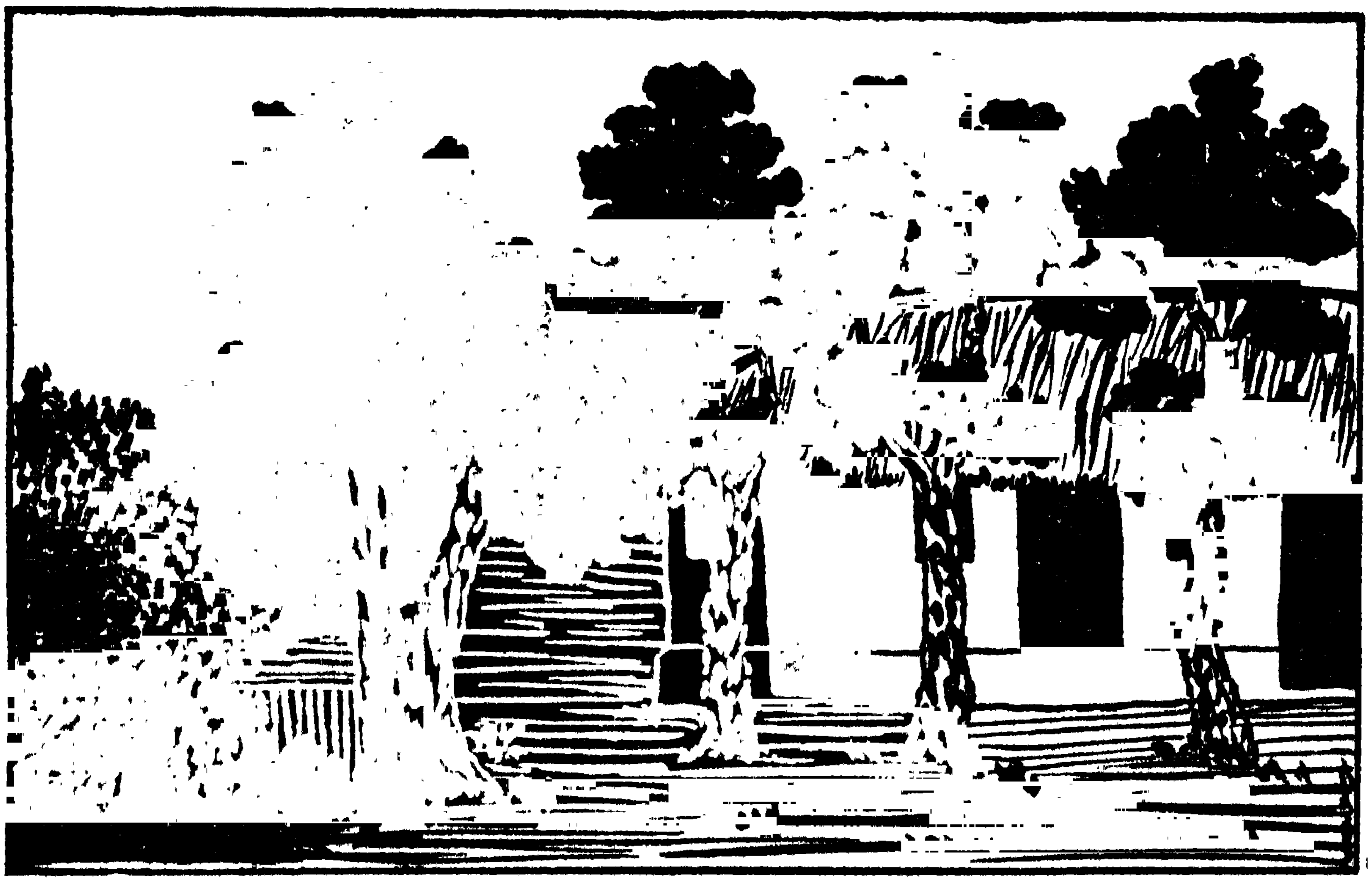

"আইভারি টাওয়ার"

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

প্রশান্ত,

ভারতবর্ষ যেমন মানব-সভ্যতাকে চারটি যুগে ভাগ করেছিল— সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি— ইয়োরোপের মনীষীরা তেমনি মানব-সভ্যতা নানা যুগে ভাগ করেছেন, যেমন প্রস্তর যুগ তাম্র যুগ ইত্যাদি— তাঁদের মুখ থেকে হয়তো আরো কোনো নতুন যুগের নামকরণ শোনা যাবে। ভারতবর্ষ ও ইয়োরোপের পক্ষ থেকে মানব-সভ্যতার এই যে বিভাগ এক নজরেই এ-দুয়ের মধ্যেকার একটা পার্থক্য ধরা পড়ে। পার্থক্যটা হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষের এই বিভাগ ভাব-জগতের আর ইয়োরোপের এই বিভাগ বস্তু-জগতের। অর্থাৎ ভারতবর্ষ দৃষ্টি দিয়েছে অন্তরে আর ইয়োরোপের দৃষ্টি বাইরে। তাই মনে হয় ভারতবর্ষের এই বিভাগ একটা পরিপূর্ণ বৃত্ত, মানব-সভ্যতার ক্ষয় বৃদ্ধি উত্থান পতন এই বৃত্তের মধ্যেই ঘটতে হবে— অর্থাৎ এই বৃত্ত দিয়ে সর্বকালের মানব-সভ্যতাকে মাপা চলবে। কিন্তু ইয়োরোপের মনীষীদের ব'সে থাকতে হবে, আবার কোন্ নব বিশেষ বস্তু এসে মানুষের ঘর গৃহস্থালি অধিকার ক'রে বসবে তারি অপেক্ষায়, সেই জড়বস্তু ধ'রে আবার নূতন এক যুগের নব নামকরণ করবার জন্যে। অথচ আজ যদি বাংলাদেশের অতি-আধুনিকদের মহলে এই কথা উত্থাপন করো তবে তাদের মুখ থেকে শুনবে যে, ভারতবর্ষের ঐ বিভাগ একটা সেকেলে গাঁজাখুরি গল্পমাত্র কিন্তু ইয়োরোপের ঐ বিভাগ একটা নিখুঁত তত্ত্ব। নিখুঁত বটে কিন্তু তত্ত্ব নয়— তথ্যমাত্র। আর তথ্য হচ্ছে সেই বস্তু যার আজকেরটা দিয়ে কালকেরটা মাপা যায় না। কিন্তু সে যা-হোক্, একেই বলে হিপ্‌নটিজ্‌ম্। এই হিপনটিজ্‌ম্-ব্যাধি দ্বারা আজ আমরা সবাই কম বেশি আক্রান্ত। এই হিপনটিক্ স্পেল (Hypnotic Spell) এই সম্মোহন থেকে আমাদের প্রাণকে সম্পূর্ণভাবে জাগিয়ে তুলতে না পারলে আমাদের মন বুদ্ধি তাদের আপন ধর্মে আপন ঔজ্জ্বল্যে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবে না— ফলে ভারতবর্ষও তার আপন স্বরূপে আপন শক্তিতে আপন আনন্দে প্রকাশিত হ'তে পারবে না। আমরা

অবশ্য এ-যুগে "খেতে শুতে যেতে প্রদীপটি জ্বালিতে কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন" এই রকমের গান বেঁধেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ "খেতে শুতে যেতে প্রদীপটি জ্বালিতে" সদা-সর্বদা এই অতি সত্য কথাটা মনে রেখো ও বিশ্বাস ক'রো (বিশ্বাস করলে পরিণামে কোনোদিন পস্তাবে না) যে এই ভারতবর্ষের অন্তরে একটি বস্তু আছে একটি বার্তা একটি শিখা আছে যা সমগ্র ইয়োরোপ আমেরিকার চাইতে বহু বহু গুণ বড়। আমি পরাধীন জাতির একটা বিরাট অহমিকার আত্মপ্রসাদের জন্য এ-কথা বানিয়ে বলছি নে। সত্যি সত্যিই ঐ শিখা ভারতবর্ষের অন্তরে আছে। সে-শিখা হাজার বছরের পরাধীনতার চাপে, ঝড় ঝঞ্ঝা শিলাপাতের প্রবল দুর্যোগেও নিভে যায় নি।

সে যা হোক্, বলছিলাম ইয়োরোপের মানব-সভ্যতার যুগ-বিভাগের কথা। এই যুগ-বিভাগের হিসেবে এ-কথা বলা যেতে পারে যে আজ আমরা লৌহযুগে বাস করছি। কিন্তু যেমন হ্যামলেটে আছে নাটকের মধ্যে নাটক তেমনি যুগের মধ্যে যুগ। বলা যেতে পারে যে আজকার এই লৌহযুগের মধ্যে আজ আমরা একটা বিশেষ যুগে বাস করছি— সেটা হচ্ছে স্লোগানের যুগ।

স্লোগান একটি অপূর্ব বস্তু। সম্ভবতঃ সত্য ত্রেতা দ্বাপরে কোনো নাগরিক এর সন্ধান পায় নি। এ সম্ভব হয়েছে এই কলিযুগেই।

স্লোগান হচ্ছে সেই বাক্য যা, হাজার মিথ্যাও যদি হয়, হাজার কণ্ঠে হাজার বার ধ্বনিত হ'তে হ'তে বেমালুম সত্যের মূর্তি ধারণ করে— মারীচ যেমন মায়া-স্বর্ণমৃগের মূর্তি ধারণ করেছিল। আর এটা সম্ভব হয় এই কারণে যে সর্বসাধারণ ব'লে যে একটি মহামান্য মহারাজ আছেন তাঁর শ্রবণশক্তি যেমন সদা প্রস্তুত সদা তৎপর হ'য়ে আছে মননশক্তি তেমন নয়।

যে-সব স্লোগান আজ আকাশে বাতাসে ভাসছে কিম্বা নরনারীর চিত্তপট দখল করেছে বা দখল করবার চেষ্টায় আছে তাদের একটা হচ্ছে এই যে, আজ আর আইভারি টাওয়ারে (Ivory Tower) ব'সে সাহিত্য বা শিল্প রচনা করা চলবে না। অবশ্য এর পাল্‌টা একটা প্রশ্ন করা যেতে পারে, তবে কি আজ সাহিত্য ও শিল্প রচনা করতে হবে বিকেল পাঁচটার সময় চৌরঙ্গি ধর্মতলার মোড়ে ট্র্যাফিক পুলিসের পাশে ব'সে? এর উত্তরে প্রচণ্ড

গণতান্ত্রিক বা পলাশফুলের মতো রক্তবর্ণ কামরেড্‌ও "হ্যাঁ" বলতে পারবেন না। অর্থাৎ তাঁদের মন যদি কিছুমাত্র সুস্থ থাকে। অন্তত ঐ প্রশ্ন ক'রে তাঁদের বেশ কিছুক্ষণের জন্য ভড়কে দেওয়া যায়। কিন্তু আসলে ঐ স্লোগানটি একটা মিথ্যা কথা। কেন? তা বলছি শোনো।

উপনিষদে এই রকমের কথা আছে যে, পতির জন্য পতি প্রিয় নয় আত্মার জন্যই পতি প্রিয়, জায়ার জন্য জায়া প্রিয়া নয় আত্মার জন্যই জায়া প্রিয়া ইত্যাদি। এই সব কথা যেমন গভীর সত্য তেমনি গভীর সত্য এই কথা যে মানুষের কাছে জড়বস্তুর যে-মূল্য সেটা জড়বস্তুর জড়বস্তুত্বের জন্য নয়— মূল্য, প্রত্যেক জড়বস্তু তার জীবন-রাজ্যের একটা ভাববস্তুকে বহন করে ব'লে, ভাববস্তুর প্রতীক ব'লে। অবশ্য ঔপনিষদিক্ নিগূঢ় গভীর সত্য হচ্ছে এই যে, কিছুই জড় নয়। কিন্তু প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে আমরা জড় ও চৈতন্যকে পৃথক ক'রেই দেখি। বাইরের উপলব্ধিতে চর্ম-চোখের দেখায় আমরা প্রজাপতিটাকে ও যে-ফুলের উপর সেই প্রজাপতি বসেছে সেই ফুলটাকে একই চৈতন্যের বিভিন্ন প্রকাশ ব'লে ধরতে পারি নে। তাই আমরা একটাকে বলি জীব আর একটাকে বলি জড়। কিন্তু ফুলটা যদি নিঃশেষে নিরেট জড়মাত্রই হ'তো তবে ফুলের সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধই ঘটতে পারত না। আসল সম্বন্ধই হচ্ছে চৈতন্যের সঙ্গে চৈতন্যের। কোথায় কোন্ গভীরে কেবলমাত্র ওরি মধ্যস্থতায় আমরা মিলিত হই একের সঙ্গে অন্যে।

কিন্তু সে যা-হোক্, এই সব গভীর তত্ত্বের এখানে কোনো প্রয়োজন নেই। আমি বলছিলাম এই কথা যে আমাদের প্রতিদিনের অগভীর ব্যবহারিক জীবনেও আমাদের কাছে জড়বস্তুর মূল্য তার নিছক জড়বস্তুত্বের জন্য নয়। তার মূল্য আমাদের কোনো-একটা ভাবের বাহক বা ধারক ব'লে। চাল-ডালের মূল্য জড় চাল-ডালের মধ্যে নয়— তার মূল্য সেটা আমাদের পুষ্টির ধারক ব'লে। ইঁট কাঠ পাথর দিয়ে তৈরি বাড়ি ঘরের মূল্য ইঁট কাঠ পাথরের স্তূপের মধ্যে নেই— আছে এর মধ্যে যে সেটা আমাদের আশ্রয়কে বহন করে ব'লে। তেমনি আইভারি টাওয়ার গজদন্তে বা সুশুভ্র মর্মরে নির্মিত হোক্ কিম্বা অতি গন্ধময় কংক্রিট দিয়েই তৈরি হোক্, সেটা মানুষের

ভাবরাজ্যের কোন্ বস্তুকে বহন করে? কিসের প্রতীক সেটা? সেটা বহন করছে বিজনতা-ভাবকে নিঃসঙ্গতা-ভাবকে। সেটা হচ্ছে মানুষের নিভৃতির প্রতীক। আর সাহিত্য রচনা করতে বিজনতার নিভৃতির অনিবার্যভাবে প্রয়োজন আছে। সুতরাং এ-কথা বললে মিথ্যা বলা হবে না যে, আইভারি টাওয়ারেই সাহিত্য রচিত হ'তে পারে। মনে রেখো যে আমি সাহিত্য রচনার কথাই বলছি। দৈনিক কাগজের সম্পাদকীয় মন্তব্যের কথা বা কোনো "ইজ্‌ম্" প্রচারের প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা-পুস্তিকার কথা বলছি নে। তবে প্রচার-পুস্তিকাও যদি ভাগ্যক্রমে সাহিত্যের কোঠায় গিয়ে উত্তীর্ণ হয় তবে সেটা হবে, প্রচার-বস্তুর চমৎকারিত্বের জন্য নয়, প্রচারকের সাহিত্যিক গুণপনার জন্যে। অর্থাৎ কারণটা বস্তুর মধ্যে নেই, আছে ব্যক্তির মধ্যে।

দেশকালের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হ'য়ে সাহিত্য-রচনা চলতে পারে না— গুরুগম্ভীরকণ্ঠে এ-রকম জ্ঞানের কথা কতকটা সেই রকমের জ্ঞানের কথা বলা হবে যদি কেউ বলে যে ভাষার জ্ঞান ছাড়া সাহিত্য রচনা চলতে পারে না। কিন্তু ভাষা যেমন সাহিত্য নয়, সাহিত্য-সৃষ্টির যন্ত্র বা উপায়মাত্র, তেমনি দেশ-কালের জ্ঞান এমন কি খানায়-পড়া রাষ্ট্রীয় রথের চাকা মারবার উদ্দীপনাও সাহিত্য নয়— ও-সবই সাহিত্য-সৃষ্টির উপাদান উপকরণমাত্র। এই সব উপকরণকে মধ্যস্থ ক'রেই উপলক্ষ্য ক'রেই কিম্বা এই সব উপকরণের সংস্পর্শে বা contactএ এসেই প্রতিভাবান সাহিত্যিক যে আপন অন্তরের চিন্তা-রাজ্যেরই চিন্তা ভাবলোকেরই ভাব ও রূপরস-সাগরেরই রূপরসের প্রকাশ করেন পরিবেশন করেন এই অতি সহজ সত্যটুকু যাঁর জ্ঞানের মুকুরে প্রতিফলিত হয় নি তিনি যত বড়ো কলম-বাজই হন না কেন তাঁর কাছ থেকে প্রকৃষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টির আশা দুরাশামাত্র। কেননা তিনি বীণাপাণির বীণার আনন্দ-ঝংকার শোনেন নি— শুনেছেন মাত্র কুটিল সংসার-সাগরের কল্লোল, বড় জোর হয়তো লক্ষ্মীর মন্দিরের শঙ্খধ্বনি। বাইরের জগৎই যাঁর জগৎমাত্র বর্তমান কালই যাঁর কালমাত্র, অন্তর্জগতের সর্বকালের আনন্দ-রসের সন্ধান তিনি কোথায় পাবেন? এবং সাহিত্যের কারবার মূলতঃ এই বস্তুটিকেই নিয়ে। সাহিত্যের নানা শাখা প্রশাখা উপশাখা উপ-উপশাখা থাকতে পারে, এমন কি

প্রচার-পুস্তিকাও তার কোনো এক উপশাখার উপশাখা হ'য়ে থাকতে পারে কিন্তু ওর মূল ঐ রসবস্তুতে এবং ওর ফল আনন্দ-বিতরণে। সাহিত্যের প্রকৃত সাহিত্যত্ব এরই সার্থকতায়।

দেশকালের প্রকৃত জ্ঞানও সাহিত্যিকের পক্ষে এই আইভারি টাওয়ার থেকেই, সুষ্ঠু ভাবে হ'তে পারে। কেননা এইখান থেকেই প্রতিভাশালী সাহিত্যিক সৃষ্টিকর্তার চোখে নির্লিপ্ততার দৃষ্টি ফেলতে পারেন তাঁর চারিদিকে। মানুষ নির্লিপ্ত না হ'লে কোনোদিন কামলোক অতিক্রম করতে পারে না। কামলোক অতিক্রম না করতে পারলে রূপলোক ও রসলোকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। এটা বৈষ্ণব শাস্ত্রে যেমন সত্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। রূপ ও রস— এই নিয়েই সাহিত্যের শাশ্বতকালের কারবার। কাম সংহার না হ'লে রাস সম্ভব হয় না; সাংসারিক বিলোপ না হ'লে সাহিত্যিকের উদয় সহজ হয় না। সুতরাং এ-দিক থেকেও এ-কথা নির্বিঘ্নে বলা যেতে পারে যে সাহিত্যিকের পক্ষে আইভারি টাওয়ারের প্রয়োজন আছে।

এই আইভারি টাওয়ার থেকে নির্লিপ্ত চোখে প্রতিভাবান সাহিত্যিকরা যে কেবল নিজ দেশকালের উপরই দৃষ্টি ফেলতে পারেন তাই নয়, অন্য দেশ অন্য কালের উপরেও তাঁরা দৃষ্টি ফেলতে পারেন অতি সহজে। কেননা এখান থেকে তাঁদের দৃষ্টির পরিধি বেড়ে যায়। ফলে তাঁদের উপাদান আহরণের স্থানের পরিধি ও কালের ব্যাপ্তিও অনেকগুণ বেড়ে যেতে পারে। তাতে সাহিত্যের লাভ বই অলাভ নেই। শেকস্‌পীয়ার অনেক নাটক রচনা করেছেন এমন আখ্যান নিয়ে যা অন্য দেশের এবং অন্য কালের এবং কালিদাস করেছেন যা অন্য কালের। কিন্তু সেই জন্য যে সে-সব রচনা সাহিত্য হ'য়ে ওঠে নি তা নয়। শেকস্‌পীয়ার বা কালিদাস পাঠকালে আমাদের মনে এ-প্রশ্ন ওঠে না যে তাঁরা তাঁদের আপনার কালের ও আপনার সমাজের অর্থনৈতিক প্রগতির চাকায় কাঁধ লাগিয়েছিলেন কি না? সে-প্রশ্ন যদি উঠত তবে তার অর্থ হ'ত এই যে আমরা এক বৈশ্য-বুদ্ধি ছাড়া আর সকল বুদ্ধিই হারিয়েছি। বস্তির উন্নতি খুব ভালো কাজ সন্দেহ নেই কিন্তু তার জন্যে শেকস্‌পীয়ার কালিদাসকে ডাকবার প্রয়োজন নেই। টাইফয়েডের রোগীর শুশ্রূষাও খুব ভালো কাজ।

কিন্তু সে-জন্যে আমরা কেউ বলিনে— ডাকো ব্যাস বাল্মীকিকে অন্তত পক্ষে হোমার বা ভার্জিলকে? আর এই যে বলি নে, এটা আমাদের বোকামির পরিচয় নয়— এটা আমাদের ষত্ব ণত্ব জ্ঞানের মূল্যবোধের, এক কথায় স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয়।

আসলে রাজ্য ভাঙে গড়ে রাজা রাজড়ার উত্থান পতন ঘটে, সমাজ-বুকে ঝড় ঝঞ্ঝা উল্কাপাত হয় কিন্তু মানব-আত্মায় সকল বিপত্তির মধ্য দিয়েও ঐ রূপ রসের সন্ধান স্থির অব্যাহত থাকে ধ্রুব নক্ষত্রের মতো শাশ্বত কালের মাঝে। এই রূপ ও রসকেই মানুষ শিল্পে সংগীতে নৃত্যে সাহিত্যে ধরবার ও প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। যেখানে ও যেকালে এর ব্যতিক্রম দেখা যাবে সেখানেই বুঝতে হবে যে আত্মার ঐশ্বর্যে বঞ্চিত দুর্গতদের আত্মপ্রবঞ্চনা আরম্ভ হয়েছে। ঐশ্বর্য হারিয়ে যে-মন নিজেকে লাভবান মনে করে সে-মন যে দুর্গতিকে প্রগতি নাম দিয়ে পতাকা ওড়াবে তাতে আর আশ্চর্য কি! অজ্ঞানীকে প্রকৃতি ক্ষমা করতেও পারে। কিন্তু অজ্ঞানকে যেখানে মানুষ জ্ঞান নাম দিয়ে চালায় সেখানে সে মার্জনা পায় না।

মাতা ধরিত্রীর যে আজ সমূহ বিপদ উপস্থিত সে-সম্বন্ধে কোনো ভুল নেই। কেননা পৃথিবীকে রাতারাতি স্বর্গলোকে পরিণত করবার জন্যে এত বেশি লোক (যাদের ঐ কার্যের জন্য কিছুমাত্র যোগ্যতা যে আছে তা মনে করবার কোনো কারণই নেই) এত বেশি রকম ব্যস্ত এবং সে-জন্যে এত বেশি রকম হাতুড়ে দাওয়াই বাতলানো এর পূর্বে আর কোনোদিন হয় নি। এতে শেষাশেষি মাতা ধরিত্রীর গঙ্গাযাত্রা না হলেই রক্ষা। বলা বাহুল্য এতে পৃথিবীর বুকে স্বর্গলোকের প্রতিষ্ঠা তো হবেই না, মাঝের থেকে মানুষের যা কিছু উৎকৃষ্ট যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যে-সব বস্তু ও বিষয়ই মানুষের বেঁচে থাকবার ভদ্রতর কারণ, তার জীবনের গভীরতর ব্যঞ্জনা সত্যতর দীপ্ততর অভিব্যক্তি, যা তার চরম সার্থকতা ও পরম কৃতার্থতা সে-সবের একটা পাইকারী ধরনের হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হ'য়ে যেতে পারে। এই হত্যাকাণ্ড যাতে না ঘটতে পারে তার সতর্ক পাহারার জন্যেও আজ বিশেষরূপে প্রয়োজন আছে ঐ আইভারি টাওয়ারের। সুতরাং তুমি আমি যাদের বুদ্ধি উজ্জ্বল আছে এবং আর পাঁচজন যাদের মন

পশ্চিম সমুদ্র থেকে উত্থিত কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয় নি এবং আর দশজন পেটের ক্ষুধার তাড়না যাদের চোখের দৃষ্টির দিকভুল ঘটায় নি তারা সবাই মিলে আজ মানব-জাতির সভ্যতার রক্ষাকল্পে মানব-আত্মার হিতার্থে উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে এই হিত মনোহারী ও দুর্লভ বচন উচ্চারণ করতে পারি—."আইভারি টাওয়ারের জয় হোক্!" আইভারি টাওয়ার— মানব-সভ্যতার চির-জাগ্রত প্রহরী!

সুতরাং আজ এই আইভারি টাওয়ারের সম্পর্কে স্বর্গত রজনী সেনের একটি গানের তিনটি লাইন দুটি শব্দের একটু পরিবর্তন ক'রে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। আজ আমরা এই আইভারি টাওয়ারকে লক্ষ্য ক'রে বলতে পারি—

"ক্ষুব্ধ জগতে চির-জাগ্রত প্রহরী
বরষিছ চির পুলকামৃত-লহরী।"

কিন্তু হায়! বহু ইজ্‌ম্‌এর পাল্লায় প'ড়ে আজ বহু মানবের

"অন্ধ আঁখি মোহে ঢাকা"

গানে "ক্ষুব্ধ জগতে"র স্থানে আছে "সুপ্ত জগতে" আর— "পুলকামৃত" স্থানে "করুণামৃত"। গানটি অবশ্য ঈশ্বর বিষয়ক।

কিন্তু ঐ মোহে ঢাকা অন্ধ আঁখি— তা খুলবে কার মন্ত্রগুণে? কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে? ইতি

হসন্ত

'বলাকা'র যুগ

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির পর বলাকায় একটি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত আবহাওয়া অনুভব করা যায়। মনে হয় একটি পর্বের সম্পূর্ণ অবসান ঘটলো। বলাকা আলোচনা প্রসঙ্গে তার ছন্দ সম্বন্ধে ঝোঁকই সাধারণতঃ বেশি পড়ে, কিন্তু বলাকার সার্থকতা কেবল সেখানে নিঃশেষিত নয়। বস্তুতঃ বলাকার সার্থকতা আরো অনেক ব্যাপক এবং গভীর, এক হিসেবে সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি মোড় ফেরার পরিচয় বলাকায় আছে। শুধু কবিতা নয় গদ্য সাহিত্যেও, শুধু আঙ্গিক নয় দৃষ্টিভঙ্গীতেও, যে পরিবর্তন সে সময় রবীন্দ্র-সাহিত্যে এসেছিলো তার রহস্য বলাকায় ধরা পড়ে।

গীতাঞ্জলির একটি কবিতায় আছে,—

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।
রয়েছে দীপ না আছে শিখা
এই কি ভালে ছিল রে লিখা,
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো।

(গীতাঞ্জলি, ১৭ নং কবিতা)

এই কবিতাটিতে গীতাঞ্জলির প্রথম অংশের সুরটি ধরা পড়ে। গীতাঞ্জলির প্রথম অর্ধের কবিতাগুলিতে দেখা যায় কবির জীবনে দীপ আছে কিন্তু শিখা নেই। তাই গভীর বিষাদ, অন্ধকার-বর্ষা-সজলহাওয়া-বিরহ-অপেক্ষার প্রাচুর্য। জীবনদেবতার আগমনের আশায় কবি চঞ্চল, কিন্তু তাঁর জীবনের বিষাদ সহজে যাবার নয়। সে কারণে কবির অভিযোগ,—

তুমি যদি না দেখা দাও
কর আমায় হেলা

কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদল-বেলা।
(১৬ নং কবিতা)

কবি আষাঢ়-সন্ধ্যাতে একলা ঘরের কোণে আপন মনে কি ভাবেন, পরানসখা বন্ধুর আগমন যদি বা হয় সে-ও ঝড়ের রাতে, শ্রাবণ-ঘন গহন-মোহে বা ঝর ঝর বারি-ঝরা ভাদ্রে। আর সে আগমন এত সঙ্গোপনে, সে মিলন এতই নিভৃতে যে কবি ছাড়া অন্য কেউ সেখানে থাকা সম্ভব নয়। নিতান্ত ব্যক্তিগত রহস্যালাপ,—

এবার হৃদয় মাঝে লুকিয়ে বসো
কেউ জানবে না কেউ বলবে না।
(২৩ নং কবিতা)

কিন্তু গীতাঞ্জলির শেষের দিকে একটি সুরের আভাস পাওয়া যায়। যেন দীপের শিখাটি জ্বললো, দীপ সার্থক হলো। প্রথম অংশের কবিতাগুলিতে বর্ষা-রাত্রি-অন্ধকার প্রভৃতির প্রাচুর্য দেখি, শেষের কবিতাগুলিতে তার পরিবর্তে আলোর জয়গান। উপমার রং বদলেছে।

আলোয় আলোকময় করে হে
এলে আলোর আলো।
আমার নয়ন হতে আঁধার
মিলাল মিলাল।
(৪৫ নং কবিতা)

আকাশতলে উঠল ফুটে
আলোর শতদল।
পাপড়িগুলি থরে থরে
ছড়াল দিক্-দিগন্তরে,
ঢেকে গেল অন্ধকারের
নিবিড় কালো জল।
(৪৮ নং কবিতা)

গীতাঞ্জলিতে আরও একটি সুর আছে, সেটি গভীর কুণ্ঠার সুর। নানা

কবিতায় দেখা যায়, কবি সবার নিচে সবার পিছনে থাকবার জন্য উৎসুক, সমস্ত অহংকার সমস্ত গর্ব ত্যাগ করার জন্য ব্যাকুল। দুঃখ-অনুভবের জন্য তীব্র আগ্রহ। গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতাই তো তাই,—

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

অথচ বলাকায়, এমন কি গীতাঞ্জলির শেষ অংশেও, এ ধরনের গভীর কুণ্ঠাবোধ নেই। বরং কর্মের উদ্যম আছে আনন্দের জয়গান আছে। কবির সেখানে রণসজ্জা,—

তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।
(বলাকা, ৪নং কবিতা)

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি হতে বলাকার মধ্যে কবির এই বেশ-পরিবর্তন ঘটেছে। যে কুণ্ঠাবোধ তাঁকে সকলের পিছনে থাকতে বাধ্য করেছিল সে কুণ্ঠাবোধ আর নেই, তাই কবি শোভাযাত্রার পুরোভাগে। রাত্রির বদলে দিনের উপমা, অন্ধকারের পরিবর্তে আলোর বর্ণনাই বেশী। মনে রঙ লেগেছে। কবি তাই বলেন,—

আবার যেদিন আসবে আমার রূপের আগুন ফাগুন দিনের কাল
দখিন হাওয়ায় উড়িয়ে রঙিন পাল,
সেবারে এই সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
যেন আমার জীবন-লতিকায়
ফোটে প্রেমের সোনার বরন ফুল;
(বলাকা, ২৬ নং কবিতা)

শুধু তাই নয়, যে কবি সমস্ত জগৎ হতে দূরে সরেছিলেন সেই কবিই নবলব্ধ আনন্দে জীবনের নব সার্থকতায় চঞ্চল, মরণবিহারে মত্ত এবং যারা

সুন্দরের গায়ে ধুলা দেয় তাদের সাজা দেবার জন্য ব্যগ্র। বলাকার ছন্দ বন্ধনমুক্ত এবং দ্রুতস্পন্দিত হবে সেটি আশ্চর্য নয়।

কবির এই অন্তরলোক হতে বহির্লোকে আসাই গীতাঞ্জলির সঙ্গে বলাকার যুগের প্রধানতম পার্থক্য। এইখানেই মৌলিক পরিবর্তন। যে কারণেই হোক্, গীতাঞ্জলির প্রথমে কবি জীবনের অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তাই দীপ আছে শিখা নেই। কিন্তু যখন জীবনের অর্থ নতুন করে আবিষ্কৃত হলো, শূন্য দীপাধারে শিখা জ্বললো তখন কবির মনের গভীর বিষাদ দূর হয়ে আনন্দ বিচ্ছুরিত হলো। এই কারণেই বলাকার কবি শোভাযাত্রার পুরোভাগে চলেছেন, তাঁর বাণী বিশ্বজগতে ছড়িয়ে দেবার প্রয়োজন হয়েছে। গীতাঞ্জলির শেষের দিকেও এর আভাস মেলে। কবির জীবন পূর্ণ ও অর্থবান হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বহির্মুখীন হবার চেষ্টা করছেন—

আমার একেলা ঘরের আড়াল ভেঙে
বিশাল ভবে
প্রাণের রথে বাহির হতে
পারব কবে।
... ...
হাটের পথে তোমার সাথে
মিলন হবে,
... ...
শুনব বাণী বিশ্বজনের
কলরবে।

(গীতাঞ্জলি, ৮৪ নং কবিতা)

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,

সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।
(গীতাঞ্জলি, ৯৪ নং কবিতা)

কবির স্বকীয় জগৎ থেকে বিশাল ভবে বাহির হওয়াই কাব্যের সুর পরিবর্তন ঘটিয়েছে। যে মরণহরণ বাণীর সন্ধান কবি পেলেন সে বাণী 'নীরব গগনে চুপে চুপে' ভরে ওঠার বাণী নয়, সে বাণীর

নৃত্যমন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
(বলাকা, ৮নং কবিতা)

কিন্তু এইখানে পরবর্তী প্রশ্ন জাগে, যদি কবির এই নবলব্ধ আনন্দ ও বহির্মুখীনতাই বলাকার যুগের প্রধান কথা হয় তা হলে সেই নবলব্ধ আনন্দ ও বহির্মুখীনতার স্বরূপ কি, হেতু-ই বা কি।

২

প্রথমে এই আনন্দ ও বহির্মুখীনতার স্বরূপ বিবেচ্য। পূর্বের উদ্ধৃতিগুলি হতে বোঝা যায়, এই বহির্মুখীনতার প্রধানতম লক্ষণ বিশ্বের সঙ্গে কবির একাত্ম হবার চেষ্টা। এই কারণে গীতাঞ্জলির শেষের দিকে "হে মোর দুর্ভাগা দেশ", "ভারত-তীর্থ", "ভজন পূজন সাধন আরাধনা", "যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন" ইত্যাদি কবিতাগুলি গভীর অর্থবহ। বর্তমানে শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ শ্রেণী-সচেতন কবি ছিলেন না। কথাটি এক হিসেবে অর্থহীন, কেননা কবিধর্ম তাঁর মধ্যে যে রকম পরিপূর্ণ মাত্রায় উচ্ছ্বসিত তাতে অত্যাচারিতদের পক্ষাবলম্বন করাই তাঁর সহজ ধর্ম। অবশ্য এর পর প্রশ্ন ওঠে, এই পক্ষাবলম্বন সজ্ঞানে কি অবচেতনে। কিন্তু এইটুকু স্বীকার করতেই হয়, কবি জীবনে যে অভাববোধ করছিলেন সে অভাববোধের মূল মনুষ্যত্বের অপমানে। 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর যে বিক্ষোভ দেখি তারও মূল এইখানে। স্পষ্ট বোঝা যায়, মানবজীবনের এমন অপমান ও

অপচয় কবির পক্ষে অসহ্য; তাই একদিকে যেমন তিনি জীবনদেবতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন যাতে জীবন (তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নয়) সার্থক হয়, তেমনি অন্যদিকে তাঁর ক্রোধ বর্ষিত হচ্ছে সেই সমস্ত বাধা বিঘ্নের উপর যার জন্যে মনুষ্যত্ব খণ্ডিত। গীতাঞ্জলি ও বলাকার কবিতাগুলি এই দিক্ থেকে আলোচ্য। গীতাঞ্জলিতে কবি এই সমস্যার আভাস পেলেও তার আসল চেহারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন নন, তার স্বরূপ তখনও ফোটেনি। গীতাঞ্জলির একটি কবিতায় আছে,—

জড়িয়ে গেছে সরু মোটা
দুটো তারে
জীবন-বীণা ঠিক সুরে তাই
বাজে না রে।

(গীতাঞ্জলি, ১২৮নং কবিতা)

সাংসারিক দ্বন্দ্ব-কলহের মোটা সুরে কবিধর্ম ও কবিকর্মের মিহি সুর চাপা পড়েছে, ফলে জীবন-বীণাই স্তব্ধ। বলাকায় এই সমস্যার তাৎকালিক সমাধান হয়েছে। তাৎকালিক, কেননা বলাকাই রবীন্দ্রকাব্যের শেষ কথা নয়, লিপিকা-পুনশ্চের পর আবার অন্য সমন্বয়ের প্রয়োজন ঘটেছিলো, রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়ে আবার নবজন্মের সন্ধান মেলে।

বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে;
ক্রন্দসী কাঁদিয়া ওঠে বহ্নিভরা মেঘে।
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া ওঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে;

(বলাকা, ৮নং কবিতা)

এর মধ্যে বলাকার গোড়ার কথাটি আছে। নানাযুগের মানুষের মধ্য দিয়ে মানবধর্মের যে চিরন্তন (বস্তুহীন) প্রবাহ বয়ে চলেছে তার প্রচণ্ড আঘাতে আজ নতুন বস্তুজগৎ গড়ে উঠলো—সেই নবজন্মের বেদনায় প্রাচীন ধ্বংসপ্রায়। সেই বেদনাই নবযুগের বহ্নিভরা মেঘে কেঁদে ওঠে, তারপর দীর্ঘকালের রাত্রির অবসানে নতুন আলোর সন্ধান মেলে, ধাবমান অন্ধকার হতে আলোকের

তীব্রচ্ছটা বর্ণস্রোতে বিচ্ছুরিত হয়। গীতাঞ্জলিতে ভবিতব্যতার ইঙ্গিত মাত্র মিলছে,—

দিগন্তরালে কোন্ ভবিতব্যতা
স্তব্ধ তিমিরে বহে ভাষাহীন ব্যথা,
কালো কল্পনা নিবিড় ছায়ার তলে
ঘনায়ে উঠেছে কোন্ আসন্ন কাজে।
(গীতাঞ্জলি, ১০০নং কবিতা)

কিন্তু বলাকায় সেই ভবিতব্যতা ঘনিয়ে এসেছে, কবি সেই ভবিতব্যতার বাণী প্রচার করতে বেরিয়েছেন। কবি বলছেন, "বলাকার শঙ্খ বিধাতার আহ্বান-শঙ্খ, এতেই যুদ্ধের নিমন্ত্রণ ঘোষণা করতে হয়—অকল্যাণের সঙ্গে পাপের সঙ্গে অন্যায়ের সঙ্গে। উদাসীনভাবে এ শঙ্খকে মাটিতে পড়ে থাকতে দিতে নেই। সময় এলেই দুঃখস্বীকারের হুকুম বহন করতে হবে, প্রচার করতে হবে।" (রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, ৫৯৩ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু কবির এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের কারণ কি? কবির নিজের কথাতেই তাঁর মানস-ইতিহাসের বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে,—

> এই কবিতাগুলি প্রথমে সবুজপত্রের তাগিদে লিখতে আরম্ভ করি।...তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে-সময়ে পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল।...য়ুরোপীয় যুদ্ধের তড়িৎবার্তা এই কবিতা (২) লেখবার অনেক পরে আসে। এণ্ড্রুজ সাহেব বলেন যে, 'তোমার কাছে এই সংবাদ যেন তারহীন টেলিগ্রাফে এসেছিল।' আমার এই অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি নয়। আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসানপ্রায়। মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন। সেজন্য মনের মধ্যে অকারণ উদ্বেগ ছিল।...এই কবিতা (৪) যে-সময়কার লেখা তখনও যুদ্ধ শুরু হতে দু-মাস বাকি আছে। তারপর শঙ্খ বেজে উঠেছে; ঔদ্ধত্যে হ'ক্, ভয়ে হ'ক্ নির্ভয়ে হ'ক্ তাকে বাজানো হয়েছে। যে যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌঁছবার সিংহদ্বার স্বরূপ। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে

একটি সার্বজাতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে। তা শেষ হয়ে স্বর্গারোহণ পর্ব এখনও আরম্ভ হয় নি। আরও ভাঙবে, সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে যাবে, ঘরছাড়ার দলকে এখনও পথে পথে ঘুরতে হবে। পাশ্চাত্ত্য দেশে দেখে এসেছি, সেই ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে। তারা এক ভাবী কালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে যে-কাল সর্বজাতির লোকের। চাকভাঙা মৌমাছির দল বেরিয়ে পড়েছে, আবার নূতন করে চাক বাঁধতে। শঙ্খের আহ্বান তাদের কানে পৌঁচেছে।...বলাকা রচনাকালে যে-ভাব আমাকে উৎকণ্ঠিত করেছিল এখনও সেই ভাব আমার মনে জেগে আছে। আমি আজ পর্যন্ত তাকে ফিরে ফিরে বলবার চেষ্টা করছি। বুকের মাঝে যে-আলোড়ন হল তার কী সার্বজাতিক অভিপ্রায় আছে তা আমি ধরতে চেষ্টা করেছি।..আমি মনে মনে একটা পক্ষ নিয়েছি; একটা আহ্বানকে স্বীকার করেছি; সে ডাক-কে কেউ মেনেছে কেউ মানে নি। বলাকায় আমার সেই ভাবের সূত্রপাত হয়েছিল। আমি কিছুদিন থেকে অগোচরে এই ভাবের প্রেরণায় অস্পষ্ট আহ্বানের পথে অগ্রসর হয়েছিলাম। এই কবিতাগুলি আমার সেই যাত্রাপথের ধ্বজা-স্বরূপ হয়েছিল। তখন ভাবের দিক্ দিয়ে যা অনুভব করেছিলুম, কবিতায় যা অস্পষ্ট ছিল, আজ তাকে সুস্পষ্ট আকারে বুঝতে পেরে আমি এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। (রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, ৫৯৭ পৃষ্ঠা)।

সুতরাং এই পরিবর্তনটি আকস্মিক বা নেহাত কবির খেয়াল এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই।

৩

ঐতিহাসিক টয়েনবী বলেন প্রত্যেক মহামানবের (এবং প্রত্যেক বড় জাতি বা সমাজের) জীবনে দেখা যায় প্রথম যুগের প্রথম উৎসাহে একটি বহির্মুখীনতা আসে, কিন্তু তারপরেই একটি পশ্চাদপসরণের পালা দেখা যায়। এটি সাধনার যুগ। তারপর নবলব্ধ উৎসাহে মানুষ আবার বহির্মুখীন হতে

চায়, তার অন্তরের কথা বিশ্বজগতে ছড়াতে চায়, তার তখন প্রচারকের রূপ। টয়েনবী-কথিত এই পশ্চাদপসরণ তত্ত্ব বাদ-প্রতিবাদ-সমন্বয়ের আরো জলীয় ব্যাখ্যা কিনা সেটি টয়েনবী-বিরোধীদের বিচার্য, কিন্তু এইরকম সাময়িক অন্তর্মুখীনতা ঘটনা হিসেবে অপ্রচুর নয়। এইদিক্ হতে দেখলে রবীন্দ্র-কাব্যের 'জীবন-দেবতা'র স্বরূপ বোঝার সুবিধা হয়। রবীন্দ্র-কাব্যে 'জীবন-দেবতা' সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে জীবনদেবতাকে একটি অতীন্দ্রিয় মিস্টিক তত্ত্বের মধ্য দিয়ে বুঝবার চেষ্টাই বেশী। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। গত মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্বে জগতে যে বাস্তব ও মানস পরিবর্তন ঘটছিল গীতাঞ্জলি সেই সংকটেরই ফল। সাংসারিক অন্যায়ে বিক্ষুব্ধ কবি সংকটে অভিভূত ও ম্রিয়মান। সেকারণেই তিনি আলো জ্বালাবার জন্য ব্যাকুল। ক্রমশ আলো জ্বলল, কবি তাঁর দীপশিখাটি নিয়ে ধীরে ধীরে যাত্রা শুরু করলেন, ভরসা হলো যে শুকতারা উঠেছে আর নিশাচরদের কাল শেষ হলো,—

ছাড়িস নে ধরে থাক্ এঁটে
ওরে হবে তোর জয়।
অন্ধকার যায় বুঝি কেটে,
ওরে আর নেই ভয়।
ঐ দেখ্ পূর্বাশার ভালে
নিবিড় বনের অন্তরালে
শুকতারা হতেছে উদয়।
ওরে আর নেই ভয়।
এরা যে কেবল নিশাচর—
অবিশ্বাস আপনার 'পর,
নিরাশ্বাস, আলস্য সংশয়,
এরা প্রভাতের নয়।
ছুটে আয়, আয় রে বাহিরে,
চেয়ে দেখ, দেখ্, ঊর্ধ্বশিরে,

আকাশ হতেছে জ্যোতির্ময়
ওরে আর নেই ভয়॥

(গীতাঞ্জলি, ১০৯ নং কবিতা)

বলাকায় নিরাশ্বাস আলস্য সংশয় দূরে গেলো, সেখানে কবি আরও স্পষ্টতঃই প্রচারক-বেশ ধারণ করেছেন। গীতাঞ্জলিতে বিধাতার শঙ্খ বাজেনি, কবি শুধু সেই শঙ্খের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন, কিন্তু সে আহ্বান তখনও এসে পৌঁছলো না। সেই কারণেই কবি তখনও সংশয়াকুল। গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি রবীন্দ্রকাব্যে একহিসেবে অনন্য। যেমন দেখি, পূর্বোদ্ধৃত (১০৯ নং) কবিতাতে রাবীন্দ্রিক ঝংকার, উপমা-আবেগ-উচ্ছ্বাসের মহাসমারোহ, ছন্দের বিপুল বেগ— এ সমস্ত নেই। কবিতাটি অত্যন্ত মৃদু, ঝংকার অত্যন্ত ক্ষীণ। এই মৃদুতার কারণ কবির মানসিক সংকটেই নিহিত। কবির গভীর কুণ্ঠা অপরের দম্ভ ও অকুণ্ঠ আত্মঘোষণারই প্রতিক্রিয়া; মানবপুত্রের মতো কবি মতিভ্রান্ত দাম্ভিকের জন্য স্বয়ং প্রায়শ্চিত্ত করছেন, তাদের পরিবর্তে নিজে আঘাত সহ্য করছেন, আরো আঘাত না পেলে তাঁর তৃপ্তি নেই কেননা পাপের বোঝা কম জড়ো হয় নি।

আরো আঘাত সইবে আমার
সইবে আমারো,
আরো কঠিন সুরে জীবনতারে ঝংকারো।

(গীতাঞ্জলি, ৯০ নং কবিতা)

এই আঘাত সহ্য করার প্রয়োজন কবির নিজস্ব নয়, এটি অন্ধ মানব-সমাজের জন্য কবির প্রায়শ্চিত্ত। সেই কারণেই কবি একদিকে তাঁর জীবন-দেবতার কাছে ক্ষমা চান নি, বল চেয়েছেন, কিন্তু অন্যদিকে প্রেম চেয়েছেন,—

বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা,

(গীতাঞ্জলি, ৪ নং কবিতা)

কেননা এই বিপদ তাঁর নিজস্ব নয়। অথচ তিনি যে প্রেমের জন্য আকুল সে প্রেমের ভার বিপদের ভারের চেয়ে বেশী। কবির বিশ্বাস আছে যে ভবিষ্যৎকালের প্রেমের বোঝা বর্তমানের অমঙ্গলের বোঝার চেয়ে এখনও বৃহত্তর, মানব-সমাজের ভবিষ্যৎ সে হিসেবে অন্ধকার নয়। এই কারণেই

কবি বিপদের বোঝা বইতে পারেন কিন্তু প্রেমের বোঝা বইতে পারেন না, সে বোঝা এতোই ভারি—

তোমার প্রেম যে বইতে পারি
এমন সাধ্য নাই।

(গীতাঞ্জলি, ৬৬ নং কবিতা)

সেই প্রেম যখন এলো তখনই কবির রণসজ্জা, তখনই কবি যুদ্ধের নিমন্ত্রণ ঘোষণা করতে বেরিয়েছেন, তাঁর যুদ্ধ অকল্যাণের সঙ্গে অন্যায়ের সঙ্গে পাপের সঙ্গে।

প্রাচীর ঐতিহ্যের মধ্যে 'জীবনদেবতা' অন্তর্গত। রুদ্রের পরিকল্পনার সঙ্গে তাঁর দক্ষিণ মুখের সাহচর্য অবিচ্ছেদ্য। নিছক ধ্বংসের পরিকল্পনা এদেশের রুচিকর নয়। সেইজন্যে অলিম্পিয়া হতে দেবরাজ শুধু মানবসমাজের উপর বজ্রনিক্ষেপ করছেন এ ধারণার পরিবর্তে আমাদের দেবতারা অনেক ঘরোয়া। সুতরাং ঐ ধরনের সংকটে কবির মন পীড়িত ও সংশয়ান্বিত হলে যেটি সম্পূর্ণ বাস্তব দ্বন্দ্বের অন্তর্গত তার সমাধানও কবিকল্পনায় জীবনদেবতা তত্ত্বের মধ্য দিয়েই হবে, এটি আশ্চর্য নয়। সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতে যে সমাস্যার সমাধান হবে, জড়বাদীরা যেখানে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে ভরসা রেখেই নিশ্চিন্ত, কবি সেই সমস্যাতেই বিচলিত কিন্তু সেই কথাটিকে অন্য ভঙ্গীতে বলছেন। জড়বাদে অবিচল বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব নয়। "জীবন-দেবতা" সেই অবিশ্বাসেরই ফল। সম্প্রতি কেউ যেন লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই যেন secular হয়ে পড়ছিলেন। কথাটি কৌতুকাবহ। আপাতত মনে হয় তাঁর রচনার বেলায় যেন একথাটি সত্য,— গীতাঞ্জলির চেয়ে বলাকা যেন বেশী secular বা বলাকার চেয়ে পরবর্তী রচনাগুলি আরও secular. কিন্তু গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি জীবনদেবতাকে সম্বোধন করে লেখা এবং বলাকার মধ্যে শাজাহান-তাজমহল-ঝিলমের প্রাধান্য, বা গীতাঞ্জলির কবিতার মধ্যে পূজা-ধূপ-বীণা প্রভৃতির প্রাচুর্য আর বলাকায় সোনার বরন প্রেমের ফুলেরই সমারোহ কেবলমাত্র এই কারণেই গীতাঞ্জলি মিস্টিক এবং বলাকা বস্তুপ্রধান এরকম ধারণা সঙ্গত নয়। আসলে এগুলির মধ্যে একটি দীর্ঘ বিবর্তনের ধারা বইছে। যে সংশয় এবং অবিশ্বাস কবিকে জীবনদেবতার আশ্রয় গ্রহণ করতে

বাধ্য করেছে সেই সংশয় ও অবিশ্বাস কাটবার সঙ্গে সঙ্গে আর জীবনদেবতার প্রয়োজন হল না। আদেশ পাবার পূর্ব পর্যন্তই আদেশদাতার নিকটে থাকতে হয়, কিন্তু যখন সে আদেশ পালনের জন্য সামনে এগোতে হবে সে সময়েও আদেশদাতা সঙ্গে থাকবেন এ আশা অন্যায়। রবীন্দ্রনাথ পরে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির ভঙ্গীতে বেশী কবিতা লেখেন নি এ হতে অনুমান করা চলে না যে তাঁর মন ক্রমশই secular হয়ে পড়ছিল। এ কথার প্রকৃত রহস্য এই যে গীতাঞ্জলির সংকট কাটানোর পর যে সমন্বয় তিনি রচনা করেছিলেন সেই ধরনের সংকট ও সেই ধরনের সমন্বয় তার বহুদিন পর পর্যন্ত আর আসে নি। লক্ষ্য করা যায়, রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়ে আবার একটি গভীর আত্মজিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেই আত্ম-জিজ্ঞাসার পাশাপাশি আছে কিষানের জীবনের শরিক হবার চেষ্টা, কথায় ও কাজে তাদের সত্য আত্মীয়তা অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা। এ হতে প্রমাণিত হয় যে কোনো গভীর মানস-সংকট নতুন এক ধাপ এগোবার পূর্বলক্ষণ, আর অন্তর্মুখীনতা আত্মজিজ্ঞাসা জীবনদেবতা সেই মানস-সংকটেরই ফল। রবীন্দ্রনাথ ক্রমেই জড়বাদী ও বহির্মুখীন হয়ে পড়ছিলেন এ কথা, সে হিসেবে, অর্থহীন। তাঁর অন্তর্মুখীনতা ও বহির্মুখীনতা একই বিবর্তনধারার বিভিন্ন ক্রম।

৪

বলাকার মধ্যে যে নবযুগের আভাস মেলে সে যুগের গল্প-উপন্যাসের মধ্যে সেটি স্পষ্টতর ভাবে অনুভব করা যায়। নবযুগের কাব্যের গোড়ার কথাটা হচ্ছে ক্রমিক বন্ধন- মুক্তি। এই বন্ধন ভাষার বন্ধন, ভাবের বন্ধন, ছন্দের বন্ধন। বলা বাহুল্য, ভাষা, ভাব বা ছন্দ তখনই বন্ধন যখন তারা কাব্যের প্রাণসারকে প্রকাশ করার বদলে ঢাকতে চায়, অলংকারের বদলে বেড়ি হয়ে দাঁড়ায়। বলাকায় মাপা অক্ষরের ছন্দের বন্ধন ভাঙা সেকারণে বিস্ময়কর নয়। ভাষার বেলায় দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ চলতি ভাষার দিকে এগোলেন। চতুরঙ্গ (রচনাকাল, ১৩২১) সম্ভবতঃ সাধুভাষায় লেখা তাঁর শেষ উপন্যাস বা বড়ো গল্প। তার মধ্যে ক্রিয়াপদ এতো কম, ভাষা এতো কঠিনতার দিকে ঝুঁকেছে যে স্পষ্ট

বোঝা যায় ঐ আঙ্গিক আর কবির ধাতে সইছে না। তারপর দেখা গেলো ঘরে-বাইরে (রচনাকাল, ১৩২২)। তার মধ্যে চলতি ভাষার সন্ধান মিললো, কিন্তু কবি সম্ভবতঃ ভাষার চলতি-রূপের ক্ষতিপূরণ করতে চাইলেন অত্যন্ত ভাবোচ্ছ্বাস দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের কথায় এই পার্থক্যের কারণ খুঁজতে হবে লেখকের পারিপার্শ্বিকে। "যে-কালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে, সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়তো আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। তাকে উদ্দেশ্য নাম দিতে পারি বা না পারি, এ-কথা বলা চলে যে লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে। আমাদের দেশের আধুনিক কাল গোপনে লেখকের মনে যে-সব রেখাপাত করেছে, ঘরে-বাইরে গল্পের মধ্যে তার ছাপ পড়েছে। কিন্তু এই ছাপার কাজ শিল্পকাজ।" লক্ষ্য করার কথা, যুগ যেমন অগ্রসর হয়েছে, জগতের আকাশে যেমন আলো-অন্ধকারের খেলা চলেছে, বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ যেমন ক্রমেই ভাঙনের দিকে এগিয়েছে রবীন্দ্রকাব্যের সুরও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। যুদ্ধশেষের যুদ্ধে যখন ফলোদয় ঘটলো না তখন আমাদের দেশে যে তীব্র আক্ষেপ ও আক্রোশ ঘনীভূত হলো অসহযোগ আন্দোলন তারই ফল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ভাবের প্রাধান্য, রবীন্দ্রনাথের গানে ও রচনায় তার অভিষেক, তার দৃষ্টিভঙ্গীও সর্বাঙ্গীণ। কিন্তু অসহযোগ অবিমিশ্র রাজনৈতিক আন্দোলন, নৈতিক আন্দোলন সে নয়। রবীন্দ্রনাথ সেইজন্য পীড়িত হয়েছিলেন, তাঁর আক্ষেপ হয়েছিলো অসহযোগের ডাক "কি সেই আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা! এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক?" কিন্তু যখন দেখা গেলো সর্ব্বতঃ স্বাহা-র পথে জগৎ চলছে না এবং সে পথে অগ্রসর হলে আশু ফললাভ অসম্ভব তখন কবির আশাভঙ্গ বিদ্রূপে পরিণত হলো। যে যুগে ভবিষ্যৎ-বিশ্বাস লুপ্ত নয় সে যুগে মুক্তির সন্ধানে একটা ভারসাম্য থাকে। কিন্তু যখন সামাজিক স্তর ভাঙায় শুধু নিরাশা ও নেতিবাদের প্রতিফলন তখন সাহিত্যেও সেইরকম এলোমেলো সুরভাঙা কাব্য, এমন কি অসংলগ্ন ব্যক্তিগত কাব্য, বেশী দেখা যায়। ঘরে-বাইরের পর রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রধান উপন্যাস, যোগাযোগ ও শেষের কবিতা। চোখের বালি-নৌকাডুবি-গোরা-চতুরঙ্গ-ঘরেবাইরে প্রভৃতি উপন্যাসের সঙ্গে এদের পার্থক্য স্পষ্ট। পূর্বের উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

লিখেছেন: "তারপরে ওই পর্দার বাইরেকার সদর রাস্তাতেই ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছে গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ। শুধু তাই নয়, ছোটো গল্পের পরিকল্পনায় আমার লেখনী সংসারের রূঢ় স্পর্শ এড়িয়ে যায় নি। নষ্টনীড় বা শাস্তি এরা নির্মম সাহিত্যের পর্যায়েই পড়বে। তারপরে পলাতকার কবিতাগুলির মধ্যেও সংসারের সঙ্গে সেই মোকাবিলার আলাপ চলছে। বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় একদিকে আমার মনকে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার আবর্তে টেনে এনেছিল, আর-একদিকে এনেছিল গল্পে এমন কি কাব্যেও মানবচরিত্রের কঠিন সংস্পর্শে।" পূর্বের উপন্যাসগুলিতে আপেক্ষিক গভীরতা আছে, তার তুলনায় পরবর্তী উপন্যাসগুলি অগভীর। শেষের কবিতা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শেষের কবিতা ট্র্যাজিডি কি ট্র্যাজিডি নয় তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তার মধ্যে যেটুকু ট্র্যাজিডি সেটি শৌখিন সমাজের ট্র্যাজিডি। এই পরগাছা শ্রেণীর শৌখিনতা পরিণামে ট্র্যাজিডি-ই, এনামেল-করা গাল বেয়ে চোখের জলের ধারা কোনও না কোনও সময় ঝরে পড়তে বাধ্য। অমিত একটু অতিশয়-ধর্মী, তাই তার সাধারণ আলাপও তির্যক ভঙ্গীর কবিত্বময় কথায়। কিন্তু তার অতিশয়টা বাদ দিলেই এযুগের শৌখিন শ্রেণীদের সন্ধান মেলে। এই শৌখিনতা লাবণ্যের মানুষী প্রেমের কাছে ভেঙে পড়লো। শেষের কবিতার শেষ কথা হচ্ছে,—

> তোমারে দিইনি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি'
> রজনীর শুভ্র অবসানে।

সুখের মধ্য দিয়ে নয়, দুঃখের মধ্য দিয়ে যে মহৎ মুক্তি নতুন উষায় দেখা দেয় সেই মুক্তি ছাড়া এই প্রাণ-হারানো শৌখিনতার হাত হতে উদ্ধারের উপায় নেই। এক্ষেত্রে শাণিত বিদ্রূপ, বৈহাসিক চটুলতা এবং বিপরীত মুখে উক্তির প্রাচুর্য স্বাভাবিক। কবির মানস-সংকট কাব্যে না হলেও গদ্যে চলেছে। যোগাযোগের মধ্যেও এই ট্র্যাজিডি অন্যভাবে ফুটেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর সংঘাতে অর্থের দম্ভে মানবস্বরূপটি চাপা পড়ে, প্রাণধারা স্তব্ধ হয়ে যায়। কুমুর আত্মসমাহিতির কারণই এই। তার মধ্যে স্বাভাবিক বিকাশ নেই; বিবাহের পূর্বে সে স্বামীকে দেবতার আসনে বসিয়েছে, বিবাহের পর সে স্বামীর মধ্যে কাল্পনিক দেবতার দেখা না পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু সবল

মানবিকতায় দৃপ্ত সে নয়। বর্তমানকাল মানুষকে পঙ্গু করেছে, কুমু তারই প্রতীক।

৫

সুতরাং দেখি, বলাকার সময় হতে যে পরিবর্তন শুরু হলো সেটি আংশিক নয়, সর্ব্বতোমুখীন। এটি একটি সম্পূর্ণ যুগ-পরিবর্তন। গত মহাযুদ্ধের সময় যে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব চলেছিল, তারপর যে তীব্র আলোড়ন জগতে এবং আমাদের দেশে দেখা দিলো সেই সময়েই এই যুগের শুরু। ক্রমশঃ ক্রমশঃ সমরোত্তর জগতে ভাঙনের ধারা প্রবল হয়ে উঠলো, নেতিবাদ ক্রমশঃ বেড়ে চললো। বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় আর একবার উলটপালট হলো। সে সময় এদেশের মধ্যবিত্ত সমাজেও সংকট তীব্রতর হয়ে দেখা দিয়েছিলো। লক্ষ্য করার কথা, গীতাঞ্জলি হতে লিপিকা-পুনশ্চ পর্যন্ত যে যুগটিকে বলাকার যুগ আখ্যা দিতে পারি সে যুগটি মোটামুটি ঐ দুটি ঘটনার দ্বারাই সীমাচিহ্নিত। গীতাঞ্জলির পর রবীন্দ্রনাথের যে মানস পরিবর্তন এসেছিলো তার মূল সুরটি বলাকায় ধরা পড়ে। তাই এটিকে বলাকার যুগ নাম দেওয়া সম্ভবতঃ অন্যায় নয়। এ যুগের মূলসুরটি হচ্ছে কবির অন্তরলোক হতে বহির্জগতে আসা। কবিতা সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত ব্যক্তিক বলেই কবিতায় বিধাতার আহ্বানশঙ্খ বেসুরো বাজে নি, সেই কারণেই বলাকার দুর্মদ উচ্ছ্বাসের পর স্বাভাবিক বিবর্তন চলেছে, পলাতকায় "সংসারের সঙ্গে সেই মোকাবিলার আলাপ চলেছে।" সেখানে উচ্ছ্বাস কম, কিন্তু বিষয়বস্তু আরো ঘরোয়া, সে 'নির্মম সাহিত্যের' পথে আরো অগ্রসর। কাব্যের মধ্যে যেটি ছন্দ ভাঙা বা তীব্র উচ্ছ্বাসেই নিঃশেষিত, উপন্যাসে সেটি কিন্তু শাণিত উপহাসে পরিণত; সম্ভবতঃ উপন্যাস কবিতার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম ব্যক্তিক ও বেশি সামাজিক বলেই এই ভাঙনের যুগে কাব্যে যেটি অন্বয়মুখে উক্তি উপন্যাসে সেটি বিরোধমুখের উক্তিতে পরিণত হয়েছে। চলতি ভাষার প্রচলন আঙ্গিকের দিক্ থেকে একই মানসিক হাওয়াবদলের পরিচায়ক। যে বৈঠকী ভাষা এতদিন প্রচলিত ছিল এখন তার পরিবর্তে অন্য বৈঠকী ভাষার প্রয়োজন

হলো কেননা শিক্ষিত সমাজের বৈঠকের চেহারা পরিবর্তিত। এগুলি শুধু কবির খেয়াল নয়, এর মধ্যে কালান্তরের ঘোষণাও আছে। বলাকায় এর প্রথম ও প্রধান ইঙ্গিত। যে দুর্মর প্রাণশক্তি ও ক্রমিক নবজন্ম রবীন্দ্রকাব্যের প্রধানতম লক্ষণ বলাকার যুগে তার আর একবার পরিচয় মেলে। রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়ের পূর্ব পর্যন্তই প্রায় এই যুগের রেশ চলেছিলো। এই যুগের মূল কথাটি বুঝতে হলে এদিক হতে বলাকার পুনরালোচনার প্রয়োজন আছে।

পাইকপাড়া

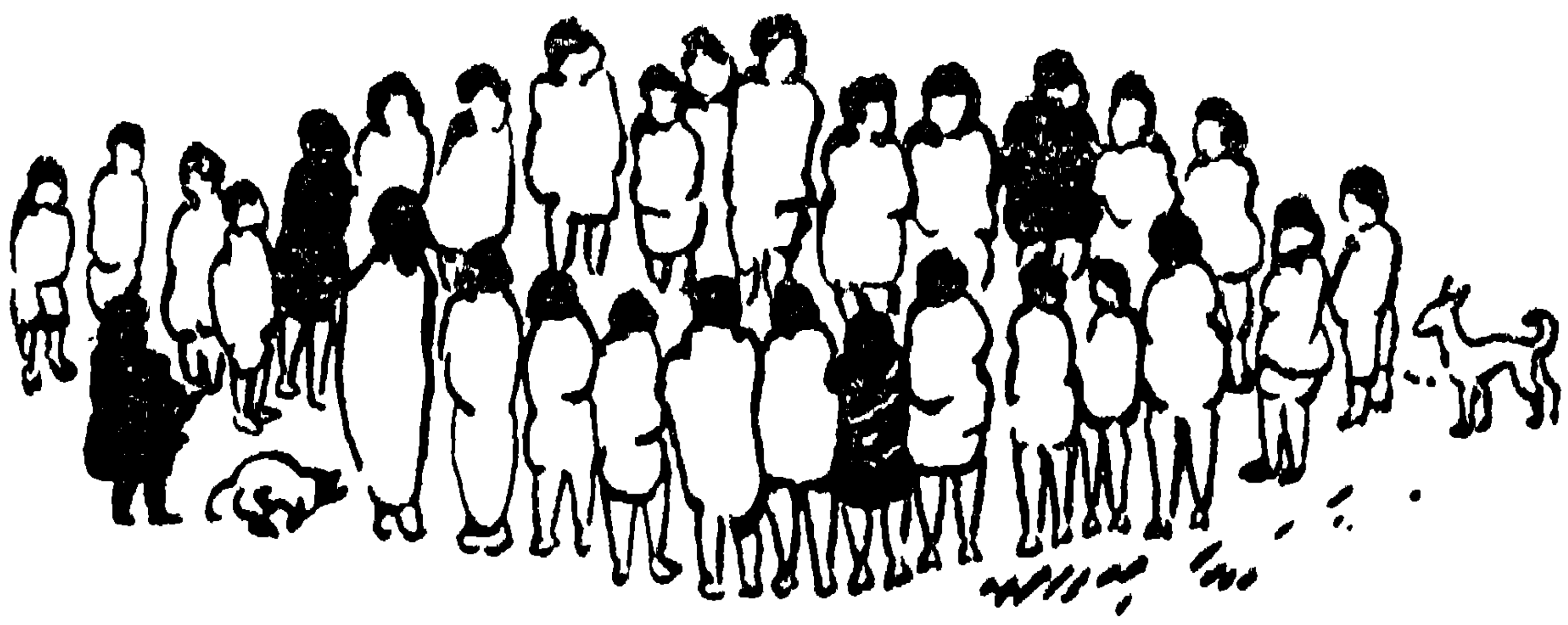

"মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি"*

শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী

আমার সামান্য বলবার কথাকে সোজাসুজি 'বক্তব্য' বলাই ভাল; 'অভিভাষণ' বল্লে লজ্জা দেওয়া হয়। যেমন আমাকে আজ আপনারা এই উচ্চ আসনে বসিয়ে লজ্জা দিয়েছেন। আমি জানি এই সম্মান অনেকাংশে আমার বয়সের খাতিরে লাভ করেছি। কিন্তু বয়সে বৃদ্ধ হলেই যে জ্ঞানে বৃদ্ধ হয় না, সে শাস্ত্রবচন ভুললে ত চলবে না।

আমি মিথ্যা বিনয় ক'রে আপনাদের সময় নষ্ট করতে আসিনি। সেকালের শিক্ষিত দলের মধ্যে আমি যে একজন, তা স্বীকার করছি। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি একথাও স্বীকার করতে বাধ্য যে, আজ যে-প্রকারের সভা ডাকা হয়েছে, আমাদের কালে ঠিক সে রকম সভাসমিতি ছিল না। তাই সভা-নেত্রীর যে কর্তব্য, অর্থাৎ আপনাদের এ সভাকে পরিচালিত ক'রে ঠিক পথে যাবার পরামর্শ বা নির্দেশ দেওয়া, সে কর্তব্য আমি ভাল রকমে পালন করতে পারব না। কারণ এখনকার শিক্ষিত মেয়েদের মন, তাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য, তাদের সামাজিক আবহাওয়ার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই; এ বয়সে নতুন করে কিছু শেখবার ক্ষমতা বা সময়ও নেই, বরং আমি শুনতে এসেছি তারা কি করছে, কি করতে চায়, এবং কি উপায়ে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে বলে' মনে করে। আমাদের তখন প্রধানত সাহিত্য সংগীত নিয়েই কারবার ছিল। এখনও তাই আছে। কত ধানে কত চাল হয়, তা কেউ আমাদের শেখায় নি, তাই আজও ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ে থাকি।

কল্যাণীয়া শ্রীমতী এলা রীড যে কাগজপত্র সম্প্রতি আমাকে পাঠিয়েছেন, তা'তে দেখলুম, যে সভা থেকে এই সম্মেলন ডাকা হয়েছে, সে সভার নাম কলিকাতা জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। এবং তার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলতে গেলে এই ভীষণ যুদ্ধের দুর্দিনে বাঙ্গলাদেশের নারী-শক্তিকে

* গত ৮ই মে সমিতির অধিবেশনে সভানেত্রীর অভিভাষণ।

জাগিয়ে ও নিয়মে বেঁধে একটি আত্মরক্ষার দল গড়ে' তোলা। অবশ্য কার্যক্ষেত্রে এই মূল উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হবে, যথা : আত্মশক্তি জাগাবার চেষ্টা; আক্রমণকারীর হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা; নিজ নিজ এলাকার মধ্যে সকল প্রকার জনরক্ষার কাজে সাধ্যমত যোগ দেওয়া; বিদেশী বিপদগ্রস্ত আশ্রয়প্রার্থীদের সহায়তা করা; দেশের লোকের দেশছাড়া হতে বাধ্য হলে তাদের সাহায্য করা; চাউলাদির দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার প্রতিকার-চেষ্টা; মেয়েদের বিপদে আত্মরক্ষার জন্য ব্যায়াম ও অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া; পাড়াগাঁয়ে অধিক খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা ও শহরে সাধ্যমত পুরুষদের কাজে সাহায্য করা, ইত্যাদি।

আত্মরক্ষা সমিতির প্রথম বার্ষিক বিবরণীতে দেখে সন্তুষ্ট,—শুধু সন্তুষ্ট নয়, আশ্চর্য হলুম যে, এই সামান্য এক বৎসর কালের মধ্যে তাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে কত দিকে কত কাজ করতে পেরেছেন। গত বৎসর বর্মা-আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই এ দেশবাসী মেয়েপুরুষ সকলে বুঝতে পারলে যে কত কাছে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। এ অবস্থায় কিংকর্তব্য স্থির করবার জন্য ঠিক এক বৎসর হল প্রায় জনশূন্য কলকাতা শহরেও যে সম্মেলনে অনুমান ৪০০ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্ত্রীলোক উপস্থিত হয়েছিল, তার থেকেই বর্তমান সমিতির জন্ম।

এই এক বৎসরের মধ্যে এই সমিতি (১) প্রথম ৫।৬ মাস ধরে' বাঙ্গলা দেশের ৭।৮টি বিভিন্ন জেলায় শাখা প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টায় অনেকটা সফল হয়েছেন, কলকাতার মধ্যেও ৮।১০টি শাখা স্থাপন করেছেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করবার পরে দেশের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ ও সরকার পক্ষ থেকে দমন-নীতির উভয়সঙ্কটে পড়ে' বিভিন্ন জেলার মহিলা-সংগঠনগুলি যাতে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে, সেই উদ্দেশ্যে গত অগস্টের শেষাশেষি এই সমিতি (২) একটি **আত্মরক্ষা সপ্তাহের** অনুষ্ঠান করেন, তা'তে নানাভাবে ও উপায়ে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝানো হয়। ঘরে-বাইরে অরাজকতা ও খাদ্যসঙ্কটের মধ্যেও এঁরা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে এ. আর. পি. আশ্রয়স্থল, টিউব্‌ওয়েল, লোকসংখ্যা ও কন্ট্রোলের দোকানের হিসেব নেওয়া, এবং সরকারপক্ষ থেকে যাতে অবস্থা বুঝে সুব্যবস্থা করা হয়,

তার জন্য প্রায় ১৫০০০ সই সংগ্রহ করে' দলবদ্ধ আবেদন পেশ করা প্রভৃতি কাজ করেছিলেন। তারপর (৩) মেদিনীপুরের বন্যার সাহায্যার্থেও কিছু টাকা তোলেন। (৪) বাঙ্গলাদেশে প্রকৃতপক্ষে বোমাবর্ষণ হবার পর সমিতির সভ্যরা বিলাতে Friends' Ambulance Unit-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত Women's Emergency Volunteer League বা সঙ্কটত্রাণ স্বেচ্ছাসেবিকা দলেও যোগ দেন। (৫) মহাত্মা গান্ধীজির অনশনে দেশব্যাপী উদ্বেগের সময়ও এই সমিতি স্থানে স্থানে দলবদ্ধভাবে তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা ও মুক্তির প্রার্থনা করতে ত্রুটি করেন নি।

(৬) কণ্ট্রোলের দোকানে দীর্ঘ সারবন্দী অবস্থায় দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান দুঃখী স্ত্রীলোকদের কিছু সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে সমিতির কয়েকজন সভ্য নানা অসুবিধা ও বাধা অগ্রাহ্য করে' উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার নানা হাট-বাজারে নিজেরা উপস্থিত থেকে যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করবার চেষ্টা করছেন, ও আন্তরিক সহানুভূতির গুণে গরীব দুঃখীদের বিশ্বাসভাজন হতে পেরেছেন। বস্তীর মেয়েদেরও এই কাজে স্বেচ্ছাসেবিকারূপে টেনে নিয়েছেন। ফলতঃ, শুধু উপদেশে নয়, দৃষ্টান্তদ্বারাও আত্মশক্তি এবং আত্মনির্ভরতার মর্যাদা দেখিয়েছেন। (৭) উত্তর কলিকাতায় ৭টি বস্তীতে নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক করে' মেয়েদের মধ্যে দেশ বিদেশের খবরাখবরের আলোচনা হয়। উত্তর দক্ষিণ উভয় অঞ্চলেই এ. আর. পি. ও প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হয়। লেক এরিয়াতে মেয়েদের খেলাধুলা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে একটি ক্লাবও খোলা হয়েছে।

(৮) সমিতি কিন্তু নিজে মনে করেন যে, তাঁদের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে এই দারুণ খাদ্যসঙ্কটের দিনে গত মার্চ মাসের মাঝামাঝি আইন সভাগৃহের প্রাঙ্গণে প্রায় ৫০০০ বুভুক্ষু বস্তীবাসী নারীর সমাবেশ ও মিলিত ভাবে মন্ত্রীসভার নিকট চালের দাবি পেশ করতে পারা। এবং তাঁদের বিশ্বাস যে এই সম্মিলিত দাবি উপেক্ষিত বা নিষ্ফল হয়নি; তার কতক প্রমাণ পাওয়া গেছে।

কিন্তু আমি পূর্বেই বলেছি যে, আমি সাক্ষাৎভাবে এ সভার সঙ্গে যুক্ত বা পরিচিত নই। বলতে গেলে আমি কিছুকাল থেকে শান্তিনিকেতনবাসী বা

প্রবাসী। আজ যে এখানে উপস্থিত হয়েছি সে কেবল এঁরা আদর করে' ডেকে এনেছেন বলে'; আর সভার কাজ সম্বন্ধে যে দুচার কথা বলতে পেরেছি, সে কেবল এঁদের বার্ষিক কার্যবিবরণী পড়ার ফলে। সে বিষয় এঁরা নিজেই বেশি বিস্তারিত খবর তোমাদের দিতে পারবেন।

আমি নিজের থেকে তোমাদের যদি কিছু বলতে পারি (অবশ্য তোমরা যদি শুনতে চাও ত) সে হচ্ছে সেকালের মেয়েরা মেয়েদের জন্য কি করেছেন, তার কিছু কিছু খবর। তাও তার সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়, কারণ আমি বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করবার সময় পাইনি; আর একজন মেয়ে নিজের জীবনে কতটুকুই বা চারপাশের খবর রাখতে পারে। আমার নিজের ক্ষেত্রে, অন্যত্রও অনেকবার যেমন বলেছি, বড় জোর এই কলকাতা শহরের ধরো ষাট বৎসর আগেকার ওরই মধ্যে অবস্থাপন্ন ইংরাজী শিক্ষিতসম্প্রদায়ের কথাই কতক বলতে পারি। তখনকার কার্যক্ষেত্র বা সমসাময়িক সমাজের অবস্থা জানলে তবেই ধারণা করতে পারবে কি উদ্দেশ্য নিয়ে সমাজসংস্কার আরম্ভ করা হয়েছিল। প্রথমতঃ ৮০ বৎসর আগে মেয়েদের লেখাপড়া শেখবার চাল ছিল না বল্লেই হয়; দ্বিতীয়তঃ অন্ততঃ সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের পর্দানশীন প্রথা সম্পূর্ণ বজায় ছিল। এ অবস্থায় শিক্ষাদানই ছিল তখনকার প্রথম লক্ষ্য; এবং সে উদ্দেশ্য সাধন করতে ব্রতী হন প্রথমতঃ খ্রীস্টান সমাজ, পরে ব্রাহ্ম সমাজ। সেই সঙ্গে হিন্দু সমাজেরও গণ্যমান্য লোকের যে যোগ ছিল না তা নয়। এঁদের স্থাপিত মেয়েদের ইস্কুল ত এখনো বর্তমান। যে স্ত্রীশিক্ষার বীজ তাঁরা বুনেছিলেন, তা' এখন বৃহৎ বৃক্ষরূপে শাখাপ্রশাখায় ফলে ফুলে শোভমান। সেই সঙ্গে পর্দাপ্রথাও ক্রমশঃ উঠে যেতে বাধ্য হয়েছে; কারণ অল্পসংখ্যক বড়মানুষ যদিও মেয়েদের ঘরে শেখাতে পারেন, কিন্তু লোকসাধারণের পক্ষে পর্দা ভেঙ্গে স্কুলে পাঠানোই সহজ ও স্বাভাবিক। ক্রমশঃ স্কুল থেকে কলেজে ধাপে ধাপে ওঠাও স্বাভাবিক, এবং সেই সঙ্গে কুমারী ছাত্রীদের ধাপে ধাপে বয়স বাড়াও স্বাভাবিক। তাই এক স্ত্রীশিক্ষা থেকেই বাল্যবিবাহ ও পর্দাপ্রথার উচ্ছেদ,—এই একে-তিন তিনে-এক সমাজসংস্কার সাধিত হল। যদি বলি যে আমার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর বাল্যকালে বাড়ীভিতরে পুরুষ চাকর ঢোকবার হুকুম ছিল না, ঘেরাটোপদেওয়া পালকীসুদ্ধ বাড়ীর মেয়েদের গঙ্গায় ডুব দিয়ে আনা হত, আট বৎসর বয়সে মেয়ের বিয়ে

দেওয়া 'গৌরীদান' বলে প্রশংসনীয় বিবেচিত হত ও তাঁর মায়ের আমলে স্ত্রীশিক্ষা নিন্দনীয় ছিল,—তাহলে এখনকার মেয়েরা কতকটা আন্দাজ করতে পারবেন একশ' বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার স্ত্রীসমাজে কি অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে।

শিক্ষা পেলেই মন খুলে যায়, চিন্তা ও বিচার করবার শক্তি বাড়ে। মতামত গড়ে' ওঠে, নিজের পরিবারের গণ্ডির বাইরে দৃষ্টি পড়ে, ও সমাজের উন্নতি করবার ইচ্ছা যায়। এক একটি পরিবারে যেন সেই যুগের সংস্কারক মনোভাব দানা বেঁধে ওঠে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী ছিল সেইরকম একটি পরিবার। আমার বাপের বাড়ী বলে' আমি একথা বলছিনে, কেবল তাঁদের কথাই বেশি করে' জানি বলে' এবং জীবনপথের শেষাশেষি এসে নিরপেক্ষভাবে দেখতে পাচ্ছি বলেই বলছি; অহমিকার ক্রুটি মার্জনীয়। সাধারণভাবে ধর্মালোচনা করাকে আমি ঠিক সমাজসংস্কারের আধুনিক পরিকল্পনার মধ্যে ফেলিনে। কারণ আপামর সাধারণে ধর্মপ্রচার ত আবহমানকাল আমাদের দেশে চলে' আসছে। তার প্রভাব সূক্ষ্ম ও ব্যাপক হলেও প্রত্যক্ষ বা আশু ফলপ্রদ নয়। ধর্মভাব আমাদের সহ্যধৈর্যের ক্ষমতা দেয় বটে; কিন্তু আজকালকার লোকের বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে একপক্ষ কেবলমাত্র সহ্য করতে থাকলে দুর্বল হয়ে পড়ে, আর প্রবল পক্ষের অত্যাচারপ্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে বাড়িয়ে তোলা হয়। এই নীরব সহ্যগুণের মূলে আছে আমাদের দেশের অদৃষ্টবাদ,—যার যা' কপালে আছে তা হবেই, অদৃষ্টের বিরুদ্ধে লড়ে' ফল কি,—এই মনোভাব। কিন্তু আজকালকার মতে এই বিশ্বাসই আমাদের যত দুর্গতির মূল, নিশ্চেষ্টার কারণ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তেই হবে, ন্যায়বিচারের চেষ্টা করতেই হবে, মানুষকে দুঃখদৈন্যের হাতে থেকে উদ্ধার করতেই হবে,—যতটুকু পারি, যে কজনে পারি, যতদিনে পারি। এই যে মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে, তার প্রতি বিশেষভাবে আপনাদের লক্ষ রাখতে বলি; কারণ এইটেই সকল সমাজসংস্কারের মূল। শিক্ষাও তার অঙ্গ, যেহেতু সৎশিক্ষার ফলেই মন উদার হয় ও পরোপকারের প্রবৃত্তি জাগে। প্রত্যেক মানুষে সুশিক্ষিত হলে প্রত্যেক মানুষই সুসভ্য হত, ও বোধহয় সমাজসংস্কারের কোন আবশ্যকতাই থাকত না। কিন্তু দুঃখের

বিষয় বনের মানুষকে শিখিয়ে পড়িয়ে মনের মানুষ করে' তুলতে অনেক সময় লাগে। যিশুখ্রীস্ট ও বুদ্ধদেব ত এত হাজার বৎসরেও তা করতে পারলেন না; বরং সম্প্রতি তারা পশুর অধম অবস্থায় নেবে যাবার লক্ষণ দেখাচ্ছে। তাই তাদের সুপথে আনবার অন্য কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

তবেই দেখা যাচ্ছে যে, সমাজসংস্কার মানে ধীরে ধীরে ব্যক্তিবিশেষের মনের ভিতর থেকে সংস্কার করে' তোলা ততটা নয়; কিন্তু বিস্তৃত ও প্রত্যক্ষভাবে সমাজের যথাসম্ভব আশু উপকার সাধন করা, সাধ্যমত দৈনন্দিন জীবনের অভাবমোচন ও দুঃখদৈন্য দূর করা। ধর্ম ও সাহিত্যালোচনা দ্বারা মনের উৎকর্ষসাধনে যে সমাজের উপকার হয় না, তা' কেউ বলছে না; কিন্তু সেটা সময়সাপেক্ষ। শিক্ষাবিস্তারে ভিতর থেকে ধীরে ধীরে মানবমনের এই উন্নতির চেষ্টা চল্‌তে থাকুক; কিন্তু সেই সঙ্গে বাইরে থেকে চাপ দিয়ে তাকে জোর করে' সুপথে আনবার আপাত ফলদায়ক চেষ্টা বা সরাসরি সাংসারিক উন্নতির চেষ্টাও চলুক যার অপর নাম সমাজসংস্কার।

সাংসারিক উন্নতি অনেকটা আর্থিক অবস্থার সঙ্গে জড়িত, বিশেষতঃ আমাদের দেশে গৃহস্থঘরের মেয়েরা যে রকম সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী, তাদের শিক্ষা দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করে' তোলাই ছিল প্রথম সমাজ-সংস্কারকদের প্রাথমিক চেষ্টা। আমাদের ছেলেবেলায় মনে পড়ে আমার স্বর্গীয়া পিসিমা স্বর্ণকুমারী দেবী বোধহয় ১৮৮৩ খ্রীঃ সখীসমিতি নামে একটি স্ত্রীসভা স্থাপন করেন, যার উদ্দেশ্য দুঃস্থ মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করে' দেওয়া। তার একটি অঙ্গ ছিল বাৎসরিক শিল্পমেলা, যাতে নানাপ্রকার লোভনীয় মনোহারী দ্রব্যের কেনাবেচা হত। একবার আমার উপর ফুলের দোকানের ভার পড়েছিল,— সেই সুকুমার হল্‌দে গোলাপের স্নিগ্ধ গন্ধ যেন এখনো পাচ্ছি। কি সুন্দর ফুল, কি মিষ্ট আঘ্রাণ! কবির কথায় "গন্ধ তাহার ভেসে আসে, আজি সজল সমীরণে।" কিন্তু আজ সজল সমীরণও নেই, (থাকলে ত বাঁচতুম!) আর কবিত্ব করবার স্থানকালও এ নয়। আর একটি অঙ্গ ছিল অভিনয় করে' টাকা তোলা। এই উপলক্ষ্যেই স্বনামধন্য 'মায়ার খেলা' রচিত এবং অভিনীত হয়। এই এক জিনিসের মধ্যেই মহিলাসমিতি, শিল্পমেলা, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি আধুনিক

সমাজের অনেক নিত্য ক্রিয়াকলাপের বীজ নিহিত ছিল দেখতে পাবেন। এই সখীসমিতিই আবার স্থাপয়িতার সুযোগ্যা কন্যা স্বর্গীয়া হিরণ্ময়ী দেবী এক মহিলা শিল্প সমিতিতে রূপান্তরিত করেন, যার থেকে হিরণ্ময়ী বিধবা শিল্পাশ্রম আজ পর্যন্ত পরিচালিত হচ্ছে; যদিও এ দুর্দিনে সকল নারী-প্রতিষ্ঠানই দুর্দশাগ্রস্ত। আমাদের দেশে দুঃস্থ বালবিধবার সমস্যা যে কি কঠিন, তা জানতে কারো বাকি নেই; এবং মাননীয়া লেডি অবলা বসু পরিচালিত বাণীভবন প্রভৃতি কত ভবন আশ্রম অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান তাদের আত্মনির্ভরশীল করবার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন, তা' প্রত্যেকটির নাম না করলেও অনেকেই অবগত আছেন। আমি সাধ্যমত পুরাতনগুলিরই নাম করবার চেষ্টা করেছি। তাও যদি সমসাময়িক কোন প্রতিষ্ঠানের নাম বাদ গিয়ে থাকে ত সে আমার অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তিবশতঃ। ব্রাহ্ম সমাজেরও অনেক প্রাচীন নারীপ্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা উচিত, যথা—আর্যনারী সমাজ, ভগ্নী-সমাজ, বরানগরের শশিপদ বাঁড়ুজ্যের আশ্রম ইত্যাদি। মোটামুটি সকলেরই উদ্দেশ্য দুঃস্থ মেয়েদের সাহায্য করা এবং উপার্জন করবার মত শিক্ষা দেওয়া। সাধারণ শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত মেয়েদের স্কুলের নাম আমি ইচ্ছা করেই বাদ দিলুম; কেবল শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণীর স্থাপিত ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে, সেকালে মেয়েদের বাইরে বেরনোর রেওয়াজ ছিল না, তখন ব্যাপকভাবে অন্তঃপুরশিক্ষা দেবার তাঁর এই প্রচেষ্টার একটা বিশেষত্ব ছিল।

আজকালকার দিনে মেয়েদের উন্নতিকল্পে মেয়েরা কত রকম অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন, তার উল্লেখ করা আমার উদ্দেশ্যবহির্ভূত, আগেই বলেছি। আত্মনির্ভরের কথাই যখন হচ্ছে, তখন সেকালের মেয়েরা অর্থোপার্জনের কোন্ কোন্ পথ খুলে দিয়েছিলেন, তা উল্লেখ না করলে তাঁদের দানের তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শিক্ষয়িত্রী, ও চিকিৎসাসেবার পথেই তাঁরা প্রথম এগিয়ে গিয়েছিলেন, যেমন আজও অধিকাংশই গিয়ে থাকেন। এবং এক্ষেত্রে শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু (বেথুন কলেজের নেত্রী) ও শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলীকেই (প্রথম ডাক্তারনী?) অগ্রণী বলে' মনে হয়। স্বনামধন্য ভারতী পত্রিকার সম্পাদনা স্বর্ণকুমারী দেবী বহু বৎসর এবং তাঁহার কন্যাদ্বয় কিছুকাল

যাবৎ করেছিলেন। যদিও সে কাজ অর্থকরী বলা যায় কিনা সন্দেহ।

আজকালকার দিনে যখন ব্যাঙ্ক থেকে বায়স্কোপ, এমন কি উড়োজাহাজ পরিচালনা থেকে মন্ত্রীপদ পর্যন্ত আমাদের মেয়েদের কাছে অর্থ ও সম্মানলাভের প্রায় সব দ্বারই অবারিত, তখন উক্ত কাজের গণ্ডি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ মনে হতে পারে। কিন্তু নবীনারা মনে রাখবেন যে, কেউ হঠাৎ ভুঁই ফুঁড়ে ওঠে না বা আকাশ থেকে পড়ে না; সব উন্নতিরই পূর্বাপর যোগাযোগ আছে ও ধাপে ধাপে নইলে সিঁড়ি ওঠা যায় না। আজ যে তাঁরা এত অবাধে শিক্ষালাভ ও স্বেচ্ছামত ঘুরেফিরে কাজকর্ম আমোদপ্রমোদ আহারবিহার করতে পারছেন, সে তাঁদের পূর্ববর্তিনীদের অধ্যবসায় ও অনেক বাধা সত্ত্বেও অগ্রগতির গুণে; সে জন্য তাঁরা আজ কৃতজ্ঞভাবে স্মরণীয়। আজ যে বাঙ্গালী মেয়ের বেশভূষা এত সুন্দর, বিচিত্র ও কালোপযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার মূলেও ছিল আমার মাতৃদেবীর পরিকল্পনা।

অনেক কথা বল্লুম, কিন্তু বঙ্গরমণীর অগ্রগতির ধারাবাহিক পরিচয় দিতে পারলুম না বলে' দুঃখিত। সে ইতিহাস লেখবার লোক সময়মত নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে; তার জন্য অপেক্ষা করে থাকো।

ইতিমধ্যে তোমরা ইতিহাস গড়তে ব্যস্ত, তোমাদের বেশি কথা শোনবার সময় নেই তা' জানি। নিজের ও পরের দুঃখ দূর করবার চেয়ে মহৎ উদ্দেশ্য আর কি থাকতে পারে? বিশেষ ক্ষুধার্ত পরিবারের খাদ্য-সরবরাহ করা ত মেয়েদের প্রথম ও প্রধান কাজ। যে কাজ নিজের ঘরের জন্য প্রত্যেক মেয়েকেই করতে হয়, সেইটেই তোমরা হাত বাড়িয়ে সমাজের জন্য করছ, এই যা' তফাত। আর অবস্থা-বিপাকে যে আক্রমণ যে-কোনো মুহূর্তে ঘাড়ে এসে পড়তে পারে, তার থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছ; সেও ত প্রাথমিক কর্তব্যের মধ্যে গণ্য, বলা বাহুল্য।

মানুষের জীবনে এমন এক এক সময় আসে, যখন পরিচিত জীবনযাত্রা উলটেপালটে যায়। যখন নতুন অনভ্যস্ত অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে অনেক কিছু পুরোনো ছাড়তে হয়, নতুন ধরতে হয়। এমন সময় হয়ত এখন এসেছে তবু আমি তোমাদের সাবধান করে' দিচ্ছি যে মনে রেখো

এই সঙ্কট অস্থায়ী মাত্র, চিরদিনের নয়। চিরদিনের হচ্ছে সেই গৃহ, যার সুখশান্তি, যার সন্তানপালনের ভার তোমাদের হাতে আছে এবং থাকবে। যতই বাইরের কাজ কর, দেখো যেন তোমাদের শরীরের স্বাস্থ্য ও গৃহের শান্তিভঙ্গ না হয়। মা ষষ্ঠীর কৃপা একটু কমে গিয়ে মা লক্ষ্মীর কৃপা যতদিন না বাড়ে আমাদের সাধারণ দুঃস্থ ঘরের মেয়েদের পক্ষে বাইরের কোন কাজ করা সম্ভব বলে মনে হয় না। তবে ঘরে বসেই অনেক কিছু করতে পারেন। আমার নিজের সন্তানাদি হয়নি, কিন্তু আমি ত আশপাশে দেখতে পাই ছেলেপিলে নিয়ে তাদের মাকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে সভাসমিতি করবে কখন ? আর আজকাল কুমারী জীবনের মেয়াদ অনেক বেড়ে গেছে, বিধবার সংখ্যা আজও কম নয়; নিঃসন্তান রমণী বা সদ্যবিবাহিতারাও সামাজিক কাজে অনায়াসে যোগ দিতে পারেন। তবে যতটা ভাল করে' করতে পারবেন তার বেশি কাজের ভার যেন না নেন। আমি স্বভাবতঃই বেশি বড় কাজে ভয় পাই, বহ্বারম্ভের প্রবাদ মনে পড়ে। এ সমিতি যত দিকে হাত বাড়িয়েছেন যদি সৌষ্ঠবপূর্বক সব দিক রক্ষা করে' যেতে পারেন তবে বাহাদুরি আছে বলতে হবে। সকল অবস্থায় তাঁরা যেন মাত্রা রেখে চলেন ও বাঙ্গালী মেয়ের স্বাভাবিক সংযম সম্ভ্রম রক্ষা করেন, এই উপদেশটুকু দিয়ে তোমাদের সমিতিকে অভিনন্দন ও আশীর্বাদ করি যেন উৎসাহ ও কর্মক্ষমতা ও সব দিক বজায় রেখে তাঁদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারেন। সম্মিলিত কাজ করতে গেলে যে ঐক্যবল এবং গঠনশক্তি সঞ্চার হয়, সেইটেই আমি প্রধান লাভ বলে মনে করি। বাঙ্গালীদের কোন কাজ বেশি দিন টেকে না, এই অপবাদ যেন তোমরা মিথ্যা প্রমাণ করতে পার।

পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত— [পোস্ট মার্ক—Shelidah, 5 Oc.00]

ভাই

আলো ও ছায়ার "মহাশ্বেতা" আমার ভাল লেগেছিল বেশ মনে আছে। আসল কথা আলো ও ছায়া লেখিকার ভাব, কল্পনা এবং শিক্ষা আছে কিন্তু তাঁর লেখনীতে ইন্দ্রজাল নেই, তাঁর ভাষায় সঙ্গীতের অভাব, আমার এই রকম মনে হয়েছিল, কিন্তু আর একবার পড়ে না দেখলে বলতে পারচিনে। পৌরাণিকী বলে একটা কাব্য কামিনী দেবী লিখেচেন, দেখেছ? সেটাও ঐ রকম, ভাল করে জ্বলে ওঠেনি। সেই অনির্ব্বচনীয় জিনিষটার অভাব সমালোচনায় বোঝান শক্ত। ভাবটা চিন্তাটা ওজন করে মাপ করে ভাষা থেকে ভাষান্তরে নিয়ে গিয়ে দেখান যেতে পারে, কিন্তু রসটাকে প্রত্যক্ষগম্য করা ভারি শক্ত। সেটা যদি শক্ত না হত তাহলে রসগ্রাহিতার এত আদর হত না। তুমি যখন আসবে আলো ও ছায়াখানি সঙ্গে করে এনো।

আসতে পারবে ত? আমি বোটে যাওয়ার কল্পনাটা পরিত্যাগ করলুম, কিন্তু তোমার আগমনপ্রত্যাশায় দেবেন্দ্র সেনকে পুনর্নিমন্ত্রণ স্থগিত রেখেছি—কারণ, তোমাকে আমি তাঁর সঙ্গে একত্রে চাইনে— আতিথ্যের কর্ত্তব্যপালনের হাঙ্গামার ভিতরে বেশ নিভৃতভাবে গুছিয়ে বসতে পারব না— অন্য লোক থাকলে তুমি এখানে এসে গৃহের স্বাদ পাবে না—তোমাকে অতিথিশালায় স্থান না দিয়ে গৃহে রাখতে ইচ্ছা করি।

কই? প্রদীপ ত আমার হস্তগত হয়নি। তুমি কি গীতিকার সমালোচনা করেছ? দেখবার জন্যে উৎসুক রইলুম— কিন্তু পূজার ছুটি উত্তীর্ণ না হলে পাব বলে আশা করচিনে। প্রদীপে কি তোমার রাস্কিনের উপসংহারটা বেরিয়েছে?

Tolstoyএর What is Art নামক একখানি বই পড়বার জন্যে সুরেন আমাকে পাঠিয়েচেন। আজ হস্তগত হল— এখনো পড়িনি। বোধ হচ্চে Art সম্বন্ধে তিনি একটা কোন নূতন পথে গেছেন। কিন্তু সমস্ত বড় বড় বিষয়ে পথ একটা বই নেই এবং সে পথ অতি পুরাতন— অপথের অন্ত নেই। তুমি আসবার সময় ভেবে চিন্তে দুচার রকম পড়বার বই নিয়ে এস। Le crime de Sylvestre Bonard নামক Anatole Franceএর ফরাসী বই যদি তোমার কাছে বা কোন্ দোকানে থাকে আমাকে পাঠাতে পার?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ

৫ই আশ্বিন * ১৩০৭

ভাই

এতদিন পরে আজ একটুখানি businesslike চিঠি লিখেছ— রোস, তাহলে পথঘাটের কথা বিস্তারিতরূপে বলা যাক্ :—

সকালে (কলকাতা টাইম্) সাড়ে ছটার সময় যে গাড়ি শিয়ালদহ ষ্টেশন ছাড়ে সেটাকে বলে চাঁদপুর মেল, বনাম চিটাগং এক্স্প্রেস। সেইটে সব চেয়ে দ্রুতগামী এবং সুবিধার গাড়ি। সেটা কুষ্টিয়ায় এসে পৌঁছয় সকাল ৯৷৷০/১০ টার মধ্যে। অর্থাৎ ঠিক স্নানের সময়। কুষ্টিয়ায় নেমে আমাদের বাড়িতে স্নানাহার করে বোটে করেও যাওয়া যেতে পারে, ষ্টীমারে করেও যাওয়া যায়। তুমি যদি এই গাড়িতে এস তা হলে ভোরে উঠে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া আর কোন অসুবিধা নেই। অবশ্য ভোরের বেলায় বিদায় লওয়ার ব্যাপারটা একটু করুণরসাত্মক হয় এবং সে রস যদি হতে-করতে একটু দীর্ঘ-কাল স্থায়ী হয়ে পড়ে তাহলে ট্রেন মিস্ করার সম্ভাবনা আছে— সেইটে যদি

* তারিখ লিখতে ভুল হয়েছে মনে হয়। ঐ বৎসর ৫ই আশ্বিনের পূর্বে বিজয়া দশমী হয়নি। পোস্ট মার্কে আছে 5 Oo. 00; ৫ই অক্টোবর ছিল বাংলা ১৯ আশ্বিন। এই তারিখটার অব্যবহিত পূর্বেই ছিল বিজয়া-দশমী। সম্ভবত ৫ই অক্টোবর লিখতে ভ্রমক্রমে ৫ই আশ্বিন লেখা হয়েছিল।

বাঁচিয়ে কোন গতিকে ঠিক সময়ে বেরিয়ে পড়তে পার তাহলে যাত্রার অবশিষ্ট অধ্যায়গুলো হুহুঃ শব্দে এগিয়ে যাবে। তোমার নিশ্চয় আসার খবর পেলে আমি কুষ্টিয়ায় উপস্থিত থাক্‌ব— নদীপথটা একত্রে ভোগ করা যাবে। যদি কোন কারণে এ গাড়িটা না পাওয়া যায় তবে কলকাতা টাইম্‌ সাড়ে সাতটার সময় যে প্যাসেঞ্জার ট্রেণ শেয়ালদ ছাড়ে সেইটেতে অধিরোহণ পূর্ব্বক বেলা ১॥০/২টার সময় কুষ্টিয়ায় অবরোহণ করতে পারবে— এবং গাড়ি থেকে নেমেই বাক্যব্যয় না করে একেবারেই ষ্টীমারে উঠ্‌তে হবে— এবং ষ্টীমার তোমাকে বেলা ৪।৫টার সময় শিলাইদহের ঘাটে নামিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে পাবনায় চলে যাবে। এ গাড়িটাও যদি ধরতে না পার তবে তুমি দুর্ভাগ্য— তাহলে রাত্রের গোয়ালন্দ মেল্‌ বই আর গতি নেই— সেটা ছাড়ে সাড়ে দশটা রাতে এবং পৌঁছয় রাত ২॥০টায়— অতএব এই গাড়িটাকে দুর্জ্জনবৎ পরিহার করবে। ভালমানুষের মত চাটগাঁ মেলেই প্রত্যূষে চড়ে বোস। কিন্তু পত্রখানি যেদিন পাবে সেই দিনই উত্তরে জানিয়ো সোমবারে কোন্‌ ট্রেনে তুমি ছাড়বে অথবা ছাড়বেনা। নতুবা কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত বৃথা যাত্রা করে ফিরে আসা আমি কিছুতেই উল্লাসজনক বলে বিবেচনা করিনে। চিঠি লেখার পরেও যদি কোন কারণে তোমার না আসা হয় তাহলে যথাসম্ভব সত্বর নিম্নঠিকানায় টেলিগ্রাফ করে দিয়ো :—

Babu Nagendranath Roy Chaudhuri
C/o Messrs Tagore & Co.
Kushtea.

আমি শৈলেশকে লিখে দিয়েছি যে, সে যদি ইতিমধ্যে বাড়ি থেকে ফেরে এবং শিলাইদা আসা সংকল্প করে তাহলে তোমার কাছে গিয়ে যেন বিজ্ঞাপন করে।

ষ্টীমার থেকে ওঠানামা সম্বন্ধে তোমার যদি কোন সংশয় থাকে তাহলে না হয় বোটে করেই যাওয়া যাবে—একটু সময়ব্যয় ছাড়া তাতে আর কোন অসুবিধা নেই—কিন্তু সময় যখন অত্যন্ত মহার্ঘ্য নয় তখন সে জন্যে ভাববার দরকার নেই।

• বিজয়ার প্রীতি অভিভাষণ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[পোস্ট মার্ক—Shelidah 9 Oc. 00]

ভাই

আজ এইমাত্র প্রদীপ পাওয়া গেল কিন্তু এখনো পড়িনি। সকাল বেলায় Tolstoyর বইখানা দেখছিলুম ওর সঙ্গে মতে মিলিনে কিন্তু খুব suggestive। আমার ইচ্ছে করচে ওর বিস্তৃত সমালোচনা করে একটা বড় প্রবন্ধ লিখি— তার মধ্যে আমার মতটা বেশ বিস্তৃত করে বল্‌তে পারি। তুমি রস্কিনে যে তর্ক তুলেচ এতেও তর্কটা তাই— তবে অনেকগুলো বিশেষত্ব আছে। সৌন্দর্য্য ও আর্ট সম্বন্ধে ইস্তক নাগাদ যত মতামতের সৃষ্টি হয়েছে টলষ্টোয় তার একটা চুম্বক দিয়ে তার উপরে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেচেন। এ বইটা যদি না পড়ে থাক ত পড়া আবশ্যক।

ব্যাকরণ ঘেঁটে ফরাসী শেখা আমার কর্ম্ম নয়— একটা বই দিয়ো। আমার লাইব্রেরীতে যে যে ফরাসী গ্রন্থের তর্জ্জমা আছে তারই কোন একটার original পেলে সুবিধা হয়। Gautier এর Capitane Fiacase, Daudet এর Jack, Maupassant এর Pierre & Jean, No Relation, Goncourt এর Sister Philomene, ইত্যাদি।

চমৎকার শরতের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সে আর কতবার বলব। রথী এবং আমার শ্যালক বোটে করে পদ্মায় বেড়াতে গেল। আমি আমার এই দক্ষিণের উন্মুক্ত দরজার কাছে স্থির নিস্তব্ধভাবে বসে বসে ভ্রমণ করব এই প্রকার সংকল্প করেছি।

কিন্তু তুমি করচ কি? লিখচ না পড়চ না পরের দলিল তৈরি করচ না চুপচাপ বসে আছ। পূজার গোলমাল ত চুক্‌ল— এখন তোমার শ্রম, না, শান্তি, না ক্লান্তি?

আমার ছোট গল্প আর অনেকগুলো মাথায় আছে। কিন্তু এখনো আমার পুজোর ছুটি ফুরোয়নি—তাই লেখায় হাত দিতে পারিনি। ছুটি শেষ হলেই একদিন তলব হবে তখন খাতাপত্র হাতে ডেস্কে বসে যেতে হবে। তুমি যে একটা গল্প লিখবে বলে গোপন গুজব তুলেছিলে তার কি হল বল দেখি? গুজবটাই গল্প হয়ে পড়ল নাকি?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[পোস্ট মার্ক—Pabna 27 Feb. 01]

ভাই

কিছুদিন থেকে অতিথিসৎকারের ব্যবস্থায় অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। প্রাতঃকাল থেকে রাত দেড়টা পর্যন্ত লেশমাত্র অবসর পাইনে— গৃহিণীর অবস্থা ততোধিক। তোমাকে অনেক দিন থেকে চিঠি লেখবার সঙ্কল্প করচি কিন্তু কোন্ মতেই হয়ে উঠ্‌চে না। অবশেষে ভারতী থেকে চিরকুমারসভার তাগিদ আসাতে নিতান্ত বিব্রত হয়ে আজ সকালে কোনমতে একটা নিভৃত কোণ খুঁজে নিয়ে একটা বড় কেদারায় বসে তারি হাতার উপর কাগজ রেখে রচনায় মন দিয়েছিলুম— এমন সময় বহুকাল পরে ডাকযোগে তোমার পরিচিত হস্তাক্ষর লেফাফার উপর থেকেই আমাকে সাদর অভিবাদন দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম হতে মুহূর্ত্তের মধ্যে আহ্বান করে নিলে। কিন্তু চিঠির মধ্যে যে অবসাদ ক্লান্তি এবং উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে তাই দেখে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হলুম। তোমাকে তোমার সমস্ত সাংসারিক ঝঞ্ঝাট থেকে কি উপায়ে যে একটা নিরাপদ বন্দরের মধ্যে আকর্ষণ করে আনব আমি ত কোনমতেই তা ভেবে পাইনে। অল্প মূলধনে সর্ব্বপ্রকার ক্ষতির আশঙ্কা বর্জ্জন করে কি করে এমন ব্যবসায় চালান যেতে পারে যাতে তোমার চলতে পারে? সম্প্রতি কলকাতার একজন মাড়োয়ারী baler এবং তার সঙ্গে একজন ইংরাজ আমাদের সঙ্গে অর্দ্ধেক ভাগে আগামী বৎসর কাজ করতে চায়— যা কিছু খরিদ হবে তার অর্দ্ধেক খরচ আমাদের অর্দ্ধেক তাদের— তারা নিজব্যয়ে কলকাতার Establishment চালাবে আমরা নিজব্যয়ে কুষ্টিয়া চালাব— আমরা খরিদ করব তারা বিক্রি করবে— লোকসানের সম্ভাবনা দেখলে অল্পের উপর দিয়েই কাজ বন্ধ করে দেব— এই রকম একটা প্রস্তাব চলচে— তুমি কি এ রকম কাজে হাত দিতে ভরসা পাবে? মূলধন পাঁচ হাজার এমন কি তার কম দিলেও চলে— লাভ যদি হয় যথেষ্ট হতে পারে— লোকসান হলে যাতে যথেষ্ট লোকসানের চেয়ে কম হয় সে জন্যে সতর্ক হওয়া যেতে পারে—কিন্তু লোকসানের লেশমাত্র আশঙ্কা থাকলেও কি তোমার কাজ করা পোষাবে? এ বৎসর কালিগ্রামে ধানের কারবার সুবিধা নয় বলে আমরা তাতে হাত দিইনি— কেবল আখের

কল পূর্ব্ববৎ চলচে। তুমি যদি আখের কলে টাকা ফেলতে চাও আমাদের আপত্তি নেই— কিন্তু আখের কল সম্বন্ধে কতকগুলি চিন্তার কারণ আছে— তোমাকে আমাদের কোন বিপদের মধ্যে জড়াতে ইচ্ছা করে না। কুষ্টিয়ায় আর একটা কাজ হতে পারে—নদীর ধারে খানিকটা জমি নিয়ে গোলাপের ক্ষেত করে কলকাতা market-এ ফুল supply করা। তাতে হাজার দুয়েক টাকা মূলধন লাগবার কথা— নগেন্দ্র সেই কাজে প্রবৃত্ত হবার সঙ্কল্প করচে— তুমি যদি ইচ্ছা কর তার সঙ্গে যোগ দিতে পার— কাজটা লাভজনক্ বলে অনেকে ভরসা দেয়। তুমি ফুলের market-এ খবর নিলেই জানতে পারবে গোলাপ তারা কি মূল্যে খরিদ ও বিক্রি করে। এ অঞ্চলের নদীতীরের বেলে জমি গোলাপের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল soil। টাকাটা ফেলে এক বৎসর অপেক্ষা করতে হবে— কিন্তু অল্প টাকা এক বৎসর পড়ে থাকলে বোধ হয় বেশি কষ্টকর না হতে পারে। তুমি যদি একবার এদিকে এসে পড়তে পার তাহলে এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক করা যেতে পারে। গোলাপের ব্যবসায় তোমার মত সৌন্দর্য্যপিসাসুর উপযুক্ত হতে পারে— এতে তোমার কোন এক ছেলে লেগে থাকতে পারে। ভেবে দেখো। তোমাকে কেবল কাজের চিঠি লিখলুম— কিন্তু সেটা আমার আন্তরিক উদ্বেগবশতঃ।

গোলমালের মধ্যেও গোটা ৯০ নৈবেদ্য লিখেচি। এখন অতিথির প্রতি মন দিতে চাই।

তোমার রবি

চেনাশোনা

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

পারপিয়া গুজরাতী মুসলমান। তাঁর পূর্বপুরুষ বাণিজ্য করতে চীন দেশে গিয়ে সাত দরিয়ার পার পেয়েছিলেন, সেই থেকে বংশপদবী "পারপিয়া"। যাঁর কথা লিখছি তিনি আমার সঙ্গে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন, আমরা দু'জনে একই জাহাজে তিন দরিয়ার পার পাই।

সপত্নীক পারপিয়া একদিন সপত্নীক আমাকে তাজমহলে নিয়ে গেলেন, অথ হোটেল। গড়নটা যথাসম্ভব পুবদেশী, তাজমহলের সঙ্গে ভাসা ভাসা সাদৃশ্য আছে। ভিতরে বিলিতী খানাপিনা গানবাজনা আদবকায়দা। স্বয়ং শাজাহান এলে মোগলের ঘরে ঘোগলকে দেখে চমকে উঠতেন। এটি বোধ হয় একমাত্র ভারতীয় হোটেল যেটি পশ্চিমকে পরাস্ত করেছে তার নিজের খেলায়। মালিকরা পার্সী, তাঁরা পরিচালনার দিক থেকে কোথাও কোনো খুঁত রাখেননি। তাই সাহেবলোকরাও সমুদ্রযাত্রার আগে এইখানে বসে সমুদ্রের সৌন্দর্য পান করেন, সমুদ্রযাত্রার শেষে এইখানে শুয়ে বাদশাহী স্বপ্ন দেখেন।

সেই যে মিসেস নায়ারের কথা বলেছি একদিন তাঁর ওখানে নিমন্ত্রণ। তিনি মহারাষ্ট্রীয়া, তাঁর স্বামী ডাক্তার নায়ার ছিলেন যত দূর মনে পড়ে কেরলপুত্র, জামাতা ডাক্তার বেঙ্কটরাও কর্ণাটকী। এঁরা বৌদ্ধ। কিন্তু প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধদেরই মতো হিন্দুসমাজের থেকে অবিচ্ছিন্ন। এঁরা একরকম একাকী একটা হাসপাতাল চালান। হাসপাতালটির নাম বাই যমুনাবাই হাসপাতাল। এখানে জাতিভেদ বা ধর্মভেদ নেই, কাউকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করারও অভিসন্ধি নেই। বিশুদ্ধ মানবসেবা এর আদর্শ। হাসপাতালটির যেখানে অবস্থান সেখানটি ধ্বনিবিরল ও নিভৃত। বেঙ্কটরাও আমাদের ঘুরিয়ে দেখালেন। ঘুরতে ঘুরতে আমরা হাজির হলুম হাসপাতালসংলগ্ন বৌদ্ধবিহারে। সেখানে আবিষ্কার করলুম দুটি সন্ন্যাসীকে।

একজনের নাম লোকনাথ। ইনি ইতালীয় বৌদ্ধ। এঁর কর্মস্থল ছিল

আমেরিকা, ইনি রাসায়নিক ছিলেন। যুদ্ধকালে মানবধ্বংসী বহু প্রক্রিয়া উদ্‌ভাবন করে পরে এঁর পরিতাপ জন্মায়। তারপর থেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। রাত্রে নাকি আসনে বসে নিদ্রা যান।

অপর জনের নাম সদানন্দ। ইনি জার্মান বৈষ্ণব। ইনি কেন সংসার ত্যাগ করলেন জানিনে। বয়স অল্প। বেশ বাংলা বলেন, চৈতন্যচরিতামৃত পড়েছেন। চেহারাও কতকটা বাঙালী বৈষ্ণবের মতো হয়েছে, দেখে বিশ্বাস হয় যে ইনি গৌরভক্ত। মানুষ কত সহজে বিদেশকে স্বদেশ করতে পারে তার দৃষ্টান্ত আগেও দেখেছি, তাই আশ্চর্য হইনি। পারবে না কেন? সবই তো মানুষের দেশ। পারে না তার কারণ অক্ষমতা নয়, অনিচ্ছা। অথবা সুযোগের অভাব।

অভিপ্রায় ছিল বম্বের শ্রমজীবী অঞ্চলে ঘোরাফেরা করব, স্বচক্ষে দেখব তারা কী ভাবে থাকে। এই সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে কার্নিক নামে এক ভদ্রলোক এলেন। তাঁর কাছে যেসব তথ্য পাওয়া গেল তাতে আমার স্বদেশের ধনিকদের প্রতি টান কিছু শিথিল হলো। এখন থেকে বলা যেতে পারে, বিশ্বাসো নৈব কর্তব্য ধনিকুলেষু চ। তাঁদেরও স্বদেশবিদেশ নেই, লাভের অঙ্কই ইষ্টদেবতা। সেই অপদেবতার পায়ে শ্রমিকের বলিদান যেমন বিদেশী কলে তেমনি স্বদেশী কলে। সরকারী আইনকেও যে তাঁরা কী ভাবে ফাঁকি দেন কার্নিক তা বিশদ করলেন। শ্রমিকদের একমাত্র অস্ত্র তো ধর্মঘট। সেই অস্ত্রের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগসত্ত্বেও তারা যে তিমিরে সেই তিমিরে। বরং তাদের কারো কারো অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। দশ বারো বছর ধরে তারা বেকার।

অধ্যাপক অল্‌তেকর শহরতলিতে থাকেন। শহরতলির নাম ভিলে পার্লে। এটা কোন্ দেশী নাম জানিনে। বোধ হয় পর্তুগীজ। একদিন আমাকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেলেন মধ্যাহ্নভোজনে। দেশী মতে অর্থাৎ মরাঠী মতে রান্না। গৃহিণীর স্বহস্তে পাক। পিঁড়িতে কি আসনে বসে খাওয়া গেল, পরিবেশনও গৃহকর্ত্রীর স্বহস্তে। এঁরা প্রাচীনপন্থী, প্রাচ্য আতিথেয়তার সবটুকু সৌন্দর্যের অধিকারী। ভাষার অভাব যে কত বড় অভাব, অনুভব করি যখন ভালো লাগা বোঝাতে চাই। আমার জানা ভাষা

কর্ত্রীর অজানা। অধ্যাপকের কাছে পাঠ শিখে নিয়ে তবে মুখরক্ষা। বর্গীয় হাঙ্গামার সময় থেকে মরাঠাদের সম্বন্ধে আমাদের একটা পরম্পরাগত ভীতি আছে। সেই যে "বর্গী এলো দেশে" বলে ছেলেভুলানো ছড়া, তার প্রভাব আমার মনের উপর বহুকাল ছিল। এবার তাঁদের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে মিশে, কফি খেয়ে, সাহিত্যালাপ করে মনের উপর থেকে পর্দা সরে গেল। বিচারপতি সেন মরাঠাদের বিশেষ ভালোবাসেন, আমিও অল্প কালের মধ্যে তাঁদের পক্ষপাতী হয়ে উঠি। কেন, কী করে বলব? একটা কারণ বোধ হয় তাঁদের বিদ্যানুরাগ। বিদ্যার জন্যে বিদ্যা ক'জন চায়? মরাঠাদের মধ্যে যে বিদ্যানুরাগ লক্ষ করলুম তা দেশানুরাগের মতো জ্বলন্ত ও নিস্পৃহ।

পারপিয়ারা আমাদের উইলিংডন ক্লাবে নিয়ে গেলেন। বম্বের ইঙ্গবঙ্গদের প্রধান ঘাঁটি। নাচ চলছিল ল্যামবেথ ওয়াক কি রুম্বা। পারপিয়ারা আমাদের ডাকলেন, কিন্তু আমরা ও রসে বঞ্চিত। দেখতে না দেখতে তাঁরা ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন, আমরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। অপরূপ পাগড়ি মাথায়, কী একটা পোশাক পরে কয়েকজন কচ্ছী জমিদার এসে আমাদের কাছাকাছি আসন নিলেন, শুনলুম মুসলমান। যাঁদের সঙ্গে বসলেন তাঁরা হিন্দু। নাচিয়েদের দলে পার্সী স্ত্রীপুরুষও ছিলেন। কসমোপলিটান আসর।

বম্বে থেকে পুনা যেন কলকাতা থেকে আসানসোল। রাঁচি বলতে পারলে দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুরত্বের আভাস দেওয়া চলত। ভয় ছিল শীতে হয়তো জমে যাওয়া যাবে, কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। বরং বম্বের গরমের পর পুনার ঠাণ্ডা আমাদের জানিয়ে দিল যে ওটা শীতকাল।

আবহবিদ্যামন্দিরের ডক্টর এস. এন. সেন ও তাঁর গৃহিণী আমাদের ঠাঁই দিলেন। "কত অজানারে জানাইলে তুমি," কবি যথার্থ বলেছেন, "কত ঘরে দিলে ঠাঁই!" দিন তিনেক পরে যখন বিদায় নেবার সময় এলো তখন সত্য হলো তার পরের পংক্তিটি—"দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।"

এই সেই পুণ্য নগরী যার সকাশে ভেট আসত দিল্লি থেকেও। দিল্লি থেকে, গুজরাট থেকে, উৎকল থেকে, তাঞ্জোর থেকে। এত বিশাল ছিল

মহারাষ্ট্র সীমান্ত! সেই নগরী এখন প্রদেশের রাজধানীও নয়। তার প্রধান আকর্ষণ তার ঘোড়দৌড়, প্রধান পরিচয় তার স্কন্ধাবার। বম্বের কুবেরকুল সেখানে বাগানবাড়ী করেছেন, শহরে অতিষ্ঠ বোধ করলে বাগানবাড়ীতে ছুটি কাটাতে আসেন। তাতে মোটরিং-এর ফূর্তিও হয়। আর হয় নিচু দরের দার্জিলিং-এর শীতভোগ।

এখনো বহু দেশীয় রাজ্য মরাঠাদের অধিকারে। গোয়ালিয়র, ইন্দোর, বড়োদা, কোল্হাপুর ইত্যাদি জুড়লে মহারাষ্ট্রের সীমান্ত সুদূরপ্রসারী। মরাঠাদের মনের উপর এর প্রভাব কোনো দিন নিষ্প্রভ হয়নি। বাংলার বাইরে লক্ষ লক্ষ বাঙালী সসম্মানে বাস করছে বলে বাঙালীর পক্ষে প্রাদেশিক হওয়া শক্ত। চার দিক থেকে বিতাড়িত হওয়ায় প্রাদেশিকতার সূচনা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু দশ দিকে ছড়িয়ে যাওয়াও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। তেমনি মরাঠাদের পক্ষে প্রাদেশিক হওয়া দুষ্কর। তাদের মধ্যে বরং একটু সাম্রাজ্যবাদের অভিমান আছে। কী করা যায়, মরাঠা সাম্রাজ্য তো ফিরবে না। তার বদলে যদি হিন্দু সাম্রাজ্য হয় তা হলে মন্দ হয় না। "হিণ্ডুডম" এই অপরূপ শব্দটি মহারাষ্ট্রীয় মস্তিষ্কের অপূর্ব উদ্ভাবন। আপাতত পুনা শহরটাই "হিণ্ডুডম"-এর প্রেসিডেণ্টধানী।

সেদিন অল্‌তেকরকেও পুনায় পাওয়া গেল। তিনি আমাকে প্রথমে নিয়ে গেলেন ফারগুসন কলেজ দেখাতে। এটি মরাঠাদের অতুল কীর্তি। গোখলের ত্যাগ ভারতবিদিত, কিন্তু ত্যাগ আরো অনেকের। কলেজ তখন বন্ধ ছিল। খোলা ছিল লাইব্রেরি। লাইব্রেরিতে বসে পড়াশোনা করার জন্যে বিস্তীর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার নিজের বই নেই তার বইয়ের ভাবনা নেই। কলেজটির অবস্থান, তার নির্মাণসৌষ্ঠব, তার বিদ্যার্থীভবন, সবই উন্নত ধরনের। পরের দিন আলাপ হলো মহাজনীর সঙ্গে। ইনি কলেজের অধ্যক্ষ। বয়স অল্প, মনীষা অসাধারণ। কেবল পড়ার গুরু নন, খেলার সাথী ও সেনানায়ক। এত বড় কলেজের অধ্যক্ষ, কিন্তু থাকেন একটি নগণ্য বাংলোয়। গোখলের মতো মহাজনেরা যে পথে গেছেন মহাজনী সেই পন্থা অনুসরণ করে স্বচ্ছন্দে না থাকুন স্বস্তিতে আছেন।

এর পরে সার্ভেণ্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে গিয়ে কোদণ্ডরাওকে

একটা চমক দেওয়া গেল। নিজেও পেলুম একটা চমক। এঁরা কত অল্পের মধ্যে ঘরসংসার চালান। সমস্ত ক্ষণ যেন তাঁবুতে। কখন্ কোন্খান থেকে ডাক আসবে, অমনি সুটকেস হাতে নিয়ে দু'এক হাজার মাইল রেলদৌড়। নিজের বলতে এঁরা বেশী কিছু রাখেননি। তবে একেবারে ফকির নন। গোখলে যে কেমন করে গান্ধীর আচার্য হলেন তার সাক্ষী এই ভারতসেবক সমিতি। এর রাজনীতি যাই হোক না কেন, এর কর্মনীতির তুলনা নেই। বিভিন্ন প্রদেশের নিঃস্বার্থ কর্মী ও বিদ্বানদের নিষ্ঠাপর জনসেবা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, দশকের পর দশক পরিচালিত হচ্ছে এই কেন্দ্র থেকে। এঁদের কার্যতালিকা বৈচিত্র্যময়। কোল ভীল অস্পৃশ্যদের মধ্যেও কাজ হচ্ছে, আবার মিল শ্রমিকদের মধ্যেও। বিদেশে এ দেশের শ্রমিকরা কী ভাবে থাকে তদন্ত করবার জন্যে মাঝে মাঝে এঁরা প্রতিনিধি পাঠান। কোদণ্ডরাওয়ের মুখে শোনা গেল ফরাসী ইন্দোচীনে তাঁর প্রবেশনিষেধের কাহিনী।

ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের ব্যবধান ইদানীং ধামাচাপা পড়েছে বটে, কিন্তু তার সত্তা এখনো রয়েছে। নেই যাঁরা ভাবেন তাঁরা কখনো বাঁকুড়া জেলায় বাস করেননি, মহারাষ্ট্রে প্রবাস করেননি, উৎকলে মানুষ হননি, দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করেননি। অল্তেকর বললেন আমি যদি তাঁর প্রদেশকে সব দিক থেকে চিনতে চাই তবে যেন অব্রাহ্মণদের সঙ্গেও মিশি। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন অধ্যাপক খাড়ুয়ের আবাসে।

খাড়য়ে সুধী ও সুপুরুষ। তাঁর সঙ্গে যা নিয়ে আলোচনা তার কিছুই স্মরণ নেই। শুধু মনে আছে পুনার মিউনিসিপাল পলিটিক্সে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ ভেদ বিদ্যমান। তা বলে সেটা মারাত্মক নয়, অব্রাহ্মণ দলে ব্রাহ্মণও জোটে, ব্রাহ্মণ দলে অব্রাহ্মণও। সাম্প্রদায়িকতার মতো জাতিভেদও দেখছি হনুমান ও বিভীষণের মতো অমর। রাবণরূপী সাম্রাজ্যবাদ যদি বা মরে এই দুটি আয়ুষ্মান যুগোচিত মুখোশ পরে লাফালাফি দাপাদাপি করতে থাকবে; যতদিন না অসবর্ণ ও অসাম্প্রদায়িক বিবাহ দেশব্যাপী হয়।

পরের দিন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলুম। মহারাষ্ট্রের আরেকটি অনুপম কীর্তি। কার্ভের দর্শন পাওয়া গেল। সাদাসিধে নিরীহ মানুষটিকে

দেখে দিনমজুর ভেবে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলুম। অলৃতেকর বললেন, ইনিই কার্ভে। অশীতিপর বৃদ্ধ, সেকালের মহাস্থবির। একদা এঁরাই ভারতের সঙ্ঘপতি ছিলেন, কখনো মিলিত হতেন পাটলীপুত্রে, কখনো পুরুষপুরে, কখনো নালন্দায়, কখনো বিক্রমশিলায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে মনে পড়ে যায়। কিন্তু কার্ভের কাজ মহিলাদের নিয়ে। তাঁর আবার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা মাতৃজাতির শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা। মরাঠির মতো একটি প্রাদেশিক ভাষায় ক'খানাই বা কেতাব আছে যা পড়ে ইতিহাসে দর্শনে গণিতে বা রসায়নে গ্রাজুয়েট হওয়া যায়। তবু কার্ভের দুঃসাহসে তাও সম্ভব হয়েছে। পরে এক গুজরাতী কুবেরজায়ার দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ হয়েছে, গুজরাতী মেয়েদের জন্যে শিক্ষার বাহন হয়েছে গুজরাতী। তাদের সুবিধার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগ স্থানান্তরিত হয়েছে বম্বেতে। পুনায় যেটুকু অবশিষ্ট সেটুকু দেখে সম্যক্ ধারণা হলো না।

এর পরে হিন্দু বিধবাভবন। এটিও পুনার তথা মহারাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। বিধবারা এখানে লেখাপড়া ও কাজকর্ম শিখে গ্রামে গ্রামে শিক্ষাবিস্তার করেন। শহরের বাইরে অবস্থান, স্বাস্থ্যকর আবেষ্টন। ফারগুসন কলেজ ও সার্ভেণ্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটির মতো এই প্রতিষ্ঠানটিরও কয়েকজন স্থায়ী কর্মী আছেন। অন্যূন বিশবছর কর্ম করবেন এই অঙ্গীকার দিতে হয়, বিশ বছর পরে নিষ্কৃতি। পরিচালনার ভার পনেরোজন নিষ্ঠাপর স্থায়ী কর্মীর হাতে। এঁদের মধ্যে কার্ভে তো আছেনই, আছেন আটজন বিদূষী মহিলা, প্রায় সকলেই কার্ভের প্রাক্তন ছাত্রী। এই প্রতিষ্ঠানটির অধীনে কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠান বা পাঠশালা আছে বিভিন্ন জেলায়।

মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনা কলেজের অধ্যক্ষ কমলাবাঈ দেশপাণ্ডে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক কেলকর মহাশয়ের কন্যা। ইউরোপের প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর। তার আগে নিজেদের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। ইনি বিধবাভবনেরও একজন স্থায়ী কর্মী। দুঃখের বিষয় অল্প বয়সেই বিধবা। সেকালের তপস্বিনীদের সম্বন্ধে আমাদের কল্পনায় একটি চিত্র আছে, কমলাবাইকে সেই ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মিলে যায়। তা বলে তিনি বল্কল কিম্বা চীবর পরিধান করেন না, অনাহারে কঙ্কালসার নন।

প্রভূত প্রাণশক্তির অধিকারিণী, সেই সঙ্গে মনস্বিতার। "প্রাচীন ভারতে শিশু" নামে একটি সন্দর্ভ লিখেছেন বিদেশী ভাষায়।

লোকমান্য টিলকের কর্মপন্থার উত্তরাধিকারীরূপে কেলকরের পরিচয় আমার অগোচর ছিল না। কিন্তু মরাঠাদের সেই লাল রঙের শিরস্ত্রাণ দেখলেই আমার শিরঃপীড়া জন্মায়। বাঁচা গেল সন্ধ্যাবেলা কেলকরকে নাঙ্গা শির দেখে! আদৌ ভীষণ নন, বেশ সহজ মানুষ, তবে রাশভারি। বাংলাদেশ সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন, যৌবনে যেন কিছু বাংলা শিখেছিলেন, মনে পড়ছে। বড় বড় মরাঠী বই লিখেছেন, একখানা দেখালেন। গম্ভীর বিষয়ের পুঁথি মরাঠারা কেনে। মরাঠারা সংখ্যায় বাঙালীর চার ভাগের এক ভাগ। কিন্তু তাদের রাজারাজড়ারা শুধু সংখ্যায় অগণ্য নয়, দাক্ষিণ্যে অগ্রগণ্য। কেলকর বয়োবৃদ্ধ, পত্রিকাগুলি সুযোগ্য হস্তে অর্পণ করে তিনি অবসর নিতে যাচ্ছিলেন। রাজনীতি থেকে অবসর, সাহিত্য থেকে নয়।

(ক্রমশঃ)

অন্নদামঙ্গল

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস উভয়ে মিলে যে ভারতচন্দ্রের একটি ভাল সংস্করণ প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছেন, এ কথা শুনে আমি মহাখুশী হই। কেননা এই যুগল সম্পাদকের প্রকাশিত ইতিপূর্বে যে সকল পুস্তিকা আমার চোখে পড়েছে, সে সকলই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ— পুরোনো সংবাদপত্র ও সরকারের দপ্তর থেকে দলিলপত্র ঘেঁটে অনেক অজ্ঞাত facts উদ্ধার করেন।

রামমোহন রায় সম্বন্ধে তাঁর সদ্য-প্রকাশিত পুস্তিকা তার প্রমাণ। তিনি রামমোহন রায়কে কিম্বদন্তির হাত থেকে উদ্ধার করে ইতিহাসের এলাকার মধ্যে আনবার চেষ্টা করেছেন ও অনেকাংশে কৃতকার্য হয়েছেন। অবশ্য এ পুস্তিকায় কোথায়ও কোথায়ও ফাঁক রয়ে গিয়েছে। সম্পাদকদ্বয় যে এবিষয়ে অক্লান্ত কর্মী, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভারতচন্দ্রের বর্তমান সংস্করণ যাকে বলে edition de luxe, তা নয়। তাহলেও তার কাগজ ও ছাপা পূর্ব পূর্ব সংস্করণের চেয়ে ঢের ভাল ও সুখপাঠ্য। এই কাগজের দুর্ভিক্ষের দিনে সম্পাদকরা এরকম কাগজ যে সংগ্রহ করতে পেরেছেন, সেটা আশ্চর্যের বিষয়।

আমি ভারতচন্দ্রের গুণগ্রাহী। যদিচ কৈশোরে তাঁর গ্রন্থের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। সেকালে স্কুলপাঠ্য কবিতাবলীতে ভারতচন্দ্রের দুটি একটি কবিতা উদ্ধৃত থাকত, যথা: "সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী" ইত্যাদি। তার বহুকাল পরে আমি যখন বি. এ. পড়ি, তখন রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে আমি প্রথম ভারতচন্দ্র পড়ি। তখন যে সংস্করণ আমার হাতে পড়ে, সেটি ভুলপ্রমাদপরিপূর্ণ। সম্পাদকদ্বয় একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করবার জন্য অসাধারণ পরিশ্রম করেছেন, এবং হস্তলিখিত পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তক থেকে বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করেছেন। তাঁদের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রকাশিত পুস্তক। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে পাঠ-উদ্ধারে অদ্বিতীয়,

তার প্রমাণ তাঁর প্রকাশিত সংস্কৃত হর্ষচরিতের আদি সংস্করণ। সুতরাং তাঁর প্রকাশিত 'অন্নদামঙ্গলে' ভুলভ্রান্তি থাকবার সম্ভাবনা কম।

প্রথম থেকে ভারতচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে আমার কৌতূহল ছিল। কবি ঈশ্বরগুপ্ত রচিত তাঁর জীবনী আজ পর্যন্ত সকলেরই কাছে একমাত্র প্রামাণ্য বলে গণ্য। আমার মনে হয় তাঁর কবিতার উদ্ধৃত অংশগুলি থেকে তাঁর কালনির্ণয় করা যায় না। সত্যপীরের পাঁচালী যখন তিনি লেখেন, তখন কারও মতে তাঁর বয়স ছিল পোনেরো, অপর কারও মতে পঁচিশ। দ্বিতীয়তঃ, বাঙলাদেশে তিন রকম অব্দ প্রচলিত, যথা: শক, সম্বৎ ও বঙ্গাব্দ। তিনি এর মধ্যে কোন্‌টির উল্লেখ করেছেন, বলা কঠিন। অবশ্য, কোনও কোনও শ্লোকে তিনি শকাব্দ শব্দের উল্লেখ করেছেন। তাঁর কালের বিচার এ প্রবন্ধে করা সম্ভব নয়।

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী থেকে তাঁর সমসাময়িক বাঙলার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার অনেক কথা জানা যায়। অন্নদামঙ্গলের গ্রন্থসূচনায় তিনি যে সব কথা বলেছেন, তার প্রায় সকলই সত্য। সে সময়ের দুখানি ইতিহাস আছে: একখানি Seir-ul-Mutaksharin ফারসীতে লেখা, যার একটি ইংরাজী অনুবাদ আছে; আর একখানি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রাজাবলী। এই দুই গ্রন্থের সাহায্যে ভারতচন্দ্রের কথা যাচিয়ে নেওয়া যায়। তিনি বলেছেন :—

মহাবদজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা বলে বার লক্ষ টাকা চায়॥
লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ।
সাজোয়াল হইল সুজন সর্বভক্ষ॥
বর্গিতে লুটিল কত কত বা সুজন।
নানামতে রাজার প্রজার গেল ধন॥

এই সুজন সিং ব্যক্তিটি কে, আমি বহুকাল আবিষ্কার করতে পারিনি; সম্প্রতি করেছি। সয়র-উল-মুতাক্ষরীনের দ্বিতীয় খণ্ডে ২৭ পৃষ্ঠায় তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন আলিবর্দির রাজস্ব বিভাগের বড় কর্মচারী। সুতরাং তাঁকে সাজোয়াল করা খুবই সম্ভব।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এই সংস্করণের দুরূহ শব্দের একটি ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়েছেন। তা'তে ভারতচন্দ্রের কাব্যের অর্থ করতে বিশেষ কোনো সাহায্য হয় না। ভারতচন্দ্রের লেখায় দুরূহ শব্দ খুব কম। কেবল বহু ফারসী ও আরবী শব্দ আছে, যার ঠিক অর্থ আমরা জানিনে; যারা জমিদারী সেরেস্তায় ব্যবহৃত শব্দ সকলের সঙ্গে পরিচিত, তারা ছাড়া। ধরুন এই সাজোয়াল শব্দ। সাজোয়ালের মানে হচ্ছে মালিকের নিয়োজিত সেই কর্মচারী, যিনি নিজেই প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করেন। এই রকম আরও অনেক শব্দ আছে, যার সঠিক মানে আমরা জানিনে। যদি জানতুম ত ভারতচন্দ্রের সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিশেষভাবে জানতে পেতুম। এ সব দুরূহ শব্দের অর্থ কোনো ফারসীনবীশের কাছে জেনে নিলে এ বিষয়ে আমাদের অনেক জ্ঞানলাভ হয়।

ভারতচন্দ্র শুধু কবি ছিলেন না। উপরন্তু তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক। এই ঐতিহাসিক ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে আমার কৌতূহল এ সংস্করণ দ্বারা সম্পূর্ণ চরিতার্থ হয়নি।

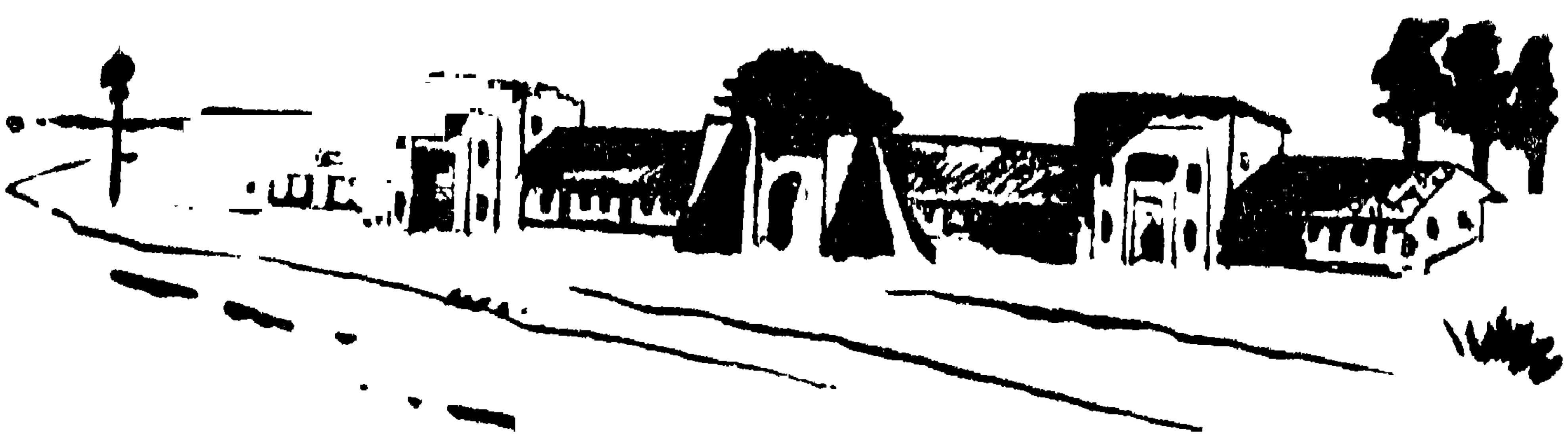

রবি-বর্তিকা

শ্রীহেমন্তবালা দেবী

গত ২২ শ্রাবণ ৮২ রবীন্দ্রাব্দ, কাশীস্থ গৌরীপুর ভবনে রবীন্দ্রনাথের স্মরণার্থ-উৎসব অনুষ্ঠিত হবার পর স্থানীয় সাহিত্য-রসিকদের সাহায্যে রবীন্দ্র-চক্রের পরিকল্পনা হয়; প্রোৎসাহিত করেন শ্রীযুক্তা হেমন্তবালা দেবী চৌধুরাণী। প্রতিষ্ঠানটির দীক্ষাকরণ হয়—রবি-বর্তিকা।

রবি-বর্তিকার উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে প্রধানতম উদ্দেশ্য রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার উপলব্ধি করা সাধারণের বোধগম্যের অতীত, তাই প্রচেষ্টা হবে বিশিষ্ট রসিকদের সম্মিলিত সাহচর্যে আলোর পথে এগিয়ে চলা। রবি-বর্তিকা-র অপর উদ্দেশ্য সংগীতানুশীলন। নারী জাতির কল্যাণ সাধনা ও তাদের সংকীর্ণ গণ্ডি বৃহত্তর করা। মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ মিলন ও পারস্পরিক প্রীতি রবি-বর্তিকা-র মূল আদর্শ।

গত ২৮ চৈত্র, ৮২ রবীন্দ্রাব্দ, রবি-বর্তিকা-র সাধারণ সভায় তিনটি বিভাগ পরিচালিত হবে বলে স্থিরীকৃত হয়। সাহিত্যিকা-র (সাহিত্য বিভাগ) সুচারু সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট থাকবেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, অধ্যাপক ডক্তর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়। ললিতা-র (মহিলা বিভাগ) নেত্রীত্বে রইলেন শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, শ্রীযুক্তা রমা দেবী ও শ্রীযুক্তা জ্যোতি ভট্টাচার্য এবং গীতিকা-র (সংগীত বিভাগ) পরিচালিকার পদে ব্রতী হোলেন শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী। রবি-বর্তিকা-র মূল সভাপতি, পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ এবং সম্পাদক, শ্রীযুক্ত বীরেন বিশ্বাস নির্বাচিত হয়েছেন।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

প্রথম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা

আষাঢ় ১৩৫০

চণ্ডীদাসসমস্যা

শ্রীসুখময় চট্টোপাধ্যায়

প্রায় পাঁচশত বৎসর ধরে' চণ্ডীদাসের অমৃতময় পদাবলী বাঙালীর জীবনে— তার সকল কাজে ও চিন্তায় রসধারা বর্ষণ করে' এসেছে। শ্রীচৈতন্য-দেব যখন যুবক, ভগবৎ প্রেমের নবীন উন্মাদনায় অধীর হ'য়ে নদীয়ার পথে পথে যখন তিনি নামসুধা বিতরণ ক'রে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁর সেই সময়কার সারারাত্রি-ব্যাপী নৃত্যগীতমহোৎসবের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছিল চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী। সন্ন্যাসজীবনেও পদাবলীর রসাস্বাদনই ছিল তাঁর মুখ্য কাজ।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ
মহাপ্রভু রাত্রিদিনে স্বরূপরামানন্দ সনে
গায় শুনে পরম-আনন্দ।

শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্য ভাবোন্মাদ ভক্ত বাঙালীর হৃদয়ে এখনও পর্যন্ত গভীর রেখায় অঙ্কিত রয়েছে। তাঁর তিরোধানের পর থেকে চৈতন্যবিরহকাতর বৈষ্ণবকবির কাব্যপ্রতিভা এক নূতন স্রোত ধরে' উৎসারিত হ'য়ে চলল। চৈতন্যদেবের জীবনচরিত রচনা, লীলাভিনয়, তাঁর লীলাবিষয়ক পদরচনাই হোল এ যুগের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর অনুচরগণের মধ্যে অনেকেই

চৈতন্যলীলাবিষয়ক পদ রচনা করে' অক্ষয় কবিযশ অর্জন করেছেন। মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ গুপ্ত, বাসুদেব ঘোষ, জগদানন্দ প্রভৃতি কবির পদাবলী বিচিত্র রসের সহযোগে শ্রীচৈতন্যদেবের ভাব ও আদর্শকে দেশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত করে' দিলে। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা কিছুদিনের জন্য চৈতন্যলীলার আড়ালে পড়ে' গেল। ষোড়শ শতকের শেষভাগে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রভৃতি পদকর্তাদের অভ্যুদয়। শ্রীকৃষ্ণলীলাই তাঁদের পদাবলীর মুখ্য বিষয় হ'লেও তাঁদের সৃষ্টির সুর সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁরা অলঙ্কার শাস্ত্রানুমোদিত রসপর্যায়ে কৃষ্ণলীলাকে ভাগ করলেন আর তার মধ্যে নিয়ে এলেন নূতন আবেগ, নূতন আদর্শ। তাঁদের রচনার ভিতর দিয়ে কৃষ্ণলীলা এক নূতন ছাঁচে গড়ে' উঠল। চৈতন্যপূর্বযুগে বৈষ্ণবসাহিত্যের উপাদান ছিল ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতি এবং কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নানা রকমের লৌকিক উপাখ্যান, কিন্তু এই নবাভ্যুদিত বৈষ্ণবসাহিত্য ভাব ও রসের উপাদান সংগ্রহ করলে শ্রীচৈতন্যদেবের লোকোত্তর মানবলীলা থেকে। এ যুগের রাধাচরিত্রে সর্বত্র গৌরাঙ্গলীলার সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে। রাধার বিচিত্র আবেগ ও উন্মাদনাময় যে মহাভাবের বর্ণনা বাংলার গীতিকাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অক্ষয় সম্পদ প্রাচীন পুরাণাদিতে তার আভাসমাত্রও ছিল না। রাধার মহাভাব বাংলার একান্ত আপনার ধন, বাঙালী কবির স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়াবেগ থেকে উদ্ভূত। আর এই মহাভাব একদিন রূপ ধরে' ফুটে উঠেছিল বাঙালীর ছেলে নিমাই-এর চরিত্রে। এ যুগের সাহিত্যে রাধা আর প্রাকৃত নায়িকা নন, বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রাকৃত সাহিত্য নয়। বৈষ্ণবগীতিকা ধীরে ধীরে রূপকের আকার ধারণ করলে। চৈতন্য-অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ উপাখ্যান গড়ে' উঠেছে তার স্রষ্টা রূপগোস্বামী। কালক্রমে এই অবতারতত্ত্ব থেকে নানা রকমের তত্ত্বালোচনা ও গীতিকাব্যের জন্ম হয়েছে। ভক্ত কবি গৌরাঙ্গবন্দনায় গেয়েছেন—

জয় নিজ কান্তাকান্তিকলেবর
জয় নিজ প্রেয়সীভাববিনোদ
জয় ব্রজযুবতিলোচনমঙ্গল
জয় নদীয়াবধূনয়ন-আমোদ।

চণ্ডীদাসসমস্যা প্রসঙ্গে এ জাতীয় ভূমিকা বাহ্যত অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও এর যে বিশেষ একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, সে কথা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল আনুমানিক ১৫৮০ খ্রীঃ। সনাতন গোস্বামিকৃত ভাগবতের বৈষ্ণবতোষিণী টীকা আরও আগেকার রচনা। দশম স্কন্দের ২৬ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় চণ্ডীদাসের উল্লেখ আছে— কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদি প্রসিদ্ধাস্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদি-দর্শিত দানখণ্ডনৌকাখণ্ডাদি প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ। এর পর থেকে অনেক বৈষ্ণবকবিই চণ্ডীদাসের প্রশস্তি গেয়েছেন।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে (১৬শ এর শেষভাগ) জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই তিন প্রাচীন বৈষ্ণবকবির উল্লেখ একত্র পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ দাস প্রেমবিলাস গ্রন্থে (১৬০০ খ্রীঃ) খেতরীর মহোৎসব বর্ণনাপ্রসঙ্গে চণ্ডীদাস-রচিত কৃষ্ণলীলার উল্লেখ করেছেন।

সন্তোষ গোবিন্দ গোকুল সবে গায় গীত।
চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলায় হরে সবার চিত॥

আজকাল চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই তাঁর সাধনসঙ্গিনী রজকিনী রামীর নাম আপনা থেকেই এসে পড়ে। রামীহীন চণ্ডীদাস-প্রসঙ্গ চণ্ডীদাস-কাব্যরসিকের নিকট সীতাহীন রামায়ণের মতই অত্যন্ত খাপছাড়া এবং উৎকট শোনায়। চণ্ডীদাস-রামী-ঘটিত প্রেমব্যাপার পরবর্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যে অপূর্ব তত্ত্ববস্তুতে পরিণত হয়েছে। এ সম্বন্ধে চণ্ডীদাসের ভণিতায় বহুসংখ্যক পদ গজিয়ে উঠেছে বর্ষার আগাছার মতো।

রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
কামগন্ধ নাহি তায়। ইত্যাদি অংশ এ যুগের শিশুদের নিকটও সুপরিচিত। রামী-চণ্ডীদাস-লীলাবিষয়ক নাটক রচিত এবং চলচ্চিত্রে অভিনীত হ'য়ে রসপিপাসিত বাঙালীর আসরে তত্ত্বময় অপূর্ব রসসুধা পরিবেশন করছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কোন প্রাচীন গ্রন্থেই চণ্ডীদাসপ্রসঙ্গে রামীর নামগন্ধও পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাসের এই সাধনসঙ্গিনীর সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় তরুণীরমণ কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়

নামক সহজিয়া গ্রন্থে। গ্রন্থটি ১৭ শ শতকের শেষ দিকে কিংবা ১৮ শ শতকের প্রারম্ভে রচিত। তারাখ্যরজকীসঙ্গী চণ্ডীদাসো দ্বিজোত্তমঃ। এই 'তারা'ই কালক্রমে রামতারা, পরে রামমণি, অবশেষে রামীতে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া আরও একটি রসাল উপন্যাসের ইঙ্গিত তরুণীরমণের গ্রন্থে পাওয়া যায়— লছিমা নৃপতেঃ কন্যা সক্তো বিদ্যাপতি স্তুতঃ। বলা বাহুল্য যে, বাঙালীর প্রতিভা এ ইঙ্গিতটিরও সদ্ব্যবহার করতে কিছুমাত্র কসুর করেনি। ঐতিহাসিকদের মতে দুটি উপন্যাসই অলীক। ১৮ শ ও ১৯ শ শতকে নব নব প্রতিভার সঞ্জীবনী স্পর্শের অভাবে যখন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা একঘেয়ে এবং নূতনত্ববর্জিত হয়ে পড়ছিল তখন সে যুগের অক্ষম কবিরা এই দুটি উপন্যাসকে বিশেষভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন নূতন একটা কিছু সৃষ্টি করবার মোহের বশবর্তী হ'য়ে।

বৈষ্ণবপদসংগ্রহ শুরু হয় ১৮শ শতকের গোড়ার দিকে। সবচেয়ে প্রাচীন সংগ্রহগ্রন্থ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-সঙ্কলিত ক্ষণদাগীতচিন্তামণির মধ্যে (১৭০৪ খ্রীঃ) চণ্ডীদাসের পদ একটিও নাই। এমন একটা ব্যাপারকে ঐতিহাসিকতার দিক থেকে নিতান্ত তুচ্ছ ও আকস্মিক বলে' উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তার পদ কোন সংগ্রহগ্রন্থে থাকবে না, এ যেন কেমন কেমন ঠেকে। এর তিনটি সঙ্গত কারণ দেখান যেতে পারে—(১) চণ্ডীদাস-পদাবলীর ভাষা প্রাচীন এবং দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছিল, (২) চণ্ডীদাস পদাবলীর বিষয়বস্তু এবং ভাব সে-যুগের পক্ষে তেমন রুচিকর ছিল না, (৩) বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যেরূপ বিশ্লিষ্টপদ বা খণ্ডপদ রচনা করে' গিয়েছেন চণ্ডীদাস-রচিত সে-জাতীয় খণ্ড পদের একান্ত অভাব ছিল। নিত্যানন্দ দাস প্রেমবিলাসে খেতরীর মহোৎসব বর্ণনা-প্রসঙ্গে "চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা"র জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সে একশত বৎসরেরও আগেকার যুগের কথা। তাছাড়া নিত্যানন্দ দাসের উক্তির মধ্যে চণ্ডীদাস-রচিত কোন খণ্ডপদের অস্তিত্ব সূচিত হয় না। "চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলায় হরে সবার চিত"— চণ্ডীদাস-রচিত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পাঁচালি-জাতীয় কোন ধারাবাহিক কাব্যের কথাই এখানে সূচিত হচ্ছে। রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্র-নামক বৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থে চণ্ডীদাসের নয়টি মাত্র পদ পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবদাস (আসল নাম গোকুলানন্দ সেন)-সঙ্কলিত পদকল্পতরু সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রহগ্রন্থ। এর ৩১০১টি সংগৃহীত পদের মধ্যে চণ্ডীদাসের পদ ১১৮টি। দেখা যাচ্ছে সংগ্রহগ্রন্থগুলিতে চণ্ডীদাসের পদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। আধুনিক সংগ্রহগ্রন্থগুলির মধ্যে অক্ষয় সরকারের প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ একসময় খুব জনপ্রিয় ছিল। জগদ্বন্ধু ভদ্রের গৌরপদতরঙ্গিনী (১২৭০ বঙ্গাব্দ) একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ সংগ্রহ করবার জন্য ভদ্রমহোদয়কে বাংলার নানান্ স্থানে ঘুরতে হয়েছিল, এবং নানান্ ধরনের বিস্তর হাতের লেখা পুঁথিও তাঁকে ঘাঁটতে হয়েছিল। ভূমিকার একস্থানে তিনি লিখেছেন, চণ্ডীদাস-রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বলে' একটি পুঁথির উল্লেখ তিনি স্থানে স্থানে পেয়েছেন কিন্তু পুঁথিটি কোথাও পাননি। এর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর ১৩১৬ সালে বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিটি আবিষ্কৃত হয়। চণ্ডীদাসের পদসংগ্রহ সকলের আগে করেন রমণীমোহন মল্লিক। তাঁর সংগৃহীত পদের সংখ্যা ৩৪০। নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহই সবচেয়ে বড়, পদসংখ্যা ৮৪৭। এটিই বাজারচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলী। সম্প্রতি ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ কর্তৃক এর নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

সমস্যার ছায়ামাত্র কোথাও নাই। গীতিকাব্যপ্রিয় বাঙালী কাব্যরসিক চণ্ডীদাসপদাবলীর রসধারা নিশ্চিন্ত মনে আস্বাদন করে' চলেছে, আর সে রস এই দুঃখতাপদগ্ধ সংসারমরুতে একান্ত দুর্লভ বস্তু। চণ্ডীদাসের কবিত্ব সম্বন্ধে নূতন করে' কিছু বলবার চেষ্টা করা অরসিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধকারের পক্ষে অনধিকারচর্চা মাত্র। সে কাজ করেছেন ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এবং বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ। চণ্ডীদাসের কাব্যে রাধার নিষ্কাম প্রেমের আদর্শ, বিরহিণী রাধার করুণ মর্মকাহিনী, প্রেমের সীমাহীন গভীর আন্তরিকতা, তার ওপর কবির অপূর্ব রসবৈদগ্ধ্য এবং অতুলনীয় প্রকাশভঙ্গি শুধু মুগ্ধ করে না, পাঠকের মনে ভাবের তীব্র উন্মাদনা জাগিয়ে তোলে। অনুরাগিণী রাধার কানে শ্যামনামের মত চণ্ডীদাসের পদও "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো।" বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, ভাষার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। সরলতা যে কতদূর শক্তিশালিনী এবং ব্যঞ্জনাময়ী হ'তে পারে তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ চণ্ডীদাসের

পদ। চণ্ডীদাস-পদাবলী এতদিন বিক্ষিপ্তভাবে প্রাচীন ও আধুনিক সংগ্রহ-গ্রন্থসমূহে, কীর্তনগায়কের কণ্ঠে কণ্ঠে, এবং কীটদষ্ট পুরানো পুঁথির মধ্যে ছড়ানো ছিল, সকলের আয়ত্তগম্য ছিল না। রমণীমোহন মল্লিক এবং নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গজননীর ঐকান্তিক সাধনালব্ধ সেই অমৃতফলগুলি একত্র সংগৃহীত ও প্রকাশিত করে' রসোপভোগের এক চিরন্তন উৎসধারা খুলে' দিয়েছেন।

এমন সময় এক অতর্কিত এবং অভাবনীয় আবিষ্কারের ফলে চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে বাঙালীর দৃঢ়বদ্ধ সংস্কারের মূলে প্রথম আঘাত লাগল। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কারের ইতিহাস সাহিত্যিক মহলে সুপরিচিত। পঞ্চাশ বৎসর আগে জগদ্বন্ধু ভদ্র চণ্ডীদাস-রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের নামোল্লেখ স্থানে স্থানে পেয়েছিলেন কিন্তু পুঁথিটি তাঁর হাতে পড়েনি। বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্রবংশীয় দেবেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘরে মাচার ওপর পুঁথিটি রক্ষিত ছিল। বসন্তবাবু কর্তৃক পুঁথিটি ১৩১৬ সালে আবিষ্কৃত এবং ১৩২৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়।

পুঁথির লিপি অতি প্রাচীন, বিশেষজ্ঞগণ ছাড়া আর কারও দন্তস্ফুট করবার সাধ্য নেই। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে পুঁথিটি ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দেরও পূর্বে লিখিত। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে এ ধরনের অক্ষরের ছাঁদ ১৫০০—১৫৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত রাঢ় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ভাষাতত্ত্ব আলোচনার পক্ষে গ্রন্থখানি একান্ত অপরিহার্য। এর আবিষ্কারের ফলে বাংলাভাষাতত্ত্বের অনেক জটিল রহস্যের সমাধান পাওয়া গিয়েছে। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

The next great landmark in the study of Bengali, after the Caryas, is Srikrisna Kirtan of Chandidas. This work, from point of view of language, is of unique character in the middle Bengali Literature....... its importance in the study of Bengali, in the absence of other genuine texts, is as great as that of the works of Layamon, Orm and Chaucer in English.

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদসংখ্যা ৪১৫। কাব্যটি তেরোটি খণ্ডে বিভক্ত

কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ধারাবাহিক পালাগান। ভণিতায় সর্বত্র বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস। রামীর উল্লেখ কোথাও নেই। ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন— "তবে কি আমাদের চিরপরিচিত চণ্ডীদাস আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক চণ্ডীদাস নহেন? চণ্ডীদাস কি দুইজন ছিলেন? দুইজনেই বড়ু চণ্ডীদাস, বাশুলীর আদেশে গান-রচনায় নিপুণ, রামী রজকিনীর বঁধু। তাহা ত হইতে পারে না। একজন তবে কি আসল, আর একজন নকল? কে আসল, কে নকল? ইত্যাদি নানা সমস্যা, নানা প্রশ্ন, বাঙ্গালা সাহিত্যে উপস্থিত হইবে।" এই প্রথম চণ্ডীদাসসমস্যার সৃষ্টি। কালক্রমে ভিন্নমতাবলম্বী তাকির্কদের লেখনীমুখে সমস্যা নানাদিক থেকে জটিলতর হ'য়ে উঠেছে। ত্রিবেদী মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে, "নানাসমস্যা, নানাপ্রশ্নে"র ঘাতপ্রতিঘাতে চণ্ডীদাসপ্রসঙ্গ আজ পঁচিশ বৎসর ধরে' ঐতিহাসিক এবং কাব্যামোদীদের রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছে। অবশ্য, এসকল সমস্যার যুক্তিসিদ্ধ, নির্ভুল প্রমাণযুক্ত কোন সমাধানই যে পাওয়া যায়নি, এমন কথা কোন মতেই বলা চলে না। এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করবার পূর্বে চণ্ডীদাসসমস্যার আবিষ্কর্তা স্বয়ং যে সমাধান করে' গিয়েছেন তারই উল্লেখ একান্ত প্রয়োজনীয়। পূর্বোক্ত প্রসঙ্গেই ত্রিবেদী মহাশয় লিখছেন— "আমার মতে—কৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাসই যে খাঁটি চণ্ডীদাস, তাহা অস্বীকারের হেতু নাই। সেই চণ্ডীদাসের ভাষাই এই কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে নূতন আবিষ্কৃত হইল— সেই ভাষাই কালে গায়কের মুখে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীতে এ কালের ভাষায় দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে সংশয়ের আমি হেতু দেখি না।" ত্রিবেদী মহাশয়ের উক্তি বিজ্ঞজনোচিত কিন্তু "সেই ভাষাই কালে গায়কের মুখে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীতে একালের ভাষায় দাঁড়াইয়াছে", শুধু এটুকু বললে চণ্ডীদাস সমস্যার কোন সমাধানই হয় না। প্রচলিত পদাবলীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মিল খুবই কম। তাছাড়া পদাবলীতে চণ্ডীদাসভণিতার আড়ালে যে সকল জাল এবং আবর্জনা আত্মগোপন করে' আছে সেগুলির পরীক্ষা বিশেষভাবে আবশ্যক।

চণ্ডীদাসসমস্যার সমাধানকর্তারূপে অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত রচনাবলীর রসঘটিত এবং ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা সম্বন্ধে গবেষণা

করে' তিনি যে সিদ্ধান্ত স্থির করেছেন এছাড়া আর কোন নির্ভরযোগ্য সমাধান সম্ভবপর নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালা থেকে তিনি প্রায় দুহাজার পদের একটি ধারাবাহিক পালাগান আবিষ্কার করেন। নীলরতন বাবুর সংগ্রহগ্রন্থে এই পদগুলির দুচারটি মাত্র পাওয়া গিয়েছে। ভণিতায় দীন চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়। বাশুলীর উল্লেখ কোথাও না পাওয়ায় মনে হয় দীন চণ্ডীদাস স্বতন্ত্র কবি। মণিবাবুর সম্পাদনায় দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৩৩-৩৪ সালের সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় মণিবাবুর প্রবন্ধে এবং দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভূমিকায় দীন চণ্ডীদাসের চৈতন্যপরবর্তিতা সপ্রমাণ হয়েছে। চণ্ডীদাসরচিত অনেক নূতন নূতন পদ আবিষ্কৃত হ'তে লাগল। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলী নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সবচেয়ে বেশি করে' চোখে ঠেকে ভণিতার বৈষম্য। ভণিতাই ছিল প্রাচীন এবং মধ্যযুগের কবিদের সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়। কবির নাম ও বৈশিষ্ট্য শুধু এই ভণিতার জোরেই বেঁচে থাকত। সকল কবিই সাধারণত একই রীতিতে ভণিতা দিয়েছেন। অনেক রচনার নানান ধরনের পাঠান্তর পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু ভণিতা সর্বত্র এক ধরনের। এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম চণ্ডীদাসের বেলায়। বিশেষণহীন চণ্ডীদাস, বড়ু, দীন, দীনহীন, দীনক্ষীণ, দ্বিজ, আদি, কবি বিশেষণযুক্ত চণ্ডীদাসের পদ আমরা পেয়েছি। ঐতিহাসিকের নিকট ভণিতায় এই রকমের অসামঞ্জস্য সত্যই সমস্যার সৃষ্টি করে। এ সব একই কবির রচনা কি না— এরূপ সন্দেহ খুবই স্বাভাবিক।

চণ্ডীদাসের পদে এই সাত-আট রকমের ভণিতা দেখে পাঠকের মনে সাত-আটজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বের সম্ভাবনা জেগে ওঠা অসম্ভব নয়। পদাবলীসাহিত্যে বারো-তেরোজন বলরামদাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে দু'চারজনের পরিচয়ও অল্পস্বল্প জানা যায়। এঁদের সকলেরই আসল নাম বলরামদাস নয়, বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের দাদা সাজবার লোভে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ভণিতায় এই ছদ্মনাম চালিয়েছেন। কয়েক বৎসর মাত্র আগে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ বলরামদাস-ভণিতায় পদ রচনা করেছেন। আরও একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে বিভিন্ন বলরামদাসের রচনায় স্বাতন্ত্র্য

ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ সুস্পষ্ট। একজন বলরামদাস ছিলেন যাঁকে আমরা রূপানুরাগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে' ধরে' নিতে পারি, তাঁর সব কয়টি পদই নিজস্ব গৌরবে স্বতন্ত্র ও অতুলনীয়। আর একজন বাৎসল্যরসবর্ণনায় অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চণ্ডীদাসের বেলায় অবস্থা ঠিক উলটো ধরনের, অর্থাৎ একমাত্র বড়ু চণ্ডীদাস ছাড়া আর সকলের রচনাই এক ছাঁচে ঢালা এবং একেবারে বৈচিত্র্যহীন। আবার বিভিন্ন সংগ্রহগ্রন্থে একই পদের ভণিতায় কবির ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ। যেমন—

(১) বিষ খাইলে দেহ যাবে রব রহিবে দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে কবি চণ্ডীদাসে॥

(২) বিষ খাইলে দেহ যাবে রব রবে দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

(৩) বিষ খাইলে দেহ যাবে রব রহিবে দেশে।
কলঙ্ক ঘুষিবে লোকে নিষেধিল চণ্ডীদাসে॥

এমন অসামঞ্জস্যের অসংখ্য নমুনা দেওয়া যেতে পারে। নীলরতনবাবুর সংগ্রহে কোন কোন পদের ভণিতায় "আদি চণ্ডীদাস" নাম পাওয়া যায়। আদি চণ্ডীদাস অর্থাৎ চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাস। এ ভণিতা নিশ্চয়ই চণ্ডীদাসের নিজের দেওয়া নয়, তাছাড়া এ থেকে একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সূচিত হচ্ছে। মণীন্দ্রমোহন বসু-সম্পাদিত দীনচণ্ডীদাসের পদাবলীর কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। দীনচণ্ডীদাস আমাদের আলোচ্য বিষয় না হ'লেও তাঁর সম্বন্ধে দুচার কথা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দীনচণ্ডীদাসের যে পদাবলী আবিষ্কৃত হয়েছে তার ভণিতায় বা অন্য কোথাও বাশুলী কিংবা রামীর নামোল্লেখ নাই। কবি সম্ভবত একজন কীর্তনিয়া ছিলেন এবং তাঁর রচিত কাব্য একটি সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক পালাগান। রচনার ভাব ও ভাষা এই উভয় দিকেই কবির অর্বাচীনত্ব অর্থাৎ চৈতন্যপরবর্তিত্ব সূচিত হচ্ছে। দীনচণ্ডীদাস যে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি তাতে সন্দেহের কারণ কিছুমাত্র নাই। এ বিষয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যোগেশচন্দ্র রায় প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মণিবাবুর সঙ্গে একমত। নীলরতনবাবুর সংগ্রহের কোন কোন পদ দীনচণ্ডীদাস-রচিত। বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ভণিতায় কোনরূপ গোলমাল

নেই— সর্বত্র একরূপ। কবির নাম ও বিশিষ্টতা নিয়ে পূর্ণভণিতা, সেই পূর্ণভণিতা চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদসমূহের মধ্যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই পাওয়া যায় এবং এই ভণিতা যে কবির নিজের দেওয়া সে সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। আগেকার যুগে কবির নাম ও পরিচয় স্থায়িত্ব লাভ করত সাধারণত ভণিতার জোরেই। সেজন্য দেখা যায়, ভণিতার দিকে তাঁরা বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন, অর্থাৎ সর্বত্র ঠিক একরকম রীতিই বজায় রাখতেন। যেমন চৈতন্যচরিতামৃতে—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

এই ভণিতাই সর্বত্র। তেমনি বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে—

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ

কিংবা—

বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস। ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ভাব, বিষয়বস্তু, ভাষা এবং ভণিতা সকল দিক দিয়েই সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। কাব্যটি যে এক যুগের এবং এক কবির রচনা, বাইরের কোনরূপ প্রমাণের ওপর নির্ভর না করে'ই একথা নিসংশয়ে বলা চলে।

দ্বিজ চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গে মণিবাবু লিখেছেন, "অনেকেই দ্বিজ চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বিরাট ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন।" তাঁদের ধারণা, ইনিই বুঝি খাঁটি চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যদেব অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে যাঁর অমৃতময়ী পদাবলীর রসাস্বাদন করতেন। অবশ্য, পদাবলীসাহিত্যের কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদ দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া গিয়েছে। কয়েকটি পদের কবিত্ব সত্যাই প্রশংসনীয়, কিন্তু শুধু কবিত্বের দোহাই দিয়ে কোন বিষয়ের ঐতিহাসিক সত্যাসত্য নির্ণয় করতে যাওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে একটি প্রধান অভিযোগ এই যে এর প্রত্যেক পদে, প্রত্যেক চরণে শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্তিত ভাবধারার ছাপ সুস্পষ্ট। চৈতন্যপূর্ববর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণলীলার সূত্র ধরে' কোন তত্ত্ব দানা বেঁধে ওঠেনি। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণ তাঁদের কাব্যে

প্রেমের প্রাকৃত লীলাকেই বিচিত্র রসাভিব্যক্তি দিয়েছেন। রাধা ও কৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি দুর্নিবার প্রেমাকুলতাকে তাঁরা নানান ধরনের বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সাহায্যে রূপ দিয়ে গেছেন, কোথাও তত্ত্বের অবতারণা করেননি। সেরূপ কোন তত্ত্ব দেশে বর্তমান থাকলে পূর্বোক্ত কবিগণের রচনায় তার অল্পস্বল্প আমেজও নিশ্চয়ই থাকত। শ্রীকৃষ্ণ যে পরম ব্রহ্মের রসমূর্তি, রসাস্বাদনই যে কৃষ্ণাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য, "মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরানী" যে মধুররসের ভেতর দিয়ে নিষ্কাম ভগবদনুরাগের আদর্শ, চৈতন্যদেবের পূর্বে এসকল তত্ত্বের নামগন্ধও কোথাও ছিল না। সুতরাং নায়িকার পূর্বরাগবর্ণনায় এধরনের উক্তি,—

অকথন বেয়াধি এ কহন না যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥ ইত্যাদি

চৈতন্যপূর্বযুগের সাহিত্যে থাকতেই পারে না। ওপরের চরণদুটিতে কোন কবিত্ব নেই, আছে শুধু একটুখানি তত্ত্ব, কারণ নায়িকার পক্ষে এরূপ আচরণ কোন আলঙ্কারিকই রসবস্তু বলে' স্বীকার করবেন না। এখানে চৈতন্যলীলার প্রভাব সুস্পষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণকারী অস্পৃশ্য দূষিত-রোগগ্রস্তকেও গাঢ় আলিঙ্গন করে' শ্রীচৈতন্যদেব ভাবাবেশে অশ্রুবর্ষণ করতেন। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত কোন কোন পদে শ্রীচৈতন্যদেবের সুস্পষ্ট উল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। একটি পদের শেষে আছে, "নাহি চিনি কালা কিংবা গোরা।"

আজু কে গো মুরলী বাজায়
এতো কভু নহে শ্যামরায়।
ইহার গৌরবরণ করে আলো
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল॥

ইত্যাদি পদটির ভণিতায়—

চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে
এরূপ হইবে কোন্ দেশে।

এখানে রয়েছে চৈতন্য-অবতারতত্ত্বের কথা, যার স্রষ্টা রূপগোস্বামী, সে উপাখ্যানকে পরবর্তী জীবনচরিতকার ও গীতিলেখকগণ নানাবিধ উপায়ে

পল্লবিত করেছেন। এ সকল পদের টীকা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলে' থাকেন, চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যদেবের আগমনী গেয়েছেন, কিন্তু এ হোল নিছক ভাবোচ্ছ্বাসের কথা। এজাতীয় উক্তির ঐতিহাসিক মূল্য কিছুই নাই। তাছাড়া এসকল পদের কোনটিই মূল চণ্ডীদাসের রচনা নয়, চৈতন্যপরবর্তী কবি দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যেই এদের ন্যায্য স্থান। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করবার এই যে, ভণিতায় বাশুলীর উল্লেখ নাই। "বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ" পদটি চণ্ডীদাসের কবিত্বের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শনরূপে সচরাচর উদ্ধৃত হ'য়ে থাকে, কিন্তু এটিও দীন চণ্ডীদাসের রচনা। সুতরাং দেখা যায়, চণ্ডীদাসপদাবলীর অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিত্বযুক্ত পদের রচয়িতা "আদি" চণ্ডীদাস নন, দীন চণ্ডীদাস, আর সে পদগুলির ভাষা ও ভাব দুইই চৈতন্যপরবর্তী যুগের। দীন চণ্ডীদাস-রচিত পদের ভাবমাধুর্যে অনেক কাব্যরসিক উচ্ছ্বলিত হয়ে পড়েন, ভ্রমবশত মনে করেন, সেই "আদি" চণ্ডীদাসের কাব্যরস আস্বাদন করছেন। নিচের পদটি কীর্তন-গায়ক ও বৈষ্ণব ভিখিরীদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়—

রাই তুমি সে আমার গতি
তোমারই কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি। ইত্যাদি।

মাত্র তিনটি চরণ থেকেই বোঝা যায়, পদের ভাবটি চৈতন্যপরবর্তী যুগের। এ ভাবের জন্মদাতা শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং এবং তার প্রচারক গোস্বামিগণ। রূপগোস্বামিকর্তৃক "মনো মে কালিন্দী পুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি", এই শ্লোক রচনার ইতিহাস চৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত। শ্লোকের মধ্যে ওপরের পদের ভাবটি ধ্বনিত হচ্ছে, বর্ণিত বৃত্তান্ত থেকে জানা যায়, শ্লোকটির বীজ নিহিত ছিল চৈতন্যদেবের হৃদয়ে। ভাগবতকার অসুরমারণাদি কার্যকেই কৃষ্ণাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য বলেছেন, ব্রজলীলা তাঁর জীবনের একটা অংশমাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রও কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে ব্রজলীলার ঐতিহাসিকতা স্বীকার করেননি, মনোজ্ঞ উপন্যাস মাত্র বলে' একেবারে বর্জন করেছিলেন। পরবর্তী সংস্করণে যে সামান্য অংশটুকু ইতিহাস বলে' গ্রহণ করেছেন, সেখানেও আবার রূপকব্যাখ্যা চালিয়েছেন। রসাস্বাদনই যে কৃষ্ণলীলার মুখ্য উদ্দেশ্য,

এ ভাব চৈতন্যদেব ও তাঁর সৃষ্ট বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একান্ত নিজস্ব। কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন, "আনুষঙ্গ কর্ম এই অসুর মারণ।"

প্রেমরসনির্যাস করিতে আস্বাদন
রাগমার্গভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ—
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম।

বলা বাহুল্য, আলোচ্য পদটি দীন চণ্ডীদাস-রচিত এবং দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর অন্তর্গত।

পদাবলীর মধ্যে আরও অনেক গোলযোগ আছে। দ্বিজ চণ্ডীদাস ও বিশেষণহীন চণ্ডীদাস-ভণিতার অনেক পদ দীন চণ্ডীদাস-রচিত। মনে হয় দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি ও চৈতন্যপরবর্তী এবং নিশ্চয়ই সেই চণ্ডীদাস নন, যাঁর পদাবলী চৈতন্যদেব আস্বাদন করতেন। এ বিষয়ে ডাঃ সুকুমার সেনের উক্তিটি উল্লেখযোগ্য—"চণ্ডীদাস-ফ্যাশন প্রবর্তিত হওয়ায় শুধু যে চণ্ডীদাস ভণিতায় নূতন পদ রচিত হইতে লাগিল এমন নহে, পুরাতন কবিদিগের উৎকৃষ্ট পদগুলি চণ্ডীদাসভণিতায় রূপান্তরিত হইতে লাগিল। ইহার জন্য দায়ী অবশ্য কীর্তনিয়ারাই বেশী। এই কারণেই নরহরি সরকার, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, নিত্যানন্দদাস, রামগোপালদাস ইত্যাদি কবির ভাল ভাল পদ পরবর্তীকালে পুঁথিতে ও কীর্তনিয়ার মুখে চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে।" এরূপ বহুসংখ্যক জাল চণ্ডীদাস পদাবলীতে স্থান পেয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের প্রসিদ্ধ পদটি—

সজনি ও ধনী কে কহ বটে
গোরোচনা গোরী নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিলুঁ ঘাটে। ইত্যাদি

পদকল্পতরুতে লোচনদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। নরহরি সরকারের কতকগুলি পদ চণ্ডীদাসের নামে চলছে।

কি না কৈল সই মোরে কানুর পীরিতি।
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি। ইত্যাদি পদটি

পদামৃতসমুদ্রে নরহরির ভণিতাযুক্ত। তেমনি—

সই কত না সহিব ইহা

আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া।—

পদটিও নরহরি সরকারের।

সুতরাং চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর কতকগুলি পদ দীন চণ্ডীদাসের, কতকগুলি নরহরি সরকার ঠাকুর, লোচনদাস, জ্ঞানদাস-রচিত। বাকি কতকগুলি পদ আছে, যেগুলি প্রসিদ্ধ পদকর্তাদের ভাল ভাল পদগুলি থেকে দুচার চরণ করে' তুলে নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। আবার বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদও আছে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সে পদগুলির মূল পাওয়া যায় না। সম্ভবত পদগুলি বড়ুচণ্ডীদাস-রচিত নয়, কারণ কোন কোনটিতে চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণবভাবধারার সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। এমন দুটি পদ পর পর দেওয়া গেল। একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে, পদগুলি গায়কদের মুখে মুখে কীভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

(১)

সোনার নাতিনী কেন আইস যাও পুনঃ পুনঃ
না বুঝি তোমার অভিপ্রায়।
সদাই কাঁদনা দেখি অঝরু ঝরয়ে আঁখি
জাতিকুল সব পাছে যায়॥
যমুনার জলে যাও কদমতলার পাশে চাও
না জানি দেখিলা কোন জনে।
শ্যামলবরণ হিরণ পিঁধন বসি থাকে যখন তখন
সেজন পড়েছে বুঝি মনে॥
ঘরে আসি নাহি খাও সদাই তাহারে চাও
বুঝিলাম তোমার মনের কথা।
এখনি শুনিলে ঘরে কি বোল বলিবে তোরে
বাড়িয়া ভাঙিবে তোর মাথা॥
একে তুমি কুলনারী কুল আছে তোমার বৈরী
আর তাহে বড়ুয়ার বধূ।

কহে বড়ু চণ্ডীদাসে কুলশীল সব ভাসে
লাগিল কালিয়াপ্রেমমধু ॥

(২)

সোনার নাতিনী এমন যে কেনি
হইলি বাউরি পারা।
সদাই রোদন বিরস বদন
না বুঝি কেমন ধারা ॥
যমুনা যাইতে কদম্বতলাতে
দেখিয়া যে কোন জনে।
যুবতীজনার ধরমনাশক
বসি থাকে সেইখানে ॥
… সেজন পড়েছে তোর মনে।
সতীর কুলের কলঙ্ক রাখিলি
চাহিয়া তাহার পানে ॥
একে কুলনারী কুল আছে বৈরী
তাহে বড়ুয়ার বধু।
কহে চণ্ডীদাসে কুলশীল নাশে
কালিয়া প্রেমের মধু ॥

দুটি পদই এক ধরনের। প্রথমটির ভাব এবং অনেকস্থলে ভাষা নিয়ে দ্বিতীয়টি রচিত। প্রথমটির ভণিতায় বড়ু চণ্ডীদাসের নাম থাকলেও পদটি বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত নয় তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রভাব স্থানে স্থানে আছে। "সোণার নাতিনী" এই সম্বোধন থেকে অনুমান হয়, এটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ারির উক্তি। "বড়ুয়ার বধূ" শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের "বড়ার বৌহারী"র মার্জিতরূপ। "বাড়িয়া ভাঙিবে তোর মাথা"—এ ধরনের কঠোর উক্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। এ ধরনের কঠোরতা বোধ হয়, অনুবাদকের রুচিসঙ্গত হয়নি, তাই একেবারে বাদ দিয়েছেন। প্রথম পদটি দেখে মনে হয়, বড়ু চণ্ডীদাসের অনেক পদ ভাঙিয়ে নূতন নূতন পদ রচনার রেওয়াজ এক সময় দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদের অনুকরণে রচিত অনেক পদ নীলরতন বাবুর পদাবলীর মধ্যে দেখা যায়। এরূপ ভাঙনের একটা সুস্পষ্ট নিদর্শন উদ্ধৃত করা হল—

(১)

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন শুনতো বাসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিয়া কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে॥
লেপিয়া তনু চন্দনে বুলিআঁ তবে বচনে
আড় বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী না দিলোঁ মো আনুমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ প্রহরে॥
তিঅজ পহর নিশী মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কোলে বসী
নেহালিলোঁ তাহার বদনে।
হসিত বদন করী মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে॥
চউঠ পহরে কাহ্নু করিল আধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আমার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : রাধাবিরহ)

(২)

প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে॥

অঙ্গে দিয়া চন্দন বলে মধুর বচন
আর বায় বাঁশী সুমধুরে।
চাহিলেন সুরতি নাহি দিল পাপমতি
দেখিল কৃষ্ণ দৌজি প্রহরে॥
তৃতীয় প্রহর নিশি মুই কৃষ্ণ কোলে বসি
নেহারিনু সে চাঁদবদনে।
ঈষৎ হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি
বিয়াকুল হইল মদনে॥
চতুর্থ প্রহরে কান করিল অধর পান
মোর ভেল রতি আশোয়াসে।
দারুণ কোকিলনাদে ভাঙ্গিল আমার নিঁদে
রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ (নীলরতন বাবুর পদাবলী)

দ্বিতীয়টি প্রথমটির অনুবাদ। এরূপে চণ্ডীদাসের মূল পদগুলির পরিবর্তন ঘটেছিল। চণ্ডীদাস-রচিত পদাবলীর প্রাচীন ভাষা ক্রমশ দুর্বোধ্য হয়ে ওঠায় কীর্তনিয়াগণ তৎকালপ্রচলিত ভাষায় সেগুলি অনুবাদ করতে শুরু করে। এরূপ উদ্যম নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়, কিন্তু অনুবাদকের অজ্ঞতাবশত অনুবাদের ভাষা অনেকস্থলে বিকৃত হয়ে পড়েছে। এখানেও একটি বিকৃতির নমুনা পাওয়া যায়। মূলপদের "আড়বাঁশী বাএ মধুরে" এর অনুবাদ "আর বায় বাঁশী সুমধুরে"। "আড় বাঁশী" শব্দের অর্থ অনুবাদকের জানা ছিল না।

উল্লিখিত বিচারের সাহায্যে আমরা প্রচলিত চণ্ডীদাসপদাবলী সম্বন্ধে পাঁচটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। পদাবলীর (১) কতকগুলি পদ দীন চণ্ডীদাসের, (২) কতকগুলি জ্ঞানদাস লোচনদাস নরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতি চৈতন্যোত্তর কবিগণ কর্তৃক রচিত কিন্তু চণ্ডীদাসের ভণিতায় প্রচলিত, (৩) কতকগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের পদের অনুকরণে রচিত। (৪) একই ভাবের ও প্রায় এক রকম ভাষার বহুসংখ্যক পদ পাশাপাশি দেখা যায়, সেগুলিও আসল নয়, কোন একটি মূলপদের অনুকরণ মাত্র। (৫) কোন কোন পদে

চৈতন্যদেবের উল্লেখ এবং তাঁহার প্রচারিত ভাবধারার সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। সেগুলি হয় দীন চণ্ডীদাসের, নয় অন্য কোন অর্বাচীন কবির রচনা। চণ্ডীদাস যে দুজন ছিলেন সে বিষয়ে সংশয়ের লেশমাত্র হেতু নাই। দীন চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি, ১৭ শ শতকের শেষ দিকে কিংবা ১৮ শ শতকের গোড়ার দিকে তিনি রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক পদাবলী রচনা করেন। প্রচলিত পদাবলীর ভাষাও আমাদের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করছে। বড়ু-চণ্ডীদাসই চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাস এবং তাঁর একমাত্র প্রামাণিক রচনা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিষয়বস্তুবিশ্লেষণ ও কবিত্ববিচার বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। যাঁরা বড়ু চণ্ডীদাসরচিত কাব্যের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে চান মনীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত "দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী"র পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ভূমিকাটি পাঠ করতে তাঁদের অনুরোধ করি। ভাব, ভাষা, বিষয়বস্তু, ও রচনারীতি সব দিক দিয়েই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত্ব ও চৈতন্যপূর্ববর্তিত্ব সূচিত হচ্ছে। এর কবিত্ব সম্বন্ধে অন্তত একটা কথা বলা আবশ্যক। রসসৃষ্টি ও চরিত্রসৃষ্টিতে বৈচিত্র্যের এরূপ একত্র সমাবেশ প্রাচীন ও আধুনিক খুব কম কাব্য ও নাটকেই দেখা যায়। নরহরি সরকার ঠাকুরের চণ্ডীদাসপ্রশস্তি-বিষয়ক উক্তিটি—

> রাধা গোবিন্দ কেলিবিলাস যে বর্ণিল বিবিধমতে।
> কবিবর চারু নিরুপম মহী ব্যাপিল যাহার গীতে॥

বিশাল বৈষ্ণবসাহিত্যের মধ্যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাসের প্রতি প্রযোজ্য।

সাহিত্যরসিক বাঙালীর মজলিসে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এখনও পর্যন্ত তার যোগ্য সমাদর পায়নি, ইহা কম দুঃখের বিষয় নহে। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেনের খেদোক্তি নিচে উদ্ধৃত করা হল— "বিশ বৎসর হইল শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আজিও শিক্ষিত বাঙ্গালীর কথা দূরে থাক, যাঁহারা সাধারণ সাহিত্যরসিক এবং যাঁহারা পদাবলীভক্ত তাঁহাদেরও দৃষ্টি কাব্যটির প্রতি কিছুমাত্র আকৃষ্ট হয় নাই। কাব্যামোদী বাঙ্গালীর পক্ষে

ইহা প্রশংসার কথা নহে। তবে এই অবহেলার একটু কারণও আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বানান একটু বিশেষ রকমের, ইহার ভাষাও প্রাচীন বলিয়া কিছু দুর্বোধ বটে, কিন্তু অবোধ্য নহে। আনুনাসিকের সঙ্গীন-খোঁচা এড়াইয়া, মহাপ্রাণ বর্ণের কণ্টক মাড়াইয়া, অপরিচিত শব্দের লতাগুল্ম ছাড়াইয়া যিনি এই কাব্যকুঞ্জে একবার প্রবেশ লাভ করিবেন, তিনি কৃতার্থ হইবেন।”

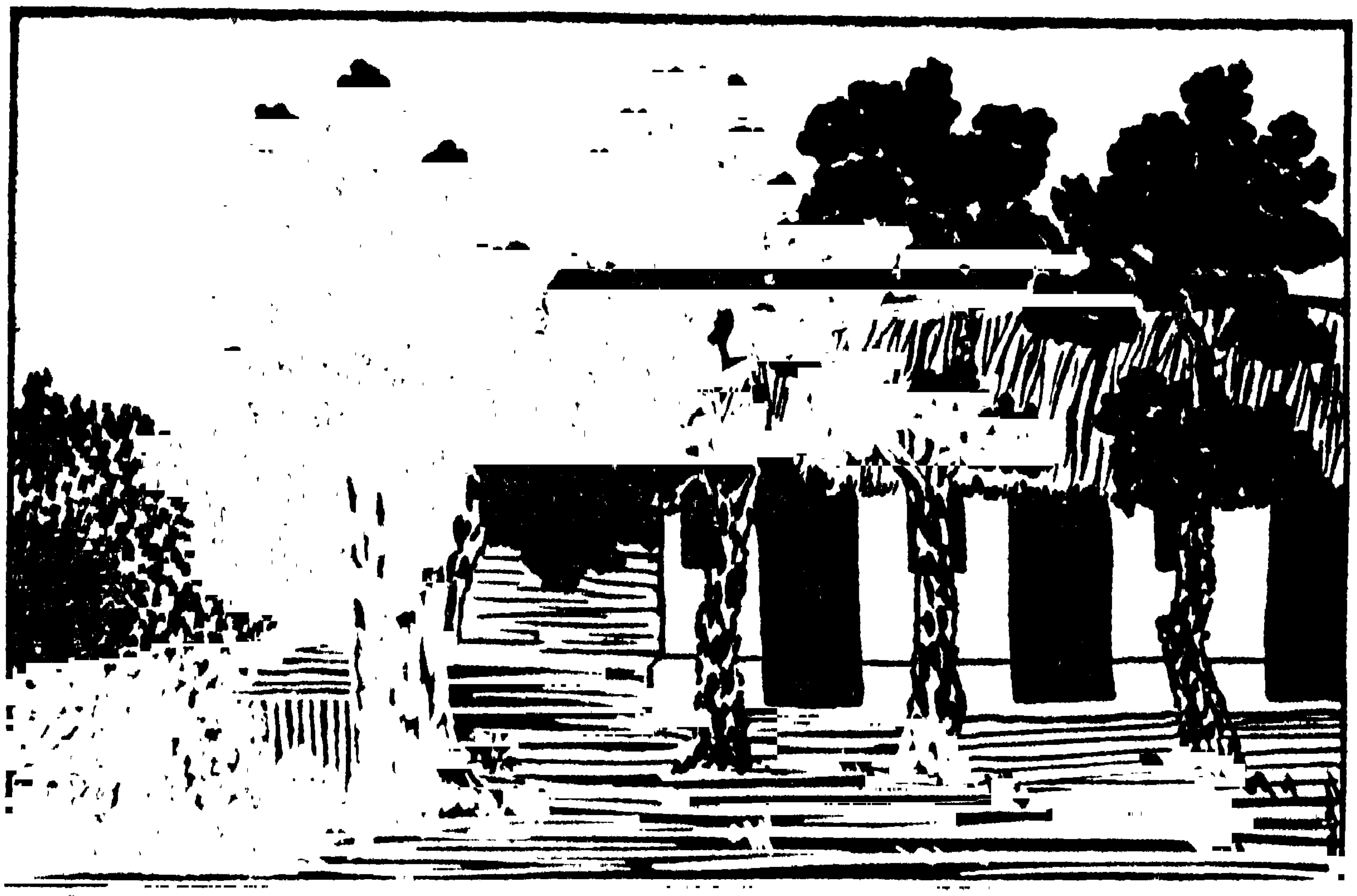

"সমালোচনা"

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার গুহ

আগের প্রবন্ধে[১] আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, 'বিবিধ প্রসংগ' আর 'আলোচনা' এই ছুটি বইকেই রবীন্দ্র-প্রবন্ধের নীহারিকা যুগের রচনা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, এবং তার কারণও সেখানে বিশ্লেষণ করেছি। এর পর আসে "সমালোচনার" পালা। এই বইটি নতুন করে বেরিয়েছে রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহের ২য় খণ্ডে[২]। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৪ সালের শেষের দিকে (২৬শে মার্চ, ১৮৮৮); অর্থাৎ কবির যখন সাতাশ বছর বয়স। "সমালোচনা"র প্রবন্ধগুলি কিন্তু রচিত হয় পুস্তকাকারে বেরোনোর অনেক আগে। এগুলি ১২৮৭ সালের ভাদ্র থেকে ১২৯১ সালের ফাল্গুন পর্যন্ত 'ভারতী'তে সাড়ে চার বছর ধরে বেরিয়েছিল। সুতরাং এটা নিশ্চিত যে, বইটি যদিও অনেক দেরিতে বেরিয়েছিল কিন্তু ভিতরের প্রবন্ধগুলি কবির ১৯ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে লেখা।

পূর্বপ্রবন্ধে আমি 'বিবিধ প্রসংগ' আর 'আলোচনা'কে রসবেত্তার দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করেছি। আমি এই কথাই বলতে চেয়েছি যে এ প্রবন্ধগুলি আবেগপ্রধান অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে emotional। আবেগ-প্রাধান্য থাকার দরুন এগুলি মূলতঃ কাব্যধর্মী (lyrical); এবং সমসাময়িক রবীন্দ্রকাব্যের সংগে এদের সাদৃশ্য কোথায় তা'ও দেখিয়েছি। সাদৃশ্য এদের ভাবপ্রবণ দৃষ্টিভংগীতে, অর্থাৎ যার নাম romanticism. ইংরেজী romantic কাব্যের বিশেষতঃ শেলীর কাব্যের একনিষ্ঠ পাঠক কিশোর রবীন্দ্রনাথের অভিজাত-মানসের পক্ষে এটাই যে উপযুক্ত প্রকাশভংগী, তা অবশ্য স্বীকার্য।

কিন্তু 'সমালোচনা'র দৃষ্টিভংগী রোমান্টিক নয়, হওয়া সম্ভবও নয়।

১. রবীন্দ্র-প্রবন্ধের আদিপর্ব—বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩৫০. পৃঃ ৬৩০-৬৩৯।

২. রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭-১৫৭।

কারণ 'বিবিধ প্রসংগ' বা 'আলোচনা'র প্রবন্ধগুলি তথ্যপূর্ণ নয়; প্রাক্-প্রভাতসংগীত রবীন্দ্রকাব্যের মতন এরা ফেনিল ভাবোচ্ছ্বাসে ফুলে' ফুলে' থরথর করে কাঁপছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে জলমগ্ন ধরিত্রীর ভিতর থেকে যেমন স্থলের আবির্ভাব হয়েছিল, তেমনি প্রভাত (১২৮৮) ও সন্ধ্যা-সংগীতের (১২৯০) সমসাময়িক 'সমালোচনা'য় আমরা চিন্তাশীল রবীন্দ্রপ্রবন্ধের প্রথম দেখা পাই।

এগুলির অবশ্য চিন্তাশীল না হয়ে উপায় ছিল না। 'বিবিধপ্রসংগ' ও 'আলোচনা'র অননুরূপ এই প্রবন্ধগুলি নামজাদা বইয়ের কিংবা তথ্যপূর্ণ বিষয়ের গভীর সমালোচনা। বিষয়ের পার্থক্যই এদের আবেগপ্রধান হতে দেয়নি।

'অনাবশ্যক' প্রবন্ধে অবশ্য যুক্তির চেয়ে আবেগই বেশি। 'অনাবশ্যকে' কবি ইতিহাসপাঠের উপকারিতা দেখিয়েছেন। আমাদের রক্তে অতীতের প্রতি যে মোহ আছে, এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে কবি তাকে জাগাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কি কি কারণে অতীতের চর্চা করা দরকার সেই কারণগুলি স্পষ্টত নির্দেশ করেননি। তা না করলেও তিনি আমাদের আবেগে (emotion) যে ধাক্কা দিয়েছেন তাতে এক ঢিলেই সবক'টি পাখী মেরেছেন এবং তাও এমনভাবে যে কোন সাধারণ লেখক কারণের তালিকা দেখিয়েও করতে পারতেন না।

'তার্কিকে' তিনি তর্ককে (অর্থাৎ যুক্তিকে) আবেগের নিচে স্থান দিয়েছেন। পূর্বে আমি বলেছি যে কবি নিজে এখনও পর্যন্ত আবেগপ্রবণই আছেন, কাজেই আবেগকে যুক্তির ওপরে স্থান দিয়ে তিনি নিজের প্রতি সুবিচার করেছেন। 'সত্যের অংশ' এবং 'বিজ্ঞতা'র মূলবক্তব্যও আবেগ-প্রধান।

এর পর থেকে সুরবদলের পালা। এখন আমরা 'মেঘনাদবধে'র দ্বিতীয় সমালোচনা পাচ্ছি (১২৮৯; প্রথম সমালোচনা ১২৮৪ সালে ভারতীতে বেরিয়েছিল)। এটি একটি চিন্তাশীল যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ। 'মেঘনাদবধে'র এই সমালোচনাটি অত্যন্ত কড়া; "দেখিতেছি মেঘনাদবধকাব্যে ঘটনার মহত্ত্ব নাই, একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই তেমন মহৎ চরিত্রও নাই। .... সুখদুঃখের মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণের চরিত্রে অনন্যসাধারণতা নাই, অমরতা

সহচর হইতে পারেন না, ইহার কোন পাত্র আমাদের নাই।........ আমাদের কার্যের প্রবর্তক নিবর্তক হইতে পারেন না। কখনো কোন অবস্থায় মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণ আমাদের স্মরণপথে পড়িবে না।"[৩] অবশ্য পরে কবি জীবনস্মৃতিতে এই বক্তব্যকে সরস করার উদ্দেশ্যে লিখেছেন—"আমি এই অমরকাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম।" কবির এই সাফাই গাওয়া সত্ত্বেও (যা তিনি কোন যুক্তি দিয়ে সমর্থন করেননি) মেঘনাদবধকাব্য সম্বন্ধে তাঁর এই প্রথম বয়সের সমালোচনাই মাইকেলের কাব্যের সঠিক সমালোচনা। কারণ শুধু রচনা-কৌশল অথবা প্রকাশভংগীই কোন কাব্যের ঔৎকর্ষ্যসূচক নয়; তার একটা সার্বজনীন আবেদন থাকা চাই। নানাগুণ সত্ত্বেও মেঘনাদবধে তা নেই। কবির এই প্রবন্ধ চমৎকার যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ।

"ডি-প্রোফণ্ডিস" ইংরেজ কবি টেনিসনের সন্তানজন্ম উপলক্ষ্যে রচিত একটি কবিতা। অনন্তপথের যাত্রী মানবসন্তান ক্ষণকালের জন্যে এই পৃথিবীতে আতিথ্য গ্রহণ করতে আসে, যেমন আমরা বিদেশে গেলে পান্থনিবাসে উঠি। অনুরূপ ভাব কবীরের একটি দোঁহায় আছে, যেখানে কবীর তাঁর নবজাত শিশুকে সম্বোধন করে বলেছেন—"হে অনন্তকালের মহাপথিক, জন্ম ও মৃত্যু তোমার দুই পদক্ষেপ। তুমি কিছুকালের জন্যে আমাদের গৃহে আশ্রয় নিয়েছ, ভগবানের কাছে তোমার শান্তি প্রার্থনা করি।" (ভাবার্থ)। "ডি-প্রোফাণ্ডিস" প্রবন্ধে আবেগের সংগে যুক্তির সুষ্ঠু মিলন রবীন্দ্রনাথ ঘটিয়েছেন।

সাহিত্য যে সমাজমানসের অভিব্যক্তি একথা ত নিতান্তই জানা, কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনে সাহিত্যরূপের কি পার্থক্য ঘটে, সে বিষয়ে বাংলায় আলোচনা রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় প্রথম করেন। ("কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন")

১২৮০ সালের বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র "বিদ্যাপতি ও জয়দেব" নামে একটি তুলনামূলক সমালোচনা লেখেন[৪]। এর আট বছর পরে (১২৮৮)

৩. রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭।

৪. শতবার্ষিকী সংস্করণ, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত, 'বিবিধ প্রবন্ধ', পৃঃ ৫৩-৫৭।

বঙ্কিমের ভাবশিষ্য রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের সংগে বিদ্যাপতির পুনরায় তুলনা করেন[৫]। আমি 'প্রাচীন সাহিত্যে'র আলোচনা না করা পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রাবন্ধিক দৃষ্টিভংগীর পার্থক্য বোঝাতে পারব না। এখানে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে উভয়ের সাহিত্যিক দৃষ্টিভংগীর পার্থক্য, আলোচনা করে এই বিষয়ে সামান্য একটু আভাস দেব। বঙ্কিমের মানসিক কাঠামো যুক্তিপ্রধান, রবীন্দ্রনাথের আবেগপ্রধান; বঙ্কিম বিদ্যাপতিকে যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখেছেন আবেগের আয়নায়। কবি বলছেন যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির চেয়ে বড় কবি,— কিসে? "বিদ্যাপতির অনেকস্থলে ভাষার মাধুর্য, বর্ণনার সৌন্দর্য আছে, কিন্তু চণ্ডীদাসে নূতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ত্ব আছে, **আবেগের গভীরতা আছে**। যে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন সে বিষয়ে একেবারে **মগ্ন** হইয়া লিখিয়াছেন। ·· বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ, কিন্তু চণ্ডীদাসের হৃদয় আরও গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরও অধিক জানেন।" এবার বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বঙ্কিমের মতামত পড়ুন,— "বিদ্যাপতির কবিতায় মনুষ্য হৃদয়ের গূঢ়তলচারী ভাবসকল প্রধানস্থান গ্রহণ করে" (কিন্তু এই ভাবের প্রসার কতটা বঙ্কিম তার বিচার করেন নি— রবীন্দ্রনাথ করেছেন) "বিদ্যাপতির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত। ইঁহার কবিতা ইন্দ্রিয়ের সংস্রবশূন্য, বিলাসশূন্য **পবিত্র**" (এখানে বঙ্কিমের ভিক্টোরীয় যুগের উনিশশতকী রুচিবাগীশ মন লক্ষ্য করুন। কোন জিনিস পবিত্র হতে গেলে তাকে অতীন্দ্রিয় হতে হবে। যেন ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে এলে একটা জিনিস অপবিত্র হয়ে যাবে)।·· ·····"জয়দেব ভোগ, বিদ্যাপতি আকাংক্ষা ও স্মৃতি; জয়দেব সুখ, **বিদ্যাপতি দুঃখ,**" (ও পরে রবীন্দ্রনাথের উক্তি দেখুন বিদ্যাপতি **সুখের** কবি) "জয়দেব বসন্ত,

৫. রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৩-১২০।

বিদ্যাপতি বর্ষা," ইত্যাদি। বঙ্কিম যেখানে প্রকাশভংগীকে বড় করে দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন আবেগকে। যুক্তির মেশাল থাকলেও আবেগপ্রাধান্যের জন্যে একই বিষয়ের রবীন্দ্র-প্রবন্ধ সেই বিষয়ের বঙ্কিম-প্রবন্ধের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদাভাবে লেখা হয়েছে।

এই প্রবন্ধের (চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি) সংগে এর পরের প্রবন্ধ "বসন্ত রায়" পড়লে কবির বৈষ্ণবসাহিত্য-রসপিপাসু মনের একটু পরিচয় পাই। তিনি যে কত বিস্তৃত এবং গভীর ভাবে বৈষ্ণবসাহিত্য পড়েছিলেন তার ছাপ এই দুটি লেখার ভিতরে আছে। বৈষ্ণবসাহিত্যের উপরে লেখা এই প্রবন্ধ দুটি কবিরসসাহিত্যের পর্যায়ে তুলেছেন।

'সংস্কার' এবং 'একচোখো সংস্কার' দুটিই সামাজিক দোষের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে লেখা। আমাদের পুরুষনিয়ন্ত্রিত আধুনিক সমাজে মেয়েদের যে অবর্ণনীয় দুঃখভোগ করতে হয়, তার আর ইয়ত্তা নেই। কবি চিরদিনই মেয়েদের দুঃখে দুঃখী, এবং মেয়েরা যাতে মানুষের মত অধিকার পায় তার জন্যে আজীবন চেষ্টা করেছেন। এই দুটি লেখার মধ্যে দিয়ে তিনি মেয়েদের অবস্থার উন্নতির জন্যে পাঠকের কাছে একটি আবেগময় আবেদন জানিয়েছেন।

"সমালোচনা"র প্রবন্ধগুলি আমি বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে এরা মূলতঃ যুক্তিধর্মী; যদিও প্রথম দিকের প্রবন্ধগুলি আবেগপ্রধান। কয়েকটি প্রবন্ধ পুরোপুরি যুক্তিধর্মী (যেমন 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'সংস্কার' ইত্যাদি), বাকি ক'টিতে যুক্তির সংগে আবেগের মেশাল রয়েছে। অর্থাৎ সমগ্রভাবে বলতে গেলে 'সমালোচনা' রবীন্দ্রমানসের এমন এক সময়ের পরিচয় বহন করছে, যখন কবির মনে আবেগের ভিতর থেকে যুক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে কিন্তু থই পাচ্ছে না। আবেগই এখনও পর্যন্ত সমস্ত রচনাগুলিকে রসসিক্ত করে রেখেছে।

ভঙ্গী ও রীতি

শ্রীনবেন্দু বসু

১

শিল্পীর রচনা রসের রচনা, অর্থাৎ যাতে তাঁর চেতনা আর বোধের প্রক্রিয়া আবেগ-ব্যঞ্জনায় পাঠক, দর্শক বা শ্রোতাকে এক গূঢ় সঙ্গতির আঙ্গিকতাবোধে তৃপ্ত করে। রসরচনায় তাহ'লে নিহিত থাকে শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ভাব, চিন্তা, উপলব্ধির প্রকৃতি আর সংগঠন আর প্রকাশের বৈশিষ্ট্য। উপাদান আর পদ্ধতিতে এইভাবে শিল্পীর একান্ত ব্যক্তিগত সৃষ্টি বলেই সাধারণ কথায় শিল্পের রচনাকে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ বলে' থাকি।

শিল্পের রচনা শিল্পীর সমগ্র ব্যক্তিত্বের স্থায়ী বা মুহূর্তবিশেষের প্রতিরূপ। রচনার ভঙ্গী বা রসভঙ্গী নামে বুঝি তার সেই লক্ষণ বা প্রভাব যা পাঠক, দর্শক বা শ্রোতার উপলব্ধিতে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের বোধ সৃষ্টি করে। অবশ্য সকল রসিকের মন রসস্রষ্টার ব্যক্তিত্বের একই রকমের প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করে না, কিন্তু ব্যক্তিত্বের বোধ একটা ঘটেই।

এই ব্যক্তিত্ব-বোধ সাধারণ আর ব্যাপক; কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খুঁটিনাটি জ্ঞানলাভ করবার পূর্বে তার সাধারণ রূপ, গতি, ভঙ্গী থেকে যেমন তার চারিত্রিক সমগ্রতার একটা ধারণা হয়, সেই ধরনের একটা অখণ্ডবোধ। পরে পর্যবেক্ষণ, বিশদ পরিচয় আর বিচারের ফলে প্রথম ধারণা হয়ত স্পষ্ট, পুষ্ট, উজ্জ্বল বা অদল-বদল হয়, কিন্তু (যদি না আমূল পরিবর্তন ঘটে) কাঠামো, রক্তমাংস, ভঙ্গী ও ব্যবহারের সমগ্র প্রভাবের যে আদল শেষ পর্যন্ত থেকে যায় সেই সত্তা-স্বকীয়তার পরিচয়ই রচনার রসভঙ্গী থেকে পাওয়া যায়। মনোভাব, শিক্ষা আর পরিবেশের সম্মিলনে গড়া শিল্পীর যে ব্যক্তিত্ব সমাজের কাছে ধরা দেয়, তারই বিকাশ তাঁর রচনার ভঙ্গীতে। শিল্পী যেখানে অন্যের কানে কানে কথা ক'ন, কিন্তু তাঁর নিজস্ব সুরে, যেখানে তিনি অবর্তমান হ'লেও মূর্ত, যেখানে তিনি নিতান্ত অন্তরঙ্গ, যেখানে তিনি রসিকের উপলব্ধিতে

নিশ্চিতভাবে সঞ্চারী, তাঁর রচনা সেইখানেই রসের ভঙ্গীতে স্বপ্রকাশ। রসভঙ্গী কথাটার অর্থের প্রস্থানভূমি সামাজিক।

রচনারভঙ্গী তার নির্মাণপদ্ধতি বা রীতি থেকে ভিন্ন। দুয়ের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য আছে বলে' বিবেচনা করি। নিয়ম, রীতি, পদ্ধতি, নির্মাণের উপায় মাত্র। কিন্তু ঐ সকল বিধি প্রয়োগ করে' সৃষ্টির কাজে যে প্রতিভাধর্ম নিযুক্ত হয়, শিল্পীর রসভঙ্গী তারই প্রতিরূপ বা পরিচায়ক। পাথর এক, বাটালি এক, আঘাতের সাধারণ নিয়মও এক, কিন্তু দুই ভাস্করের আঘাতের ধর্ম বা ঝোঁক স্বতন্ত্র। আঙ্গিকের গঠনে যতটা নির্দিষ্ট, বাস্তব, ন্যায়বিন্যস্ত, তথ্যমূলক, তার অতিরিক্ত, সংখ্যানীতির অতীতে, যে রস-নির্দেশ থেকে যায়, তারই বিকাশ শিল্পীর ভঙ্গীতে।

এই অতিরিক্ত রস-নির্দেশ সাহিত্যের যে রচনায় পাওয়া যায় তারই ভাষা রসসাহিত্যের ভাষা। ভাব-কল্পনায় জারিত হয়ে অভিজ্ঞতার ধারণা-রূপ ভাষার মধ্যে ন্যায়, ব্যাকরণ আর অর্থসঙ্গতির অতিরিক্ত যে প্রসন্ন শক্তি বা বেগ বহন করে তাই ভাষার রসমর্যাদার লক্ষণ। রসের ভাষাতে পরিচয় পাওয়া যায় শিল্পীর ভাষাজ্ঞান ছাড়া তাঁর ভাষাবোধেরও।

রীতির দিক থেকে যে বিভিন্ন ধারাগুলি একাধিক ভাবে রচনায় প্রযুক্ত হয় সেগুলি মোটামুটি হ'ল (১) ছন্দধর্ম, অর্থাৎ অর্থ আর ভাবের সমন্বয়ে ভিতরকার গতি আর ধ্বনির বোধ; (২) যতিবিন্যাসের ফলে সেই ছন্দলীলার স্পষ্ট প্রকাশ; (৩) শব্দ আর পদ নির্বাচন আর তাদের আবহ-মূল্য; (৪) শব্দ আর পদের অর্থ-প্রাধান্য অনুযায়ী বিন্যাস; (৫) তাদের ধ্বনিগত বিন্যাস; (৬) বাক্যের গঠন; (৭) ব্যাকরণ-নিয়মাবলীর প্রয়োগ-বিশেষত্ব; (৮) অলঙ্কার-পদ্ধতি; (৯) ব্যক্তিগত বাহ্যিক ঢং বা ভঙ্গিমা; (১০) যুগসুলভ বা গোষ্ঠী-সাহিত্যের রীতিপ্রকৃতি।

রচনার রসভঙ্গী আর রীতির মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য থাকলেও, ভঙ্গী রীতিতেই বিকাশ পেয়ে রূপরসের বোধ সঞ্চার করে। ভঙ্গীর রসপ্রভাব পরিস্ফুট হয় রীতি-নিয়মাবলীর সম্মিলিত প্রয়োগ-ব্যবস্থায়। ভঙ্গীর আলোচনা তাই রীতির আলোচনা বাদ দিয়ে হয় না। আর রচনারীতিও ভঙ্গীর প্রসঙ্গ থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য নয়। রসভঙ্গী আর রচনারীতির সম্বন্ধ আলোচনাতেই

রূপরসের ব্যাপক আলোচনা। তবেই দেখা যায় কোথায় আর কিভাবে রীতিশাস্ত্রের প্রয়োগে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সুষ্ঠু হয়েছে বা ব্যাহত হয়েছে আর কোথায় ভঙ্গী বা ব্যক্তিত্ব রীতিপদ্ধতিকে নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী নতুন করে' গড়েছে। ভঙ্গী আর রীতির সম্বন্ধ-ধর্ম আর প্রকৃতির বিশ্লেষণই রসবিচার।

রসভঙ্গী আর রীতিপদ্ধতির আলোচনার ঐতিহাসিক পটও থাকে। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব বা স্বকীয়তাকে পূর্বাপর সম্পর্কবিহীন নিরালম্ব একটা ক্রিয়া-কৌশল বা ঘটনারূপে বিবেচনা করলে রসালোচনা সম্যক হয় না। শিল্প-রূপকে দেখতে হবে একটা উত্তরাধিকারের মতন, গত দিনের সৃষ্টির ন্যায়-পরিণতিরূপে, ভূত বর্তমানের সঙ্কলনে ভবিষ্যতের যোগ-বিবর্তনরূপে। যুগধারায় পরিবর্তন যা দেখব, অভিনবত্ব যেখানে যা কিছু আবিষ্কার করব, সে হবে ঐতিহ্যের ভিত্তিতে কালগত পরিণতি। পূর্বতনের ন্যায়বিকাশেই ধরা থাকবে পরবর্তী সৃষ্টির অনিবার্যতা ; তার রস-মৌলিকতা।

এই ঐতিহ্যবাদের যাথার্থ্য সহজেই বোঝা যায়। শিল্পী মানুষ ; তাঁর রচনা তাঁর মনোভাবের ছবি। সে মনোভাবের গঠনে আছে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস— জলবায়ু আর অন্যান্য ভৌগোলিক কারণ-ঘটিত অর্থনৈতিক আর সামাজিক পরিস্থিতির এককালীন বা ক্রমসঞ্চিত প্রভাব ; বংশ আর পরিবেশের নিরূপণ ; স্বাস্থ্য, স্নায়ু আর চেতনা অবচেতনার নানা স্তরের পরিণতি আর পরিবর্তনের বৈচিত্র্য। ফলে, এই মানুষ যখন শিল্পসৃষ্টি করেন তখন সে সৃষ্টির আলোচনায় ন্যায্যতঃ আবশ্যক হয় তাঁর মন আর প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান ; জানতে হয় শিল্পীর পরিবেশ ; জীবনের নানা বিভাগে তাঁর সম্বন্ধ-রূপ ; তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্ব আর তাঁর কলাকৌশল। এ সবই ঐতিহাসিক আলোচনার অন্তর্গত।

২

রসবিচারে ভঙ্গী আর রীতি সম্বন্ধে যে সকল তথ্যের অবতারণা করা হ'ল, রচনাবিশেষ থেকে তাদের প্রয়োগবিধি দেখা যেতে পারে। তজ্জন্য আজ থেকে পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে প্রকাশিত শ্রীমতী রাসসুন্দরীর "আমার জীবন" থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি। এই লেখিকার ভঙ্গী আর রীতি নিতান্ত নিরাভরণ ; সহজ, সাধারণ ; বিশেষত্ব বা রূপসমৃদ্ধিতে সরল আর অনাড়ম্বর।

এঁর লেখার মধ্যে দিয়ে তাই আমাদের তথ্যগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করা সহজ হবে। আর ব্যক্তিত্ব-প্রবল শক্তিশালী কোন লেখকের রচনা নির্বাচন করলে তাঁর ভঙ্গী আরো রীতির উজ্জ্বল স্বকীয়তায় তাদের সাধারণ কার্য-নিয়ম ঢাকা পড়ে' যেত। এ না হ'লে রাসসুন্দরীর রচনাভঙ্গীতে এমন বিশেষ কিছুই ছিল না যাতে সূক্ষ্ম আলোচনা চলতে পারে। তাঁর লেখা থেকে এইটুকুই প্রতিপাদ্য যে সে লেখায় একটুও ব্যক্তিত্ব যদি প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে সে প্রকাশে তার সাধারণ নিয়মরীতির ক্রিয়াও লক্ষ্য করা যায়। রাসসুন্দরী লিখছেন :—

"আমি বার বৎসরের সময় পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া রামদিয়া গ্রামে আসিয়াছি। আর এই পর্য্যন্ত সেই রামদিয়াতেই আছি। কিন্তু এই বাটীর সমুদয় লোক বড় সজ্জন ছিলেন, আমাকে ভারী স্নেহ করিতেন, এমন কি, যদি আমার কোন প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হইত, তাঁহাদের স্নেহগুণে সে যন্ত্রণা আমার যন্ত্রণাই বোধ হইত না।

ঐ বাটীর চাকর চাকরাণী এবং গ্রামের প্রতিবাসিনী প্রভৃতি সকল লোক আমাকে এত স্নেহ করিত যে আমার নিশ্চয় বোধ হইত যেন পরমেশ্বর ইহাদিগকে তাহা বলিয়া দিয়াছেন। আমার মনে আর একটি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যেন ঐ গ্রামের লোক তাঁহাদিগের নিজ পরিবার অপেক্ষাও আমাকে স্নেহ করেন। বাস্তবিক আমার প্রতি কেহ কখন অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। বস্তুতঃ ঐ দেশের সমুদয় লোকই বড় সজ্জন। আমি এতকাল ঐ দেশে বাস করিতেছি, এবং এখন পর্য্যন্তও আছি। (ইহার মধ্যে আমার পরিবারের তো কথাই নাই)। ঐ দেশের সকল লোক আমার প্রতি অকপট স্নেহ করিয়া থাকেন। মনের ভ্রমেও কেহ কখন আমাকে কটুবাক্য বলেন নাই। এখন পর্য্যন্তও সেই ভাবটি আছে, পরে কি হয় বলা যায় না। এখানে আমায় আর কত দিবস থাকিতে হইবে। শেষ দশাতে আমার কি প্রকার অবস্থা ঘটিবে, এবং সেই সকল লোকেরা আমার সঙ্গে কি প্রকার ব্যবহার করিবেন, জানি না ; তাহা পরমেশ্বর জানেন।

হে প্রভু! বিশ্বময়! বিশ্বপাতা! তোমার অসীম মহিমা, তুমি কখন কি কর, কে জানিতে পারে, তোমার কথা তুমি জান। এ বিষয়ে

আমাদের চিন্তা করাই ভ্রম। আমি বার বৎসরের সময়ে রামদিয়া গ্রামে আসিয়াছি। আর আর ছয় বৎসর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নূতন বৌ ছিলাম। মনের ভাবটিও ছেলেমি মতই ছিল। এই আঠার বৎসর আমার এই অবস্থায় কালগত হইয়াছে। কিন্তু এই আঠার বৎসর পর্য্যন্ত আমার মনটি বড় বেশ ছিল। সাংসারিক বিষয় চিন্তার কোন কারণ ছিল না; কেবল সর্ব্বদা গৃহকার্য্য করিব, আর কোন কর্ম্ম করিলে লোকে ভাল বলিবে, কি প্রকারে সকলের মন সন্তুষ্ট থাকিবে, এই চেষ্টাটি ছিল। কিন্তু এইটি ভারি আক্ষেপের বিষয় ছিল যে মেয়েছেলে বলিয়া লিখিতে পড়িতে পাইতাম না। এখনকার মেয়েছেলেদের কি সুন্দর কপাল! এখন মেয়ে জন্মিলে অনেকেই বিদ্যা-শিক্ষার চেষ্টা করেন। যাহা হউক এ মত ভালই বলিতে হইবেক।"

বর্তমান লেখকের মতে এ রচনার কতকটা রসভঙ্গী আছে। অর্থাৎ এর রচনারীতিতে এমন কিছু আছে যা পাঠকের মনে রচয়িত্রীর ব্যক্তিত্বের একটা বোধ সঞ্চার করে আর পাঠকের আগ্রহকে অল্প-বিস্তর রচনায় নিবদ্ধ করে' রাখে। লেখিকার ব্যক্তিত্বের যে বোধ বর্তমান প্রবন্ধকারের হয় সেটা এমন এক মনোভঙ্গীর, বিশ্বাসে আর মতামতে যেটা স্পষ্ট আর স্থির; আবেগ যার সংযত; যেখানে স্বাভাবিক উৎসাহবোধ জীবনের অভিজ্ঞতায় মন্থর, কিন্তু মন আশায় প্রবুদ্ধ আর তৃপ্তিতে উদ্ভাসিত।

লেখিকার মনোভঙ্গীর এই পরিমাপ তাঁর জীবনের ঘটনাবলী, মতামত বা উদ্ধৃত অংশের অর্থ থেকে করছি না, ঐ রচনার রীতি থেকেই করছি। রচনাভঙ্গীর মধ্যেই মনোভঙ্গীর একটা প্রতিরূপ পাই। কথাটা বিশদ করি।

৩

উদ্ধৃত রচনাটি একাধিকবার পাঠ করে' ওর রীতির যে সকল লক্ষণ বর্তমান লেখকের কাছে স্পষ্ট বলে মনে হয় তার মধ্যে মুখ্য হ'ল স্পষ্ট অর্থের সহজ সাধারণ শব্দ আর পদের গ্রন্থন, প্রাঞ্জল নিরাভরণ সরল বাক্য বা অর্থ-স্বচ্ছ সহজ যৌগিক বাক্যের প্রাধান্য আর যতির দিক থেকে তাদের হ্রস্বতা। সমগ্রভাবে এই লক্ষণগুলি নির্দেশ দেয় এক স্থির, নির্দিষ্ট আর সংশয়হীন মনোগতির। লেখিকার ধারণারাজিতে দ্বিধার স্থলে স্পষ্টতা আছে বলে'

শব্দ আর বাক্যের অর্থে জড়তা নেই। বিশ্বাস দৃঢ় আর মতামত স্থির বলেই বাক্য বা বাক্যাংশ সরল, আর তাদের গতি যেন ঋজু পদক্ষেপে অকম্পিত। উচ্চারণকালে হ্রস্ব যতিধারায় তারই প্রতিধ্বনি শুনি:—

"তোমার মহিমা অসীম। তুমি কখন কি কর। কে জানিতে পারে। তোমার কথা। তুমিই জান। এ বিষয়ে আমাদের। চিন্তা করাই ভ্রম"।

কথাটা অন্যদিক থেকেও প্রমাণ করা যায়। দেখা যায় যে রাসসুন্দরীর সাধারণতঃ সরল লেখাতেও যেখানে চিন্তা আর ভাবের ধারা যুক্তির পথে চলে আর আভাস-ইঙ্গিতের ওপর-নিচু, বাঁকাচোরা, শাখা-পল্লবিত, আলো-ছায়া গতি অবলম্বন করে, সেখানে বাক্য সরল আর হ্রস্ব যতিযুক্ত না হয়ে জটিল আর যৌগিক হয়েছে :—

"আমার মনে আর একটি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যেন ঐ গ্রামের লোক তাঁহাদিগের নিজের পরিবার অপেক্ষাও আমাকে স্নেহ করেন। বাস্তবিক আমার প্রতি কেহ কখন অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। বস্তুতঃ ঐ দেশের সমুদয় লোকই বড় সজ্জন……(ইহার মধ্যে আমার পরিবারের তো কথাই নাই) ঐ দেশের সকল লোক আমার প্রতি স্নেহ করিয়া থাকেন।"

"যেন"র প্রমাণ দিয়ে কোন "দৃঢ় বিশ্বাস"কে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। ওঠা প্রকৃতপক্ষে লেখিকার মনের সঙ্গে স্বগত বোঝাপড়া। সন্দেহের দোলা থাকছে ব'লে অন্ধ বিশ্বাসের মূলে যুক্তির জোর দিতে হচ্ছে। সরল বাক্যের স্থলে "যেন", "বাস্তবিক", "বস্তুতঃ" ইত্যাদি অব্যয় ব্যবহার করে' যৌগিক বাক্য গড়ে উঠছে। বন্ধনীর মধ্যে "ইহার মধ্যে আমার পরিবারের তো কথাই নাই" এই খণ্ডবাক্য দিয়ে জটিল বাক্যধারাও সৃষ্টি হচ্ছে।

তা'হলে দেখা গেল যে ভাব আর অর্থের গতিধর্মে আর সেই অনুযায়ী যতিবিন্যাসের প্রভাবেই রচনার ছন্দপ্রকৃতি নির্দিষ্ট হয়। বাক্যপর্যায়ে শ্বাসপর্ব অনুসরণ করে' কিম্বা তাতে ইচ্ছাপূর্বক ব্যতিক্রম ঘটিয়ে যে যতি স্থাপন করা হয়, শব্দ আর পদের সেই গ্রন্থনরীতির ওপরই নির্ভর করে পর পর বাক্যের পারস্পরিক হ্রস্ব-দৈর্ঘ্য, বিভিন্ন বাক্যাংশের ওজনের সমতা বা অসমতা, উপাদান-বাক্যগুলির রূপ-সম্বন্ধ আর সমগ্র রচনার গতিনিয়ম। এই গতি-ধারার প্রভাব সুষম হলেই তাকে বলি রচনার ছন্দ।

"সেই সকল লোকেরা আমার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিবেন", এটা হ'ল সমস্যাবাহী একটি দীর্ঘ বাক্যাংশ ; "জানি না" ব'লে নিশ্চয়তাজ্ঞাপক একটি স্বল্প কথার বাক্যে সে সমস্যার নিষ্পত্তি। তার পর "তাহা পরমেশ্বর জানেন" ঐরকম একটি খণ্ডবাক্য যেটা "জানি না"র সঙ্গে তাল দেয়। এই দুটি নিশ্চয়-বোধাত্মক স্পষ্ট বাক্যের দমকের যুগ্মতা প্রথম দীর্ঘতর সংশয়বাক্যের ছড়ান ধ্বনিভারকে কেন্দ্রীভূত করে' তার সঙ্গে ওজন রাখে। যতি আর শ্বাসপর্যায় এইভাবে ভাবার্থের গতির অনুগামী হয়ে সুশ্রাব্য ছন্দধ্বনি সৃষ্টি করে।

ছন্দের নিয়ন্ত্রণ যে ভাবার্থের রূপধর্ম অনুযায়ী হয় রাসসুন্দরী থেকেই তার আরও প্রমাণ দেওয়া যায়। যেখানে ভাবার্থের প্রবাহ-পর্যায় প্রায় সমান সমান সেখানে বাক্যপর্যায়ে যতির ব্যবধানও প্রায় সমান; প্রায় পদ্যের মাত্রানিয়মে নির্দিষ্ট। ছত্রগুলিকে পদ্যের মতন করে সাজালেই এটা ধরা পড়বে :—

"বিশ্বময় বিশ্বপাতা,
তোমার অসীম মহিমা ;
তুমি কখন কি কর
        কে জানিতে পারে ?
তোমার কথা তুমি জানো ;
এ বিষয়ে আমাদের
        চিন্তা করাই ভ্রম।"

"তোমার" কথাটিকে দুই মাত্রা ধরলে চতুর্থ আর সপ্তম ছত্র ছাড়া সবগুলিই আট মাত্রার ; ও দুটি ছয় মাত্রার। এ ছাড়া অল্প আয়াসে দুটি একটি মাত্রা কমিয়ে বাড়িয়ে ছত্রগুলির মধ্যেও খণ্ড-যতির একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করা যেতে পারে।

রাসসুন্দরী নিশ্চয় এত বিবেচনা করে' তাঁর গদ্য-ছন্দ নির্মাণ করেন নি। তাঁর ভাব-চিন্তার প্রকৃতিই যতি আর শ্বাস-পর্যায়কে নিজস্ব বেগের অনুবর্তী করে' রচনার ছন্দপ্রবাহ নির্ধারিত করেছে। আর ঐ যতি আর বাক্যবিন্যাসের রীতি বিশ্লেষণ করেই আমরা তাঁর ভাব-চিন্তার ভঙ্গীর আভাস গ্রহণ করবার

চেষ্টা করেছি। ভাবার্থের রস-মূল্যের বিকাশ ভঙ্গীতে আর সে ভঙ্গীর দেহধারণ রচনারীতিতে। "আমি বার বৎসরের সময়ে রামদিয়া গ্রামে আসিয়াছি," এ বাক্যের ভাবপ্রকৃতিই কি আর ছন্দপ্রকৃতিই কি? বহুকাল পূর্বের কথা লেখিকা বলছেন। বলতে গিয়ে অনেক কিছু মনে পড়ে; প্রসঙ্গ উত্থাপনমাত্র সে সকল কথা মনের মধ্যে ভিড় করে' ওঠে। কিন্তু বড়ই ব্যক্তিগত সে সকল কথা; লোকসমক্ষে বলা চলে না। রচনার গতি আর ধ্বনিতেও তাই পাই যে লেখিকা যেন আবেগ আর আগ্রহের সঙ্গে বলতে আরম্ভ করে' হঠাৎ সাবধান হয়ে যান। "বার বৎসরের সময় রামদিয়া গ্রামে" বলে' দৃঢ় সরব ব্যঞ্জনবর্ণবহুল শব্দযোগে, তারিখ ধরে', সেবিশেষভাবে কথা আরম্ভ হয়ে "আসিয়াছি" পদের ক্ষীণ স্বরাঘাতে সে কথার ধ্বনি আর গতি বিলীন হয়ে যায়। ক্ষিপ্রবেগে, এক নিশ্বাসের দমকে, "রামদিয়া গ্রামে" পর্যন্ত বলে "আসিয়াছি" তে যতি পড়ে' যায়। রাসসুন্দরীর লেখার প্রায় সত্তর বৎসর পরে, ভাষাভঙ্গীতে তাঁর থেকে পৃথক রবীন্দ্রনাথ যখন ঐ ভাবের কথা বলতে যান, তখন তিনিও কি ভঙ্গীতে বলেন? "উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি" ("আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা," প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪০)। সেই একই সুর, একই ধ্বনি। উচুঁ স্বরে "উপনয়নের পরেই" বলাতে যে প্রতিশ্রুতি, সেটা "আমি এখানে এসেছি" এই স্বরবর্ণবহুল বাক্যের ক্ষীণতর ধ্বনিতে ত্রস্ত হয়ে পড়ে। রাসসুন্দরী আর রবীন্দ্রনাথ এই উভয়ের ক্ষেত্রে তাহ'লে বাক্যগঠনের আঙ্গিক একই হ'ল; বাক্যাংশের প্রথম দিকে বেশী ঝোঁক, শেষের দিকে লঘু। ভাবরসের প্রতিরূপ ভঙ্গী; ভঙ্গীর আশ্রয় রীতি।

৪

ভঙ্গীর নির্ণয়ে ছন্দ আর যতি ছাড়া রীতিপদ্ধতির অন্যান্য অঙ্গ, অর্থাৎ শব্দচয়ন, বাক্যগঠন, ব্যাকরণ আর অলঙ্কার প্রভৃতির কার্যকৌশল এবার লক্ষ্য করা যাক।

রাসসুন্দরী মোটের ওপর সাধুভাষার শব্দই ব্যবহার করেন, কিন্তু কিছু সংস্কৃত-ঘেঁষা আর কিছু ফারসী উৎপত্তির শব্দরাজিও তিনি ব্যবহার করেছেন

যেগুলি কথিত ভাষার সহজ অর্থ আর গতি নিয়ে সেদিনের জনসাধারণের চলতি ভাষা গঠনে সাহায্য করেছিল। তাঁর কথায় বাটীর "সজ্জন"দের মধ্যে "চাকর চাকরাণী"ও ছিল। "চাকর" শব্দের উৎপত্তি ফারসী। শ্বশুরবাড়ীতে কত "দিবস" থাকতে হবে ভাবতে গিয়ে তাঁর মনে পড়ে যে তিনি ছয় বৎসর পর্যন্ত "বৌ" ছিলেন, "বধূ" নয়। তাঁকে "গৃহকার্য্য" করতে হোতো কিন্তু "মেয়েছেলে" ছিলেন বলে' লেখাপড়া করতে পারতেন না।

রাসসুন্দরী সাধু আর চলতিভাষার শব্দরাজি যেভাবে ব্যবহার করে' গেছেন তাতে মনে হয় শব্দ নির্বাচনে তিনি কোনরকম বাতিকগ্রস্ত বা মতাবলম্বী ছিলেন না। মনে হয়, যেমন সহজ অনাড়ম্বর তাঁর বক্তব্য ছিল সেইরকমই তাঁর কলমের মুখে সরাসরি যে শব্দরাজি যখন যেমন এসেছে তেমনি তিনি ব্যবহার করে' গেছেন। সহজবোধ্য সাধুভাষার ভিত্তি অবলম্বন করে' তিনি কথা কয়ে যান; ভাষাকে ঝঙ্কৃত মন্দ্রিত করবার জন্যে ধ্বনি-সমৃদ্ধ কথা খোঁজেন না। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের কুলবধূ ঈষৎ সঙ্কোচে, চাপা সুরে অথচ অমায়িকভাবে, ঘরোয়া আলাপের সাধারণ ভাষাধর্ম অবলম্বন করে' সরল শব্দ আর বাক্যে তাঁর বিবৃতি রচনা করেন। রাসসুন্দরীর রচনাভঙ্গীর যে বিশ্লেষণ ওপরে করা হয়েছে তার পক্ষে এইরকম শব্দার্থ আর নিরাভরণ শব্দ আর বাক্য নির্বাচনই সঙ্গত হয়েছে।

অন্যমনস্কা লেখিকার রচনায় বাক্যধারার মধ্যে অনেক সময়ে অতিমাত্রায় কথ্যভঙ্গীর মিশ্রণ দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দেয়! "এই আঠারো বৎসর আমার এই অবস্থায় কালগত হইয়াছে।" "কালগত" পদের পর বিদ্যাসাগরী রীতিরই অনুসরণ আশা করি। তার স্থলে এসে পড়ে "এই আঠারো বৎসর পর্যন্ত আমার মনটি 'বড় বেশ' ছিল।" সাধু আর চলতি রীতির এই রকম পাশাপাশি আর কতকটা বিরোধী অবস্থান থেকে এই তথ্যই সূচিত হয় যে ভাবধর্ম বিশ্বস্ত আর সরল হ'লে তার রূপগ্রহণও হয় কৃত্রিমতাহীন ভাষাভঙ্গীতে — সময়বিশেষে এত অকৃত্রিম যে প্রায় গ্রাম্য, সৌন্দর্যমূল্যে খণ্ডিত।

রাসসুন্দরীর ব্যাকরণ ব্যবহারে তখনকার দিনের বা আজকের তুলনায় অসাধারণত্ব নেই, তবু যখন তিনি "এ মত ভালই বলিতে হইবেক" এই বাক্যে প্রচলিত "ইবে"র স্থলে "ইবেক" ধাতু-বিভক্তি দিয়ে সমাপিকা ক্রিয়া-পদ গঠন

করেন তখন তিনি একেবারে পনর শতকের পত্রসাহিত্যের গদ্যের দুয়ারে আঘাত দেন। এই রীতির ফলে তাঁর রচনাভঙ্গী একালের হয়েও কেমন যেন অদ্ভুত অথচ কমনীয় প্রাচীনত্বের আবহ-গুণ্ঠন বহন করে, যার একটা স্বতন্ত্র রসমূল্য অনুভব করা যায়।

অলঙ্কারবিন্যাসের দিকে রাসসুন্দরী যান না। তাঁর নিজস্ব বাহ্যিক কোন ভঙ্গিমা বা সাহিত্যিক ঢং নেই। তাঁর রচনাধর্মের সঙ্গে তা সঙ্গতও হ'ত না।

৫

রীতির বিশ্লেষণ থেকে ভঙ্গীর আর রীতির যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেখা গেল ঐতিহাসিক আলোচনা থেকে তার সমর্থন আর পরিপোষণ মিলবে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে গড়ে' উঠেছিল রাসসুন্দরীর লেখিকাজীবন। ইংরাজী আমলের সমারোহ, সুবিধা আর নিরাপত্তার মধ্যে একদিকে ভূস্বামীশ্রেণীর মধ্যবিত্তেরা সামন্ততন্ত্রী ঐতিহ্যের স্মৃতিবাহী আভিজাত্য-গর্বে আরো নিশ্চিন্ত আর আত্মপ্রতিষ্ঠ বোধ করলে। অন্যদিকে যে নতুন চাকুরে আর স্বাধীন-ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় উঠলো তারা সুবিধাবাদী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি-সচেতন আর বুদ্ধিবাদীও হ'ল। ভূস্বামী-ঘরের বধূ রাসসুন্দরীতে জমিদারী গর্ব, নতুন সাধারণ মধ্যবিত্তের ব্যক্তি-সচেতনতা, বিচারপ্রবণতা, আর সঙ্গে সঙ্গে রঘুনন্দনের ব্রাহ্মণ্য ধর্মনীতির শাসন-প্রসূত ভবিতব্যবাদিতা বিচিত্র সমন্বয়ে স্থানলাভ করেছিল মনে হয়। যুগের ব্যক্তি-চেতনাই বুঝি অন্তঃপুরচারিণীকে জীবনীসাহিত্যের কলম ধরালে। ব্যক্তিত্ব-বোধ আর ধর্মবিশ্বাসের একটা আপস মীমাংসার পরিচয়ই ছড়ান আছে তাঁর ছত্রে ছত্রে। আমাদের উদ্ধৃত অংশটিতেই তার অনেক প্রমাণ। তাঁর ব্যক্তিগত কথা স্পষ্ট করে' বলতে তিনি যত্ন করেন। জীবনে সুখের কথা বলতে গিয়ে আক্ষেপের কথাগুলিও বলতে ভোলেন না। বর্তমানে অপরের স্নেহ সম্বন্ধে বিশ্বাস থাকলেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর সংশয় আছে। আবার ঈশ্বরের মহিমায় বিশ্বাস আর তাঁর ওপর সত্যই নির্ভর করেন বলে' তিনি সকল ভয়কেই ভরসার সুরে নিঃশঙ্ক করে' তোলেন। তাঁর আভিজাত্যের গর্ববোধের প্রমাণ তাঁর স্বামী,

সম্বন্ধে তাঁর নানা উক্তিতে। "তিনি বিলক্ষণ প্রতাপবিশিষ্ট পুরুষ ছিলেন"—এর প্রমাণ কি ?—"তদুপযুক্ত তাঁহার বিশ পঁচিশটা মোকৰ্দ্দমা লাগিয়াই থাকিত।" এমন কি, "দুই পরগণার জমিদার এক কুঠিয়াল সাহেবের সহিত তাঁহার সর্ব্বদাই ফৌজদারী মোকৰ্দ্দমা হইত। কিন্তু পরমেশ্বরের প্রসাদে ঐ সকল মোকদ্দমাই জয় হইত, একটি মোকদ্দমাতেও তিনি সাহেবের সহিত পরাজিত হইতেন না।" অতি দৃঢ় ঈশ্বর বিশ্বাস হ'লে তবেই মোকদ্দমার মত ব্যাপারে জয়লাভ করাকে পরমেশ্বরের প্রসাদ বলে' মানা চলে। সাহেবের সঙ্গে ফৌজদারি করে' সাহেবকে পরাজিত করার গর্ব প্রভুবিদ্বেষী, অথচ প্রভুর গর্বে গর্বিত, সাহেবদের মধ্যবিত্ত ভৃত্য-সম্প্রদায়ই করতে পারে।

সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার দিক থেকে রাসসুন্দরীর সাহিত্যিক ভঙ্গী আর রীতি সম্বন্ধে বলা যায় যে যেখানে তাঁর ব্যক্তিত্ববোধ তাঁর উক্তির ঝোঁক আর ধ্বনিকে স্পষ্ট আর বিদ্রোহ-বোধে সরল আর প্রবল করে' তুলতে পারতো, সেখানে তাঁর সংস্কার আর ধর্মভীরুতা, নির্ভর আর মীমাংসাবৃত্তি, বিদ্রোহের সকল বন্ধুরতা আর কর্কশতা এড়িয়ে তাঁর রচনাভঙ্গীকে করেছে শান্ত, মৃদু, অমায়িক। ভয় আর ভরসার দোলা তাতে সমান সমান। মনোগতির পরিমাপে বাক্যের যতির মাপ। চঞ্চলভাবে দীর্ঘপদে ক্ষিপ্রগতিতে আরম্ভ হয় "কি প্রকার ব্যবহার করিবেন জানি না।" পরক্ষণেই নিজেকে ক্ষুদ্র বাক্যে সংযত করে' বলেন "তাহা ঈশ্বর জানেন।" মধ্যবিত্তের মনোভাব নিজের বিদ্রোহবোধ আর অসন্তোষ নিজেই দমন করে। রাসসুন্দরীর ভাষা আর ধ্বনিতে বিক্ষোভ আছে কিন্তু স্বীকৃতি আর আশার প্রবোধে তাঁর ছন্দ মসৃণ আর প্রসন্ন। পথের পাঁচালীর ইন্দির ঠাকরুন শীতের মধ্যাহ্নে স্মৃতি-রোমন্থন করতে করতে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে আবার ঝিমিয়ে পড়েন!

বুদ্ধিজীবীর সন্দেহবৃত্তি আর সংস্কারগত বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব সময়ে সময়ে অদ্ভুত গঠনের বাক্যধারা রাসসুন্দরীকে দিয়ে রচনা করিয়েছে। "আমার নিশ্চয় বোধ হইত যেন পরমেশ্বর ইহাদিগকে তাহা বলিয়া দিয়াছেন।" যেমন পূর্বে উল্লেখ করেছি, "নিশ্চয় বোধ" হ'লে আবার "যেন" কেন? সমগ্র রচনাভঙ্গীর ওপর এই ধরনের বাক্যরীতি একটা অযত্ন-লালিত সরল গ্রাম্য সুর মেলে দেয়।

"এইটি ভারি আক্ষেপের বিষয় ছিল যে মেয়েছেলে বলিয়া লিখিতে পড়িতে পাইতাম না"—এখানে যে বিদ্রোহের ধ্বনি প্রায় জেগে উঠেছিল তাকে পরমুহূর্তেই মধ্যবিত্তের ঘরনী-সেবাব্রতী কল্যাণী অন্য মেয়েদের সৌভাগ্য প্রশংসার মধ্যে নিস্তেজ করে ফেলেন। সংস্কারবশে নিজের কথা আর বলেন না। দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হয়। বাক্যের ধ্বনিও আবার মসৃণ হয়ে ওঠে—"এখনকার মেয়েদের কি সুন্দর কপাল! এখন মেয়ে জন্মিলে অনেকেই বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করেন।"

৬

রচনাভঙ্গীর আলোচনায় শিল্পীর মনোগঠন ছাড়া ভাষার প্রসঙ্গও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করবার আবশ্যক হয়। রূপ-রচনার আঙ্গিকে তার প্রকাশ-মাধ্যমেরও একটা ইতিহাস থাকে। সে মাধ্যমও ইতিহাসের ধারা আর ঐতিহ্য আর ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রতিক্রিয়াতেই গড়ে' ওঠে। তাই সমগ্র উনিশ শতকের বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাসই যাঁর চোখের ওপর একরকম বিবর্তিত হ'ল, ১৩০৩ সালে অষ্টাশী বছর বয়সে যিনি তাঁর গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেন, সেই রাসসুন্দরীর সাধুভাষা আর চলতি ভাষার সমন্বয়ে গড়া রচনারীতি সম্বন্ধেও ভাবতে হয়। তার কতটাই বা তাঁর লাজুক, অমায়িক আর বিশ্বস্ত প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে; কতটা বা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অন্যতম দুর্গ সংস্কৃত ভাষাভঙ্গীর বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর চিরকালীন শাসন-বিদ্রোহী মনোভাবের প্রতিচ্ছবি; ইংরাজী আমলে ভাব-চিন্তার ভঙ্গী পরিবর্তনে স্বাভাবিকতা, ব্যাপকতা, নমনীয়তা, ক্ষিপ্রতা, বৈচিত্র্য আর স্পষ্টতার (আর সাঙ্কেতিকতারও) প্রয়োজনেই বা কতটা; শেষতঃ সাহিত্যিক গোষ্ঠী-লক্ষণের দিক থেকে কার দ্বারা তিনি কি পরিমাণে প্রভাবিত— কেরীর কথ্যভঙ্গীর অনুসারী রামরাম বসু না অন্যদিকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার; প্রাচীনপন্থী 'সংবাদ প্রভাকর' না নবযুগের 'তত্ত্ববোধিনী'; প্যারীচাঁদ মিত্র না ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর;—এ সকল প্রশ্ন সঙ্গতভাবে আলোচ্য। সংস্কৃত সূত্র-সাহিত্যের ভঙ্গীতে সহজিয়া সাধন সম্পর্কীয় বৈষ্ণব কড়চা সাহিত্যের কাটা কাটা যে গদ্য—"তুমি কে, আমি জীব; তুমি কোন্ জীব, আমি তটস্থ জীব"—তারই কি প্রতিধ্বনি রাসসুন্দরীর—

"জানি না, তাহা পরমেশ্বর জানেন; ··তোমার কথা তুমি জান"? এই ধ্বনি কি বঙ্কিমেও স্থানে স্থানে পেয়েছি? আজও কি যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি এই ধ্বনি অনুসরণ করেন? এই রকম নানাদিক থেকে বিচার করলে তবেই ন্যায়তঃ লেখক-বিশেষের ভাষা-প্রতিভার আলোচনা সম্যক হ'তে পারে।

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনাপদ্ধতিতে ভঙ্গী আর রীতি বিচারের পরিধি হয়ত বেড়ে যায়, সমাধানের চেয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয় হয়ত বেশী; কিন্তু তার কমে, রসালোচনার সম্মাননাও হয় না। রসব্যাখ্যা কোন দিন এক কথায় হয় নি; হয়ত সে ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে সম্ভবপরই নয়; রসের তত্ত্বও বুঝি নিহিতং গুহায়াম্।

"নামকরণে রবীন্দ্রনাথ"

(আলোচনা)

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী

বর্তমান বৎসরে বি শ্ব ভা র তী প ত্রি কা র বৈশাখের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের লেখা উল্লিখিত-শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলা আবশ্যক মনে হইতেছে।

বিশ্বভারতীর সম্বন্ধে যতগুলি নামের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিই গুরুদেবের করা ইহা বলা যায় না, যদিও অধিকাংশই তাঁহার করা এবং প্রত্যেকটিই তাঁহার অনুমোদিত। ঐ সমস্ত নামের কোন-কোনটি অন্যের করা অথবা অন্যের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহার করা। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

গু রু প ল্লী নামটি আমার কথায় রাখা হয়। ইহার মূলে একটা কথা ছিল। তখন বি শ্ব ভা র তী র সৃষ্টি হয় নি, ছিল ব্র হ্ম চ র্যা শ্র ম। ইহা হইতে আমার মনে এইরূপ কল্পনা বরাবর ছিল যে, সেই আশ্রমের চারিদিকের এক-এক দিকে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এই চারি আশ্রমেরই ব্যক্তি যদি বাস করেন তো ভাল হয়। ব্র হ্ম চ র্যা শ্র ম হইতে গুরুকুলের কথা সহজেই মনে হইয়াছিল, এবং তাহা হইতে অধ্যাপকদের পাড়ার নাম গু রু প ল্লী হওয়াই ঠিক, ইহা ভাবিয়াছিলাম ও প্রস্তাব করিয়াছিলাম। অধ্যাপকগণের সহিত গুরুদেব ইহা অনুমোদন করিলে আমার সহযোগী বন্ধুগণকে ঠাট্টা করিয়া বলিতাম, সংস্কৃতের গু রু শব্দ পালি ভাষায় হয় গ রু, তাই গু রু প ল্লী হইতেছে বস্তুত গ রু প ল্লী! তাঁহারা এই কৌতুক অনুভব করিয়া হাসিতেন, কিন্তু কোন আপত্তি করেন নি। ঐ নাম চলিয়া গেল।

শ্রী ভ ব ন নামও আমার কথায়। গুরুদেব সেই সময়ে কোন একটি ভাল ঘরের সঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধেয় নন্দবাবুর নামটি যোগ করিতে চাহিতেছিলেন। (এরূপ নাম আশ্রমে আছে, যেমন স ত্য কু টী র, শ মী ন্দ্র কু টী র।) গুরুদেব বলিতেছিলেন উহার নাম ন ন্দ ন হউক। আমাকে উহা ভাল লাগে নাই। আমি বলিয়াছিলাম, 'যদি নন্দবাবুর নাম যোগ করিবারই ইচ্ছা আপনার

থাকে, তবে স্পষ্ট করিয়া ন ন্দ ভ ব ন নাম করা হউক না কেন? গুরুদেবকে ইহাও ভাল লাগিল না। আমি তখন অন্য দিক্ দিয়া ভাবিয়া বলিলাম, 'ঐ বাড়ীতে তো আমাদের মেয়েরা থাকিবে, অতএব "স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন" মনুর এই বচন-অনুসারে ঐ বাড়ীর নাম শ্রী ভ ব ন রাখা হউক।' গুরুদেব ইহা অনুমোদন করিলেন।

ইহার পাশের পাড়াটি শ্রী ভ ব নে র লাগা বলিয়া গু রু প ল্লী র অনুকরণে তাহার নাম শ্রী প ল্লী রাখা হয় আমারই প্রস্তাবে।

শ্রীনিকেতনের প্রথম অবস্থায় কৃষির প্রাধান্য হইল, তাই কৃষিজাত লক্ষ্মীর কথা মনে করিয়া উহার নাম শ্রী নি কে ত ন রাখিবার পরামর্শও আমিই গুরুদেবকে দিয়াছিলাম, মনে হইতেছে।

বে ণু কু ঞ্জ নাম আমার দেওয়া। ঐ ঘরখানি মূলত দিনুবাবুর[১] জন্য হইয়াছিল। তিনি তাহার একটা নামের জন্য আমাকে বলিলে, ঐ ঘরের উত্তরে ও দক্ষিণে বাঁশের ঝাড় থাকায় আমি ঐ নামটি নির্ধারণ করি, তিনি ও অন্যান্য সকলেই ইহা অনুমোদন করেন। এই বে ণু কু ঞ্জে দিনুবাবুর পরে কিছুকাল রথীন্দ্রনাথ, তাহার পর এণ্ড্রুজ সাহেব ছিলেন, এবং তাহারও পরে আমি দীর্ঘকাল রাজার মত বাস করিয়া আসিয়াছি।

সাধারণত 'সেক্রেটারী' বুঝাইতে 'সচিব' শব্দের যোগে প্রথম-প্রথম যে সকল নাম ওখানে করা হয়, যেমন আ শ্র ম স চি ব, ক র্ম স চি ব, অ র্থ স চি ব, সে সব আমারই প্রস্তাবে। আমার সেখানে বাস করার সময়ে 'ভবন' শব্দের যোগে যে সব নাম হইয়াছিল তাহাদেরও সম্বন্ধে এই কথা।

পাঠের দ্বারা শিক্ষা, এবং শিক্ষা দ্বারা বিদ্যা হয়, ইহাই এক দিন গুরুদেব ও আমার মধ্যে আলোচনা হইয়াছিল। তাহা হইতে পা ঠ ভ ব ন, শি ক্ষা ভ ব ন, ও বি দ্যা ভ ব ন এই তিনটি নাম হয়।

উ ত্ত রা য় ণ ও ইহার সংসৃষ্ট কয়েকটি বাড়ীর নাম গুরুদেবের একবারে নিজের করা। উ ত্ত রা য় ণ আশ্রমের উত্তর দিকে, আর স্বয়ং র বি (অর্থাৎ গুরুদেব) ঐদিকে বাস করিতে গিয়াছেন, এই ভাবিয়া তিনি তাহার নাম

১। স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

করেন উ ত্ত রা য় ণ। ইহারই মধ্যে উদয়ন সৌধ। উ দ য় ন বলিতে 'উদয়'। ওখানে র বি র (গুরুদেবের) উদয় হয় বলিয়া তাহা উ দ য় ন। তার পাশে 'কোনারক' নহে, কো ণা র্ক। এ সম্বন্ধে তিনি একদিন আমাকে এইরূপ বলিতেছিলেন যে, উ ত্ত রা য় ণ বলিতে ঐ স্থানের চারিদিকের সমস্ত হাতাটা, আর তাহার এক কোণে অ র্ক (অর্থাৎ র বি, অর্থাৎ স্বয়ং কবি আমাদের গুরুদেব) থাকেন তাই ঐ বাড়ীর নাম কো ণা র্ক। এই নামকরণে উড়িষ্যার কো না র ক মন্দিরের ভাবও তাঁহার মনে হয় তো ছিল।

সহজেই মনে হয়, এই উ ত্ত রা য় ণে র ই অনুকরণে কলিকাতার দক্ষিণে কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে গড়িয়াহাট রোডের উপরে শেষ বাড়ীটির নাম করা হইয়াছে দ ক্ষি ণা য় ণ।

বি শ্ব ভা র তী নাম রাখিবার পূর্বে গুরুদেব ঐ সম্বন্ধে আমার সহিত অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন।

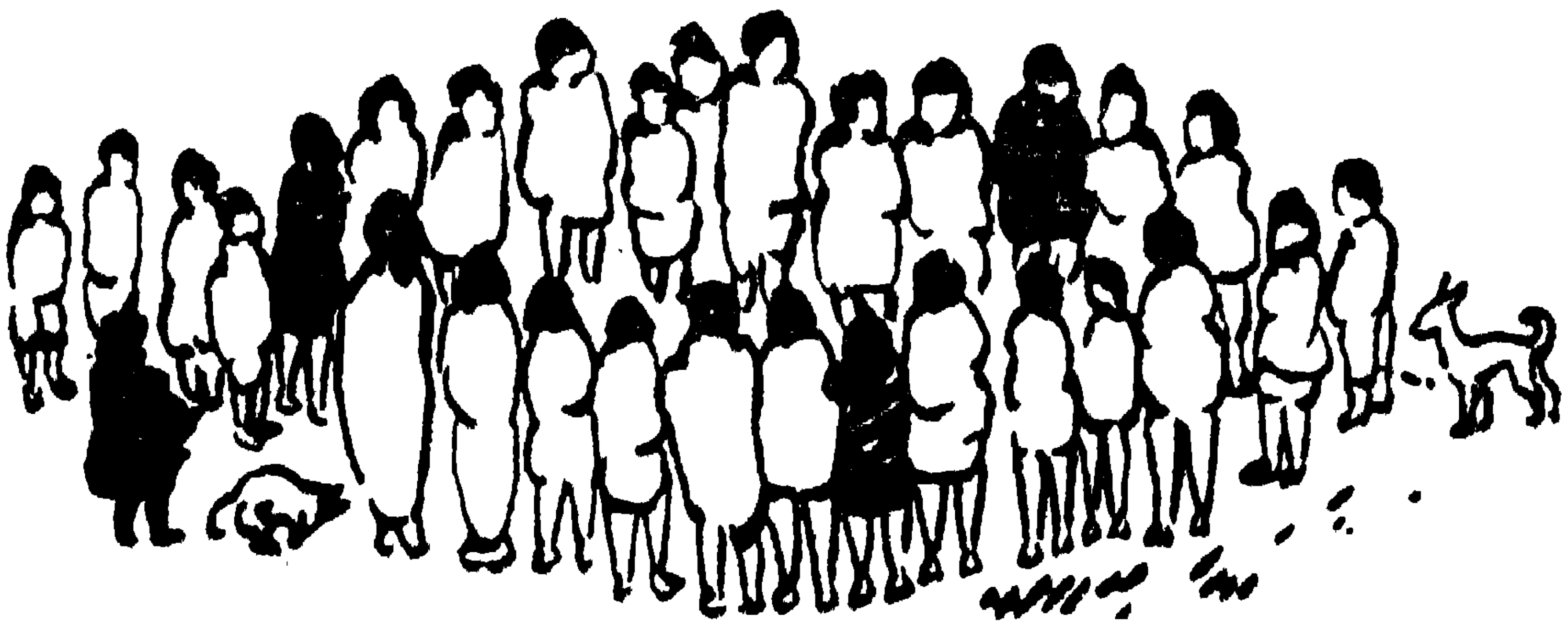

চিত্রশিল্পী ও শিক্ষাগুরু

শ্রীমতী তরুণপ্রভা সিংহ রায়

সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। একদিন প্রাতে কলাভবন দেখতে গিয়ে দেখলাম সেখানকার সামনের উন্মুক্ত বারান্দায় শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ বসে,'— হাতে তাঁর তুলি আর রঙ। একদিকে দাঁড়িয়ে কয়েকটি শিক্ষার্থী, অন্যদিকে কয়েকটি শিক্ষার্থিনী; সকলেরই মন আকৃষ্ট তাঁর চিত্রের দিকে। পাশে একটি পিতলের থালা,— কুল, কমলালেবু ইত্যাদি নানাবিধ ফলে পরিপূর্ণ। একটি চিত্র সমাপ্ত হতে শিক্ষার্থিনীরা যাবার জন্য পা' বাড়িয়েছে, অমনি তিনি পিছন থেকে ডেকেছেন— 'এই মেয়েরা, চলে যাচ্ছিস কেন?' মেয়েরা এগিয়ে আসতে তিনি তাদের হাতে তুলে দিলেন একটি করে ফল। তারা হাসিভরা মুখে চলে গেল। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের এমন একটা মধুর সম্পর্ক দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমাদের প্রাচীনকালের গুরুশিষ্য সম্বন্ধটি কেমন ছিল, তা যেন দেখতে পেলাম চোখের সম্মুখে। চিত্রশিল্পী ও শিক্ষাগুরু অবনীন্দ্রনাথের এমন একটি পবিত্র মূর্তি সেদিন অঙ্কিত হয়ে গেল মনের মধ্যে যে, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা না বলে' পারছি নে। তাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির অবতারণা।

বহুযুগ আগে উপনিষদের ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল এক অমৃত মন্ত্র 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'। যিনি সত্য, যিনি কল্যাণ, তিনিই সুন্দর। কল্যাণকে সুন্দরের রূপে রূপায়িত করবার জন্য তাঁরাই আবার ব্যক্ত করেছিলেন চিত্রলিপির ষড়্ অঙ্গ। কিন্তু কালের গতিতে ভারতীয় কলা হারিয়ে ফেলেছিল তার নিজস্ব রূপকে। সে সুপ্ত ছিল অতীতের গহ্বরে আর লুপ্ত হতে চলেছিল ভবিষ্যতের অন্ধকারে। কিন্তু আজ অবনীন্দ্রনাথ সেই হারানো রতনকে কুড়িয়ে এনে আবার প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার পবিত্র আসনে; তাঁর প্রাণের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েছে, পুনরুদ্দীপিত হয়েছে ভারতের চিত্রকলা।

ছেলেবেলায় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা শুরু করেছিলেন ইউরোপীয় শিক্ষকদের নিকটে। কিন্তু যাঁর অন্তরে উপনিষদের গুঞ্জরণ, তাঁর ক্ষুধা

ইউরোপীয় কলা-কৌশলে মিটবে কেন? তাই তিনি অনেক শিক্ষার পরেও একটা অজানা অনির্দেশ্য চঞ্চলতা বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এ সময়ে কয়েকটি মোগল চিত্রের সন্ধান পেয়ে তাঁর চোখের সামনে যেন নতুন আলোর দুয়ার খুলে যায়। তিনি ইউরোপীয় অঙ্কনরীতি পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ ভারতীয় কল্পনায় চিত্র অঙ্কনের বিষয়বস্তু সন্ধান করতে থাকেন। মোগল চিত্র রূপে বর্ণে সুন্দর হলেও তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল তার ভাবব্যঞ্জনার অভাব; অথচ ভারতীয় শিল্পকলার এটুকুই বৈশিষ্ট্য। তাই তিনি এ অভাব দূরীকরণের জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে তিনি ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণবপদাবলী, বুদ্ধচরিত্র ইত্যাদি চিত্রিত করতে থাকেন। প্রথমে তাঁর আঁকবার ধারা বদলানো কষ্টসাধ্য হয়েছিল, কিন্তু অদম্য উৎসাহের বেগে ক্রমেই তাঁর কার্য সহজ হতে সহজতর হতে লাগল। তাঁর প্রাণের ক্ষুধিত সৃজনীশক্তি যেন আপনার লীলাক্ষেত্রটি অনায়াসে আবিষ্কার করে ফেললে। রঙে, রেখায়, আলো-ছায়ায়, যে চিত্রটি সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হ'ত তাঁর মনের মুকুরে, তারই প্রতিচ্ছবিকে তিনি মূর্ত করে তুলতেন মুহূর্তের মাঝে। চিত্রের রূপসৌন্দর্যে, অন্তরের আলোকে তিনি তন্ময় হতেন আর উপভোগ করতেন অনির্বচনীয় আনন্দ। নিজের কন্যাকে হারিয়ে তিনি আঁকলেন কারাগারের মধ্যে কন্যার পার্শ্বে শাজাহানের চিত্র। সমালোচকেরা এ চিত্রে করুণভাবের ব্যঞ্জনা দেখে মুগ্ধ হয়ে' গেলেন। এ চিত্রে ফুটে উঠেছিল তাঁর নিজেরই হৃদয়ের ক্রন্দন।

এ সময়ে তিনি গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু কিছু পরেই ভারতীয় চিত্রকলার সংস্কৃতি ও উন্নতির জন্য 'Indian Society of Oriental Art' বলে' আর একটি প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপনা করেন। এখানে অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীন কলাপদ্ধতি নিয়ে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন; পণ্ডিত নিযুক্ত করে' রামায়ণ মহাভারত বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, যাতে চিত্রের ভিত্তিস্বরূপ থাকে ছাত্রদের নিষ্ঠা, জ্ঞান ও ভক্তি। তিনি দেশে দেশে ছড়িয়ে দিলেন ভারতীয় চিত্রকলার নিদর্শন অনুসন্ধানের বার্তা, আর প্রাচীন ধারা নিয়ে লিখলেন প্রবন্ধ।

তাঁর শিক্ষাধারার ছিল দুটি দিক, একটি বাইরের, একটি অন্তরের।

বাইরের দিক দিয়ে তাঁর শিক্ষার গোড়ার কথা অন্তরকে প্রথমে চিত্রের আলোকে আলোকিত করা ও পরে তুলির রেখা টানা। প্রথমেই গণিতশাস্ত্রের কঠিন পাশে রেখার বন্ধন এবং পরে তাতে প্রাণশক্তি বিকাশ করার চেষ্টা, এ তাঁর শিক্ষাবিরুদ্ধ। তিনি ইউরোপীয় কলাবিদ্যা শিক্ষাকালে উপলব্ধি করেছিলেন যে যন্ত্রস্বরূপ হয়ে' ছবি আঁকলে, ছবি, মাপে, করণকৌশলে, আকৃতিতে সুন্দর হতে পারে, কিন্তু তার সত্যরূপ ফুটে ওঠে না,— তাতে প্রাণের স্পন্দন জাগে না ; কাজেই সে ছবি চিত্রকর বা দর্শক কারুরই প্রাণে সাড়া জাগায় না। তাই তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে এ দিকে দৃষ্টি দিলেন সর্বাগ্রে। ছবিকে প্রাণ-চঞ্চল করবার আগ্রহে, মাপ পরিমাপ ইত্যাদি বিষয়ে সে ছবির সঙ্গে বাস্তবের অনেক সময় গরমিল দেখা যেত ; কিন্তু ছবির বিষয়বস্তু প্রকৃতিই হউক, আর মানবচরিত্রই হউক, সকলেরই মধ্যে এমন একটা প্রাণের দীপ্তি ও স্বতঃস্ফূর্তি অনুভব করা যেত যে, তিনি তাই এঁকেই আত্মপরিতৃপ্তি পেতেন, পেতেন মুক্তির আস্বাদ। এই মুক্তির আস্বাদ বিতরণ করবার উদ্দেশ্যে তিনি কখনও তাঁর ছাত্রদের প্রতিচ্ছবি আঁকতে শিক্ষা দিতেন না, দিতেন সৃজনীশক্তি। হিন্দুশিল্পশাস্ত্রের ষড়ঙ্গের উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতেন তাদের মনে, চিত্রপরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ভাবব্যঞ্জনা, প্রাণের স্পন্দন জেগে উঠত অলক্ষিতে। আর ছবি প্রথম থেকেই ছন্দে, প্রাণে গতিতে লয়েতে রূপায়িত হতে থাকত, ছড়িয়ে দিত অখণ্ড সুষমা। প্রাচীন ঋষিদের নির্দেশ—

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্‌
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গং ইতি চিত্র ষড়ঙ্গকম্‌।

রূপভেদ, প্রমাণ, সাদৃশ্য, বর্ণের ব্যঞ্জনা, এ চতুরঙ্গের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে ভাবকে ও লাবণ্যকে। প্রতিকৃতি নিয়মকানুনসহ রাঙিয়ে উঠবে ;— তার একদিকে থাকবে লিপিকুশলতা, অন্যদিকে থাকবে মাধুরী ও সৌন্দর্য। এ নির্দেশ তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল বলে' তিনি কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের বাণীকে, আর আজ তাকে ব্যাপ্তও করেছেন শিল্পীদের সাধনার ক্ষেত্রে।

অন্যদিকটি তাঁর লিপিকুশলতায় নেই, তাঁর নৈপুণ্যেও নেই, আছে তাঁর হৃদয়ে। সূক্ষ্মনিপুণ হাতের রেখার জালবুনানিতে তিনি বিস্মিত করেছেন

সমস্ত জগৎকে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি বিস্মিত হয়েছে জগৎ তাঁকে আদর্শস্বরূপ পেয়ে। শিক্ষা দেবার কালে শাসনের রক্তচক্ষু তাঁর নেই, আছে স্নেহের অপরিমিত দান; তাই ছাত্রগণ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার ভিতর দিয়ে পায় তাঁর মধুর শিক্ষা। কলাভবনে ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের সম্পর্ক, স্নেহের ভিতর দিয়ে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ। নন্দলাল বলেন একটি আলো যেমন অন্য আলোকে জ্বালিয়ে দেয়, তেমনি করে' তিনি জ্বালিয়ে দেন ছাত্রদের মনে জ্ঞানের প্রদীপ। জোরজুলুম নেই, বাধা নেই, কঠোরতা নেই; শুধু উৎসাহ, শুধু সাহায্য, শুধু ধারাপ্রবর্তন। বৃক্ষ হবার শক্তি বীজই ধারণ করে, শুধু তাকে জল হাওয়া দিয়ে বাড়ানো, এ কথা তিনি কার্যক্ষেত্রে বারে বারে প্রকাশ করেছেন,— তাই তাঁর শিষ্যের দল তাঁর দিকে আকৃষ্ট, নৈপুণ্যে নয়, হৃদয়ের আহ্বানে।

যে পথ তিনি বেছে নিয়েছিলেন বহুকাল পূর্বে, আজও তিনি যাত্রা করে' চলেছেন সেই পথেই; আর তাঁর শিষ্যদেরও তুলে নিয়েছেন সেই আলোর রথে,— জ্ঞানের মহিমায় মহিমান্বিত,— ভক্তিরসে আপ্লুত,— মহান্ কর্মে দীক্ষিত। কলাভবনে নিত্যনিয়ত চলছে শ্রীমূর্তির বন্দনা। হৃদয়ে উপলব্ধ সত্যের স্ফুরণ মূর্ত হয়ে উঠছে তুলির রেখার রঙে, অপূর্ব কুশলতায়, বিশাল সৌন্দর্যে। সেতারের বাঁধা তারের ভিতর থেকে যেমন করে সুর পায় ছাড়া, তেমনি করে' রেখার বন্ধনের মধ্যে দিয়ে প্রতিকৃতির প্রাণ পায় ছাড়া,— তারা যেন বলতে থাকে 'অসংখ্যবন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ'। কোণের প্রদীপ হাতে নিয়ে যে মানব চলেছিলেন দুর্গম পথ দিয়ে, তিনি দাঁড়িয়েছেন এসে জ্যোতির সমুদ্রে,— আলোছায়ার ফাঁকে ফাঁকে যেন রৌদ্রকিরণে ঝল্‌মল্ উন্মুক্ত প্রান্তর— তার দিকে চলেছে ভারতীয় তরুণ শিল্পীর দল বিস্মিত হয়ে, শ্রদ্ধায় আনত হয়ে। আজও তাঁর চলার আনন্দ ছল্‌ছল্ করে বয়ে চলেছে। দেহের ভারে তিনি নত হলেও অন্তর তাঁর ভরে উঠেছে মহান্ শক্তির অপরূপ খেলায়, তাই তিনি যেন অদ্ভুত আনন্দে মেতে উঠেছেন। দৈনন্দিন প্রয়োজনের বাইরে যাকে ফেলে দেওয়া হয় অপ্রয়োজনীয় বলে', একটি ছোট্ট কাঠের টুক্‌রো, একটি পাখীর পালক, একটি পশুর লোম,— এরাও তাঁর নিতান্ত প্রয়োজনের কোঠায় স্থান পেয়েছে। তিনি এদের

নিয়ে অভিনব বস্তুর রূপ দেন আর আনন্দে আত্মহারা হ'ন। তিনি বলেন— 'মায়ের কোলে ফিরে যাবার সময় হয়েছে তাই শিশুর মত খেলতে শিখছি'। পবিত্র তাঁর সাধনা, উদার তাঁর হৃদয়মাধুরী।

নন্দলাল যেদিন বললেন 'আমি তাঁরই সৃষ্টি' সেদিন যেন অবনীন্দ্রনাথের স্বরূপ আরও পরিষ্কারভাবে উদ্ঘাটিত হ'ল আমাদের চোখের সমুখে। শিশুর মত সহজ সরল আবরণের ভিতরে রয়েছে কী বিরাট্ সৃজনীশক্তি, কী উজ্জ্বল দীপ্তিকিরণ। সাধক নন্দলাল যে শক্তির আবাহনে উদ্ভূত, সে শক্তি নির্ধারণের মাপকাঠি আমাদের নেই, তাই তাঁর দিকে শুধু তাকিয়ে থাকি — যত দেখি তত মুগ্ধ হই আর বার বার বলি—

ওগো ঋষিবর, তোমায় প্রণাম করি।

পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কালিদাস বসু (১৮৮৮-১৯৩৩) ছিলেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের একজন কৃতী অধ্যাপক। উক্ত বিদ্যালয়ে তিনি প্রায় দশ বৎসর (১৯০৮-১৮) কাল গণিত ও বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন। শুধু যে সাহিত্যের অধ্যাপনায় তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন তা নয়, সাহিত্যরচনাতেও তাঁর যথেষ্ট পটুত্ব ছিল। তিনি প্রধানত কবিতা-রচনাই করতেন এবং কবিত্বখ্যাতির ফলে 'কবিরত্ন' উপাধিও পেয়েছিলেন। এককালে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা এবং সুপ্রভাত, পল্লীচিত্র প্রভৃতি অন্যান্য সাময়িক কাগজে তাঁর বহু কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। এই সাহিত্যপ্রিয়তার ফলেই তিনি কাব্য-রসিক অজিতচন্দ্র চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুতার অধিকারী হয়েছিলেন। তৎকালীন চিঠিপত্র থেকে জানা যায়, পিয়ার্সন এবং এণ্ডরুজ সাহেবের সঙ্গেও তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁর চরিত্রের সরলতা ও সাধুতা সকলকেই আকৃষ্ট করত। শুধু মানসিক ও চারিত্রিক সম্পদ্ নয়, তিনি অসাধারণ স্বাস্থ্যসম্পদেরও অধিকারী ছিলেন। ব্যায়ামচর্চা এবং ব্যায়াম-শিক্ষাদানের নৈপুণ্যের জন্যও তিনি অনেকের কাছে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

কালিদাস বসু সম্বন্ধে আরেকটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, তিনি ছিলেন খুলনা জিলার ফুলতলা দক্ষিণডিহি গ্রামের অধিবাসী। এই গ্রাম অধুনা রবীন্দ্রনাথের (তথা জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের) শ্বশুরকুলের বাসভূমি বলে খ্যাতি অর্জন করেছে।

এককালে রবীন্দ্রনাথ কালিদাস বসুকে অনেক পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কালিদাস বাবুর মৃত্যুর পর অধিকাংশ পত্রই অযত্নে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দৈবক্রমে দুখানি মূল্যবান্ পত্র বিনাশের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। কালিদাস বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র এবং আমার প্রাক্তন ছাত্র (দৌলতপুর কলেজে) শ্রীমান্ আনন্দমোহন বসু যথাস্থানে প্রকাশ করার জন্যে ওই দুখানি পত্র আমাকে দিয়েছেন। সে জন্যে তাঁকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি।

—প্রবোধচন্দ্র সেন]

শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালিদাস বসুকে লিখিত—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। মনে মনে একটু ঈর্ষ্যাও হচ্চে। তোমাদের শিউলি ফুলের গন্ধে আমোদিত আশ্রমটির নির্ম্মল আকাশ আমার মনে আস্‌চে। কিন্তু তাই বলে এখানকার পদ্মাতীরের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারবনা। এখানেও বেশ আছি। ছাতের উপর একটি নূতন খোলা ঘর হয়েছে— সেখান থেকে সম্মুখে নদী এবং চারিদিকে মাঠ দেখা যায়— নদী এখন জলে পূর্ণ, মাঠ এখন শস্যে সবুজ— চুপ করে চেয়ে বসে থাকি কোনো কাজ করতে ইচ্ছা হয় না। এখানে এসে আমার খুব উপকার হয়েছে— দীর্ঘকাল সম্পূর্ণ একলা বসে থাকবার অবকাশ পাই— একটা বইও খুলিনে— তাতে নিজের ভিতর থেকে অনেক কথা শোনবার সুযোগ পাওয়া যায়। নিজের সমস্ত ভাঙাচোরা মেরামত করে তোলবার এই একটি ভারি সুসময়। এই রকম নির্জ্জনতার মধ্যে আরো অনেক দীর্ঘকাল আমার থাকা আবশ্যক বলে মনে হচ্চে। অন্য সমস্ত খোরাক একেবারে বন্ধ হলে তখন আসল খোরাকটি খুঁজে বের করবার শক্তি ও পথ আপনি বেরিয়ে পড়ে।

সেই From the bottom up নামক বইটি পড়ে ফেলেছি। ভারি উপকার পেয়েছি। আমাদের যেখানে দৈন্য সেই জায়গাটা খুব স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে গেছে। সেইদিকে এবার আমাদের বিশেষ করে দৃষ্টিপাত করতে হবে। বিদ্যালয় খুল্‌লে এবার আমি আমাদের সেই শক্তির দিকটা গড়ে তোলবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হব। অনেক শৈথিল্য, অনেক দুর্ব্বলতা, অনেক অমনোযোগ, অনেক নির্লজ্জ ঔদাসীন্যের বিপুল বোঝা আমাদের মেরুদণ্ডকে একেবারে নত করে দিয়েছে— সে সমস্ত সবলে কাটিয়ে উঠে সমস্ত মহৎ প্রয়াসের কর্ম্মভূমির জন্যে আমাদের উৎসাহের সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে উঠ্‌তে হবে। ছোট বড় সকল কর্ম্মেই আমাদের নিরলস হয়ে হস্তক্ষেপ করতে হবে। চারিদিকের অপারিপাট্য এবং সকল কর্ম্মেরই অসম্পূর্ণতা আমাদের নিয়ত গঞ্জনা দিচ্চে কিন্তু সে আমরা গ্রহণ করচিনে— কেবল পলে পলে

তিলে তিলে জড়তা ও অকৃতার্থতার পঙ্ককুণ্ডের মধ্যে ডুবতে ডুবতে বিনাশের দিকেই তলিয়ে চলেছি। কিন্তু আর নয়, এখন থেকে কোমর বাঁধতে হবে। বিদ্যালয় খোলবার দিকে আমার মন আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করে আছে।— ছেলেদের আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ দিয়ো—তাদের জীবন উদ্যমে তেজে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক্। তাদের সকল চিন্তা সকল চেষ্টাই অদম্য বল লাভ করুক— তাদের সংকল্প দৃঢ় হোক্— তারা পৌরুষ লাভ করে নিজের দুর্দ্ধর্ষ জীবনকে প্রবলভাবে অপরাজিত বীর্য্যের দ্বারা সর্ব্বত্র প্রকাশ করুক ঈশ্বর তাদের সেই শক্তি দিন। ইতি ৫ই কার্ত্তিক, ১৩১৭।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

C/O Messrs Thomas Cook & Son
Ludgate Circus, London.
২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০

কল্যাণীয়েষু

ঘোরাঘুরি করতে হচ্চে। যতটা পারি নিজেকে মুক্ত রাখবার চেষ্টা করি কিন্তু লণ্ডন থেকে না সরে পড়তে পারলে এর থেকে নিষ্কৃতি দেখিনে। কখন সময় পাব তার স্থির নেই বলে এখনি তোমাদের চিঠি লিখ্‌তে বসলুম যদিও বিদেশী ডাকের দিন আজ নয়। সকালের দিকটায় ওরি মধ্যে একটু ফাঁকা পাওয়া যায় তাই আজ এই বাদলার সকালে মেঘের অন্ধকারে তোমাদের স্মরণ করতে বসলুম। এতদিনে তোমাদেরও মেঘবাদলের দিন কাছাকাছি হয়ে আস্‌চে— আষাঢ়ের প্রথম দিবস ত এল বলে। আমাদের সেই অবারিত আকাশের পূর্ব্ব দিক্‌তোরণদ্বারে রাজবন্দুন্নতিধ্বনি আষাঢ়ের রথযাত্রা দেখবার জন্যে আমার মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে কিন্তু কেবলি দেরি হয়ে যাচ্চে—ছুটি পাচ্চিনে।

। তোমাদের মধ্যে কারো মনে এ রকম ধারণা হয়েছে যে নিজের সম্বন্ধে, বিদ্যালয়ের প্রতি আমার আর্থিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, আমি অত্যুক্তি করতে বসেছি এবং যে সব সঙ্কল্প মনের মধ্যে রেখে দেওয়া উচিত আমি তাই অযথাপরিমাণে প্রকাশ করচি। এই ভর্ৎসনাবাক্য শুনে আমি চিন্তা করে দেখলুম এর মধ্যে সত্য আছে এবং তোমাদের মনে এ ধারণা হওয়া অন্যায় হয়নি। কিন্তু তবুও আমার নিজের দিকে যে একটা কথা বলবার আছে সেটা তোমাদের কাছে খোলসা করে বলা উচিত। বরাবর আমি দেখে আসছি আমি কেবল কথা কয়ে কয়ে নিজেকে শিক্ষা দিয়েছি। নিজের ভিতরে কোনো ভাল জিনিষ ভাব আকারে বা সঙ্কল্প আকারে দেখা দেবামাত্র সেটাকে প্রকাশ করার দ্বারাই আমি নিজের কাছে সেটাকে পরিস্ফুট করে তুল্‌তে পারি— সেটা আমার ভাষায় ব্যক্ত হতে হতেই উত্তরোত্তর আমার জীবনের সামগ্রী হয়ে উঠ্‌তে থাকে। এটা বিশেষভাবে আমার স্বভাব। এই জন্যেই বস্তুত অধিকাংশ স্থলে নিজের সাধনা সম্বন্ধে আমার অত্যুক্তি ঘট্‌তে বাধ্য। কারণ বর্ত্তমানে আমার শক্তির সীমা যেখানে আমার আকাঙ্ক্ষার সীমা সেখানে নয়। আমার লক্ষ্য যেখানে আমার অবস্থিতি সেখানে হতেই পারে না। সেইজন্যে আমার মধ্যে যে মানুষটি সাধক সে আমার সংসারী মানুষের ভাষা অতিক্রম করে কথা কয়— কিন্তু তার কথা যদি আমি চাপা দিয়ে ফেলি তাহলে আমার এই সংসারী মানুষের আর পরিত্রাণ নেই। তার উচ্চারিত বাণী ক্রমশ আমার উপর জয়লাভ করতে থাকে। এমন অবস্থায় তোমরা যদি আমাকে বল যে যখন পারবে তখন কথা কোয়ো আগে থাকতে এ সব আলোচনা অসঙ্গত তাহলে সেটা আমার পক্ষে কল্যাণকর নয়— কেননা আমার স্বভাব-বশতঃ কথাকওয়াই আমার সকলের চেয়ে প্রশস্ত পথ। কোনো পথিককে যদিবা বলা যায় লক্ষ্যে যখন পৌঁছবে তখনি পথে পা বাড়াবার সময় হবে তাহলে সে যেমন তাকে বাধা দেওয়া তেমনি আমার অন্তরতর যে প্রকৃতি আমার চেয়ে এগিয়ে গিয়েছে তার বাক্‌রোধ করলে সেটা আমার পক্ষে ব্যাঘাতস্বরূপ হয়। তাকে কথা বল্‌তে দিয়ে দিয়েই আমি শিখতে থাকি— একবার শুনেই ত শিক্ষা সমাধা হয় না— বারবার মাষ্টার মশায়ের মুখ থেকে পাঠ নিতে নিতে তবেই বিষয়টা সহজ ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমার

অতীত জীবনে এই পন্থার উপযোগিতা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছি। বারবার দেখেছি, জীবনের ক্ষেত্রে কোনো জিনিষের প্রকাশের বহু পূর্ব্বে বাণীর ক্ষেত্রে তার অভ্যুদয় হয়েছে— তার কারণ ঠিক অহঙ্কার নয়— তার কারণ আমার বাক্যের প্রকাশ আমার জীবনের প্রকাশের অঙ্গ। আমার এই জীবনের প্রক্রিয়া এমনি নিগূঢ় যে অনেক সময়ে এ আমার অগোচরে হয়ে থাকে। এজন্যে তোমরা আমাকে ক্ষমা কোরো— আমার কথা কওয়াটাকে আমার একটা অপরাধ বলে গণ্য কোরো না— কেননা ওটা আমার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ফুল নিঃশব্দে ফোটে কিন্তু নদী নিঃশব্দে চলে না কেননা তার চলা এবং বলা একসঙ্গেই ঘট্‌তে থাকে— এ স্থলে নদীকে ফুলের দৃষ্টান্ত দিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া নদীকে ব্যর্থ হতে দেওয়া। পদধ্বনি দূরের থেকে শোনা যায়, বলা জিনিষটা চলার চেয়ে এগিয়ে যায় কিন্তু সেটুকু সহ্য করতেই হবে— যার যা ধর্ম্ম তাকে সেই পথ দিয়েই সার্থকতা লাভ করতে হবে। আমি যে পথ-চল্‌তি মানুষ— যখন হঠাৎ বাঁক ফিরি তখন নতুন দিগন্তে নতুন দৃশ্য হঠাৎ চোখে পড়ে তখন সেটা আমার সঙ্গে সমস্ত চিত্তকে উদ্‌বোধিত করে তোলে— তখন আমি সেই দৃশ্যে পৌঁছবার পূর্ব্বেই আনন্দগান জুড়ে দিই। কেননা এই গানে পথ চলবার বল দেয় ক্লান্তি দূর করে। বৈষয়িক মানুষরা তাদের বৈষয়িক সংকল্প নিয়ে আলোচনা করে, সেই আলোচনা দ্বারা তাদের সংকল্প সুস্পষ্ট হতে থাকে এবং শক্তি লাভ করে— সে সংকল্প পরে ব্যর্থ হতেও পারে কিন্তু তার প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যাই হোক্‌ যানবাহনের প্রণালী নানারকমের— কোনো জাহাজ পালে চলে, কোনো জাহাজ ষ্টীমে চলে— কেউ বা দাঁড় লাগায়, কেউ বা গুণ টানে— চলবার ঠিক পথটা কি সে উপদেশ বাইরে থেকে দেওয়া বড় শক্ত— এই জন্যেই গুরুগিরিকে আমি সব চেয়ে ভয় করি। তোমাদের কাছে আমি অনেক সময়েই অনেক বড় কথা হয় ত অনেক বাহুল্যসহকারে বলে থাকি কিন্তু নিশ্চয় জেনো তার মধ্যে যদি উপদেশের অংশ কিছু থাকে তবে তার প্রধান শ্রোতা আমি। আমি নিজে যদি সেটা সম্পূর্ণ পরিমাণে পেতুম তাহলে হয় ত কথা বলতুমই না— পাইনে বলেই শব্দ করি—বস্তুত এ একরকম প্রার্থনা— নিজের বাক্যের দ্বারা নিজেকে জাগিয়ে রাখা। কেবল ব্যক্তিগত মানুষ কেন বিশ্বমানুষের,

ইতিহাসে এটা আমরা প্রতিদিন দেখতে পাচ্চি— মানুষের কথা যেখানে পৌঁছচ্চে মানুষ সেখানে এখনো পৌঁছয় নি কিন্তু কথাকে মানুষ যদি এগতে না দিত তাহলে তাকে পথ দেখাবার কোনো লোক থাক্‌ত না। মানুষের বাতি মানুষের চেয়ে এগিয়ে থাকে বলেই তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারে— যদি সেটা পিছিয়ে থাকে তাহলে সেটা সামনের দিকে ছায়া ফেলে। আমাদের প্রকৃতির যেটা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সেটা আমাদের চেয়ে এগিয়ে এগিয়েই চলে। কিন্তু এ নিয়ে বেশি তর্ক করা কিছু নয়। আসল কথা আমাকে এ কথা বারবারই বল্‌তে হবে যে ঈশ্বরের কাছে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করব— যদিও কাজের ক্ষেত্রে সেই আত্মসমর্পণ যথেষ্ট বাধা পাচ্চে—আমাকে বারবার বল্‌তে হবে যে টাকার থলির উপর ভরসা না রেখে আধ্যাত্মিক মঙ্গলশক্তির উপর আস্থা রাখ্‌তে হবে যদিও টাকার থলি মনের ঘাড়ের উপর চেপে বসে আছে তাকে সহজে নামানো যাচ্চে না। কিন্তু একথা যে জীবনের গভীর মর্ম্মস্থান থেকে উঠ্‌তে চাচ্চে— বাইরের বাধাকেই সত্য বলব আর সেই বেদনাকে সেই প্রেরণাকে কি অবিশ্বাস করতে হবে? অন্তর্যামী যেদিক থেকে আমাদের সত্যকে দেখেন সেইদিক থেকেই কি সত্যকে আমল দিতে হবে না? প্রকাশের চেষ্টার মধ্যে যে বেগ আছে সেই বেগের দ্বারা যে আমাদের অনেক বাধা ক্ষয় হতে থাকে— আমাদের অন্তরতম জীবনের বাণীকে ব্যক্ত করার দ্বারা আমাদের বাইরের দিকের আবরণকে আমরা ক্রমে ক্রমে কাটিয়ে উঠ্‌তে থাকি। অবশ্য অন্তরের মধ্যে যদি মিথ্যা থাকে তাহলেই কথা কেবল কথামাত্র হয়— সে কথা বাধা কাটায় না, বাধা সৃষ্টি করে— আমাদের কথা যদি অহঙ্কারের প্রকাশ হয় আত্মার প্রকাশ না হয় তাহলে তার চেয়ে দুর্গতি আর কিছু নেই। আমার মধ্যে সে অহঙ্কার হয় ত আছে কিন্তু অহঙ্কারকে সম্পূর্ণ ছিন্ন করে আমার সত্যকে বাধামুক্ত করবার জন্যে আমার জীবনের একান্ত উৎকণ্ঠা সত্য কি না সে সম্বন্ধে আমার অন্তর্যামীর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে— তিনিই জানেন যাঁকে আমি ডাক্‌চি— সে ডাক তাঁর কাছেই পৌঁছচ্চে— এবং তোমাদের কাছে যাকিছু বলে ফেলচি সেও বস্তুত তাঁরই কাছে আমার নিবেদন— আবিরাবীর্ম্মএধি।

পূর্ব্বেই তোমাদের লিখেছি আমার কবিতা ও বক্তৃতা ছাপাবার ব্যবস্থা

হচ্চে। এর থেকে বিদ্যালয়ের আর্থিক সুযোগ যদি ঘটে তবে সেটাকে ঈশ্বরের প্রসাদ বলে গ্রহণ করতে পারব। এতদিন পরে গীতাঞ্জলি বিক্রির লাভ পাবার সময় হয়ে আসচে। এক কিস্তি টাকা পেয়েছি— আর একটু সংগ্রহ হলেই আর দিন পনেরো কুড়ি পরে তোমাদের একশো পাউণ্ড পাঠাতে পারব— তার দ্বারা তোমরা সর্ব্বাগ্রে নিত্যগোপালবাবুর দেনা শোধ কোরো। এমনি করে কিছু কিছু যেমন জম্‌বে তোমাদের পাঠিয়ে দেব। বক্তৃতার বইটা বের হলে বোধ করি বিদ্যালয়ের অভাব মোচনের আর একটু সুবিধা হবে।

Mrs. Moody আর ৫।৬ দিনের মধ্যে এখানে এসে পৌঁছবেন। দেবলকে আমি তাঁর হাতে সমর্পণ করে দেব। দেবলের হাতের কাজে যে রকম দক্ষতা আছে তাতে আমেরিকায় গিয়ে ও অনেক শেখবার বিষয় পাবে। মাটির ছাঁচের কাজে ওর দ্রুত উন্নতি হচ্চে। ক্ষিতিমোহন বাবুর সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে এইবার পাকাপাকি সমস্ত ঠিক করে ফেলব। পূজার ছুটির সময়ে তিনি যদি আসেন তাহলে বিদ্যালয়ের কোনো ক্ষতি হবেনা— যদি তার পূর্ব্বেই আসতে প্রস্তুত হন তাহলে বোধহয় তার ব্যবস্থাও করতে পারব। এণ্ড্রুজ এবং পিয়ার্সন বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিতে সম্মত হয়েছেন এমন অবস্থায় ক্ষিতিমোহনবাবুর স্থানে অন্য কোনো লোক নিযুক্ত করার কি প্রয়োজন হবে?

অপূর্ব্ব লণ্ডনে এসে পৌঁচেছে। তার সঙ্গে আজকালের মধ্যেই আমার দেখা হবে।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থসংখ্যা কত?

শ্রীসরোজকুমার বসু

১

রবীন্দ্রনাথ ঠিক কতগুলি গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন, তা জানবার আগ্রহ অনেকেরই আছে। তাছাড়া রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা করতে গেলে তার বনিয়াদ হিসাবেও তাঁর রচিত গ্রন্থসংখ্যা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

এ পর্যন্ত বিশেষভাবে এ বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী' (পৌষ ১৩৩৮) এবং ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রগ্রন্থপরিচয়' (পৌষ ১৩৪৯) নামক যে-দুটি গ্রন্থতালিকা আমরা পুস্তকাকারে পেয়েছি, তাতে গ্রন্থগুলির ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে বটে। কিন্তু নানাকারণে এর সাহায্যে গ্রন্থগুলির মোট সংখ্যা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়।

প্রভাতবাবু তাঁর 'গ্রন্থপঞ্জী'তে ইং ১৯৩১ সালের শেষ পর্যন্ত যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন তাতে গ্রন্থসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪৮। এর মধ্যে পাঠ্যপুস্তক, স্বরলিপি এবং সম্পাদিত গ্রন্থও স্থান পেয়েছে। ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁর 'গ্রন্থপরিচয়ে' ইং ১৯৪২ সাল (কার্তিক ১৩৪৯) পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থগুলির যে তালিকা দিয়েছেন তাতে রবীন্দ্রপ্রণীত মুখ্য বাংলা গ্রন্থের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩৭। তাছাড়া পাঠ্যপুস্তক ১২, সম্পাদিত গ্রন্থ ৬, এবং স্বরলিপি ২২। আমরা এই প্রথমোক্ত সংখ্যাটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

২

এই তালিকাভুক্ত কতকগুলি গ্রন্থকে উক্ত সংখ্যা থেকে বাদ দেওয়া প্রয়োজন। যেমন—

(ক) সংগ্রহগ্রন্থগুলি (Collected Works)। ১৩০৩ সাল থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কাল পর্যন্ত নানা সময়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী একত্র সংগৃহীত হয়ে নানা আকারে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এগুলিকে গণনা

করলে রচনাসংখ্যা অযথা বেড়ে যায়। সংখ্যাগণনায় এই সমস্ত সংগ্রহ-গ্রন্থগুলিকে বাদ দিতে হয়। সুতরাং বাদ যাবে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলী (৪১[১]), মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ (৫৭), হিতবাদী-প্রকাশিত রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী (৫৯), প্রহসন (৭৬), ইণ্ডিয়ান পাবলিসিং হাউস-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ (১১৭), ঋতু-উৎসব (১৪৬), যাত্রী (১৫১), বনবাণী (১৬০), জাপানে-পারস্যে (১৮৮), পাশ্চাত্যভ্রমণ (১৯১), পত্রধারা (২০২), রবীন্দ্ররচনাবলী ১৫ খণ্ড (২০৮, ২১০ ইত্যাদি), এই ছাব্বিশখানি।

(খ) দ্বিতীয়ত সঞ্চয়নগ্রন্থগুলি (Selections)। সুস্পষ্ট কারণ-বশত এদেরও স্বতন্ত্র গণনার কোনো সার্থকতা নেই। কাজেই স্বদেশ (৬২), কথা ও কাহিনী (৮১), চয়নিকা (৯০), আটটি গল্প (৯৯), সংকলন (১৪০), গীতিচর্চা (১৪২), সঞ্চয়িতা (১৬২), এই সাতখানিও বর্জনীয়।

(গ) রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গ্রন্থ পরবর্তী কালে আপনার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে অন্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে এদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। 'আত্মশক্তি' ও 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থ-দুখানির অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি প্রধানত 'সমূহ' ও 'স্বদেশ'-এর মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। 'নদী' কাব্যখানি পরে 'শিশু'র অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। এই জাতীয় রচনাগুলিকে বাদ দেওয়া দরকার। অতএব রামমোহন রায় (১৭), নদী (৩৯), ব্রহ্মোপনিষদ (৪৬), বাঙলা ক্রিয়াপদের তালিকা[২] (৫৫), আত্মশক্তি (৬০), ভারতবর্ষ (৬৩), সভাপতির অভিভাষণ—পাবনা সম্মিলনী (৭৫), বিদ্যাসাগরচরিত (৯২), ধর্মের অধিকার (১০৮), কর্তার ইচ্ছায় কর্ম (১২৬), শিক্ষার মিলন (১৩২), ঋতুরঙ্গ (১৪৯), বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ (১৬৮), শিক্ষার বিকীরণ (১৭০), এই চোদ্দখানি গ্রন্থ গণনায় বাদ যাবে।

(ঘ) রবীন্দ্রনাথের গল্পগ্রন্থসমূহ নানা সময়ে নানা আকারে প্রকাশিত

১ ব্রজেন্দ্রবাবুর গ্রন্থপরিচয়ে ধৃত ক্রমিক সংখ্যা। হিসাবের সুবিধার জন্য উক্ত গ্রন্থকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন করা গেল।

২ এখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদা পাবার যোগ্য নয়। রচনাবলীতে এটি 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে।

হয়েছে। পরবর্তী কালে এগুলি সমস্তই আপন স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে গল্পগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। সংখ্যানির্ধারণে এগুলিকে বাদ দিয়ে সমগ্রভাবে গল্পগুচ্ছকে একসংখ্যক ধরাই বাঞ্ছনীয়। এই কারণে ছোটগল্প (৩৫), বিচিত্র গল্প (৩৬), কথাচতুষ্টয় (৩৭), গল্পদশক (৩৮), গল্পচারিটি (১০২), গল্পসপ্তক (১২৫), পয়লা নম্বর (১৩০), এই সাতখানি বাদ যাবে। পরবর্তী কালে প্রকাশিত লিপিকা, সে, তিনসঙ্গী ও গল্পসল্প স্বতন্ত্রভাবে গণনীয়।

গীতবিতান সম্বন্ধেও এই কথা। নানা সময়ে প্রকাশিত গানের বইগুলি একত্র সংগৃহীত হয়েই গীতবিতানের সৃষ্টি হয়েছে। গণনায় শুধু গীতবিতানকেই ধরা হবে। সুতরাং বাদ যাবে রবিচ্ছায়া (১৯), গানের বহি ও বাল্মীকিপ্রতিভা (৩২), বাউল (৬১), গান (৮২), গান (৯১), গান (১১২), ধর্মসংগীত (১১৫), প্রবাহিণী (১৪১), এই আটখানি।

এখানে আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন। গল্পগুচ্ছ ও গীতবিতান এই দুখানি গ্রন্থই খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এই খণ্ডগুলিকে বিভিন্নভাবে হিসাব না করে সমগ্রভাবে একসংখ্যক বলে গণনা করাই সমীচীন। অতএব গল্প (৫২), গীতবিতান (১৬৪), এই দুইখানিও গণনীয় নয়।

'শান্তিনিকেতন'-নামক ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত রচনা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। 'শান্তিনিকেতন' প্রথমত সতেরো খণ্ডে প্রকাশিত হয়ে আধুনিক কালে নূতন রূপে দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ব্রজেনবাবু তাঁর তালিকায় এই গ্রন্থখানিকে বাৎসরিক প্রকাশ হিসাবে ছয়ভাগে তালিকাভুক্ত করেছেন। আমরা একে সমগ্রভাবে এক-সংখ্যক হিসাবেই গণনা করব। সুতরাং ৮৮, ৯৪, ৯৮, ১১৬, ১১৮ এই পাঁচটি সংখ্যা বাদ দিয়ে শুধু ১৮০ নম্বরটিকে স্বীকার করলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

কিন্তু 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' দুই খণ্ডকে স্বতন্ত্রভাবে গণনা করা হয়েছে। কেননা, এদুটি একই নামে প্রকাশিত হলেও এর প্রত্যেক খণ্ডেরই স্বতন্ত্র গ্রন্থমর্যাদা আছে।

৩

বিশেষ বিশেষ কারণে তালিকাভুক্ত কতকগুলি গ্রন্থকে যেমন বাদ দেওয়া প্রয়োজন, তেমনি তালিকায় স্থান পায়নি এমন কতকগুলি রচনাকে স্বতন্ত্র গ্রন্থহিসাবে স্বীকার করাও আবশ্যক।

(ক) রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গ্রন্থকে আংশিকভাবে সংগ্রহগ্রন্থ বা গুচ্ছগ্রন্থ বলে বর্ণনা করা যায়। এদের অন্তর্গত বিভিন্ন অংশকে আলাদা করে গণনা করা দরকার। যেমন 'জাপানে-পারস্যে'-র অন্তর্গত 'জাপানযাত্রী' অংশটুকু পূর্বে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল এবং স্বতন্ত্র গণ্যও হয়েছে, কিন্তু 'পারস্যভ্রমণ' অংশটুকু নূতন। এক্ষেত্রে 'জাপানে-পারস্যে' গুচ্ছগ্রন্থ বলে গণনায় বাদ পড়লেও এর অন্তর্গত এই নূতন অংশটিকে স্বতন্ত্র গণনা করা প্রয়োজন। এইরূপ 'বনবাণী'র অন্তর্গত 'বনবাণী', 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা', 'বর্ষামঙ্গল' এবং 'ঋতুউৎসবে'র[১] অন্তর্গত 'শেষবর্ষণ' স্বতন্ত্রভাবে গণনীয়। 'যাত্রী'র অন্তর্গত 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' এবং 'জাভাযাত্রীর পত্র'ও স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলে স্বীকার্য।

'ব্যঙ্গকৌতুক' গ্রন্থখানি একহিসাবে দুখানি গ্রন্থের সমবায়। এর অন্তর্গত নাট্যাংশটুকু ও প্রবন্ধাংশটুকু স্বতন্ত্রভাবে গণ্য হবার যোগ্য। রবীন্দ্র-রচনাবলীতেও ব্যঙ্গকৌতুক দুই অংশে বিভক্ত হয়ে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'গল্পসল্প'কেও গদ্যে পদ্যে দুইখণ্ডের সমষ্টি বলে গণ্য করা সমীচীন।

'কাহিনী'র অন্তর্গত 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' একখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ নাটক। রচনাভঙ্গি এবং বিষয়বস্তু উভয়ে দিক্ দিয়েই কাহিনীর অন্যান্য অংশের সঙ্গে এর যথেষ্ট প্রভেদ আছে। সুতরাং একে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলে গণনা করাই সঙ্গত।

সুতরাং বনবাণী, নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা, বর্ষামঙ্গল, শেষবর্ষণ, পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি, জাভাযাত্রীর পত্র, ব্যঙ্গকৌতুক, গল্পসল্প, লক্ষ্মীর পরীক্ষা এবং পারস্যভ্রমণ, এই দশখানি গ্রন্থ উপলক্ষে তালিকাসংখ্যায় দশ যোগ করতে হবে।

(খ) গ্রন্থমর্যাদা পাবার যোগ্য কোনো কোনো রচনা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পরে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি বা কোনো সংগ্রহগ্রন্থেরও অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সংখ্যাগণনায় এদের বাদ দেওয়া চলে না।

১ এর অন্তর্গত অন্যতম গ্রন্থ 'সুন্দর' আসলে কতকগুলি গানের সংগ্রহমাত্র। পরে এই গানগুলি গীতবিতানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং সুন্দরকে গণনা করা হয়নি।

এই শ্রেণীতে পড়ে 'করুণা' (১২৮৪-৮৫ সালের ভারতীতে প্রকাশিত অসম্পূর্ণ উপন্যাস) এবং 'মুক্তির উপায়' (১৩৪৫ সালের অলকায় প্রকাশিত নাটক)।

সম্প্রতি প্রকাশিত 'আত্মপরিচয়' ও 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থ দুখানিকেও আমরা গণনা করব। সুতরাং তালিকাসংখ্যায় আরও চার যোগ করতে হবে।

৪

কতকগুলি গ্রন্থের সংখ্যাগণনা নিয়ে বিতর্ক হবার সম্ভাবনা। একহিসাবে এগুলিকে বাদ দেওয়া চলে, অন্য হিসাবে এদের গণনা করতে হয়। ঐইরূপ সংশয়স্থলে আমরা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি পুস্তকের গুরুত্ব বিচার করে সংখ্যা নির্ণয় করব।

(ক) প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের একশ্রেণীর কতকগুলি নাটক আছে যেগুলি প্রকৃতপক্ষে পূর্বপ্রকাশিত কোনো না কোনো নাটকের সামান্য পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত আকার মাত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই রূপান্তর সাধিত হয়েছে অভিনয়ের সৌকর্যসাধনের জন্য। যেমন— 'মায়ার খেলা' 'নলিনী'র সংশোধিত রূপ, এবং 'গুরু' 'অচলায়তনে'র অভিনয়যোগ্য সংস্করণ-মাত্র ; তেমনি রাজা = অরূপরতন, গোড়ায়গলদ = শেষরক্ষা, প্রায়শ্চিত্ত = পরিত্রাণ, শারদোৎসব = ঋণশোধ। এগুলি আসলে পূর্বপ্রকাশিত নাটকগুলিরই প্রতিরূপমাত্র। তাই এগুলির মৌলিক রচনার স্বাতন্ত্র্য নেই। সুতরাং গ্রন্থসংখ্যা নির্ধারণ করবার সময় এগুলিকে বাদ দেওয়া চলে। কিন্তু এই গ্রন্থগুলি দুইরূপেই সাহিত্যজগতে পরিচিত এবং রচনাবলীতেও এই নাটকগুলির উভয়রূপই স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। এই হিসাবে এগুলিকে গণনায় আনতে হয়।

কিন্তু 'তপতী' 'রাজা ও রানী'র রূপান্তর হলেও তার মধ্যে যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। সুতরাং এটিকে সর্বথাই স্বতন্ত্রভাবে গণনা করা সঙ্গত।

যে-সকল ক্ষেত্রে এই মিল কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ কথাবস্তুতেই

সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ যেখানে ভিতরকার কাহিনী এক হলেও বাইরের রূপ সম্পূর্ণভাবেই স্বতন্ত্র ও মৌলিক, সে ক্ষেত্রে উভয় রূপকেই স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে হয়। যেমন, 'রাজর্ষি' উপন্যাস অবলম্বনে রচিত 'বিসর্জন' নাটক এবং 'বৌঠাকুরানীর হাট' অবলম্বনে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক। এক্ষেত্রে পরিবর্তন সামান্য ও বহিরঙ্গগতমাত্র নয়, এখানে দুটিই মৌলিক রচনার সম্মান পাবার উপযুক্ত।

(খ) নষ্টনীড়, মুকুট, কর্মফল ও কালমৃগয়া— এই চারখানি গ্রন্থ নিয়েও বিচারবিভ্রাট হতে পারে। প্রথমোক্ত উপন্যাস দুখানি স্বতন্ত্রগ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। 'নষ্টনীড়' হিতবাদী-সংস্করণ রবীন্দ্রগ্রন্থাবলীতে স্বতন্ত্র উপন্যাসের মর্যাদা পেয়েছে। বর্তমানে এটি গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত হয়ে গিয়েছে; এর আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। 'মুকুট' বর্তমানে 'ছুটির পড়া'তে স্থান পেয়েছে; ভবিষ্যতে এটিরও গল্পগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবার সম্ভাব্যতা আছে। 'কর্মফল' গল্পটি পূর্বে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও পরে স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে গল্পগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যটি পরবর্তী কালে প্রায় সমগ্রভাবেই 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অন্তর্গত হয়ে গিয়েছে। এর অধিকাংশ গানই সামান্য পরিবর্তিত হয়ে বা অবিকলভাবেই 'বাল্মীকিপ্রতিভা'তে স্থান পেয়েছে।

আমরা এই চারটি গ্রন্থের কোনোটিরই স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করব না। কিন্তু নষ্টনীড় ও মুকুট তালিকাভুক্ত না থাকায়, মূল সংখ্যা থেকে বাদ যাবে দুই—কালমৃগয়া (৮) ও কর্মফল (৫৮)।

(গ) কতকগুলি রচনা পরবর্তী সময়ে অন্য গ্রন্থের মধ্যে ঢুকে গেলেও এদের একটা বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য আছে। যেমন 'চিঠিপত্র' (প্রবন্ধ— ২২) বইখানি পরে 'সমাজ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, কিন্তু স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসাবে এর একটা মর্যাদা আছে। 'রচনাবলী'তেও 'চিঠিপত্র' পৃথক্‌ভাবেই মুদ্রিত হয়েছে। 'পঞ্চভূত' (৪৩) গ্রন্থখানিও এক সময়ে 'বিচিত্রপ্রবন্ধে'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু পরে আবার স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' (৩) গীতিনাট্যটি বর্তমানে স্বতন্ত্রাকারে পাওয়া যায় না, এখন এটিকে গীতিসংগ্রহের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই তিনটি পুস্তককে গণনা থেকে বাদ দেবার কোনো কারণ নেই।

(ঘ) 'সভ্যতার সংকট' (২২৪) এবং 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' (২২৬)

নামক গদ্যরচনা-দুটি যদিও স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত হয়েছে, তবুও স্বতন্ত্র গ্রন্থের সম্মান পাবার যোগ্যতা এদের আছে কিনা সন্দেহ , বস্তুত ভবিষ্যতে এদের অন্য গ্রন্থভুক্ত হয়ে যাবার সম্ভাব্যতা যথেষ্টই আছে। সুতরাং আমরা এ-দুটিকে গণনা থেকে বাদ দেব ।

'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' (১৮৪) গ্রন্থপরিচয়ে স্থান পেয়েছে। কিন্তু আসলে এটি Education Naturalised-নামক বুলেটিন বা প্রচারপুস্তিকার অন্তর্গত একটি প্রবন্ধমাত্র (বুলেটিনটিতে অন্য লেখকের রচনাও স্থান পেয়েছে)। অধিকন্তু এ প্রবন্ধটি ভবিষ্যতে 'শিক্ষা'র অন্তর্ভুক্ত হবে বলে আশা করা যায়। সুতরাং সংখ্যাগণনায় এটিকেও গ্রহণ করা চলে না।

(ঙ) ভারতপথিক রামমোহন রায় (১৭৬), সুর ও সঙ্গতি (১৮২), প্রাক্তনী (১৯২), প্রসাদ (২০৯), চিত্রলিপি (২১৬), চিঠিপত্র (পত্রসংগ্রহ—২৩৪) এবং দেবনাগরী হরফে মুদ্রিত গীতাঞ্জলি (১১৪), এই সাতখানি গ্রন্থকে গণনায় স্থান দেওয়া যায় কিনা সন্দেহ। 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' বিভিন্ন সময়ে রচিত ও পঠিত কতকগুলি প্রবন্ধের সংগ্রহমাত্র ; এতে ইংরেজি রচনাও আছে। তাছাড়া এটিতে যে-দুটি নূতন রচনা স্থান পেয়েছে, সে-দুটি পরে 'চারিত্রপূজা'র অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। 'প্রসাদ' গ্রন্থখানি ঐ নামের কোনো ছাত্রের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধের সমষ্টিমাত্র। 'প্রাক্তনী' প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সভায় বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর সংগ্রহ, শান্তিনিকেতন-আশ্রমিকসংঘকর্তৃক প্রকাশিত। 'সুর ও সঙ্গতি' ধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত সংগীত-সম্বন্ধীয় পত্রালাপসংগ্রহ। এতে ধূর্জটিপ্রসাদের পত্রও স্থান পেয়েছে। 'চিত্রলিপি' অঙ্কিত চিত্র ও সেগুলির পরিচয়সূচক কবিতাসংগ্রহমাত্র। 'চিঠিপত্র' (বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত) ব্যক্তিগত পত্রসংগ্রহ। 'ছিন্নপত্র', 'পথে ও পথের প্রান্তে' প্রভৃতির মতো এগুলিকে সাহিত্যিক মর্যাদা দেওয়া চলে কিনা সন্দেহ। কবিচিত্তের নিগূঢ় ভাবধারা ও তাঁর জীবনচরিতের সঙ্গে পরিচিত হবার যথেষ্ট উপাদান এতে আছে বটে, কিন্তু সাহিত্যের মাপকাঠি নিয়ে বিচার করলে এর মূল্য খুব বেশি দাঁড়াবে না।

১১৪নং গ্রন্থখানিতে ইংরেজি গীতাঞ্জলির অন্তর্গত কবিতাগুলিকে

দেবনাগরী হরফে মুদ্রিত করা হয়েছে। মূল বাংলা গীতাঞ্জলির সঙ্গে এই দ্বিতীয় গীতাঞ্জলির কোনো সম্বন্ধ নেই এবং এর কোনো স্বাতন্ত্র্যও নেই।

এই সাতখানি গ্রন্থকে আমরা 'বিবিধশ্রেণী'ভুক্ত বলে বর্ণনা করতে পারি। সাহিত্যগ্রন্থের গণনায় এদের স্থান না দিলে লেখকের প্রতি অবিচার হবে না।

৫

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের রচিত মুখ্য বাংলা গ্রন্থের সংখ্যা যথোচিতভাবে নির্ধারণ করা সহজ নয়। এই ব্যাপারে আমাদের কতকগুলি সর্ত মেনে নিতে হয়। তার ফলে রচনার সংখ্যাও বাড়ে কমে। একহিসাবে কতকগুলি রচনাকে গণনা করতে হয়, তাতে সংখ্যা বেড়ে যায়; অন্য হিসাবে সেগুলিকে বাদ দিতে হয়, ফলে সংখ্যা কমে যায়। অবশ্য কতকগুলি রচনাকে বাদ দিতেই হয় এবং কতকগুলিকে যোগ করতেই হয়। এইভাবে যোগবিয়োগ করবার পর যে সংখ্যাটি দাঁড়ায় তাকেও আবার কতকগুলি সর্তসাপেক্ষভাবেই স্বীকার করতে হয়।

আমাদের বিচারে ব্রজেন্দ্রবাবুর গ্রন্থতালিকায় ধৃত ২৩৭ সংখ্যাটি থেকে ৮১ বিয়োগ এবং ১৪ যোগ করতে হবে। ফলে এই সংখ্যাটি দাঁড়াবে ১৭০।

সুতরাং আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি পাঠ্যপুস্তক বাদে রবীন্দ্রনাথ ১৭০ খানি মুখ্য বাংলা গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন।

৬

রবীন্দ্ররচিত গ্রন্থগুলির মোট সংখ্যা জানার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনেই আরও একটি কৌতূহল দেখা দেয়। সেটি হচ্ছে এই। সমস্ত গ্রন্থের মোট সংখ্যা যদি হয় ১৭০, তবে তার মধ্যে কোন্ শ্রেণীর রচনা কখানি, অর্থাৎ কাব্যই বা কখানি, নাটকই বা কখানি, উপন্যাসই বা কখানি ইত্যাদি।

আমরা এই কৌতূহল নিবৃত্ত করবার উদ্দেশ্যে নীচে রচনাগুলির একটা

শ্রেণীগত হিসাবও দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনমতো কিছু কিছু মন্তব্যও দেওয়া গেল।

১। কাব্য—	৫৩	গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, খাপছাড়া, ছড়া প্রভৃতিও এর অন্তর্গত; গল্পসল্পের কাব্যাংশটুকুও গণ্য হয়েছে।
২। গান—	১	গীতবিতান দুই খণ্ড। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি কাব্য বলেই গণ্য হয়েছে।
৩। নাটক :		
নাট্যকাব্য[১] —	৩	বিদায়-অভিশাপ,[২] মালিনী, কাহিনী।
কাব্যনাট্য[৩] —	৫	রুদ্রচণ্ড, প্রকৃতির প্রতিশোধ, রাজা ও রানী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা।
গীতিনাট্য—	২	বাল্মীকিপ্রতিভা, মায়ার খেলা।
নৃত্যনাট্য —	৪	শাপমোচন, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা।
বিবিধ[৪] —	৪	নবীন, নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা, বর্ষামঙ্গল, শ্রাবণগাথা।
গদ্য নাটক—	২৫	চারটি রূপান্তরিত : গুরু, পরিত্রাণ, অরূপরতন, ঋণশোধ; গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত 'মুক্তির উপায়' গণিত হয়েছে।
প্রহসন (গদ্য)—	৬	একটি রূপান্তরিত : শেষরক্ষা।
প্রহসন (পদ্য)	১	লক্ষ্মীর পরীক্ষা।
	৫০	
৪। উপন্যাস—	১৪	অসম্পূর্ণ ও গ্রন্থকারে অপ্রকাশিত 'করুণা'ও গণিত হয়েছে।
৫। গল্প—	৫	গল্পগুচ্ছ তিনখণ্ড, লিপিকা, সে, তিনসঙ্গী গল্পসল্প (গল্পাংশ)।
৬। প্রবন্ধ—	৪৭	জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, পারস্যভ্রমণ প্রভৃতিও এর অন্তর্গত।
	১৭০	

১ নাট্যাকারে রচিত হলেও এগুলি মূলত কাব্য। এগুলি ছন্দোবদ্ধ পদ্যে রচিত. সে পদ্যও আবার সমিল।

২ রচনার প্রকৃতি ও আয়তনের বিচারে এটি কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য। এক সময়ে এটি 'চিত্রাঙ্গদা'র সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। বর্তমানে স্বতন্ত্র হয়েছে এবং রচনাবলীতেও তাই।

৩ কাব্যাকারে রচিত হলেও এগুলিতে নাট্যপ্রকৃতিই প্রাধান্য পেয়েছে।

৪ এই রচনাগুলিকে কোনো বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায় না। এগুলিতে কিছু আবৃত্তি, কিছু গান, কিছু গদ্যরচনা এবং স্থানে স্থানে নৃত্যের অবকাশও আছে।

শান্তিনিকেতনের অভিজ্ঞতা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

আমি ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ সপ্তাহে একদিন তাড়াহুড়ো করে' শান্তি-নিকেতনে যাই। শান্তিনিকেতনে ইতিপূর্বে আমি ৫।৭ বার গিয়েছি। কিন্তু এবার যাই সেখানে কিছুদিন বসবাস করবার অভিপ্রায়ে। এর কারণ, কলকাতায় তখন থাকা নিরাপদ ছিল না।

লোকমুখে শুনলুম যে, ট্রেনে অসম্ভব ভিড়। যাহোক্, কোন রকমে শান্তিনিকেতনে বহু বিলম্বে গিয়ে পৌঁছলুম। সেখানে গিয়ে দেখি রথীবাবু আমাদের জন্য ঘরদোর সব ঠিক করে রেখেছেন; উত্তরায়ণের এলাকার মধ্যে "পুনশ্চ" নামক সুন্দর একতলা বাগানবাড়ীতে আমাদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে দেখে খুশি হলুম। আমি তার গতপূর্ব জুলাই মাসের প্রথমে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথকে দেখতে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলুম। তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল যে, তিনি কবিরাজী চিকিৎসায় উপকার বোধ করছেন। তারপর কলকাতায় গিয়ে অস্ত্রোপচারের কিছুদিন পর ৭ই অগস্ট তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়, একথা সকলেই জানেন।

গিয়ে দেখলুম শান্তিনিকেতন যা ছিল তাই আছে। নেই শুধু রবীন্দ্রনাথ, যিনি ছিলেন এ আশ্রমের একমেবাদ্বিতীয়ং প্রাণ। আর আবিষ্কার করলুম যে, বোমার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য ঠাকুরপরিবারের অনেকেই সেখানে আমাদেরই মত আশ্রয় নিয়েছেন। যে অঞ্চলে আমরা গিয়ে উঠলুম সেটা দ্বিতীয় জোড়াসাঁকো হয়ে উঠেছে বল্লেই হয়। আমি সস্ত্রীক মাস চার পাঁচ একাদিক্রমে সেখানেই বাস করি।

শান্তিনিকেতনের কোন বিস্তারিত বর্ণনা করব না। এক কথায়, বীরভূমের মরুভূমির মধ্যে শান্তিনিকেতন একটি সুন্দর মরূদ্যান, এবং এ মরূদ্যান রবীন্দ্রনাথের হাতে তৈরি। এ গ্রামটি আধা শহর হয়ে উঠেছে। শান্তি-নিকেতনে বিজলী বাতি আছে, টেলিফোন আছে; যা নেই সে হচ্ছে যথেষ্ট জল। যদিচ রথীবাবু তিনটি ছোট বড় ট্যুব-ওয়েল খনন করেছেন। শান্তি-

নিকেতন একরকম তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে। নানা স্থান থেকে নানা লোক এ রবি-তীর্থ দর্শন করতে আসে। আমি সেখানে বসেই অনেক গণ্যমান্য লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি। আমি যাবার পরেই পৌষমেলায় প্রথমে আগমন করেন স্যর আকবর হাইদারি। তিনি বোম্বের লোক হলেও যখন Acct. Dept.এর কর্মচারী হিসেবে কলকাতায় সস্ত্রীক বাস করতেন, তখন তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। পরে তিনি নিজামের প্রধান মন্ত্রী হন। ভদ্রলোক ছিলেন অতি অমায়িক, নিরীহ প্রকৃতির, এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব বর্জিত। তাঁর স্ত্রী ছিলেন রূপসী, গৌরী তন্বী ও শ্রীমতী। বছর পঁয়ত্রিশেক পর স্যর হাইদারির সঙ্গে আবার শান্তিনিকেতনে সাক্ষাৎ হয়। এতদিন পরেও তাঁর কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করিনি। আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় দেখি তিনি অল্প অল্প কাশছেন। সেই রাত্রেই তিনি দিল্লী ফিরে যান। এবং অল্পদিন পরেই নিউমোনিয়ায় মারা যান। এই পুনর্মিলনও যেমন আকস্মিক, এই মৃত্যুও তেমনি অপ্রত্যাশিত। আমি তাঁকে শুধু সামাজিক লোক হিসেবেই জানতুম, এবং এক্ষেত্রে তাঁর মত উদার প্রকৃতির লোক বিরল। তাঁর স্ত্রী ইতিপূর্বেই মারা গিয়েছিলেন। তিনিও শুনেছি শেষ জীবনে মহিলাদের নেত্রীস্থানীয় হয়ে উঠেছিলেন।

এর মাস দুই পর স্বাধীন চীনের হর্তাকর্তা বিধাতা চিয়াং-কাই-শেক সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে দুদিনের জন্য আসেন। যুদ্ধের পূর্ব থেকেই শান্তি-নিকেতনে জনৈক চীনা অধ্যাপক ছিলেন। এবং ক্রমশঃ সেই জাতিরই বদান্যতায় সেখানে একটি চীনাভবন স্থাপিত হয়, যার বর্তমান অধ্যক্ষ তান-যুন-সান। এই চীনা ভদ্রলোকের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দেখতে সব পুতুলের মত, আর সকলেই বেশ বাঙ্গলা বলে। বিশেষতঃ বড় ছেলেটি এখানকার ইস্কুলেই পড়ে, এবং দিব্যি বাঙ্গলা বলে ও লেখে। চীনাভবনে গুটি দু'তিন চীনা ও সিংহলী বৌদ্ধ ভিক্ষু বৌদ্ধধর্মের চর্চা করেন। এবং একটি বাঙ্গালী ছেলেও চীনাভাষা শিক্ষার জন্য তখন থাকতেন। চিয়াং-কাই-শেক শান্তিনিকেতনের এবং রবীন্দ্রনাথের মহাভক্ত। তাই তিনি বোলপুরে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল আরো ৫।৭ জন চীনা বড়লোক ও সাঙ্গোপাঙ্গ। চিয়াং-কাই-শেককে আমি দেখেছি, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার কোন কথাবার্তা

হয়নি। এর একটি কারণ এই যে, তিনি ইংরেজী ভাষা জানেন না। অপর পক্ষে তাঁর স্ত্রী আমেরিকায় শিক্ষিত, এবং ইংরেজী ভাষা বলতে ও লিখতে পারদর্শী। চিয়াং-কাই-শেক ক্যাথলিক পাদ্রীদের মত একটি আগুলফলম্বিত জোব্বা পরেন; কিন্তু মাডাম সাহেবার বেশভূষা ও চালচলন বিলেতী-ঘেঁষা। চিয়াং-কাই-শেক স্বাধীন চীনের সর্বপ্রধান সেনানায়ক, এবং তাঁর স্ত্রীও তাঁর যোগ্য সহধর্মিনী। এঁরা সকলেই কথাবার্তায় ব্যবহারে অতিশয় ভদ্র। আমার সঙ্গে এঁদের দলের একটি শিক্ষাব্রতীর আলাপ হয়; তিনি ইংরেজী জানেন ও ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে শিক্ষিত। অতি চমৎকার ভদ্রলোক। শুনতে পাই পরে তিনি চিয়াং-কাই-শেকের মন্ত্রীসভার সদস্য হয়েছেন। রথীবাবুর মুখে শুনলুম যে, চীনদেশের উচ্চশ্রেণীর লোক ভদ্রতায় পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য; দেখলুমও তাই। শান্তিনিকেতনের প্রতি যে চিয়াং-কাই-শেকের অগাধ শ্রদ্ধা আছে, তার প্রমাণ তিনি চীনাভবন ও শান্তিনিকেতনকে এককালীন ৮০০০০৲ দান করে গেছেন। এঁদের সাক্ষাৎ পেয়ে আমি অত্যন্ত প্রীতি লাভ করলুম।

তারপরে জুলাই মাসের শেষাশেষি Sir Stafford Crippsএর ভারতবর্ষে দূত হিসেবে আগমন একটি স্মরণীয় ঘটনা। Cripps সাহেবের লেখা এবং বক্তৃতার সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলুম। তাঁর প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং বিশিষ্ট আইনজ্ঞ। বিলেতে তিনি ব্যারিষ্টারদের শীর্ষস্থানীয়। তিনি ইতিপূর্বে আর একবার ভারতবর্ষে আসেন। এবং এদেশে এসে যে সকল বক্তৃতা করেন, তার থেকে আমার ধারণা হয় যে, পলিটিক্সে তিনি নিতান্ত উদার মত পোষণ করেন। আমি 'অলকা' পত্রিকায় তাঁর গুণগান করি। তারপর তাঁকে চার্চিল গবর্ণমেন্ট রাশিয়াতে ambassador করে' পাঠান। কারণ তিনি কম্যুনিজমের পক্ষপাতী ছিলেন। এবং রাশিয়ায় তাঁর দৌত্য সফল হয়েছিল। দেশে ফিরে তিনি চার্চিলের মন্ত্রীসভার সদস্য হ'ন। সুতরাং তিনি যে স্বকপোলকল্পিত কোন প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন, এ সন্দেহ আমার হয়নি। তাঁর এ-দেশে অবস্থানকালে আমরা সকলেই নিত্য খবরের কাগজে তাঁর প্রস্তাবের আলোচনা পড়ে' উত্তেজিত হয় উঠতুম। শেষটা কংগ্রেসের সঙ্গে Cripps আপস মীমাংসা করতে পারলেন না। এবং এ-দেশ থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন।

এর পরে কংগ্রেসের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের মনের গরমিল উত্তরোত্তর বেড়েই চললো। কংগ্রেস Cripps-এর প্রস্তাব সর্ববাদিসম্মতে প্রত্যাখান করেন এবং নিজেদের দাবি জানান। অগস্টের প্রথম দিকেই মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল নেহেরু প্রভৃতি কংগ্রেসের নেতারা গ্রেপ্তার হন। তাতে দেশে একটা মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়; সে চাঞ্চল্যের ঢেউ শান্তিনিকেতন পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। শান্তিনিকেতনের অনেক ছাত্রছাত্রীর ভিতরেও সে চাঞ্চল্যের পরিচয় পাওয়া গিছল।

এর পর দিন পনর কোন আগন্তুক বা চিঠিপত্র বোলপুরে আসেনি। ট্রাঙ্ক টেলিফোনে খবর দেওয়া নেওয়া ও খুব সুবিধা রকম ছিল না। বোলপুরের স্টেশনে— চোখে দেখিনি— কিন্তু শুনেছি— একটি গোলযোগ ঘটে। এর ফলে বোলপুর পাহারা দেবার জন্যে সৈন্য মোতায়েন হয়। সমস্ত অগস্ট মাস এই ভাবে কেটে যায়।

যাঁদের কলকাতায় ফেরা নিতান্ত দরকার, তাঁরা গোরুর গাড়ীতে কাটোয়া লাইনের ছোট রেল ধরে যেতে লাগলেন। বহুদিন পর্যন্ত শুনতে লাগলুম শুধু সেই-জাতীয় গুজব, যাতে মনের শান্তিভঙ্গ করে। পুজোর প্রাক্‌কালে একদিন ভয়ঙ্কর ঝড় হয়, যার প্রকোপে শান্তিনিকেতনের অনেক বাড়ী ঘর ভেঙ্গে পড়ে, এবং বড় বড় গাছ পড়ে গিয়ে বোলপুর থেকে শান্তিনিকেতন যাবার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। আর সেই সঙ্গে বিজলী বাতি পাখাও বন্ধ হয়। তারপর কাগজে মেদিনীপুরের ভীষণ বাত্যা ও জলপ্লাবনের খবর দেখলুম। কাঁথী মহকুমা থেকে জনৈক লোক শান্তিনিকেতনে এসে এই বিষম বন্যার বর্ণনা করলেন। তিনি নাকি আত্মরক্ষার্থে সপরিবারে বাড়ীর চালের উপর উঠে ছিলেন। জলের ধাক্কায় তাঁর বাড়ী ধ্বসে' পড়ল, কিন্তু চালটি ভাসতে ভাসতে শেষটা একটি কোটা বাড়ীর মাথায় ঠেকল। তখন তাঁরা তাড়াতাড়ি নেবে সেই বাড়ীর ছাদে আশ্রয় নিলেন। ইতিমধ্যে তাঁদের বাড়ীর একটি ছোট ছেলে নাকি অনাহারে মারা গিয়েছিল। এ গল্প কতদূর সত্য তা বলতে পারিনে।

কিছুদিন ধরে' কাগজে শুধু মেদিনীপুরের কথাই পড়লুম। ট্রেণ যাতায়াত শুরু হলে কলকাতা থেকে লোক আসা যাওয়া করতে আরম্ভ করলে। তাদের

মুখে কলকাতায় সাইরেনের আওয়াজের কথা শুনলুম। আকাশে সাইরেনের ধ্বনি আর নীচে যাতায়াতের পথ বন্ধ, এইভাবে তাদের দিন কাটতে লাগল। খ্রীষ্টমাসের সময় জাপানীদের বোমা-আক্রমণ শুরু হল। তাতে ন্যাকি বহুলোক মারা যায়। ফেব্রুয়ারি মাসে মহাত্মা গান্ধীর উপবাস আরম্ভ হল। তিনি মরণবাঁচনের মধ্যে ইতস্ততঃ করতে করতে অবশেষে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠলেন। এ অবস্থায় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল না বলে' বড়লাটের দরবারের তিন জন সদস্য পদত্যাগ করলেন।

উপরে যা বর্ণনা করলুম, সে বর্তমান মহাভারতের অ-শান্তি পর্ব। এর পরে যা আসবে সেটি হবে স্বর্গারোহণ পর্ব।